বনফুল রচনাবলী

দ্বাবিংশ খণ্ড

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ।। কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

উপন্যাস : প্রচ্ছন্ন মহিমা ৩
এরাও আছে ১০১
প্রথম গরল ১৯৫
আলোচনা : দ্বিজেন্দ্র-দর্পণ ২৯৫
ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলাল ২৯৭
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ৩১৩
স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৪২
ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৫৯
ভাষণ : তারাশঙ্কর সম্বন্ধে আমার স্মৃতি ৩৮৫

উপন্যাস

প্রচ্ছন্ন মহিমা

উৎসর্গ

আমার বড় বউমা

শ্রীমতী ভারতী মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়াসু

পূর্বাভাস

কল্পনার পটভূমিকায় পর পর যে দুইটি ছবি ফুটিয়া উঠিল, সে ছবি দুইটির কথাই প্রথমে লিখি। তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলা দরকার, কারণ কল্পনার পটভূমিকায় যে সব জীবন্ত ছবি ফুটিয়া ওঠে তাহারা বেশীক্ষণ থাকে না, দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়। ঊষার দীপ্তি, কুয়াসার রহস্য, উল্কাপাতের উজ্জ্বল প্রকাশের মতোই তাহা সত্য কিন্তু ক্ষণস্থায়ী।

সম্মুখে দুরারোহ বিরাট পর্বত, পিছনে তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ বিরাট সমুদ্র। এই উভয় বিরাটের মাঝখানে যে সংকীর্ণ জমিটুকু তাহা উপলাকীর্ণ। তীব্র বাতাস বহিতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই পরিবেশে বসিয়া আছে বজ্র (ভাল নাম ব্রজেন্দ্র) এবং কবি। কবিরও একটা সামাজিক নাম আছে, কিন্তু সেটা অবান্তর। কবির কবি-পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনে হয় উহারা দুইজনে বন্ধু। অনেক কালের বন্ধু।

কবি বলিলেন—"তুমি চুপ করে' আছ কেন। তোমার কাহিনী শোনাও। আমি উৎসুক হয়ে আছি।"

বজ্র উত্তর দিল, "বারবার তুমি বলেই চলেছ—শোনাও, শোনাও, শোনাও। বেশ শোনাচ্ছি। কিন্তু তার আগে জানতে চাইছি একটা কথা, তোমার শোনবার কান আছে তো? আছে তো সেই সূর্যালোকের মতো উদার দৃষ্টি যা অপবিত্রকেও পবিত্র করে, অনুজ্জ্বলকেও উজ্জ্বল করে, অধন্যকেও ধন্য করে, যার কাছে আঁস্তাকুড় আর সমুদ্র তুল্য-মূল্য, সেই দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারবে তো আমাকে? সে দৃষ্টি কি আছে তোমার? তুমি আমাকে অনেক দিন থেকে জানো। কিন্তু পোশাক-পরা আমাকে জানো। জানো আমার সাজানো-পরিচয়। আমার উলঙ্গ সত্তা দেখেছ কখনও? দেখ নি। আমি একজন অজ্ঞাতকুলশীল জঘন্য নগণ্য ব্যক্তি, এদেশের অসংখ্য ধূলিকণার একটি কণিকা মাত্র, স্বার্থের প্রয়োজনে আমি যে কোনও পাতালে নামতে পারি, যে কোনও পোশাকে সাজতে পারি। এসব তুমি জান না। জানলে আমার কাহিনী শোনবার আগ্রহ হ'ত না তোমার। আমাকে নিয়ে বই লিখবে? আমার এই ভাগ্যহত জীবনের মর্মন্তুদ ঘটনাগুলোর মুখরোচক ব্যঞ্জন বানিয়ে তৃপ্ত করবে সেই আধা-অসভ্য, আধা-জানোয়ার জীবগুলোকে, যারা দৈবাৎ-পাওয়া বা চুরি-করা টাকার গরম কাটাবার জন্যে, কিংবা লোকসমাজে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে সংস্কৃতি-ফ্যানের তলায় বসে' সাহিত্যের উদ্গার তোলে যখন তখন? আমার বুকের রক্ত বেচে বাড়াবে তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স?"

কবি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ বজ্র, তুমি এরকম কবিতাঘেঁষা ভাষায় কথা বলছ কেন? অবশ্য আমি আপত্তি করব না। আর একটা কথাও জেনে রাখ, আমার বই বিক্রি হয় না। প্রকাশকরা ছাপতে চায় না। তোমার কাহিনী শুনতে চাই, কারণ তোমার মধ্যে নিজেকেই দেখতে চাই আমি। যদি সরল চাঁছা-ছোলা গদ্যে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারতে তাহলে ভালো হ'ত। বোঝবার সুবিধা হ'ত। তোমাকে বুঝতে চাই। তোমার মনের কথা শুনতে চাই। সেই জন্যেই আমি উৎসুক। তুমি হয়তো

বলবে, কেন খবরের কাগজ পড় না? প্রতিবেশীদের দেখ না? সাহিত্যের ইতিহাসে কি খুঁজে পাওনি আমার মনকে? ওইখানেই তো আমি লুকোতে পারি নি নিজেকে, ভিন্ন নামে ওইখানেই তো আমি ধরা পড়েছি। কিন্তু আমি বলব, না, পাই নি। তোমার মুখেই শুনব তোমার কথা।"

বুজু বলিয়া উঠিল—"তুমি পেয়েছ। কিন্তু পেয়েছ এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে তোমার। আমাদের আচরণে, আমাদের ইতিহাসে, আমাদের সাহিত্যে আমাদের সত্য পরিচয় বিব্রত করছে তোমাকে। তুমি চেষ্টা করছ তোমার কবিত্ব দিয়ে সেটাকে চাপা দিতে। কিন্তু পারবে না। যে বাংলাদেশ অষ্টম শতাব্দীতে গোপালদেবের নেতৃত্বে এদেশে সর্বপ্রথম গণতন্ত্র স্থাপন করতে পেরেছিল—সেই বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে আমারও জন্মভূমি, কিন্তু ওই গোপালদেব কি এই পা-চাটা হুজুকে বাঙালীদের পূর্বপুরুষ ছিলেন? যে বাংলাদেশ সুরেন বাঁড়ুয্যেকে জুতোর মালা পরিয়েছিল, যেখানে খিস্তি-খেউড়ে সকলের মুখে ফেনা উঠছে অবিরত, দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, যতীন সেনগুপ্তকে নিয়ে সুবিধাবাদী কাগজগুলো রাজনীতির 'ব্যাডমিন্টন' খেলেছে, যে দেশে হুজুগের উত্তেজনায় এবং হুজুগেরই উত্তেজনায় যাদের মৃত্যুর পর তাদের গলায় মালা পরিয়ে হৈহৈ করেছে—সে দেশের মনের খবর তুমি জান না? বাংলাদেশে অনেক বড় বড় লোক জন্মেছিলেন মানছি, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ সম্ভব হয়েছিলেন এই দেশেরই মাটিতে, কিন্তু সেই মাটিতেই কি সেই একই যুগে জন্মায়নি অগনিত ট্যাসমার্কা মদ-খোর, গোখাদক, উন্নাসিক, সভ্যতার-পেঁচোয়-পাওয়া নব্য ধিঙ্গিরা? আর্য বাঙালীরা কি দলে দলে বৌদ্ধ হয় নি? বৌদ্ধ বাঙালীরা মুসলমান? তারপর খৃষ্টান? তারপর নব্য হিন্দু? কত রকম ভোল বদলেছে আমাদের, কত রকম খোল বাজিয়েছি আমরা। এই সেদিনকার কথা। ইংরেজকে তাড়াবার জন্য আমরা বোমা ফেলেছিলুম, পিস্তল চালিয়েছিলুম, জার্মানির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলুম—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ফেঁসে গেল। দলে দলে ধরা পড়ে ফাঁসি গিয়ে শহীদ হল বাঙালীর ছেলেমেয়েরা। আন্দামানে গিয়ে ঘানি টানতে লাগল, পাগল হয়ে গেল অনেকে। এদের ধরিয়ে দিয়েছিল কারা? লক্ষ লক্ষ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বাঙালী গুপ্তচররা। বাঙালী শহীদদের চেয়ে বাঙালী গুপ্তচর সংখ্যায় অনেক বেশী। এদের মধ্যেই আমি আছি, কারণ আমি চাকরি চাই, যে কোনও চাকরি। হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে কশাইয়ের দোকানে রোজ গরু কাটতেও আমি প্রস্তুত আছি—যদি বেশী মাইনে পাই। স্বাধীনতার পর যাঁরা হিন্দী-প্রেমী হয়েছেন, বাংলা ভাষায় হিন্দী 'লবজ্' ঢুকিয়ে যাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে 'মোকাবিলা' আর 'সমঝোতা' করছেন, যাঁরা প্রস্তাব না করে' প্রস্তাব 'রাখছেন', নানারকম মোর্চা'য় যাঁদের পরিচয় পাচ্ছি—তাঁরাও এই একই জাতের সুবিধাবাদী তৈল-নিষেক-পটু বাঙালী সন্তান। পয়সা পেলে মাকে বা বউকে ঘাগরা পরিয়ে আম-দরবারে নাচিয়ে দিতেও এদের আপত্তি নেই। যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাদের খোশামোদ করবার জন্যে বাঙালী মন সর্বদাই উৎসুক। এ মনের খবর রাখ না তুমি?"

কবি বুজুর মুখের দিকে স্মিতমুখে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহার চোখের কোণে জল চক্‌চক্ করিতেছে। জল কিন্তু গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল না। স্মিত হাসিটাই মুখে জাগিয়া রহিল। গলা খাঁকারি দিয়া তিনি

বলিলেন, "দেখ বজ্র, আত্মনিন্দায় এক ধরনের সুখ আছে। অনেকটা তিক্ত মদিরার মতো। খেতে প্রথমটা খারাপ লাগে, কিন্তু খেতে খেতে নেশা জমে যায়। তুমি যে মনের দিকে ইঙ্গিত করেছ সে মনের খবর আমি জানি। এ-ও জানি ওটা শুধু বাঙালীদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, মানবজাতিরই বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, নকল-নবীশ মানুষ সর্বকালে সর্বদেশে ছিল, এখনও আছে, চিরকাল থাকবে। সব দেশেই মহৎ আদর্শও আছে, কিন্তু সেই আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করে, জীবন-পণ করবে এরকম মানুষের সংখ্যা কোনও দেশেই বেশী নেই। অধিকাংশ মানুষই পশু, পশুত্বের সুখই অধিকাংশ মানুষ উপভোগ করতে চায়। তাদের কেন্দ্র করেই এক ধরনের আপাত-মধুর পশু-সভ্যতাও গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের সহায়তায়। পশু-ধর্ম, পশু-রাজনীতি, পশু-সাহিত্য এমন কি পশু-সংস্কৃতিও আজকাল চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে সকলের। কিন্তু তবু তার মধ্যেও এমন মানুষ আছে যার মনে বিদ্রোহ জেগেছে এ-সবের বিরুদ্ধে। আমি জানতে চাইছি, তোমার মনেও জেগেছে কি না। নকল-করা খাঁটি বিদ্রোহ নয়, খাঁটি বিদ্রোহ যা তোমার বৈশিষ্ট্যে সুন্দর, তোমার সুগন্ধে সুরভিত। অর্থাৎ আমি তোমার মধ্যে সেই বস্তুর সন্ধান করছি যা গোলাপ নয়, জবা নয়, রজনীগন্ধা নয়, পদ্ম নয়, অথচ যার যোগ্যতা আছে ওদের সঙ্গে সমাসনে বসবার। যা পুষ্প, কিন্তু কোনও বিশেষ পুষ্পের নকল নয়। যা অনন্য, যা অনবদ্য।"

বজ্র হাসিয়া উঠিল। তাহার পর গম্ভীর হইয়া গেল। "দেখ বন্ধু, তোমার চোখে জলের আভাস দেখে যা মুখে আসছিল তা আর বললাম না। কিন্তু তোমার ওই লম্বা-লম্বা বুলির মোহে মুগ্ধ হ'য়ে আমি যদি ভুলে যাই যে আমি কুকুরের মতো খোশামুদে, চটকের মতো মৈথুন-প্রিয়, আমি যদি বলি আমি পরশ্রীকাতর নই, মিথ্যুক নই, অলস নই, নিন্দুক নই, অসমর্থ বাক্যবাগীশ নই, আমি যদি বলি আমার সমস্ত বাহ্যিক প্রসাধন আমার অন্তরের পশুত্বকে ঢাকবার কৌশল মাত্র নয়, তাহলে কি সেটা সত্যভাষণ হবে? মিথ্যার আবরণে মণ্ডিত, ভণ্ডামির কারুকার্যে শোভিত পরিচয় কি আমার সত্য পরিচয়? সেই মিষ্টি মিষ্টি লোক-ভোলানো সত্য তুমি চাও না কি।"

কবি উত্তর দিলেন—"তোমার সত্য পরিচয় কি, তা আমাকে ঠিক করতে দাও। তুমি তোমার দোষের যে তালিকা দিলে তাতে আমি হতাশ হই নি। আমি জানি ওই দোষগুলো তোমার বৈশিষ্ট্য নয়, বরং তুমি যে তার-স্বরে সেটা বলতে পেরেছ এইটেই তোমার বৈশিষ্ট্য। আগেই বলেছি সব মানুষেরই ওসব দোষ আছে। দোষের বীজ নিয়েই আমরা জন্মেছি, আগাছা জন্মাবেই নানারকম। বিদেশী পপুলার সাহিত্য পড়ে দেখ, বিদেশী মাসিকপত্রের পাতা ওলটাও, দেখতে পাবে তোমার চেয়েও বড় বড় পাষণ্ড বিদেশের রঙ্গমঞ্চ গুলজার করে রেখেছে। শুধু আজ নয়, চিরকাল। আমাদের মধ্যেও প্রচুর পশুত্ব আছে, চিরকালই আছে, কিন্তু তার জন্য আমরা বরাবরই লজ্জিত। ওদের দেশে সে লজ্জাটুকুও নেই। ওদের দেশে পার্কে কুক্কুর-কুক্কুরীর মতো মৈথুনরত নরনারীর ভীড়। ওদের সাহিত্যে ওইসব চিত্রই রূপায়িত হয়ে বাহবা পাচ্ছে নির্লজ্জ জনতার কাছে। আমাদের দেশেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে বিদেশী আবর্জনাও এসে জমছে আমাদের মনে। ওদের পশুত্বকেও আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ভুলে যাচ্ছি যে পশুত্বটাই ওদের পরিচয় নয়। ওদের পরিচয় সেইখানে

যেখানে ওরা পশুত্বকে অতিক্রম করেছে, যেখানে ওরা মনুষ্যত্বের মহৎলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সাহিত্যে-বিজ্ঞানে যেখানে ওরা ভূমা-বিলাসী, সেখানেই ওদের সত্য পরিচয়। আমি জানি তোমার মধ্যেও পশুত্বের সীমা লঙ্ঘন করবার আকুলতা আছে। তোমার অসীম দুর্দশার মধ্যেও তোমার অশান্ত মন তাই খুঁজছে, যা পেলে সে কৃতার্থ হ'য়ে যাবে। তা ধন নয়, মান নয়, মনুষ্যত্ব। তা নারীমাংস নয়, প্রেম। তা সেই পরশমণি যা তোমার সমস্ত লোহাকে নিমেষে সোনা করে' দেবে। তোমার সর্বাঙ্গে কাদার দাগ, তোমার অপরিচ্ছন্ন মনে লালসার ক্লিন্নতা, মাঝে মাঝে তুমি সেই কাদার দাগ আর মনের মলিনতা নিয়ে আস্ফালনও করছ, ধূর্ত নেতাদের পাল্লায় প'ড়ে স্লোগান দিতে দিতে মিছিলে ভীড় বাড়াচ্ছ, পশু-লেখকের লালসা-বমনকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলে' ভুল করছ, কিন্তু আমি জানি এসব করে' অন্তরের নিভৃতে তোমার লাঞ্জিত সত্তা কাঁদছে। বাইরে সে তার দুর্দশার জন্যে দায়ী করছে অনেককে কিন্তু সে জানে এর জন্যে সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। মনে মনে সে আকুল হ'য়ে আছে কোন্ পথে কোথায় গিয়ে স্নান করে' সে পবিত্র হবে। কোন্ গঙ্গায়, কোন্ সাগরে, কোন্ ঝরনাতলায় গিয়ে কলঙ্কমুক্ত হ'য়ে নব-জীবন লাভ করবে সে, কবে বলতে পারবে আমি ধন্য হলাম। এই তার গোপন আকাঙ্ক্ষা। বাইরে যদিও সে উদ্ধত নাস্তিক, বাইরে যদিও সে ভুয়ো বিজ্ঞানের আপাত চাকচিক্যে মুগ্ধ, কিন্তু মনে মনে তাই সে হ'তে চায় যা সে হ'তে পারে নি। সেই সনাতন মনুষ্যত্বের দিকেই সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে তার পঙ্গু পৌরুষ—যা সে পায় নি—যা সে পেতে চায়। তার সমস্ত ভণ্ডামি, তার সমস্ত নীচতা, তার সমস্ত বক্র-ভঙ্গী ওই নিদারুণ অসামর্থ্যকে ঢাকবার জন্যে। ওই মনুষ্যত্ব-তীর্থের দিকে এগিয়েও চলেছে সে দিবারাত্রি। কিন্তু সে জানে না যে সে এগোচ্ছে। অনেক সময় জেনেও স্বীকার করতে চায় না, অনুতপ্ত চরিত্রহীন লোক সতীস্ত্রীর কাছে এসে যেমন অসঙ্কোচে বলতে পারে না, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি—এ-ও অনেকটা সেই রকম। তোমাকে আমি চিনি, বন্ধু।"

"আমাকে তুমি চেন? তাহলে আর আমার পরিচয় জানবার এ আগ্রহ কেন তোমার! তোমার ওই চেনার আলোকে ফুটিয়ে তোল আমাকে। আমার দোষ যদি তোমার কল্পনাকে বিচলিত না করে, আমার গায়ের পাঁক যদি তোমার স্বদেশী চোখে চন্দন বলে' প্রতিভাত হয়, তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই! এঁকে ফেল আমার একটা রংচঙে ছবি তোমার কল্পনার তুলি দিয়ে—হয়তো সিনেমার বাজারেও চলবে ছবিটা। আমি জানি, আমি কি বস্তু! অবাস্তব স্বর্গের মিথ্যা-মহিমার মুকুটে আমাকে সাজিয়ে যদি তৃপ্তি হয় তোমার, সে তৃপ্তির পথে আমি অন্তরায় হব না, যদি তোমার বিবেক না হয়।"

"আমার বিবেক তো শুধু আমারই বিবেক নয়, তোমারও বিবেক। বস্তুত সমস্ত জাতিরই বিবেক। যুগ যুগ ধরে' সে বিবেক মহাকালের ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে, লক্ষ লক্ষ সংস্কারের শৃঙ্খল পরে' ইতিহাসের আলো-ছায়া-বিচিত্র পথ পার হ'য়ে, বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় যে রূপ ধারণ করেছে, তাই আমাদের বিবেক। তোমার সবটা তুমি দেখতে পাও নি, কেউ পায় না। তোমার মহিমা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তোমার কাছে। সকলের কাছেই থাকে। কবির চোখেই মানুষের বা জাতির স্বরূপ ধরা

পড়ে প্রতিভার দূরদর্শিতায়, ইতিহাসের পটভূমিতে। কবিই মানবজাতির চিত্রকর, ঐতিহাসিক এবং নিয়ন্তা। আমি হয়তো খুব বড় কবি নই, কিন্তু তোমার সত্য রূপ আমি দেখেছি। আমি যা দেখেছি তুমি তা দেখ নি। সেইটে আমি আঁকব।"

বজ্র কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর হাসিয়া উঠিল আবার।

"হঠাৎ একটা অদ্ভুত ছবি ভেসে উঠল আমার চোখে। একটা বাঁদরওলা বাঁদর নাচাচ্ছে। আমিই সেই বাঁদর। আমি ঠিক আছি, কিন্তু বাঁদরওলাটার চেহারা বদলাচ্ছে। সে কখনও আর্য, কখনও বৌদ্ধ, কখনও মুসলমান, কখনও ইংরেজ, কখনও ব্রাহ্ম, কখনও কংগ্রেসী, কখনও কমিউনিস্ট—নানাবেশে সে আমাকে নাচিয়ে চলেছে। সকলের অন্তরালে তুমিই আছ না কি! তোমার খুশি মতো তুমিই আমাকে নাচাচ্ছ কি চিরকাল?"

"যারা বাঁদর নাচায় তারাও কবির কাছ থেকে প্রেরণা নেয়, কবির ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু কবির কাজ বাঁদর নাচানো নয়, বাঁদরকে শিব করা। পশুত্বের পলিমাটির তলায় যে শিব চাপা পড়েছে তাকে আবিষ্কার করা। তুমি তোমার কথা বল, অকপটে বল, আমি সে কাহিনীর মধ্যে তোমার সত্য স্বরূপ আবিষ্কার করব।"

"কি ভাবে বলব—"

"যেমন খুশি তোমার—"

"যেমন খুশি? তুমি হংসের মতো নীরের ভিতর থেকে ক্ষীর বার করে নেবে? ক্ষীর তো নেই, পাঁকই আছে কেবল। আমি বদ লোক। অত্যন্ত বদ"

"বল না শুনি। পাঁক ঘাঁটা অভ্যাস আছে আমার—"

"অভ্যাস আছে?"

"আছে বই কি। পাঁক না ঘাঁটলে পঙ্কজের সন্ধান মেলে না। আর পঙ্কজের নাগাল না পেলে পঙ্কজিনীর পদপ্রান্তে পৌঁছব কি করে? ওই তো জীবনের লক্ষ্য। তুমি বল—"

"কিন্তু আমার জীবনের কাহিনী তো একসূত্রে গেঁথে রাখি নি কখনও। ছাড়া ছাড়া ঘটনা মনে আছে—"

"তাই বল—"

দুরারোহ পর্বত ও উত্তাল তরঙ্গসমাকুল সমুদ্র অন্তর্হিত হইল। কবি এবং বজ্রর ছবিও মিলাইয়া গেল। কল্পনা মেয়ের মতো আসে, কিন্তু থাকে না। আমার নিজেরই মন সম্ভবত কবি-রূপে আমার মানসচক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। আর বজ্র? বজ্র অলীক কল্পনা নয়। বজ্র আমার বাল্যবন্ধু। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অনেক দুঃখ-কষ্ট, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক নিগ্রহ-নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাকে। কিন্তু তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিল বজ্র। কোনোও পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হয় নাই। কিন্তু হায়, চরিত্রহীন ছিল সে। হেন কু-কাজ নাই যাহা সে করে নাই। নিত্য নূতন মেয়ে তাহার পিছু-পিছু ঘুরিত। নেশার রাজা ছিল। বড় বড় চাকরি পাইয়াও রাখিতে পারে নাই। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে, তহবিল ভাঙার দায়ে, জনৈক বড়লোকের পত্নীকে প্রকাশ্য সভায় অশ্লীল ভাষায় অপমান করিয়াছিল বলিয়া দেশত্যাগ করিতে হইল তাহাকে। হঠাৎ সে একদিন অন্তর্ধান করিল। না করিলে তাহার জেল হইয়া যাইত। দশ বছর তাহার কোনও

খবর পাই নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে মেয়েটিকে সে অপমান করিয়াছিল, সে মেয়েটি নাকি গোপনে গোপনে তাহার খবর রাখে, লুকাইয়া টাকা-কড়িও পাঠায়। আমার বোন কুশলার বান্ধবী সে। কুশলার মুখেই একথা একদিন শুনিয়াছি। কুশলা একদিন বলিল, "অমিলা বড় বেহায়া, দাদা। অত অপমানের পরও বজ্রদাদাকে ও আবার চিঠি লিখেছে। টাকাও পাঠায় নাকি শুনেছি। এতটুকু আত্মসম্মান নেই ওর"

"অমিলা কি বজ্রর ঠিকানা জানে না কি—"

"একজন পাইলট বজ্রদার খুব বন্ধু। সে নাকি জানে। সেই পাইলটের সঙ্গে অমিলার ভাব হয়েছে। তার হাত দিয়েই চিঠিপত্র টাকাকড়ি পাঠায়। তুখোড় মেয়ে তো"

আমার সন্দেহ কুশলাও বজ্রকে ভালবাসিত। এখনও বাসে। কারণ অনেক ভালো ভালো বিবাহের প্রস্তাব সে প্রত্যাখান করিয়াছে।

আজ সকালে একজন সৌম্যদর্শন ব্যক্তি একটি প্যাকেট হাতে করিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল।

নমস্কার। বজ্রবাবু, এই প্যাকেটটি পাঠিয়ে দিয়েছেন—"

"বজ্র? কোথা আছে সে"

এখন কোথা আছে জানি না। দিন সাতেক আগে দেখা হয়েছিল রোমে। শুনেছি সে আমেরিকায় প্রফেসারি করে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমি একজন পাইলট—"

"ও। নমস্কার, বসুন"

"না, এখন বসব না। এখনি 'ফ্লাই' করতে হবে আমাকে। এই প্যাকেটটা যে আপনি পেয়েছেন তা একটু লিখে দেন যদি তাহলে ভালো হয়। আবার যখন দেখা হবে তাকে দিয়ে দেব আপনার চিঠিটা—"

"তার ঠিকানা কি?"

"তা তো জানি না আমি। আমার গতিবিধির খবর রেখে সে-ই দেখা করে আমার সঙ্গে—"

কোন্ ইউনিভার্সিটিতে সে প্রফেসার?"

"তাও আমি জানি না। প্রফেসার কিনা তা-ও জানি না ঠিক। একজন এয়ার-হোসটেস বলেছিল খবরটা। বজ্র কিছু বলে নি। নিজের সম্বন্ধে সে কোনও কথাই বলতে চায় না কখনও"

"বসুন একটু। চিঠিটা লিখে দি। আপনার নামটা কি?"

"পাইলট মুখার্জি লিখলেই বুঝতে পারবে সে।"

পাইলট মুখার্জি সামনের চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন।

লিখিয়া দিলাম—"ভাই বজ্র, অনেকদিন পরে তোমার খবর পাইলট মুখার্জির কাছে পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। তিনি একটি প্যাকেট আমাকে দিয়ে গেলেন। প্যাকেটে কি পাঠিয়েছ বুঝলাম না। পাইলট মুখার্জি তোমার ঠিকানা বলতে পারলেন না। তুমি কোথায় আছ, কি করছ, জানতে ইচ্ছে করে। সব খবর দিয়ে চিঠি লিখো। আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।"

চিঠি লইয়া পাইলট মুখার্জি চলিয়া গেলেন।

প্যাকেটটি সামনে লইয়া আমি বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে মানসপটে একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল। সম্মুখে দুরারোহ পর্বত, পিছনে বিশাল সমুদ্র। মাঝখানে উপলাকীর্ণ সংকীর্ণ তটে আমি আর বন্ধু মুখোমুখি বসিয়া আছি। কল্পনায় তাহার সহিত কথা হইল, অনেক কথা। তাহা আগেই লিখিয়াছি।

দুই

প্রথম চিঠি

প্যাকেটের ভিতর একটি চিঠি ও একটি পাণ্ডুলিপি ছিল। চিঠিটা এই। বেশ বড় চিঠি।

ভাই কবি,

আমার আশা তোমরা ছেড়ে দিয়েছ এ সান্ত্বনা যদি নিজেকে দিতে পারতাম তাহলে আরাম পেতাম বোধ হয়। কিন্তু তা দিতে পারছি না নিজেকে। আমি বুঝতে পারছি কেউ তোমরা আমার আশা ছাড় নি। তোমরা আশা করে' আছ ফুটবলটা একদিন-না-একদিন ফিল্ডে (field) আবার ফিরে আসবে তখন সকলে মিলে আবার লাথাব তাকে। একটা কথা জান? লাথাবার মতো লোক না পেলে তোমাদের জীবন বৃথা হয়ে যায়। ঘোঁট করবার মতো একটা পুরুষ বা নারী, একটা রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি, বা নিদেনপক্ষে বাংলা সাহিত্য নিয়ে দুশ্চিন্তা এসব না করলে তোমাদের ভাত হজম হয় না, জীবন বিস্বাদ হয়ে পড়ে। তোমরা যা কিছু কর তার ওই এক উদ্দেশ্য—বিস্বাদ জীবনকে সুস্বাদ করা। তোমাদের দেশভক্তির পনরো আনা তিনপয়সা হুজুগ এবং সে হুজুগের আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন। দেশে যথেষ্ট দুঃখ আছে, কিন্তু তোমরা সে দুঃখ মোচন করবার জন্যে ততটা সচেষ্ট নও যতটা সচেষ্ট সে দুঃখ নিয়ে বাগবিস্তার করতে—কবিতায়, থিয়েটারে, আড্ডায়, সভায়, খবরের কাগজে। কালোবাজারীরাও কালোবাজারের বিরুদ্ধে সাড়ম্বরে বক্তৃতা করে চলেছে, ঘোর মিথ্যাবাদী মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। কষ্ট অপরিসীম কিন্তু আর্তনাদ নেই, সবাই মজা দেখছে, বিক্ষত মর্মকে থেঁতলে দিচ্ছে ওরা ঠিকই—কিন্তু তবু সবাই মজা করছে তাই নিয়ে। মজাদার জাত তোমরা। মজা নদীর মতো। তোমরা যদি মর্মন্তুদ একটা আর্তনাদ করতে পারতে তাহলে ওই গজদন্তের মিনারটা কেঁপে উঠত, ফেটে যেত ওর মণিমাণিক্যখচিত ছাদটা, কিন্তু তোমরা আর্তনাদ করছ না, মজা করছ। তোমরা থিয়েটারের স্টেজে দাঁড়িয়ে ধার-করা গোঁফ-দাড়ি পরে' নকল গদা ঘুরিয়ে বলছ—ছাদ ফাটাব, ছাদ ফাটাব। ওতে ছাদ ফাটে না, ছাদ ফাটাবার ইচ্ছেও নেই তোমাদের। তোমরা যাহোক কিছু নিয়ে মজা করতে চাও কেবল। কোথাও একটু কেচ্ছার গন্ধ পেলে নাক বাড়িয়ে ছুং ছুং করে যাও সেখানে। আমি এমন লোক দেখেছি যারা কেচ্ছার গল্প ছাড়া আর অন্য কোন গল্প জানেই না। পর্নোগ্রাফি

তাদের কাছে বড় সাহিত্য, যে লেখক কায়দা করে' অশ্লীল ইঙ্গিত-ভরা লেখা লেখে, সে জিনিয়াস। শূকর-শূকরীরা কাদাই ভালবাসে। তোমরা নিজেদের মানুষ বলে' পরিচয় দাও, তোমাদেরও কিন্তু ওই প্রবৃত্তি। কাদাতেই মজা পাও। আমি তোমাদের চক্ষে কাদার সমুদ্র ছিলাম একটি। আমি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করাতে তোমাদের অনেকেরই অন্তর্দাহ হয়েছে নিশ্চয়, কল্পনা-নেত্রে নিশ্চয়ই ভেবেছ সমুদ্র এখন মহাসমুদ্র হয়েছে, যথাকালে সব খবর পাওয়া যাবে, কারণ তোমরা জান ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই। আমার আশা যে তোমরা ছাড়নি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। পাইলট মুখার্জি সে-সব প্রমাণ বহন করে' নিয়ে আসে। বুঝতে পারি তোমরা আমাকে ভোল নি। আজ এমন অযাচিতভাবে তোমাকে চিঠি লিখছি কেন একথা নিশ্চয়ই তোমার মনে জাগছে। ভুরু এতক্ষণ কুঁচকে গেছে হয়তো। দেবার মতো কোনও জবাবদিহিও নেই আমার। যেটা আছে সেটা বাজে, অত্যন্ত বাজে। মেয়েলি সেণ্টিমেণ্ট। তোমাদের জন্য মন কেমন করছে ভাই। বিশেষ করে' তোমার জন্যে। তুমি আদর্শবাদের লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতে—আমি খারাপ ছেলে ছিলাম—আমাকে দেখলে তোমার বক্তৃতাটা আরও উথলে উঠত—তাই আমি তোমাকে এড়িয়ে চলতাম। তোমাকে প্রিগ্ (prig) মনে হত। দুধ ভাল জিনিস, কিন্তু ওতে কোনোও দিন রুচি ছিল না আমার, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েই কাটিয়েছি চিরকাল। কিন্তু আর পাচ্ছি না ভাই। শরীর ভেঙে গেছে। অখাদ্য কুখাদ্যে আর রুচিও নেই। খাঁটি দুধেরই স্বপ্ন দেখি এখন, যদিও তা কোথাও পাবার উপায় নেই। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। এ বাজারে তুমি খাঁটি দুধ। আমার পরিচিত এলাকায় জল-মেশানো মাখন-তোলা দেশী দুধের কদর বেশী। টিনে-ভরা বিলিতি দুধেরও। দুটোই চড়া দামে বিক্রি হয় বাজারে। চড়া দামটা হয়তো কষ্টেসৃষ্টে জোগাড় করতে পারি কিন্তু ও জিনিস আর খাবার ইচ্ছে নেই। খেতে হলে খাঁটি টাটকা দেশী দুধই খাব। তাই তোমার কাছে এলাম। আমার চরিত্রের আর একটা পরিবর্তনও হয়েছে। নকল বিলিতি-মার্কা-মারা বাঁদরদের পাল্লায় পড়ে' আমার ধারণা হয়েছিল যে অসভ্যরাই জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে, যারা সুসভ্য তাদের তৃষ্ণাও নাকি সুসভ্য, মদ্য ছাড়া সে তৃষ্ণা না কি অন্য কিছুতে নিবারিত হয় না। আমি মদ কম খাই নি, এখনও কিনে খাবার মতো পয়সা হাতে আছে, মদ খাওয়ার সঙ্গী-সঙ্গিনীও যথেষ্ট (আশে-পাশে সঙ্গী-সঙ্গিনী না থাকলে মদোচ্ছল হওয়া যায় না, নেশা জমে না), কিন্তু ভাই মদ খেয়ে তৃষ্ণা আর মিটছে না। এখন সন্ধান করছি কুঁজোর ঠাণ্ডা জল কোথায় পাই। কুঁজো বাজারে পাওয়া যায়, তাতে জল ভরে ঠাণ্ডাও হয়তো করা অসম্ভব নয় কিন্তু আমি যে কুঁজোর ঠাণ্ডা জল চাইছি তাতে জল ছাড়াও আরো এমন কিছু থাকবে যা বাজারে দুর্লভ। আমাকে মনে করে' আমার তৃপ্তি হবে বলে বিশেষ করে' আমার জন্যেই যে জল সস্নেহে তুলে সযত্নে ঢাকা দিয়ে ঠাণ্ডা ঘরের কোণে রাখা হয়েছে, যে জলে প্রেমের ছোঁয়া আর মনের মাধুরী মিশেছে, তা বাজারে পাওয়া যায় না। বাজারে যা পাওয়া যায় তাতে অরুচি হ'য়ে গেছে। তাই তোমার কাছে এলুম। তুমি হয়তো বলবে—'এলে তো। কিন্তু কি করব আমি তোমাকে নিয়ে। তুমি ঝরঝরে ভাঙা মোটর-কারের মতো, তোমার হর্ন ছাড়া আর সব কিছুই শব্দ করছে। সত্যি সত্যি যদি মোটর-কার হ'তে অমলকে খবর দিতুম, 'সে ভাল মিস্ত্রি, মন দিয়ে

কাজ করলে তোমাকে হয়তো খাড়া করে' তুলত। কিন্তু তুমি তো মোটর-কার নও, তুমি মানুষ! ফোর্ড বা অস্টিন তোমাকে সৃজন করেন নি করেছেন রহস্যময় বিধাতা। তার সৃষ্টি এই মানুষ নামক যন্ত্রটিকে মেরামত করবার জন্যে বহু পূর্বে বুদ্ধ, যিশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দেরা বড় বড় ওয়ার্কশপ খুলেছিলেন—কিন্তু হেরে গেছেন। আমি কি করব তোমাকে নিয়ে! আমি সামান্য লোক।' তুমি ঠিক এইসব কথাই বলছ কি না তা জানি না, কল্পনা করছি হয়তো বলছ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সব জেনে শুনেই তোমার কাছে এলাম। রোগী যেমন ডাক্তারের কাছে আসে, ঠিক সে মনোভাব নিয়ে আসি নি। আমার মনোভাবটা—ঠিক কি উপমা দিয়ে বোঝাই তোমাকে মাথায় আসছে না—উপমার অলঙ্কার পরিয়ে কথা কইতে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু মনে হয় ও ছাড়া উপায়ও নেই—আমরা যেমন উলঙ্গ হয়ে পথে বেরুতে পারি না, তেমনি নিরুপমা কথাও কইতে পারি না যদিও জানি পোশাক অলঙ্কার বা উপমা সত্যটাকে ঢেকে রাখে অনেকখানি। উপমা দিয়েই যদি বলতে হয় তাহলে বলব একটা ছেলে মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে' ক্ষতবিক্ষত হয়ে মায়ের কাছে ছুটে যায় যে মনোভাব নিয়ে, আমি সেই মনোভাব নিয়েই তোমার কাছে এসেছি, যদিও তোমার সঙ্গে আমার মা ছেলের সম্পর্ক নয়। হ্যাঁ, একটা অবান্তর কথা মনে পড়ল। প্রকৃত প্রেমের নানারকম সামাজিক রূপ আছে—মা-ছেলে, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, প্রণয়-প্রণয়িনী, স্বামী-স্ত্রী, বান্ধব-বান্ধবী, কিন্তু আসলে সব প্রেমই এক যদি সেটা খাঁটি হয়, অনেকটা খাঁটি সোনার মতো, গয়নার চেহারা যা-ই হোক। আর আমার মনে হয় মা-ছেলের প্রেমটাই বোধ হয় আদি অকৃত্রিম প্রেমের মহত্তম প্রকাশ। তাই মা-ছেলের উপমাটা খুব যে বেখাপ্পা হল তা মনে হচ্ছে না। যাই হোক—এসে গেছি। প্রথমেই এবার রহস্যের যবনিকাটা তুলে ফেলি। আমি এই কলকাতা শহর ছেড়ে কোথাও যাই নি। আমিই গুজব রটিয়েছি আমি না কি বিলেত গেছি, আমিই প্রচার করেছি আমি আমেরিকায় প্রফেসারি করছি। কলকাতা বিশাল শহর, বিশাল সমুদ্র। এখানে আত্মগোপন করা খুব সহজ। আমি এখন যে জায়গায় আছি তা কলকাতা শহরেই অবস্থিত। যাদের মধ্যে আছি তারা কলকাতার লোক। অর্থাৎ এই কলকাতা শহরের নব পরিস্থিতিতে আমার নবজন্ম লাভ হয়েছে। আশ্চর্য, নয়? তোমাদের জগতে আমার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তোমাদের পাশেই একই নগরে আবার আমি জন্মেছি। তোমাদের জগতে আমার নাম ছিল বুজু। এখন আমি অন্য নামে পরিচিত। তোমাদের জগতে আমার পরিচয় ছিল শয়তান, এ জগতে আমি মহাপুরুষ। আমরা যখন মারা যাই তখনও এই কাণ্ড হয় বোধহয়। কাছেই থাকি, কিন্তু কেউ আমাদের ধরতে ছুঁতে পারে না। আমাদেরও বোধ হয় ইচ্ছে হয় না পুরাতন জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার। আমারও সে ইচ্ছে হয় নি এতদিন, আজ হঠাৎ হল। সেদিন মহাজাতি সদনে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। যৌবনে যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা আমার চিত্তহরণ করেছিলেন তাঁহারাই আবার একত্রিত হয়ে নেমেছিলেন একটা নাটকে। মহাজাতি সদনে ওই নাটক দেখতে তুমিও গিয়েছিলে। আমার কাছেই বসেছিলে, কিন্তু আমাকে চিনতে পার নি। পারবার কথাও নয়। আমার এক মুখ কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ির জঙ্গল, বড় বড় বাবরি চুল, আর কালো গগল্‌সের রহস্য ভেদ করে তোমার সেকালের বুজুকে চিনতে পার নি তুমি। আমি কিন্তু তোমাকে চিনেছিলাম।

দেখলাম তুমি রোগা হয়ে গেছ, বুড়ো হ'য়ে গেছ একটু। মনে পড়ল যৌবনে তুমি আমাকে কবিতা গল্প পড়ে শোনাতে। তোমার কিছু লেখা ছাপাও হয়েছে, কিন্তু তুমি পপুলার হ'তে পার নি। দু'চারটে হিংসুকে বেরসিক সমালোচক আলতো-আলতো ভাবে তোমার পিঠ চাপড়ে মুরিব্বিয়ানা প্রকাশ করেছিল বলে' তুমি তোমার বই আর সমালোচনার জন্যে পাঠাও নি। ভাগ্যে এ দেশেও কিছু কিছু সত্যিকার রসিক আছে তাই তোমার লেখার কিঞ্চিৎ কদর হয়েছে। আমি অবশ্য তোমার কড়া সমালোচক ছিলাম, নানাভাবে তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছি, কিন্তু মনে মনে আমি বরাবরই তোমার ভক্ত ছিলাম, যদিও এ কথা তোমার সামনে কখনও বলিনি। বললে, খোশামোদের মতো শোনাতো। অনেকে দেখেছি, যারা সাহিত্যের 'স'-ও জানে না, ডাস্টবিন, আস্তাকুড় নিয়েই যাদের কারবার, সরস্বতীর কমল-বনের ধার কাছ দিয়েও যারা হাঁটেনি কখনও—তারা তোমার লেখার অজস্র স্তুতিবাদ করে' তোমার কাছ থেকে নানারকম সুবিধা আদায় করে নিয়েছে এবং সব জেনে-শুনেও তুমি সে-সব সুবিধা তাদের দিয়েছ। আমিও তোমার কাছে কম সুবিধা পাই নি। আমার বাবা যখন আমাকে ত্যাগ করলেন, তুমিই তখন আশ্রয় দিয়েছিলে আমাকে। তোমার আশ্রয় না পেলে আমি এম. এ. পরীক্ষাটা দিতে পারতাম না। তোমার লেখার নির্জন ঘরটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের পড়ার ঘরে বসে' তুমি লিখতে? ভীড়ে বার বার তোমার লেখার ছন্দপতন হ'ত নানা গোলমালে, কিন্তু আমাকে তুমি তাড়াও নি। কিন্তু আমি এর কি প্রতিদান দিয়েছিলাম তোমার মনে আছে তো? আসবার সময় তোমার দামী 'টাইমপীস'টি চুরি করে' এনেছিলাম। এর পরও তুমি তোমার বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দিয়েছ। টাইমপীসের কথা উল্লেখ পর্যন্ত কর নি। এমন ভাব দেখিয়েছ যেন ও জিনিস তোমার ছিল না। আমি শুধু 'টাইমপীস্' চুরিই করি নি, তার চেয়েও মহত্তর কাজ করেছিলাম একটা। তোমার নবোদ্ভিন্নযৌবনা ভগ্নী কুশলার সঙ্গে প্রেমও করেছিলাম। সে প্রেম কোন্ উলঙ্গ পরিণতিতে পৌঁছেছিল তা লিখে তোমাকে বা কুশলাকে লজ্জা দিতে চাই না। এইটুকু শুধু বলছি—জয়, জয় বিজ্ঞানের জয়। তাঁরা সাক্ষাৎ মৃত্যু ইলেকট্রিফায়েড্ (electrified) তারকেই ওয়াড় পরিয়ে ইনস্যুলেট (insulate) করেন নি, অনেক পাশবিকতার গায়েও নানারকম ওয়াড় পরিয়েছেন। কামুকদের জন্যে কনট্রাসেপশন্ (contraception), ক্রোধীদের জন্য ট্র্যাংকিউলাইজার (tranquiliser), লোভীদের জন্য নানারকম হজমের ওষুধ বার করে বিজ্ঞান মোহ, মদ, মাৎসর্যের যে বর্ণাঢ্য বহ্ন্যুৎসব করছে, আধুনিক জগতে তার নামই প্রগতি। কুশলাকে নিয়ে সে প্রগতির কিছু চর্চা করেছিলাম তোমার বাড়িতে বসে'। এম. এ.-তে যদিও আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম কিন্তু কুশলা আমাকে পাসমার্ক দেয় নি। অসাধারণ মেয়ে ওই কুশলা। শুনেছি ও নামকরণ তুমিই করেছিলে। চমৎকার নামটা দিয়েছ। কিন্তু তুমি বোমভোলা লোক, নামটা দেবার পরই অন্যমনস্ক হয়ে গেছ, লক্ষ্য করনি কিভাবে ও সে নামের মর্যাদা রক্ষা করেছে। বৌদি কিন্তু তোমার মতো অন্যমনস্ক নন, কুশলার লীলাকৌশল নারীসুলভ সহজাত বুদ্ধিবলে তিনি সব লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু মুগ্ধ হ'তে পারেন নি। ঈর্ষার কালো ধোঁয়া তাঁর দৃষ্টিকে মলিন ক'রে দিয়েছিল, আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। তিনি কুশলার মহিমাটা দেখতে পান নি। ঈর্ষা কেন হয়েছিল জানো? আমি জানি। কারণ

অনেক মেয়েমানুষ ঘেঁটেছি। এ কথা নিশ্চয় তোমার অবিদিত নেই যে ইয়ার-বক্সি মহলে ওরা আমার নাম রেখেছিল বুজু দি বায়রন্। হ্যাঁ, বায়রনই ছিলাম আমি। একপাল মেয়ে আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। আধুনিক সাহিত্যের বাজারে যে-সব বই যুগান্তকারী বাস্তব উপন্যাস নামে ঘোষিত বিঘোষিত নিনাদিত সিনেমায়িত প্রকাশিত এবং প্রচারিত হ'য়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করছে, আমি ইচ্ছে করলে বস্তা কয়েক ওরকম রাবিশ বাংলা সাহিত্যের ধাপায় এনে হাজির করতে পারতুম। কিন্তু সে প্রবৃত্তিই আমার হয় নি। আমি প্রেম-ট্রেম, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ফ্যাশান-ট্যাশান বিষয়ে অত্যাধুনিক, বাজারে যখন রেঅন আর টেরিলিন্ উঠল, তখন আমি সেকেলে ভালো মুর্শিদাবাদী গরদ, চমৎকার আসামী মুগাকে বাতিল করে' দিতে ইতস্ততঃ করিনি, ডশনের বাড়ির ভালো ডার্বি 'শু' ত্যাগ করে' পাঞ্জাবি চপ্পলে পা ঢোকাতে দ্বিধা করি নি। ফ্যাশানের খাতিরেই জওহর জ্যাকেট পরেছি, ভালো ভালো দেশজ আতরের বদলে মেখেছি নানারকম বিলিতি এসেন্স, গোঁফ জুলফির উপরও অত্যাচার কম করি নি। কিন্তু সাহিত্যের বেলায় ভাই আমি সেকেলে। আমার মতে ভালো কাব্য হচ্ছে সেই অদৃশ্য 'ক্রেন্' (crane) যা মনুষ্যজাতিকে পাঁক থেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করে। আমার কাছে গীতা বাইবেল উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত জাতক ইলিয়াদ অডিসি সেক্সপীয়র মিলটন শেলী কীটস টলস্টয় ডস্টয়ভেসকি রবীন্দ্র বঙ্কিম এবং ওই জাতের লেখকরাই নমস্য হয়ে আছেন। আমার ধারণা কি ক'রে একটা রসগোল্লা চুরি করে' গোপনে সেটা চেটে চুষে কামড়ে খেলাম এর লালাসিক্ত বর্ণনা কাব্য নয়। তাই বায়রন হয়েও আমি কাব্য লিখি নি। কাব্য লিখি নি বটে কিন্তু নারীচরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণ করেছি। তাই বৌদির ঈর্ষার কারণটা বুঝতে পারি। অধিকাংশ নারীই অবচেতনলোকে আর একজন নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। মা-ও মেয়ের রাইভাল হয়েছে—এ-ও দেখেছি। তাই অধিকাংশ নারীর মনে হ্লাদিনীশক্তিসম্পন্না মেয়েরা ঈর্ষা জাগায়, বিশেষ করে' গতযৌবনা বুড়ীদের মনে। কিন্তু তা বলে' ওই বুড়ীরা খারাপ লোক নয়। আমাদের বৌদি তো—গডেস্। 'দেবী' বললাম না, কারণ দেবী কথাটা আজকাল ঘসা-পয়সার মতো জৌলসহীন হয়ে গেছে। বৌদিরা না থাকলে সংসার মরুভূমি হ'য়ে যেত। এই বৌদিরা আমাদের সমাজে এক একটি বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান, নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যদিও, রাগের মরাই এক একজন, উপরে অনেক ময়লা জমে' আছে, ভিতরে কিন্তু খাঁটি সোনা। এবড়ো-খেবড়ো কঠিন পাথরের তলায় স্বচ্ছ জলের ফল্গুধারা বইছে। ওরাই মধ্যবিত্ত সমাজের ধারক, বাহক, রক্ষক—যে সমাজ থেকে বাংলা দেশের প্রতিভা-দ্যুতি সারা জগতে বিকীর্ণ হয়েছে—সেই সমাজ ও'দেরই স্তন্যসুধা পান ক'রে বেঁচে আছে এখনও। ও'রা যদি অবলুপ্ত হন, ও'রা যদি হাল-ফ্যাশানের প্রজাপতি-মার্কা রুজ-পাউডার-মাখা 'ডল' সেজে নানান আসরে ন্যাকামি করে' বেড়াতে শুরু করে দেন—বাস্, তাহলেই খতম। তাহলেই এ জাতের দফা শেষ। কিন্তু ওরা নিঃশেষ হবে না। যদিও ধস্ ভাঙছে, যদিও আমরা রোজ ওদের পায়ের তলায় দলে' দলে' যাচ্ছি, তবু কিন্তু ওরা মরবে না। দুর্বাঘাসের মতো বেঁচে থাকবে, অক্ষয় বটের মতো ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে খাড়া থাকবে। ওরা মা, ওদের জীবনীশক্তি ঠুনকো শৌখিন পেয়ালার মতো নয়, বজ্রের মতো কঠিন, আগুনের মতো প্রদীপ্ত। বৌদিই

আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর বকুনি খেয়েই আমি পালিয়েছিলাম তোমার বাড়ি থেকে।

তিনি একদিন তাঁর আড়ময়লা শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে আমার ঘরে এসে ঢুকে সোজা বললেন, "দেখুন বুজুবাবু, আপনার মতো বিদ্যে আমার নেই, কিন্তু যতটুকু বুদ্ধি থাকলে সংসারের গৃহিণী হওয়া যায়, ততটুকু বুদ্ধি আমার আছে। ঘরে সাপ ঢুকলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, এটুকু অন্তত আমি বুঝি। কুশী কলেজে-পড়া মেয়ে, অনেক রং-ঢং আছে ওর, আপনার কাছে পড়া করবার ছুতোয় যখন তখন আসে, আপনারা দুজনে মুখোমুখি বসে' থাকেন। এর অর্থ যে কি তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে, এর পরিণাম যে কি তা-ও আমার অজানা নয়। আপনি আমাদের স্বজাতি নন, আপনার চাল-চুলোও কিছু নেই, সুতরাং আপনার সঙ্গে ওর বিয়ে হোক একথা ভাবতেও পারি না। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এখান থেকে চলে' যান। চোখের সামনে আমি এসব ঢলাঢলি দেখতে পারবো না। তাই আপনার বন্ধুটিকে এসব বলে' হৈ-চৈ করবার ইচ্ছে নেই, তাঁকে ব'লে বিশেষ লাভও হবে না কোনও। তিনি চিরকাল যে উত্তর দিয়েছেন—'আমি কিছু বুঝি না, যা করবার তুমিই কর'—এবারও সেই উত্তরই দেবেন। তাই যা করবার আমিই করছি। অনুরোধ করছি আপনি চলে' যান এখান থেকে—"

মনে পড়ছে নিজের আত্মসম্মানের মুখোশটা রক্ষা করবার জন্যে হেসে বলছিলাম—"যদি না যাই—"

তিনিও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"আশা করি অতটা অবুঝ আপনি হবেন না। যদি হ'নই তাহলে মনে রাখবেন আমাদের হাতে সাবেক কালের এমন সব অস্ত্র আছে যার সামনে আপনি দাঁড়াতে পারবেন না।"

"অর্থাৎ?—"

বৌদির চোখ দুটো থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে এল। বললেন—"ঝাঁটা—"

[illegible] রয়ে গেলেন। আমার মনে হ'ল মুখে যেন সপাৎ করে' ঝাঁটাটা লাগল [illegible] রাগ হয়নি তাহলে সেটা মিথ্যাভাষণ হবে। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলাম, আমার কালো মুখ বেগুনে হ'য়ে গিয়েছিল সম্ভবত। প্রতিশোধ নেবার চেষ্টাও করেছিলাম। ভেবেছিলাম কুশলাকে নিয়ে ভেগে পড়ব। সে চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম কুশলা আমাকে পাস মার্ক' দেয় নি। বুঝতে পারলাম সে যখন আমার সঙ্গে মাখামাখি করছিল, তখন সে আমাকে চেখে চেখে দেখছিল আসলে। প্রস্তাবটা যখন করলাম তখন মুচকি হেসে শুধু বললে—তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়। দু'দণ্ডের ফুর্তিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দলিলে পাকা করবার সামর্থ্য যে তোমার নেই তা তুমিও জানো, আমিও জানি।' আর একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল। আর দেখা হয় নি তার সঙ্গে। সেই দিনই আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে' আসি। কিন্তু ছেড়ে আসবার অব্যবহিত পূর্বে যা ঘটেছিল তা তোমার জানা নেই। তোমাকে বলে এসেছিলাম—আমার এক পিসিমা এসেছেন, সেখানেই আমি যাচ্ছি। কিন্তু আমি গিয়ে উঠেছিলাম একটা হোটেলে আর সেখান থেকে ফোন করেছিলাম অমিলাকে। গুজবের চশমা চোখে দিয়ে অমিলা মেয়েটিকে তোমরা যে রূপে দেখেছ, তার আসল

রূপ তা নয়। মহীয়সীকে পাপীয়সী বলে' ভুল করেছ একথা বলব না, কারণ ষোল-আনা মহীয়সী বা ষোল-আনা পাপীয়সী কোনও নারীকে বিধাতা সৃষ্টি করেন নি। বিধাতার শিল্পভাণ্ডারে অনেক রং, প্রতিটি সৃষ্টিতেই তিনি অনেক রং অনেক কায়দায় ফলিয়েছেন, তাঁর দুটি সৃষ্টি একরকম হয় নি। দুটি নারীও একরকম নয়, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই অপরূপ। তা দেখবার চোখ তোমাদের নেই। সে মহীয়সী, না পাপীয়সী, সতী না অসতী এই নিয়ে ঘোঁট করতে তোমরা ওস্তাদ। সুতরাং অমিলার সম্বন্ধে তোমরা ভুল করেছ। এ ভুল সংশোধন করবারও আমার গরজ হ'ত না হয়তো, যদি না দুর্নিবার আকর্ষণে তোমার দিকে আকৃষ্ট হতাম। তুমি আমাকে দুর্নিবার টানে টানছ কবি। তোমার কাছে আসতে হ'লে সব কথা খুলে বলতে হবে। সব শুনেও তুমি যদি বল, ঠিক আছে, চলে এস—তাহলে যাব তোমার কাছে।

অমিলা মেয়েটি খারাপ নয়, সে আমাকে ভালবাসে এই অপরা ধেতোমরা তাকে দাগী করে' রেখেছ। ভুলে গেছ ভালবাসা সেই দুর্লভ দ্যুতি যা ক্বচিৎ কারো জীবনে এসে তার জীবনকে ধন্য করে' দেয়। তা গোপবধূ শ্রীরাধার জীবনে আলোর বন্যার মতো এসে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে, উদ্ভাসিত করেছিল তার আত্মাকে। কুৎসার লেলিহান শিখা যাকে দগ্ধ করতে পারে নি, কবিদের উচ্ছ্বসিত বন্দনা-বর্ণনায় যা কাব্যলোকে চিরভাস্বর, আধ্যাত্মিক মহিমায় যা রসিকের চিত্তলোকে চিরপ্রতিষ্ঠিত তা পাপ নয়, তা পুণ্য। এ সৌভাগ্য সকলের জীবনে আসে না। অবশ্য এ সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য বহন করে' আনে সাংসারিক জীবনে, পথ চলতে চলতে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যায়, কলঙ্কের কালিমা-ধূমে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায় চোখের দৃষ্টি—তবু যার জীবনে এ ভালবাসা এসেছে সে থামে না, ফেরে না। যে বাঁশী তাকে ডাকছে, যে রূপের আভা উদ্ভাসিত করছে তার সত্তাকে তারই দিকে সে চলতে থাকে, চলতেই থাকে আমরণ। সাবিত্রী সত্যবানকে ভালোবেসেছিল বলেই যমের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছিল তাকে। আমার বিশ্বাস অমিলাও এই জাতের মেয়ে। কিন্তু ট্রাজেডি হয়েছে আমি শ্রীকৃষ্ণও নই, সত্যবানও নই। আমার মধ্যে অমিলা যে কি দেখেছে তা আমি জানি না, কারণ আমার চোখ দিয়ে আমি আমার সবটা দেখতে পাই না, অমিলার চোখও আমার নেই, সুতরাং ও রহস্য আমি উদ্‌ঘাটন করতে পারি নি, পারবও না। আমি জানি আমি চোর, চরিত্রহীন, মাতাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেছি বটে কিন্তু সে ডিগ্রীকে কাজে লাগাতে পারি নি। আমার মা নেই। বাবা দারোগা। ঘুস দিয়ে, ঘুস নিয়ে, সেলাম করে' সেলাম কুড়িয়ে সারা জীবনটা কাটিয়েছেন তিনি। পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ—তাঁর সম্বন্ধে এ ধারণা আমার কোনও দিনই হয় নি। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা তো করতে পারিই নি, ঘৃণা করেছি। যদিও হয়তো ধর্মতঃ এবং ন্যায়তঃ তিনি ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য, তবু আমি তাঁর ঋণ শোধ করে দিয়েছি। স্নেহের ঋণ শোধ করা যায় না, কিন্তু তিনি আমাকে কোনদিনও স্নেহ করেছেন বলে' মনে পড়ে না আমার। মুসলমান যেমন মুরগি পোষে, আমাকেও তেমনি ভাবে পালন করছেন তিনি। আমি টাকার অঙ্কটা হিসাব করে দেখলাম একদিন। দেখলাম বড় জোর দশ হাজার টাকা তিনি খরচ করেছেন আমার জন্যে। সে টাকাটা তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি। কি করে যোগাড় করলাম অত টাকা? বলা বাহুল্য অসদুপায়ে। তখন আমি দুটো বড় বড়

পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলাম। কিছু বড় লোকের ছেলেকে প্রশ্নপত্র বলে' দিয়ে এবং কিছু অযোগ্য ছেলেমেয়েদের ভালো নম্বর দিয়ে অনেকগুলো টাকা পেয়েছিলাম তখন। কম নয়, সাত হাজার টাকা। বাকী টাকাটা কিছু রোজকার করেছিলাম, কিছু ধার করেছিলাম। তুমি হয়তো ভাবছ এরকম নাটকীয় কাণ্ড করতে গেলাম কেন। নাটকীয় কাণ্ড করাই আমার স্বভাব, আমার নেশা। এর জন্যেই আমি নানারকম বিপদে পড়েছি জীবনে। আমি যদি সবদিক বাঁচিয়ে সোজা সহজ নিষ্কণ্টক নিরামিষ পথে সাধারণভাবে চলতাম, তাহলে হয়তো আর পাঁচজনের মতো সুখের জীবন হ'ত আমার। বছরের পর বছর মাইনে বাড়ত, মোটা পণ নিয়ে কোনও সুলক্ষণা সুন্দরী মেয়ের পাণিপীড়ন করে' নামজাদা কোনও ঘানির বলদ হ'য়ে আমি এতদিনে হয়তো অনেক তৈল নিষ্কাশন করে' ফেলতাম। কিন্তু আমার ধাতে ও জিনিসটা নেই। আমি নাটক করতেই ভালবাসি। ওর জন্যেই আমি অনেক দুষ্কার্যও করে ফেলেছি। অমিলাকে যে এক তথা-কথিত সাংস্কৃতিক জলসায় কটূক্তি করেছিলাম, যার জন্যে অমিলার হোমরা-চোমরা স্বামী আমার পিছনে পুলিস লেলিয়ে দিয়েছিলেন, যার জন্যেই আমাকে শেষ পর্যন্ত গা-ঢাকা দিতে হ'ল, তার মূলে আছে ওই শয়তানী নাটক করার প্রবৃত্তি। সভায় অমিলা উঠে দাঁড়িয়ে যখন গুছিয়ে-সাজিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা আওড়াতে লাগল তখন আমার লোভ হ'ল—দিই রঙীন বেলুনটা ফাটিয়ে? একটা আলপিনের খোঁচাতেই তো চুপসে যাবে! উঠে বললাম—অমিলা দেবী যদি গ্রামোফোন বা কাকাতুয়া হ'তেন ও'র কথায় আপত্তি করতাম না, কিন্তু উনি মানুষ, উনি জানেন, ভাল করেই জানেন, আমার ধারণা ও'র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে, যে মানুষের অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ বারবার মানুষের তৈরি কৃত্রিম আইনকে লঙ্ঘন করে চলে যায়। তিনি নিজেই সে আইন লঙ্ঘন করেছেন একথা আর কেউ না জানুক, আমি জানি। সুতরাং তাঁর মুখে এসব কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি ধাপ্পা দিচ্ছেন। তিনি কি মনে করেন সংস্কৃতি মানে একটা মুখোশ পরে' লোক-ভোলানো? না, কতকগুলো বিবর্ণ নীতিকথার ন্যক্কারজনক পুনরাবৃত্তি করা? আলপিনের খোঁচা খেয়ে রঙীন বেলুনটা চুপসে গেল। ওই চুপসে-যাওয়ার নাটকীয়তাটা আমি উপভোগও করলাম খুব। অবশ্য দামও দিতে হল, বেশ চড়া দাম। তার আগেই আমাদের আপিসে অডিট্ হ'য়ে গিয়েছিল, অডিটারের তীক্ষ্ম দৃষ্টি সন্দেহ করেছিল আমিই দশ হাজার টাকা গাপ করে' বসে আছি। হাতে-নাতে ধরতে পারে নি যদিও, কিন্তু কথাটা মিথ্যা নয়। অমিলার স্বামী হোমরা-চোমরা লোক, কলেজের এক্জিকিউটিভ কমিটির প্রভাবশালী সদস্য একজন, একদিন অমিলার আগ্রহে তিনিই সুপারিশ করে' আমাকে কলেজের প্রিন্সিপাল পদে বাহাল করেছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে আমাকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু ওই ঘটনার পর তিনি সে ইচ্ছে আর করলেন না, পুলিসে খবর দিয়ে দিলেন। হয়তো আমি ধরাই পড়ে' যেতুম, কিন্তু ওই অমিলাই আমাকে বাঁচালে। সে-ই আমাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বললে—তুমি কিছুদিন আত্মগোপন করে' থাক। আমি কড়া ভাষায় একটা রেজিগনেশন লেটার (resignation letter) লিখে পাঠিয়ে দিলাম আপিসে। তারপর গা ঢাকা দিলাম। বেশী দূরে যাই নি। কলকাতার একটা হোটেলেই আড্ডা গাড়লাম দিন কয়েকের জন্য। আর সেখানে বসে' খান পঞ্চাশেক পোস্টকার্ড লিখে ফেললাম পরিচিত অর্ধ-পরিচিত পঞ্চাশ জন স্ত্রী-পুরুষকে। সব

চিঠিরই এক বক্তব্য, এদেশ থেকে চললুম, আমেরিকায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছি। আমাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য কি জান? আমরা কেউ কিছু যাচিয়ে দেখি না, বাজিয়ে দেখি না। যে যা বলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করি সেটা। যেই কেউ ফুসফুস করে বললে যদুবাবু ডুবে ডুবে জল খান অমনি সবাই বিশ্বাস করে ফেললাম। বড় বড় লোকের নামে এরকম রাশি রাশি মিথ্যা গুজব প্রচলিত আছে। আমাদের মতো সাধারণ লোকও নিস্তার পায়নি। ও, অমুক আমেরিকায় পালিয়ে গেছে? যাবেই তো! ও তমুকের ছেলে ঘুস দিয়ে পাস করেছে? তাই বলি, ওরকম গবেট ছেলে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করল কি করে'। তাই না কি, ওই মেয়েটার এই কাণ্ড। এই ধরনের ছোট-বড় আবর্জনার টুকরো ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে আমাদের জীবন-স্রোতে। আমরা সত্য মিথ্যা যাচাই করি না। আমাদের থিয়োরি হচ্ছে—যা রটে তার কিছু বটে। রটন্তী কালী পুজো পাঁজিতে একদিনই লেখা আছে। কিন্তু আমরা ও পুজো অহোরাত্র বারো মাস করছি। করছি এবং কালি ছেটাচ্ছি। সুতরাং কালী পুজোই বলতে পার একে। ওই কালীপুজোর সুযোগ আমি নিয়েছি। আমার মতো মাতাল, বদমাশ, চোর যে আমেরিকায় পালিয়ে শেষে আত্মরক্ষা করবে একথা বিশ্বাস করতে কারও বাধে নি।

পাইলট মুখার্জিও আমার সহায়তা করেছে। ও মোটেই পাইলট নয়, মুখার্জিও নয়। ওর উপাধি পতিতুণ্ড। চমৎকার ছেলে। বিজ্ঞানের ছাত্র, ভালো বোমা বানাতে পারে। কিন্তু গানও গায় চমৎকার, ছবি আঁকে আরও চমৎকার। আমার মতো বাউণ্ডুলে নয়। সচ্চরিত্র, বিনয়ী, মিতভাষী। বিড়িটি পর্যন্ত খায় না। আমার এক বক্তৃতা শুনে ও আমার ভক্ত হয়ে পড়ল। বক্তৃতাটা দিয়েছিলাম এক চায়ের দোকানে। সেই শতবার-মোছা-রেক্সিন্-ঢাকা টেবিলের সামনে বসে হঠাৎ কেমন যেন প্রেরণা এসে গেল এক অচেনা ভদ্রলোকের টিপ্পনি শুনে। অচেনা ভদ্রলোকটি ডিশে ঢেলে ঢেলে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে' চা খাচ্ছিলেন আর তার ফাঁকে স্বদেশী আলোচনা করছিলেন পাশের আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমাদের ছেলেবেলায় স্বদেশী আলোচনায় মন উদ্দীপ্ত হ'ত, আশার আলো দেখতে পেতাম, বুকে প্রেরণা জাগত, বিশ্বাস করতাম সত্যেন্দ্রনাথের সেই অমর ভবিষ্যদ্বাণী —বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়। এখন স্বদেশী আলোচনা মানে পাঁক-ঘাঁটা। আমাদের অযোগ্যতা, আমাদের স্বার্থপরতা, আমাদের পশুত্ব নিয়েই আলোচনা করেন সবাই। ওই ভদ্রলোকও তাই করছিলেন। আমিও আগে এরকম অনেক আলোচনা করেছি। সিগ্রেট টানতে টানতে, বা মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমিও অনেকবার বলেছি—"এ দেশে কিস্সু হবে না। আমরা এতদিন ইংরেজের ক্রীতদাস ছিলাম, এখন দুনিয়ার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি। দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। পাওনাদারেরা যখন হিসেবের খাতা নিয়ে দেনা উসুল করতে আসবে তখন আজকের নেতারা—যাঁরা নানাভাবে 'মজাসে' জীবনটাকে উপভোগ করছেন আর বক্তৃতার খই ফোটাচ্ছেন—তাঁরা হয়তো তখন থাকবেন না— কিন্তু ওই পাওনাদাররা আমাদের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যাবে। দেশ এখন দু'ভাগ হয়েছে, তখন শত ভাগ হবে। কেউ নেবে হাত, কেউ নেবে পা, কেউ ধড়, কেউ মুণ্ড। মহাকাল শিব ভারত-সতীর শবদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয় নাচন

নাচবেন তখন, আর তার পরে বিষ্ণুচক্রে সেই দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। বিষ্ণুচক্র মানে পলিটিক্‌স্‌। ছিন্নভিন্ন সতীদেহ যেখানে যেখানে পড়েছিল সেগুলিকে পৌরাণিকেরা পীঠস্থান বলে' চিহ্নিত করছেন, কিন্তু ভারত-মাতার খণ্ডিত-বিখণ্ডিত দেহ যেখানে যেখানে পড়বে তার নাম পীঠ হবে না। হবে zone কিম্বা টেরিটারি। আত্মনিয়ন্ত্রণ হবে তাদের মন্ত্র। আর সে মন্ত্র পাঠ করাবে বিদেশী পুরোহিতেরা"—এ ধরনের নানাকথা আমিও নানা আসরে বড় গলা করে' বলেছি। কিন্তু সেদিন একটা কথা শুনে আমার মগজে রক্ত চড়ে' গেল। ভদ্রলোক বলছিলেন—"ওরা দেখবেন এবার আমাদের দিয়ে বাসন মাজাবে আর মা-বেটিদের রক্ষিতা রাখবে। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে' রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমরা যে সংস্কৃতি গড়ে' তুলেছিলাম তার শেষ পরিণতি ওই হবে। আমরা বাসন মাজব। না, বড় চাকরি পাব না—ওদের ফ্যাকটারিতে বা আপিসে বড় চাকরিতে ওদের জাত-ভাইরা ঢুকবে, আমরা খালি তেল দেব আর বাসন মাজব। আর আমাদের মা-বোন-বউরা ওদের বাগানবাড়িতে গিয়ে টুইস্ট্‌ নাচ নেচে সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা দেখাবে। এই আমাদের পরিণাম—"

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"আপনি কি জ্যোতিষী? সমস্ত জাতের বিরুদ্ধে এতবড় একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেললেন। আপনি কি সকলের নাড়ীনক্ষত্র জানেন নাকি?"

"সকলের জানবার দরকার নেই। অধিকাংশ লোকেরই জানি—যা গতিক দেখছি—"

"আপনি কিছুই জানেন না। একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যদি বেঁচে থাকে সে-ই দেশের সব আবর্জনা পুড়িয়ে দেবে। একটি স্পর্শমণি যদি কোথাও আত্মপ্রকাশ করে সে-ই সোনা করে দেবে সমস্ত লোহাকে, একটি খাঁটি প্রাণের উদ্বোধন-শঙ্খ জাগিয়ে দেবে সমস্ত জাতকে। সে স্ফুলিঙ্গ, সে স্পর্শমণি, সে শঙ্খ কোথাও না কোথাও আছে এই আমার বিশ্বাস! সমস্ত দেশ যখন মাৎস্যন্যায়ের কবলে কবলিত, তখন দেখা দিয়েছিলেন গোপাল দেব, বৌদ্ধ অনাচারের পঙ্কে সমস্ত দেশ যখন হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন আবির্ভূত হয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর. মুসলমানী সভ্যতা যখন গ্রাস করছিল আমাদের, তখন এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য, ইংরেজদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বাঙালী ছেলেমেয়েদের হাতেই গর্জে উঠেছিল বোমা-পিস্তল, বাংলাদেশের সুভাষ বোসই গড়েছিল আই-এন-এ। বাংলাদেশের বুকেই আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে আছে—আপনি চিন্তিত হবেন না, ঠিক সময়ে সে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দশদিক সচকিত করে' আত্মপ্রকাশ করবে।"

"আপনি বিশ্বাস করেন একথা?"

"নিশ্চয় করি। বাংলাদেশ যদি না বাঁচে ভারতবর্ষ বাঁচবে না। আর বাঙালীই বাঁচাবে বাংলাদেশকে। তাদের ন্যাকামি, পেজোমি, ভণ্ডামি, অশিক্ষা, তাদের আলস্য, ঔদাসীন্য, জড়তা ভেদ করে' দেখা দেবেন সেই বিরাট পুরুষ যিনি বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী, যিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তর সাধক। যিনি অবিচলিতকণ্ঠে বলবেন—সত্য, শিব, সুন্দরের জন্য জীবন-মরণ তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে হবে। চল, আমি তোমাদের পথ দেখাচ্ছি। আমরা তাঁর অনুসরণ করব। এ ঘটনা ঘটবেই, কিন্তু কবে তা ঠিক বলতে পাচ্ছি না—"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক"—বলে' ভদ্রলোক আড়ময়লা রুমালে মুখ

মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যঙ্গ-ক্রুর হাসি ঝিকমিক করে উঠল।

যাবার মুখে হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন—"আপনার নামটি জানতে পারি কি ?"

"আমি অনামা। বিনামাও বলতে পারেন।"

"কি রকম ? আপনার পিতৃদত্ত নাম আছে নিশ্চয় একটা"

"ছিল, এখন নেই। এখন আমার পিতা ভারতবর্ষ, মা বাংলাদেশ। তাঁরা কোনও নামের ছাপ মেরে দেননি আমার কপালে। যে ছাপটা বাবা দিয়েছিলেন সেটা মুছে ফেলেছি"

"মাই গড্! আপনি তো মহাপুরুষ দেখছি—"

কাউণ্টারে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বুরুশ বিশ্বাসের সঙ্গে এর বেশী পরিচয় হয়নি সেদিন। পরে হয়েছিল। ওঁর নাম বীরেশ, কিন্তু সকলের মন থেকে ময়লা ঝেড়ে দেওয়ার প্রবৃত্তি ওঁর প্রবল বলে' ওঁর বন্ধুরা ওঁর নামকরণ করেছিল 'বুরুশ'।

বুরুশ বিশ্বাস চলে' গেলেন। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম রেস্তোরাঁর কোণের দিকে এক ভদ্রলোক নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছেন। চোখাচোখি হ'তে এগিয়ে এলেন এবং কাছে এসে প্রণাম করলেন আমাকে পায়ের ধুলো নিয়ে। হকচকিয়ে গেলাম।

"কে আপনি! এত বড় একটা দুষ্কার্য করে' ফেললেন কেন ? আমি তো অস্পৃশ্য চণ্ডাল—"

সবিনয়ে তিনি উত্তর দিলেন—"আমার নাম জীবন পতিতুণ্ড। আপনার কথা শুনে আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। ও ভদ্রলোক আপনার যে নাম দিলেন তাই আপনার ঠিক নাম। সত্যিই আপনি মহাপুরুষ।"

"আপনি কি করেন ?"

ফুটপাতে ফুটপাতে হেঁটে বেড়াই। আর কিছু করবার সুযোগ পাইনি। আমার একটা বাসা আছে অবশ্য, নেবুতলায়, সেখানে একটা পঙ্গু বোনও আছে। সে-ই আমার একমাত্র অবলম্বন। তার জন্যেই কিছু রোজগার করে' নিয়ে যাই রোজ—"

"কি করে' রোজগার করেন"

"কুলিগিরি করে। আমাদের দুজনের তাতে চলে' যায় কোনরকমে"

লেখাপড়া কতদূর করেছেন—"

"বেশীদূর করতে পারি নি। মাত্র এম. এস-সি. পাস করেছি। অনেক কিছু করবার ইচ্ছা ছিল, পারি নি। সুযোগ পাইনি। ব্যাকিং না থাকলে সুযোগ পাওয়া যায় না এদেশে। ইচ্ছে ছিল পাইলট হব। পাইলট মুখার্জি আমার আদর্শ ছিলেন, কিন্তু হ'ল না।"

"কোন্ পাইলট মুখার্জি—"

"সুব্রত মুখার্জি। তাঁর নাগাল পেলে হয়তো হ'য়ে যেত কিছু। কিন্তু হ'ল না। তিনি জাপানে হঠাৎ মারা গেলেন—"

পতিতুণ্ডর স্বর কেঁপে উঠল। চোখের কোণে জল চকচক করতে লাগল। অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। পতিতুণ্ড বলল—"আমরা গরীব

হ'য়ে জন্মেছি এইটেই আমাদের মস্ত অপরাধ। সারাজীবন সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে' যেতে হবে। কিন্তু আপনার কথা শুনে বুকে বল পেলাম। হঠাৎ মনে হল হয়তো চিরদিন এমন থাকবে না। আপনি কোথায় থাকেন?"

"কোথাও না। আমিও আপনার মত পথচারী। আপনার তবু একটা বাসা আছে, ঠিকানা আছে। আমার তা-ও নেই। আপনার বোন আছে, আমার কেউ নেই। আমি একেবারে বন্ধনহীন, অবলম্বনহীন। চলুন আপনার বাড়ি যাই—"

"আমার বাড়ি! সেখানে আপনাকে বসাব কোথা?"

"আমি দাঁড়িয়েই থাকব। ভ্যালো ভালো চেয়ারে সোফায় বিছানায় অনেক বসেছি, এবার কিছুক্ষণ দাঁড়ানোই দরকার। চলুন"

তখনও আমি নিঃস্ব হই নি। পকেটে ছিল কিছু টাকা।

রাস্তায় বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার বোন রাঁধতে পারে?"

"পারে"

"কি কি খেতে ভালোবাসে সে"

"যা খেতে ভালবাসে তা তো তাকে খাওয়াতে পারি না। মাছ খুব ভালবাসে। কিন্তু সে জিনিস তো আমাদের নাগালের বাইরে"

"মাছ কোথায় পাওয়া যেতে পারে এখন?"

"খোলাবাজারে কোথাও পাওয়া যাবে না। বৈঠকখানা বাজারে বেশী দাম দিয়ে পেতে পারেন। অনেক বেশী দাম নেবে—"

"চলুন দেখা যাক—"

বৈঠকখানা বাজারে গিয়ে কুড়ি টাকার মাছ কিনে ফেললাম। দশ টাকা দিয়ে একটা ইলিশ। আর দশ টাকা দিয়ে কাটা এক কিলো পোনা। ভালো কাটারিভোগ চাল কিনলাম পাঁচ কিলো। দাম নিলে পনরো টাকা। মুগের ডালও কিনলাম কড়া দামে। ভাল ঘি আর ভাল তেলও কিনলাম। স্বচ্ছ দিবালোকে সবার সামনেই কিনলাম কালোবাজার থেকে। দূরে একটা পুলিসও দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। এদেশে কালোবাজার রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে খোলে না। সদর রাস্তার ধারে দিবা দ্বিপ্রহরেই কালোবাজারে কেনাবেচা চলে পুলিসের চোখের সামনে। যে দেশে ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই চোর, যেখানে সরকারী কর্মচারীরা অধিকাংশই ঘুসখোর, সেখানে নিয়ন্ত্রণ করা মানেই কালোবাজার সৃষ্টি করা। আমাদের সরকারই কালোবাজারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সৃষ্টি করেছেন বললেও খুব ভুল হয় না। কালোবাজারের বিরুদ্ধে কাগজেপত্রে যে আইন আছে সে আইন কালোবাজার বন্ধ করতে পারে নি, ঘুসখোর কর্মচারীদের ব্যাংক ব্যালান্স বাড়িয়েছে খালি। এদের সঙ্গে মহামান্য মন্ত্রীদের যোগসাজশ আছে কি না তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাইনি তাই কিছু বলতে চাই না, কিন্তু সন্দেহ হয়। না, আর এ প্রসঙ্গ নয়। এ নিয়ে তোমরা অনেক মাতামাতি করেছ, ডিমের মতো ফদফদ করে' ফেনিয়ে ওমলেট বানিয়ে বানিয়ে রোজ খাচ্ছ, আমার পক্ষে কিছু বলা বাহুল্য হবে।

বাজার করে' অগ্রসর হলাম পতিতুণ্ডির বাড়ির দিকে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি চড়ে'। পতিতুণ্ডির দিকে চেয়ে বললাম, "আপনাকে আর 'আপনি' বলব না, 'তুমি' বলব। আশা করি আপত্তি নেই—"

"না, না, কিছুমাত্র না"

"তাহ'লে আসল কথাটা ভেঙে বলি' শোন। আমি মোটেই মহাপুরুষ-টুরুষ নই, আমি অতি পাষণ্ড লোক। প্রায় সবরকম খারাপ কাজই করেছি জীবনে, কতকটা অভাবে পড়ে', কতকটা স্বভাবের দোষে। যে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা, সে শিক্ষা আমরা পাইনি। প্রায় হাজার বছর ধরে পাইনি। কাকাতুয়ার মতো পরের শেখানো বুলি কপচেছি কেবল, আর সেই কপচানোর কেরামতির জন্যেই বাহবা পেয়েছি, মেডেল পেয়েছি, চাকরিও পেয়েছি বড় বড়। হাজার বছরের অশিক্ষা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের দেশে যুগে যুগে জ্ঞানী, ধার্মিক, কবি, ভাবুক, বিদ্রোহী জন্মেছেন, তার কারণ ভারতবর্ষ দেবভূমি। এদেশের মাটি থেকে আপনিই মহিমার বিকাশ হয়। কিন্তু রাজনীতির আবর্জনায়, স্বার্থপরতার জঞ্জালে, পাশবিকতার প্রকোপে মাঝে মাঝে সে মহিমা চাপা পড়ে' যায়। জীবনে অনেক পাপ করেছি, এখন ইচ্ছে হয়েছে কিছু প্রায়শ্চিত্ত করব। এখন দেশের বড় দুর্দিন। চারিদিকে চেয়ে এখন আবর্জনার স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি জানি ওই আবর্জনা স্তূপের তলায় মণি-মাণিক্য লুকিয়ে আছে। আবর্জনা সাফ করতে হবে। সেইটেই এখন একমাত্র কাজ। কিন্তু কি করে যে করব তা জানি না। তোমার সঙ্গে এই অকস্মাৎ যোগাযোগটা ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হচ্ছে। তুমি ফুটপাথে হেঁটে বেড়াও, তুমি দেশকে চেন। তোমার অভিজ্ঞতা হয়তো কাজে লাগবে। আমাকে তুমি একটা মেকি সিংহাসনে বসিয়ে দূরে হাত জোড় করে' দাঁড়িয়ে থেকো না। আমাকে পাজি জেনেই আপন লোক করে' নাও।"

পতিতুণ্ডি চুপ করে বসে রইল কয়েক মিনিট মাথা হেঁট করে'। তারপর চোখ তুলে বলল—"এসব শুনেও আপনাকে আমি মহাপুরুষ বলব। পথ চলতে গেলেই পায়ে ধুলোকাদা লাগে, যারা সেটাকে ধুলোকাদা বলে' চিনতে পারে তারাই মহাপুরুষ। আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

"আমি দাগী লোক, নাম কাউকে জানাব না। তুমিই নূতন নামকরণ করে দাও আমার—"

পতিতুণ্ডি হেসে বললে, "বেশ, মহাপুরুষ নামই থাক"

"আপত্তি নেই। আমি গোঁফদাড়িও রাখব ভেবেছি। মহাপুরুষ নামটার সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যাবে। আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষেরই গোঁফদাড়ি ছিল। এখনও আছে—"

পতিতুণ্ডি নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন খুঁজছিল। হঠাৎ সে বলল—"আমি যখন বঙ্গবাসী কলেজে পড়তাম, তখন ব্রজেন মুকুজ্যে বলে' একজন ইংরিজির অধ্যাপক এসেছিলেন। চমৎকার পড়াতেন। প্রিন্সিপালের সঙ্গে ঝগড়া করে' তিনি চাকরি ছেড়ে চলে' যান। তাঁর চেহারার সঙ্গে আপনার চেহারার অদ্ভুত মিল কিন্তু"

আমিও নির্নিমেষ হয়ে গেলাম। তারপর অকম্পিতকণ্ঠে বললাম—"ঠিক ধরেছ। আমিই সেই লোক। কিন্তু একথা কারও কাছে ঘুণাক্ষরে প্রকাশ কোরো না। যদি কর, সঙ্গে সঙ্গে আমি সরে' পড়ব"

পতিতুণ্ডি কিছুক্ষণ চুপ করে' রইল। তারপর বলল—"না, তা করব কেন। কিন্তু এমনভাবে আত্মগোপন করবার মানেটা কি—"

"মানে খুব সহজ এবং সরল। কোন রকম পালিশ না দিয়েই বলছি আইনের চক্ষে আমি চোর বলেই আমাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে, কিছুদিন আগে আমি একটা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম। কলেজফাণ্ড থেকে দশ হাজার টাকা সরিয়েছিলাম। তার থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলাম একটি কন্যাদায়গ্রস্ত কেরানীকে। তিন হাজার টাকা দিয়েছিলাম গ্রামের একটি স্কুল ফাণ্ডে, হাজার খানেক গয়না কাপড় কিনে দিয়েছিলাম মধ্যবিত্তঘরের একটি মেয়েকে আর হাজারখানেক টাকা দিয়েছিলাম আমার এক ছাত্রকে। সে টাকার অভাবে জার্মানি যেতে পাচ্ছিল না। ভেবেছিলাম অন্য কোথাও থেকে ধার করে' টাকাটা ফাণ্ডে জমা করে' দেব, কিংবা আমার মাইনে থেকে ক্রমে ক্রমে শোধ করে' দেব। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না, অডিটার এসে পড়লেন। কাজে ইস্তফা দিয়ে সরে' পড়তে হ'ল। আমাদের কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য আমার পেছনে পুলিস লাগিয়েছেন। নীতি-প্রণোদিত হ'য়ে লাগান নি, লাগিয়েছেন প্রতিশোধ নেবার জন্য। কেন তিনি প্রতিশোধ নিতে চাইছেন তা পরে জানতে পারবে। কারণ সব কথা তোমাকে এখন খুলে বলবার আমার অধিকার নেই। একজন ভদ্রমহিলা জড়িত আছেন এর সঙ্গে। তিনি যদি আপত্তি না করেন তোমাকে তাও বলব। কিংবা হয়তো না বললেও তুমি জানতে পারবে। এসব জিনিস বেশীদিন লুকানো থাকে না। তা ছাড়া সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ স্থাপন করতেই হবে। হয়তো তোমাকেই দূত করে' পাঠাব তার কাছে। যদি পাঠাই, আপত্তি করবে কি?"

"না, এতে আর আপত্তি কি—"

পতিতুণ্ডির চোখমুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন একটা রোম্যাণ্টিক উপন্যাসের গহনে প্রবেশ করছে। বললাম, "যদি যাও, ছদ্মনামে যেতে হবে কিন্তু। তোমার ঠিকানাও কাউকে দেবে না। পাইলট মুখার্জি নামই নাও না। আমি প্রচার করে দিয়েছি যে আমি আমেরিকায় চলে' গিয়ে সেখানকার কোন ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করছি। তুমি এমন একটা ভাব করতে পার যেন তুমি উড়ে উড়ে নানাদেশে ঘুরে বেড়াও এবং মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হয়। এটা মন্দ হবে না কি বল—"।

পতিতুণ্ডি চুপ করে' রইল।

তারপর যা বলল তাতে তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল।

বলল, "দেখুন, ছল-চাতুরি করতে পারিনি বলেই আমি কোনও চাকরি করতে পারি নি। কুলিগিরি করি কারণ ওতে মিথ্যাচার নেই। চায়ের দোকানে আপনার কথাগুলো শুনে খুব ভালো লাগল। মনে হচ্ছে আমাদের বাঁচবার জন্যে আপনার একটা আকুলতা আছে, হয়তো একটা প্ল্যানও আছে। তাতে যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। কিন্তু ছদ্মনাম নিতে বলছেন কেন। স্বামীজির একটা কথা মনে পড়ল—চালাকির দ্বারা কোনও মহৎকর্ম হয় না। তাই—"

একটু ইতস্তত করে' থেমে গেল সে।

বুঝলাম একটা লম্বা লেকচার দিতে হবে।

বললাম "স্বামীজি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তুমি ছদ্মনাম নেওয়াটাকে চালাকি বলছ কেন। তুমি তো ছদ্মনামে ছদ্মবেশেই আছ। তুমি কি জীবন পতিতুণ্ডি?

তুমি কি সত্যিই কুলি ? একটা বিশেষ পরিবেশে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে তোমাকে ওই পরিচয় দিতে হচ্ছে সকলের কাছে। আমাদের সকলের আসল পরিচয়ের কথা অনেকদিন আগে আচার্য শঙ্কর বলে' গেছেন—চিদানন্দ রূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্। দেশের দুর্দশামোচনই আমি করতে চাই, কিন্তু কি ভাবে কি করব তা এখনও জানি না। কিন্তু একটা কথা জানি। যা-ই করতে যাই টাকার দরকার। টাকা সংগ্রহের জন্য মাঝে মাঝে লোকসমাজে যেতে হবে এবং তার জন্যে প্রয়োজন মতো কিছু 'মেক্-আপ'ও করতে হবে। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তাহলে ছদ্মবেশ ধারণ নিন্দনীয় নয়। রাবণ ছদ্মবেশ ধারণ করে' যোগী সেজেছিল, আমরা তার নিন্দা করি কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল সীতাহরণ। কিন্তু ভগবান ব্রাহ্মণের বেশে যখন কর্ণের বাড়ি গিয়ে তার ছেলে বৃষকেতুর মাংস খেতে চাইলেন এবং কর্ণের আতিথেয়তা দেখে তাকে বর দিলেন, তখন আমরা সেটার নিন্দা করি না, খুশি হই। আমাদের দেশে টেররিস্টরাও নানা রকম ছদ্মবেশ ধারণ করত। তা দেখে আমরা বরাবর বাহবা বাহবা করেছি। অর্জুনের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে স্বয়ং মহাদেব কিরাত বেশে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এতে কাব্যের ছন্দপতন হয়নি। ভাগবতী শক্তি মহিষাসুরকে বধ করবার জন্য চণ্ডীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, এতে চণ্ডী অশুদ্ধ হয় নি। ছদ্মবেশটাকেই বড় করে' দেখো না, উদ্দেশ্যটাকেই বড় করে' দেখ। আমি অবশ্য তোমার উপর জোর জবরদস্তি করব না। আমি সামান্য খড়কুটো, এখন তোমার ঘাটে লেগেছি। তুমি যদি আমাকে না চাও অন্যত্র ভেসে যাব। আমার স্বপ্নটা হয়তো সফল হবে না। না হোক। সব স্বপ্নই কি সফল হয় ?

পতিতুণ্ডি চুপ করে' রইল। সমস্ত রাস্তা আর একটি কথাও বলল না সে। পতিতুণ্ডিকে অবশ্য সব কথা বলি নি, সব কথা বলবার সাহস হয় নি। যতটা শুনলে আমার উপর তার ভক্তি হয় ততটা বলেছিলাম, সেটা মিথ্যেও নয়, যে কোনও লোকই সেটাকে যাচিয়ে নিতে পারে, দশহাজার টাকার হিসেবটার মধ্যে কোনও গলদ নেই। কিন্তু তবু ওটা পুরো সত্য নয়—মানে whole truth—নয়। পতিতুণ্ডির কাছে বলতে পারিনি সবটা, তাকে তখনও ভাল করে' চিনিনি। পাগলেরাই বা বোকারাই অচেনা লোকের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে' দেখায়। কিন্তু তোমার কাছে কিছু গোপন করব না। তোমার মধ্যে যিনি আদর্শবাদী আছেন, তাঁর নাকটা হয়তো কুঞ্চিত হ'য়ে উঠবে, কিন্তু আশা আছে তোমার মধ্যে যিনি কবি, যিনি সৌন্দর্যপিপাসু, যিনি মানুষের সব রকম দুর্বলতার খবর রাখেন, who understands all, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। ক্ষমা কথাটা লিখলুম বটে কিন্তু ঠিক ক্ষমা আমি চাই না, সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা বোধ হয় কেউ কাউকে করতেও পারে না, আমি চাই তুমি আমাকে বোঝ, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে' যেও না। একদিন তোমার ভালবাসা পেয়েছিলুম, সে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত কোরো না আমাকে। আমি সেই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতীক, যাদের মধ্যে অনেকে আদর্শ কি তা জানে, কিন্তু ষড়রিপু বিধ্বস্ত বলে' সে আদর্শের নাগাল পায় না, কিন্তু যেহেতু তাদের বুদ্ধির অভাব নেই, যেহেতু তারা নানাবিধ 'ইজম' এ প্রারঙ্গম, যেহেতু তারা ফক্কোড় ফাজিল আর সবজান্তা হবার মতো বিদ্যে স্কুল কলেজে আর তৃতীয় শ্রেণীর বই আর সাময়িক পত্র থেকে আহরণ করতে পেরেছে, সেই হেতু তারা ওই আদর্শের নাগাল না-পাওয়াটাকেই একটা বিশেষ বাহাদুরি বলে' জাহির

করে' বেড়ায়, একটা ঝুটো লালসা-ক্লিন্ন পশু-মনোহারী রংচঙে আদর্শ খাড়া করে' সেইটেই আস্ফালন করে যেখানে সেখানে। মনে হয় ওরা বুঝি ভারি আধুনিক। কিন্তু আসলে ওরা আদিম পশু। সেটা ওরা জানেও, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বশত স্পষ্টভাবে সেটা স্বীকার করতে পারে না। নানারকম মিথ্যা মুখোশের আড়ালে আত্মগোপন করে' মহৎ আদর্শকে ভ্যাংচায়। যারা অমহৎ, মহত্ত্বকে বিদ্রূপ করাই তাদের স্বভাব। যাদের ছেলেরা থার্ড ডিভিশনে পাস করে তাদের অনেককে বলে' বেড়াতে শুনেছি, আরে মশাই, ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেই বা কি হাতি ঘোড়া হবে। থার্ড ডিভিশনই হোক বা ফার্স্ট ডিভিশনই হোক—অমুককে তেল না দিলে চাকরি জুটবে না। অমুকের ছেলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েও ভেরেণ্ডা ভেজে বেড়াচ্ছে। অথচ দেখুন অমুকের ছেলে, কি বা তার ইউনিভার্সিটি কেরিয়ার, কিন্তু যথাস্থানে তেল দিতে পেরেছে বলে সাঁ সাঁ করে' উপরে উঠে যাচ্ছে। যাদের মেয়েরা বিপথে গেছে, মেয়েদের সতীত্ব-বেচা রোজকারে যাদের সংসার চলছে, তাদের অনেকের মুখেও শুনেছি—আরে মশাই সতীত্ব নিয়ে কি ধুয়ে খাব? সমাজের ব্যাপার তো জানেনই। মেয়েটাকে গরু বাছুরের মতো দেখে গেল দলে দলে লোক এসে, তাদের জলখাবার খাওয়াতে খাওয়াতে আর আপ্যায়ন করতে করতে নাভিশ্বাস উঠল, ঠিকুজি-কুষ্ঠি, গান-বাজনা নিয়ে কত রকম বায়নাক্কা, তারপর পণের ফর্দ! অনেকে আবার মুখে মহত্ত্ব আস্ফালন করেন কোন ডিমাণ্ড নেই, মনে মনে কিন্তু প্রত্যাশা করেন যথাসর্বস্ব তাঁর পায়ে উজাড় করে দেব। এ সত্ত্বেও মেয়ের বিয়ে দিলুম এক হাড়-জিরজিরে কেরানীর সঙ্গে, তার মাইনে দুশো, কিন্তু পরিবার বিরাট। বিয়ের পর আমার মেয়ে এক ফোঁটা দুধ খেতে পায়নি বা একটুকরো মাছ চোখে দেখেনি। পেয়েছিল শুধু এক দজ্জাল শাশুড়ীর কাছে গঞ্জনা আর এক হাড়হারামজাদা ভাজের কাছে নীচ ব্যবহার। আমার মেয়ের প্রতিভা ছিল, সে এখন সমাজকে কলা দেখিয়ে সিনেমায় নেমে হাজার হাজার টাকা রোজকার করছে। তার অভিনয় দেখে বাহবা বাহবা করছে দেশসুদ্ধ লোক। সতীত্ব নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? তার প্রকাণ্ড মোটরখানা দেখে তোমাদের হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে বলেই ও কথা বলছ, কিন্তু আমায় ধর্ম-ধ্বজী প্রতিবেশী যার গলাটা সব চেয়ে বেশী জোরে শোনা গিয়েছিল, সে-ও নাকি তার মেয়েকে স্টুডিওতে স্টুডিওতে পাঠাচ্ছে, প্রডিউসার ডিরেকটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরনা দিচ্ছে। মেয়েরা রোজকার না করতে পারলে তাদের মুক্তি নেই। এই নারীমাংসলোলুপ সমাজের জন্যে কতদিন আর মাংস সরবরাহ করবে তারা। আমার মেজ মেয়েটা একজন ভদ্র মুসলমানকে বিয়ে করেছে। বিয়ে করে' সুখে আছে। সেজ মেয়েটা রূপের ছিপ ফেলে একটা বড় রুইকে গেঁথেছে, দেখি টেনে তুলতে পারে কিনা। সমাজের যে অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে তাতে কোন রকমে বেঁচে থাকাটাই প্রধান কথা। সতীত্ব অসতীত্ব এখন অবান্তর। তেষ্টা পেয়েছে জল চাই, গেলাসটা মাটির, তামার, রুপার না সোনার তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি করব—জল চাই। এই ধরনের কথা প্রায়ই শুনি। ওদের যুক্তি যে অকাট্য তাও বুঝি, তবু কিন্তু ভাই মনের মধ্যে খচখচ করে। আমিও ওদেরই একজন, আমারও দেহ-মনে দুর্গন্ধ পাঁক, সে পাঁকের মহিমা কীর্তন করে' আমি তাকে সুগন্ধ চন্দনের মর্যাদাও দিতে পারি,—তুমি তো জানই আমি বাক্যবীর—কিন্তু মনের ভিতর খচখচ করে। অন্তরের অন্তরতম

প্রদেশে কে যেন বার বার বলে তুমি পশু, লোলুপ পশুত্বের গায়ে যতই রং চড়াও, তা কখনই মহৎ মনুষ্যত্বের মর্যাদা পাবে না। মহৎ মনুষ্যত্ব লাভ করাই তো জীবনের পুণ্য-পরিণাম। সেখানে পেঁছতে না পারলে তুমি সুখী হবে না। সেখানে তোমাকে পেঁছতেই হবে। তার মানে, আমার বিবেকটা এখনও মরেনি। সে বিবেক অহরহ আমাকে তোমার দিকে টেনে নিয়ে আসছে চুলের মুঠি ধরে। বুঝতে পারছি তোমার কাছে অন্তত সব কথা আমাকে খুলে বলতেই হবে। না বললে তোমার কাছে আসা যাবে না। আর কারো কাছে বলতে পারিনি সবটা। পতিতুণ্ডি খানিকটা জানে, বুরুশ বিশ্বাসও খানিকটা জানে। তোমাকে সব বলতে চাই। না বলতে পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না। ক্রিশ্চানদের 'কনফেশন' বলে' একটা ব্যাপার আছে, সেটা মনের এই অস্বস্তি দূর করবার জন্যেই। এটাও আমার কনফেশন। প্রথমে ওই দশ হাজার টাকাটার কথাই বলি। দশ হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা এক কন্যাদায়-গ্রস্ত কেরানীকেই আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগে ওই কন্যাটিকে নষ্ট করেছিলাম আমি। তার প্রবল যৌবনের উদ্দাম স্রোতে আমার মতো ঐরাবতও ভেসে গিয়েছিল। বিয়ে দিয়ে দিতে না পারলে মেয়েটা আমার ঘাড়েই পড়ে' যেত। আমার মহত্ত্বের মূলে আছে আমার কামুক প্রবৃত্তি। কিন্তু আমার সবচেয়ে আশ্চর্য কি লেগেছিল, জানো? মেয়েটা একটুও আপত্তি করেনি। সে যেন একটা ছোট চাকরি ছেড়ে আর একটা বড় চাকরিতে চলে গেল। ভাড়াটে বাসা ছেড়ে যেন নিজের বাসায় গেল। তার মনের এই জলবৎ ব্যবহার বিস্মিত করেছিল আমাকে। গেলাসে যখন ছিল, তখনও বেশ ছিল, গাড়ুতে যখন ঢুকতে হল তখন গাড়ুর আকারই ধারণ করল সে অনায়াসে। মেয়েটার বাপ সব জানত কিন্তু ভান করত যেন কিছু জানে না। হাবাগোবা অন্ধ বধির সেজে থাকত লোকটা। অনেক রাত করে বাড়ি ফিরত, সম্ভবতঃ আমাকে আমাকে সুযোগ দেবার জন্যেই। মেয়েটার মা ছিল না। থাকলে হয়তো তার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকত। সেকেলে মায়েরা এ বিষয়ে খুব সজাগ, খুব কড়া। এঁরা কিন্তু ক্রমশ অন্তর্ধান করছেন। আদর্শ মা তৈরি করা আমার জীবনের একটা লক্ষ্য। কিন্তু সে কথা পরে বলছি। এইবার আমার দ্বিতীয় মহত্ত্বের কথা বলি, আজকালকার ভাষায় অবদান বললে হয়তো আরও লাগসই হবে। একটি ছেলেকে জার্মানি যাবার জন্যে আমি এক হাজার টাকা দিয়েছি তা ঠিক। কিন্তু সে ছেলেটি তার আগে ধারস্বরূপ আমাকে ওর চেয়ে অনেক বেশী টাকা দিয়েছিল। ভাল ছেলে, স্কলারশিপ পেয়েছিল। আমি তাকে বাড়িতে পড়াতাম, অবশ্য বিনা-মাইনেতে। সে জানত আমি মদ খাই, বে-হিসাবি খরচপত্র করি, কিন্তু তবু সে আমাকে ভক্তি করত। হ্যাঁ হে, ভক্তি করত, এই চরিত্রহীন মাতালটাকে। আমার মধ্যে সে কি দেখেছিল জানি না। না, কথাটা ঠিক বলা হল না। আমার মতো শয়তানের মধ্যে দেবতা প্রত্যক্ষ করবার চোখ কে তাকে দিয়েছিল জানি না। যখনই আমি অভাবে পড়তাম, তাকে বললেই সে টাকা এনে দিত। কোথা থেকে দিত জানি না। শুনেছিলাম—তার বাবাই বলেছিল—ছেলেবেলা থেকে ও যত স্কলারশিপ পেয়েছিল তা নাকি তিনি ওর নামে ব্যাঙ্কে জমা করে' দিয়েছিলেন—হয়তো সেই টাকা থেকেই এনে দিত। ঠিক জানি না। হীরের টুকরো ছেলে। সে যখন জার্মানি যাবার সুযোগ পেল তখন দেখা গেল ওর হাতে টিকিট কেনবার টাকাও নেই। তার বাবা বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকাটা

জোগাড় করবার চেষ্টায় ছিল। আমিই দিয়ে দিলুম টাকাটা। অপ্রত্যাশিতভাবে ওই দেওয়াটার মধ্যে যে নাটকীয়তাটা আছে সেটা উপভোগ করবার জন্যেই দিলুম সম্ভবত। স্কুল ফাণ্ডে তিন হাজার টাকা দেওয়ার মধ্যেও একটু নাটকীয়তা আছে। যে স্কুলে টাকা দিয়েছিলাম আমি ছিলাম তার ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য। চেয়ারম্যান ছিলেন অবশ্য একজন এস. ডি. ও.। ওই এক আপদ হয়েছে আজকাল। যাদের শিক্ষা বা সংস্কৃতির ভাণ্ডারে কিছুমাত্র দান বা কৃতিত্ব নেই, তাঁরা গভর্নমেণ্ট অফিসার বা মন্ত্রী হওয়ামাত্র রাতারাতি ভুঁইফোড় বাদুলে পোকার মতো ভিড় করেন এসে শিক্ষামন্দিরে বা সংস্কৃতির মণ্ডপে। শুধু ভীড় করেন নয়, জাঁকিয়ে বসেন এসে পুরোধার আসনে। Fools rush in where angels fear to tread। বোধ হয় ওদেরও দোষ নেই। আমাদের দেশের পা-চাটা খোশামুদের দলই ওদের খোশামুদ করে' নিয়ে আসে। আমাদের ওই স্কুলটার বিল্ডিং মেরামত করবার জন্যে তিনহাজার টাকার দরকার ছিল। মীটিং হচ্ছিল সেদিন। এস. ডি. ও. চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ইনিয়ে-বিনিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন—গভর্নমেণ্টের পক্ষে এখন টাকা দেওয়া শক্ত। ইরিগেশন, সার প্রভৃতির জন্য অনেক টাকা গভর্নমেণ্ট বরাদ্দ করেছেন কিনা—তাই—ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুদিন ধরে ইরিগেশন আর সারের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও গভর্নমেণ্ট আমাদের দুবেলা অন্ন জোটাতে পারেন নি এখনও। বলেন জনসংখ্যা খুব বেড়েছে না কি। স্ট্যাটিসটিকস দেখান। ওই আর একটা ভাঁওতা—কে যেন বলেছিলেন ওটা হচ্ছে ফোর্থ লাই (fourth lie): আমি কিন্তু এস. ডি. ওর কথা মন দিয়ে শুনছিলাম না। আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম লোকটিকে। নাদুসনুদুস গোলগাল বেঁটেসেটে মানুষটি, খুব ফরসা, যেন একতাল মাখন। মাথায় বিরাট চকচকে টাক। আমি একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসলাম মীটিংয়ের মাঝখানে। এস. ডি. ও.-র চেয়ারের পিছনে গিয়ে তাঁর টাকে ছোট্ট একটা চাঁটি মেরে বললুম—আশ্চর্য, টাকটি বাগিয়েছেন আপনি। ওর উপর বীজ বুনে দিলে কিছু ফসল নিশ্চয়ই ফলবে। নীচে ভাল সার নিশ্চয় আছে। ভদ্রলোকের মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ তিনি সভা ত্যাগ করে' চলে' গেলেন। হই-হই করে' উঠলেন সকলে। সকলের মুখেই এক কথা—হঠাৎ এ কি করে' বসলেন আপনি। আমি হাতজোড় করে' বললুম—সত্যি খুব অন্যায় কাজ করে' ফেলেছি। কিন্তু ভারী লোভ হ'ল। কিছুতেই সামলাতে পারলাম না নিজেকে। সকলে বললেন—ওঁকে চুমরে কিছু টাকা আদায় করব ভেবেছিলাম আমরা, এখন উনি কি যে কাণ্ড করবেন কে জানে। বললাম, বড় জোর আমাকে অ্যারেস্ট করে' নিয়ে যাবেন। আপনাদের ভয় কি। আপনারা তো কিছু করেননি। আর আপনাদের স্কুল-ফাণ্ডে আমিই তিনহাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এস. ডি. ও. ভদ্রলোকের কিন্তু কিঞ্চিৎ রসবোধ ছিল। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। আমাকে কেবল ছোট্ট একটা চিঠি লিখেছিলেন—'হিতৈষী হিসাবে আপনাকে অনুরোধ করছি কোন ডাক্তারের কাছে যান। পাগলা-গারদের বাইরে বেশী দিন থাকা উচিত নয় আপনার।' এই তো আমার স্কুল-ফাণ্ডে তিন হাজার টাকা দেওয়ার সত্য ইতিহাস। আমরা, বাঙালীরা, নাটুকে জাত। নাটক করবার জন্যে আমরা সব করতে পারি। ক্ষুদিরাম—কানাইলাল—বাঘা যতীনরা যে উন্মাদনায় মেতে আত্মবিসর্জন করার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে স্বদেশপ্রেম ছিল নিশ্চয়

কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছিল ওর ড্রামাটিক অ্যাপীল (dramatic appeal)। চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোস সম্বন্ধেও ওকথা মনে হয় আমার। ধনকুবের চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ করে' দেশের মাটির উপর যখন নগ্নপদে একবস্ত্রে দাঁড়ালেন, সুভাষ বোস যখন হেভেনবর্ণ (Heaven born) আই. সি. এস. চাকরি ছেড়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এমন কি তার আগেও যখন তিনি ভারত-বিদ্বেষী ওটেন সাহেবকে ঠ্যাঙালেন, যখন তিনি ইংরেজ-পুলিসের তীক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে জার্মানি জাপান ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে আই. এন. এ. সৈন্যবাহিনী গঠন করে ইম্ফলে এসে স্বাধীন ভারতের পতাকা ওড়ালেন —তখন ওসবের নাটকীয়তাই উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাদের। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও যা dramatic তাই করেছিল প্রদীপ্ত আমাদের, তাঁর দাণ্ডি মার্চ, তাঁর চম্পারণ বিদ্রোহ, তাঁর ছোট ছোট শাণিত উক্তি, তাঁর নন-কো-অপারেশনের অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। তাঁর খদ্দর আর চরকা বাঙালীর মনে সাড়া জাগায় নি, কারণ ওর মধ্যে নাটক নেই। আমি বাঙালী বলেই আমার মধ্যে ওই নাটক করবার প্রবৃত্তি খুব প্রবল। সেইজন্যে আমি বিপদেও পড়েছি বারবার। আমার বিশ্বাস বাঙালী জাতটাও বিপদে পড়েছে ওই জন্যে। নাটক ভালো মদের মতো, তার উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী। চরিত্র বা দেশ গঠন করবার জন্যে প্রতি পলে পলে যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দরকার এবং সে সাধনার মূলে যে ভিত্তিভূমির, যে একনিষ্ঠতার প্রয়োজন, নাটকের উন্মাদক উত্তেজনায় তার উপাদান নেই। বাঙালী ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জাতের এই একলক্ষ্যমুখী সাধনা আছে, সে সাধনাটা বৈষয়িক বলে' বৈষয়িক ব্যাপারে তারা উন্নতিও করেছে খুব। বাংলা দেশের রাজধানী কলকাতায় আজ বাঙালীদের স্থান নেই, তা নিয়ে আমরা যে আন্দোলন করছি তাতেও ওই নাটকই আছে কেবল। তাই স্থায়ী কোনও ফল হচ্ছে না। যে ছেলে শিশির ভাদুড়ী বা অহীন চৌধুরীর নকল করে হাততালি পায়, সে সামান্য একটা মনিহারী দোকানও টিকিয়ে রাখতে পারে না। তার কথার ঠিক নেই, কাজের বাঁধন নেই, সে বড়জোর প্রসেশনের ভীড়ে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহু তুলে গলাবাজি করতে পারে। কিন্তু ওসব করে' দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ স্থির-লক্ষ্য বণিকদের একচুলও সরানো যাবে না। কারণ ওদের টাকা আছে, আইনও ওদের অনুকূলে। বিরাট অগ্নিকাণ্ডে সব নিশ্চিহ্ন করে দিতে না পারলে ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। যে স্ফুলিঙ্গ সে রকম অগ্নিকাণ্ড করতে পারে, তার উপাদান অবশ্য বাঙালী চরিত্রে আছে। কারণ স্ফুলিঙ্গও একটা নাটক। হয়তো একাঙ্ক নাটক, কিন্তু তার শক্তি আছে বিরাট একটা বহ্ন্যুৎসব করবার।

অন্য কথায় এসে পড়েছি। দশ হাজার টাকার তৃতীয় হিসাবটা দিয়েছি। এবার চতুর্থটা শোন। মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়েকে সত্যই গয়না কাপড় কিনে দিয়েছিলাম। তুমি হয়তো হাসছ, ভাবছ আর একটা প্রেমের ব্যাপার শুরু হল বুঝি। মোটেই তা নয়। মেয়েটিকে আমি একবার মাত্র দেখেছি। একটা বড় দোকানে 'শো' কেসের ধারে ধারে সসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লোলুপ দৃষ্টিতে সেই সব জিনিসের দিকে তাকাচ্ছিল যা কেনবার কথা সে ভাবতেও পারে না। আমি গিয়েছিলাম ক্ষুরের ব্লেড কিনতে। মেয়েটিকেই লক্ষ্য করছিলাম। তার সস্তা শাড়ি, তার ফাঁপানো ছোট্ট খোঁপায় সস্তা পিন্ এঁটে বিলাসিতার প্রয়াস, তার করুণ দৃষ্টি, তার সংকুচিত লোলুপ

হাব-ভাব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আমার বারবার। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে পড়ে' গেলে যার প্রথম দুটো লাইন হচ্ছে 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে, হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে। চারিদিকে বিলাসের রঙীন উৎসবে সেজে কত ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী দলে দলে চলেছে নানাভাবে আস্ফালন করে—তাদের চোখমুখে চলনে বলনে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অহমিকা আর আত্মপ্রসাদ—তারা ওই লোভাতুরা মেয়েটির পানে ফিরেও দেখছে না একবার। আমি হয়তো চলে' যেতাম। হঠাৎ সেলস্‌ম্যান জিগ্যেস করলে—"আপনার আর কিছু চাই কি ? আপনার বডিসের কাপড় তো দিয়ে দিয়েছি। আরও কিছু নেবেন ?"

দেখলাম মেয়েটির হাতে একটি কাগজের খাম রয়েছে।

"না, আর কিছু কিনব না। আচ্ছা, ওই দিকে ওই যে শাড়িটা টাঙানো রয়েছে, ওটা একটু দেখতে পারি কি, ওর দাম কত হবে—"

"ওটার দাম সাড়ে পাঁচ শো টাকা। নেবেন কি"

"ওর জরিটা কেমন একটু দেখতুম—"

সেলস্‌ম্যান এর উত্তরে যা বললে তা হয়তো সঙ্গত, কিন্তু আমার কানে যেন খট্ করে' লাগল কথাটা। মনে হ'ল লোকটা অসভ্য। তার চোখের দৃষ্টিতে একটা কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাবও ফুটে উঠেছে দেখলাম।

সে বললে—"আপনি নেবেন কি ? তাহ'লে নামাই—"

"না, আমি এখন নেব না। কি শাড়ি ওটা, ভারি চমৎকার"

"কাশ্মীরী শালের শাড়ি। দুখানা এসেছিল, একখানা একজন আমেরিকান টুরিস্ট কিনে নিয়ে গেছে—"

"ও। না, আমি এখন কিনব না। শুধু দেখতুম একবার কেমন জিনিসটা।

"যখন কিনবেন তখন দেখাব ভাল করে'। তবে কিনতে যদি চান তাড়াতাড়ি আসবেন। ও জিনিস পড়ে' থাকবে না। বিড়লার বাড়ির একটি মেয়ে দেখে গেছে। সে বোধ হয় বিকেলেই আসবে।

আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল মেয়েটি।

এগিয়ে গেলুম আমি। পকেটে টাকা ছিল।

বললাম, "শাড়িটা নাবিয়ে ওকে দেখান। ওর যদি পছন্দ হয় এখুনি কিনে নেব"

মেয়েটি অবাক হয়ে চাইল আমার মুখের দিকে।

আমি সপ্রতিভভাবে হেসে বললাম—"আমি সম্পর্কে তোমার কাকা হই। এতদিন আমেরিকায় ছিলুম। পরশু ফিরেছি। শাড়িটা যদি তোমার পছন্দ হয় কিনে নাও। আমার কাছে টাকা আছে—"

মেয়েটি তবু মনস্থির করতে পারছিল না।

"আপনাকে আমি চিনতে পারছি না কিন্তু"

"আমি যখন আমেরিকায় যাই তখন তুমি খুব ছোট ছিলে। তাই মনে নেই। তোমার বাবার নাম তো—"

"পৃথ্বীশ সরকার"

মেয়েটিই যুগিয়ে দিলে উত্তরটা।

"পৃথ্বীশ আমার সহপাঠী ছিল—"

"তাই না কি—"

"হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ি যাব একদিন। সেই বাড়িতেই আছ তো এখনও ?"

"হ্যাঁ, নিউগি পুকুর লেন—"

"যাব একদিন—"

সেলস্‌ম্যান ততক্ষণ শাড়িটা বার করেছিল। ঝুঁকে পড়ল মেয়েটি তার উপর। শুধু শাড়ি নয়, তার সঙ্গে ম্যাচ করে' ভালো জুতো আর দুলও কিনে দিলাম তাকে। একটি ভ্যানিটি ব্যাগও। হাজার টাকাই খরচ হ'য়ে গেল। জীবনে ওই একটি পুণ্যকর্ম করেছি যা নির্মল, যার আনন্দ আমার মনকে এখনও পবিত্র করে' রেখেছে। লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, এর অন্তরালেও ছিল আমার নাটক করার প্রবৃত্তি। আর ওইটেই হল আমাদের জাতীয় প্রবৃত্তি। আমি যদি কুল ক্যালকুলেটিং (cool calculating) বণিক হতাম তাহলে একাজ করতে পারতাম না। আমাদের দেশের অধিকাংশ বড়লোকরাই একাজ করেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী মনে আছে? তাঁর সমস্ত জীবনটাই তো নাটকের সিরিজ। তাঁর বড়লাটের নাকের সামনে চটি-সুদ্ধ পা তুলে দেওয়া, তাঁর এককথায় অত বড় চাকরির মুখে লাথি মেরে' চলে আসা, তাঁর মহাসমারোহে বাজনা বাজিয়ে প্রীতি-উপহার ছাপিয়ে বিধবা-বিবাহ দেওয়া, নিজের টাকায় পঞ্চাশটি বালিকা-বিদ্যালয়ের খরচ চালানো, পাত্রে-অপাত্রে তাঁর অজস্র দান, তাঁর তীক্ষ্ণ রসিকতা, তাঁর একমাত্র ছেলেকে বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া, ভার্সাই শহরে মাইকেল মধুসূদনকে তাঁর টাকা পাঠানো, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতরণ—সবই তো নাটক। রসিকরা উপভোগ করলেও দেশের লোক তাঁর এ সব নাটক তেমন উপভোগ করেনি। কারণ তাঁর অধিকাংশ নাটকই ছিল হয় চাবুক, না হয় কোদাল। অসাড় সমাজের পিঠে সপাসপ চাবুক লাগিয়েছেন তিনি। যাদের পিঠে চাবুক পড়েছে তারা তাঁকে ঘিরে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, এটা আমাদের দেশে আশা করা যায় না। যে-সব আবর্জনা সমাজের বুকে অলংকার হয়ে ছিল তা-ও তিনি নির্মম হস্তে পরিষ্কার করেছেন কোদাল দিয়ে। বুঝিয়ে দিয়েছেন এসব অলংকার নয়—পাঁক। আবর্জনারা কোদালের জয়-গান করেছে, এ-কথা কোথাও শোনা যায় নি। আমাদের দেশের লোক বিদ্যাসাগর মশায়ের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল, শেষ জীবনে তিনি পালিয়ে এসে বাস করেছিলেন কার্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের মধ্যে। তিনি দেশের জন্যে এত করেছিলেন, তবু দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বলেই এ দেশের দাসমনোভাবাপন্ন জনসাধারণের কাছে কিছু খাতির হয়েছিল তাঁর, দেশের হুজুকে লোকেরা—যারা রবীন্দ্র-সাহিত্য ভাল করে' পড়েও দেখেনি কখনও—তারা মালাচন্দন নিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে ভীড় করেছিল। কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সাহিত্যসাধনার সঙ্গে কটা লোক পরিচিত? রেডিও গ্রামোফোনের কৃপায় তাঁর দু'চারটে গান তারা শুনেছে, দু'পাঁচটা বিখ্যাত কবিতার নামও হয়তো জানে। অধিকাংশ লোকই পরের মুখে ঝাল খায়। বাস্ ওই পর্যন্ত। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে কেউ অধ্যয়ন করে নি। করলে দেখতে পেত তিনি শুধু সাহিত্য-সাধনাই করেন নি, নানাভাবে সমাজসংস্কার করবার চেষ্টাও করেছেন, আমাদের আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখে আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে কি করে আমরা উন্নতি করতে পারি,

সে-সম্বন্ধে নানারকম চিন্তা করছেন তিনি। তাঁর সে-সব প্রবন্ধ কেউ পড়ে নি। এর মধ্যেই তা গবেষকদের গবেষণার বিষয় হয়ে পড়েছে। তিনি কল্পনা-বিলাসই করেন নি শুধু। তিনি শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন গড়েছেন, ঘরে বসে' বাংলাভাষার মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে সুশিক্ষিত হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন, তিনিই প্রথম এদেশে গ্রামের লোকেদের জন্যে ব্যাংক খোলেন,—যদিও সে ব্যাংক অসাধুতার চোরাবালিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এখন। সারা জীবনই দেশের মঙ্গলচিন্তা করেছেন, অনেক প্রবন্ধ, অনেক বক্তৃতা, অনেক কবিতা, অনেক গানে তার প্রমাণ সমুজ্জ্বল। কিন্তু তবু দেশ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে আছে। আমরা আগে ইংরেজের পদলেহী ছিলাম, এখন দেশী হাইকমাণ্ডের পদলেহী হয়েছি। আমাদের লেহন-প্রবৃত্তি কিছুমাত্র কমে নি। এই পদলেহনের চমৎকার একটা গালভরা অজুহাতও পেয়েছি আমরা—সর্ব-ভারতীয়ত্ব। আমাদের আপন মা-বাবা-ভাই-বোন-প্রতিবেশীদের কথা বললেই সমুদায় সর্বভারতীয় উচ্চসঙ্গীত নাকি বেসুরো হয়ে যায়। আমাদের দেশে এসে আমাদের যারা লুটেপুটে খাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার জো নেই—বললেই সর্বভারতীয় সুরে ছন্দপতন ঘটবে। আমাদের এখন যা কিছু করতে হবে তা সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া চাই। অথচ ওই সর্বভারতীয় নেতারাই নিজেদের স্বার্থের জন্য আমাদের দেশকে দু'টুকরো করে তার একটা টুকরো তুলে দিয়েছেন মুসলমানদের বেনামীতে সেই পিশাচ ইংরেজদের হাতেই যারা শাসক হিসাবে এতকাল আমাদের পিষেছে তাদের লোহার নাল-বাঁধানো বুটের তলায়। পাকিস্তান যে আজ ইংরেজদের লীলাভূমি, পাকিস্তান যে তাদের পাদপীঠ, তাদের ষড়যন্ত্রই যে আজ সেখানকার রাজনীতি, একথা কে না জানে। অথচ টুঁ শব্দ করবার যো নেই, কেবল মিষ্টি-মিষ্টি অহিংসার বুলি আওড়াতে হবে, তা না হলেই সর্বভারতীয় মহিমা ম্লান হয়ে যাবে। পাকিস্তানের হিন্দু রেফিউজিদের দলে দলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আন্দামানে, মধ্যপ্রদেশে, উড়িষ্যায়, বিহারে। বাঙালীদের স্থান বাংলাদেশে তাঁরা করে' দিতে পারলেন না। অথচ বাংলাদেশে হাজার হাজার বিঘে জমি নাকি পড়ে' আছে যেখানে তাদের স্থান সংকুলান হতে পারত—একথা বলেছেন মাননীয় সতীশ দাশগুপ্ত স্বয়ং। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনে নি, কারণ তিনি আধুনিক মাপকাঠিতে আর সর্বভারতীয় নেতা নন। আমি যদি বলি বাঙালীদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সর্বভারতীয় মনোভাব ঈর্ষাক্লিষ্ট তাই তাঁরা সেটা নষ্ট করতে চান, আমি যদি বলি পূর্ববঙ্গের সব বাঙালীদের বাংলাদেশে বসবাস করালে পাছে ওই রেফিউজিরা বিরুদ্ধপক্ষের ভোটের পাল্লা ভারী করে দেয়—দেবার খুবই সম্ভাবনা, কারণ সর্বভারতীয় নেতাদের গদিতে বসবার অশোভন লালসার জন্যই তাদের ঘরবাড়ি পুড়েছে, মা-বোন ধর্ষিতা হয়েছে। দলে দলে স্বদেশ ছেড়ে dumb driven cattle-এর মতো অনেক দুঃখকষ্ট মাথায় নিয়ে তারা অজানা অচেনা দেশের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে, তাদের গরু-বাছুর বাক্স-বিছানার মতো যে-কোনও খোঁয়াড়ে যে-কোনও গুদোমে পুরে দেওয়ার জন্যে সর্বভারতীয় নেতারা মহত্ত্ব আস্ফালনে ব্যস্ত। তারা যে তাদের পক্ষে ভোট দেবে সত্যিই তো তার নিশ্চয়তা নেই—আমি যদি বলি এই কারণেই বাংলার বাইরে—ভারতবর্ষের অরণ্যে, দ্বীপে, পর্বতে, মরুভূমিতে যেখানে হোক তাদের ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা বিহারী, উড়িয়া, রাজস্থানী,

মধ্যপ্রদেশবাসী হোক—হিন্দী শিখুক, তাদের বাঙালীত্ব লোপ পাক, যাতে তারা বাঙালী হিসেবে আর যেন কখনও মাথা তুলতে না পারে। এসব বললেই সর্বভারতীয় মনোভাবের পান থেকে চুন খসে' যায়—আর আমরা সংকীর্ণমনা প্রাদেশিক বলে' গণ্য হই। বাঙালী নেতারাই বা কি করেছেন ওদের জন্যে? তাঁরা তো জো-হুকুমের দল। অন্য প্রদেশবাসীরা কি খুব উদার, খুব মহৎ, ন্যায়ের নিক্তি হাতে নিয়ে চুলচেরা বিচার করে সর্বদা সব কাজ করে যাচ্ছেন? বাংলাভাষার জন্য শিলচরে গুলি চলল, বাংলাদেশের স্টেশনে এখনও হিন্দীতে নাম লেখা থাকে, বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য প্রশ্নপত্র হিন্দী ভাষায় ছাপা হয়। হিন্দী না জানলে কোথাও তার চাকরি জোটে না। কেন এসব জবরদস্তি? হিন্দীই বা রাষ্ট্রভাষা হবে কেন? কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করা যাবে না, করলেই বলবে তুমি সংকীর্ণমনা প্রাদেশিক। আইন বানিয়ে যদি খোলা বাজার থেকে চাল, গম, মাছ, সন্দেশ, সোনা কেনা বন্ধ করা যায়, আইন বানিয়ে বাংলাদেশের কালোবাজারীদের জমিকেনাও বন্ধ করা যাবে না কেন? বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতা শহরে বাঙালীদের সব জমি তো অবাঙালীরা কিনে নিলে। আইন বানিয়ে কি এটা বন্ধ করা যায় না? সর্বভারতীয় মনোভাব তো হরদম আইন ভাঙছে গড়ছে? অবাঙালীদের বড় বড় কারখানা, বড় বড় অফিস কলকাতায়। অথচ বাঙালী ছেলেমেয়েরা নাকি সেখানে চাকরি পায় না। যোগ্যতা থাকলে কেন পাবে না? বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, মাদ্রাজে কি বাঙালীদের স্থান আছে? সেখানেও নেই। বাঙালীর ছেলেরা—যাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতাযজ্ঞের হোতা, যারা আধুনিক ভারতের জন্মদাতা, যাদের ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতার জন্যে দলে দলে প্রাণবিসর্জন করেছে—তারা না খেতে পেয়ে মরুক এইটেই কি সর্বভারতীয় মনোভাব? তা যদি হয় তাহলে ও মনোভাব যত শীঘ্র বদলায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। তার জন্যে যদি আরও কিছু রক্তপাত প্রয়োজন হয় তা করতে বাঙালীর ছেলেমেয়েরা পশ্চাৎপদ হবে না। যে স্বাধীনতায় আমাদের বাংলাভাষায় শিক্ষালাভ করবার বিরুদ্ধে এতরকম ষড়যন্ত্র, যেখানে সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র হিন্দীর লেজুড় জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যে স্বাধীনতা আমাদের খেতে পরতে দিতে পারে না, যে স্বাধীনতায় সর্বভারতীয় মুখোশের আড়ালে খোশামুদেদের গদগদ মুখচ্ছবি, স্বার্থপরদের লুব্ধ দৃষ্টি আর কালোবাজারীদের লালায়িত জিহ্বা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, সে মেকি স্বাধীনতা নিয়ে আমরা কি করব? স্বাধীনতা তো গুটিকয়েক মতলব-বাজ স্বার্থপর লোকের খাস তালুক হয়ে দাঁড়িয়েছে—protected preserve—সেখানে সর্বভারতীয়ত্বের দোহাই দিয়ে তারা আত্মপোষণ আত্মতোষণ করে যাচ্ছে খালি। টাকার আর ঘুসের জাল ফেলে ওরা রাশি রাশি ভোট ছেঁকে তুলবে, আর democracyর নামে dictatorship চালাবে। এ ভণ্ডামি বাংলাদেশ কতকাল সহ্য করবে আর? শাসন বিভাগের সব জায়গায় তো পচ্ ধরেছে—ডাক্তারি ভাষায় যার নাম 'গ্যাংগ্রিন্'—আর যার চিকিৎসা অস্ত্রোপচার করে' পচা জায়গাটা কেটে বাদ দেওয়া। ছুরি নিয়ে কবে এগিয়ে আসবে সেই মহৎ ডাক্তার। আমি জানি, সে আসবেই। কিছু দেরি হবে কারণ বাংলাদেশের মধ্যেই অনেক মীরজাফর, উঁমিচাদ গিজগিজ করছে এখনও। তাদের আগে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কিন্তু ওই দেখ, কথায় কথায় আবার সেই কুম্ভীপাকে নেবে পড়েছি।

ওর ঘূর্ণাবর্তে একবার নেবে পড়লে আর রক্ষে নেই। গল্পটার খেই হারিয়ে গেছে।

ছ্যাকড়া গাড়ি অবশেষে পাঁতুণ্ডির বাসার সামনে এসে দাঁড়াল। গলির গলি তস্য গলিতে একটা ভাঙা-চোরা একতলা বাড়ি, একটা নোংরা বস্তির মধ্যে।

পাঁতুণ্ডি নেবে হাঁকাহাঁকি করতে লাগল—"ক্ষেন্তি, ক্ষেন্তি, কপাট খোল—"

খট্ করে খিল খুলে যেতেই জীর্ণ কপাটের একটা পাল্লা খুলে পড়ল।

"কব্জাটা আজও লাগিয়ে দিয়ে যায় নি? বলেছিল আজ আসবে—"

"নগদ পয়সা না পেলে আসবে না"

এই বলে ক্ষেন্তি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। তাকে দেখে চমকে গেলাম আমি। মেয়েটি খোঁড়া। নেংচে নেংচে চলে। যখনই ন্যাংচায়, মনে হয় একটা সাপ বুঝি ছোবল মারবার জন্যে ফণা উদ্যত করছে। ফরসা রং। মুখটা এককালে হয়তো সুন্দর ছিল। কিন্তু গালের উপর প্রকাণ্ড একটা লাল কাটা দাগ। স্কার টিসু (scar tissue) ডান চোখের নীচে থেকে ডান দিকের ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ডান চোখটাও একটু যেন বেশী বড়। মনে হল যেন বিস্ময়-বিস্ফারিত।

"ইনি আজ আমাদের এখানে খাবেন। বাজার করে এনেছেন। তোকে রেঁধে খাওয়াতে হবে—"

ক্ষেন্তি ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ভিতরে ঢুকে গেল।

তারপর ফিরে এসে বললে—"কিন্তু কাঠ, কয়লা কিচ্ছু নেই। তোমার জন্যে আজ ছাতু মুড়ি আর শসা রেখেছি একটা—"

আমি তখন বললাম—"কতদূরে কয়লার দোকান?"

"কাছে—এই মোড়েই!"

"এখনি এনে দিচ্ছি—"

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম এবং একটু পরে একমণ কয়লা নিয়ে ফিরলাম। ইত্যবসরে পাঁতুণ্ডি ক্ষেন্তির কাছে আমার কি পরিচয় দিয়েছিল জানি না। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম ক্ষেন্তি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে শশব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। রান্নাঘরে ঢুকল একবার। তারপর একটা ভাঙা মোড়া আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—"বসুন"। বসলাম। তারপর সে উনুন-ধরানো একটা ভাঙা পাখা নিয়ে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগল। মানা করলাম, শুনলে না কিছুতে।

"উনুনে আঁচ দিয়ে দিয়েছি। উনুনটা ধরুক। ততক্ষণ আপনাকে বাতাস করি—"

আমার মতো পাষণ্ডও কেমন যেন দ্রবীভূত হ'য়ে পড়ল। মনে হল আমাদের দেশ এখনও তার সমস্ত সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে আছে এই গরীব নিম্নমধ্যবিত্তদের ঘরে। এদের বাঁচাতে পারলেই দেশ বাঁচবে। আমার মতো অজ্ঞাতকুলশীল লোককে অভ্যর্থনা করার জন্য কি আগ্রহ, কি উৎসাহ ওদের। তথাকথিত বড়লোকদের বাড়িতেও আতিথ্য গ্রহণ করেছি অনেকবার। তাদের মধ্যে এ আন্তরিকতার স্পর্শ পাই নি। তারা মুখে ভদ্রতা করে, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টি তাদের ভাব-ভঙ্গী অন্য কথা বলে। দামী দামী বাসনে উৎকৃষ্ট খাবার পরিবেশন করে' তারা তাদের ঐশ্বর্য আস্ফালন করতে কসুর করে না, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টি নীরব ভাষায় যেন বলতে থাকে— তুমি একটা আপদ। আর কতক্ষণ জ্বালাবে আমাদের। অবশ্য এ ভাষা শোনবার

কান সকলের থাকে না, কিন্তু আমার মনের ভঙ্গীটা বক্র বলেই হয়তো আমার কান একটু বেশী তীক্ষ্ণ—তাই আমি ওসব শুনতে পাই। মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তাররা একে হয়তো বলবেন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স্ (inferiority complex)—কিন্তু তাই শুনতে পাই, পাই না বললে মিথ্যা কথা বলা হবে।

আমাকে বসিয়ে পতিতুণ্ডি ছাতু মুড়ি আর শসা নিয়ে রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে বাধা দিলুম। "আজ আর বেরিও না। আজ তো খাওয়ার জোগাড় হয়েই গেছে। তাছাড়া আমার মতো একটা লোককে তুমি আজ রোজগার করে ফেলেছ। আমি অবশ্য একটা অপদার্থ বাজে লোক, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার কোন কাজে লাগাতে। আজ আর বেরিও না। আজ এসো বসে' একটু গল্পসল্প করা যাক। তোমাদের পরিচয় নিই"

বসবার জায়গা কিন্তু তেমন ছিল না। এক ফালি বারান্দা আর দুটি শোবার ঘর। একটি পতিতুণ্ডির আর একটি ক্ষেন্তির। এ দুটি ঘরের সংলগ্ন আর একটি টিনের ঘরও ছিল। সেখানে গেলাম। দেখলাম সেটি ওদের পুরনো জিনিস-পত্রে ভরতি। মেঝেতে সংকীর্ণ একটু স্থান আছে। এককোণে একটা তুলো-বার-করা ফাটা গদি ছিল (পতিতুণ্ডিরা এককালে হয়তো গদিতে শুত)—সেই গদিটা আমি টেনে বার করে মেঝেতে বিছিয়ে ফেললুম। আর একটা ভাঙা ক্যাশবাক্স তার শিয়রের দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে করে ফেললুম মাথার বালিশ।

বললাম—"এইটেই হল আমার শয্যা, এইখানেই থাকব। বস"

পতিতুণ্ডি সসংকোচে বসল একধারে। তারপর বলল—"আপনি আমার ঘরটাতেও থাকতে পারেন। একটা দড়ির খাটিয়া আছে। আমি মেজেতেই শোব"।

"চল, তাহলে তোমার ঘরটাও দেখে আসি"

দেখলাম ঘরটার দেওয়ালের চারদিকে সস্তা সেলফ্—আর তাতে অনেক বই। বিজ্ঞানের বই, সাহিত্যের বই, ইকনমিক্সের বই। আর কয়েকটা ফোটো আছে। দুটো ফোটো পতিতুণ্ডির, ইউনিভার্সিটির গাউন পরা। রোদে-পোড়া পতিতুণ্ডির নয়, প্রতিভাদীপ্ত যুবক পতিতুণ্ডির।

"কনভোকেশনের সময় তোলা বুঝি?"

সলজ্জ হাসি হেসে পতিতুণ্ডি বললে—"হ্যাঁ"

"দুটো ফোটো কেন"

আরও লজ্জিত হ'য়ে পড়ল পতিতুণ্ডি।

"একটা কেমিস্ট্রির, আর একটা ফিজিক্সের—"

"দুটোতেই তুমি এম. এস. সি.?"

হাসিমুখে চুপ করে রইল পতিতুণ্ডি।

আর একটা ফোটো দেখলাম, তার বাবার। বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। মনে হল যেন অগ্নিগর্ভ পর্বত।

পতিতুণ্ডি বললে—"অসহযোগ আন্দোলনে পুলিসের লাঠির ঘায়ে বাবা মারা গিয়েছিলেন। মায়ের জেল হয়েছিল"

মায়ের ছবিও দেখলাম পাশেই রয়েছে। তেজোদীপ্ত মাতৃমূর্তি। আর একটা ছবিও দেখলাম। আশাভরা দৃষ্টি তুলে হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে রূপসী কিশোরী একটি।

"এ কার ছবি"

"ক্ষেন্তির"

"ক্ষেন্তির ? কিন্তু এখন ওর এ চেহারা তো নেই"

"না। পূর্ববঙ্গে আমাদের বাড়ি ছিল। রায়টের সময় মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে পড়ে গিয়েছিল ও। একটা রাম দা নিয়ে ও তাদের সঙ্গে লড়েছিল। তারাও ছাড়েনি। সেই সংগ্রামের চিহ্ন এখন ওর সর্বাঙ্গে। অজ্ঞান অবস্থায় ওকে কাঁধে করে' নিয়ে জঙ্গলের ভিতর পালিয়েছিলাম আমি। ক্রমাগত রক্ত পড়ছিল। ভেবেছিলাম মরে' যাবে। কিন্তু মরেনি। নিরাপদ হিন্দুস্থানে যখন পেঁছিলাম তখন ওর গায়ের গয়না বেচে ওর চিকিৎসা করিয়েছিলাম। বিনা পয়সায় সুচিকিৎসা করবার মহত্ত্ব কেউ দেখায়নি। হাঁটুতে খুব বেশী লেগেছিল, তাই ন্যাংচাতে হচ্ছে ওকে। আমরা যে কি অকথ্য কষ্ট সহ্য করেছি তার জীবন্ত প্রমাণ ওই ক্ষেন্তি। আমরা দেশের জন্য গৃহহারা নিঃস্ব হ'য়ে গেলাম। ঢাকার অনেকেই তাই হয়েছে। ঢাকা থেকেই পাস করেছিলাম। কিন্তু তেল দিতে পারি না বলে' একটা চাকরি জোটে নি—অথচ যাঁরা দেশের জন্য কিছুই ত্যাগ স্বীকার করেননি তাঁরাই আজ লাট-বেলাট। ভি. আই. পি. হিসেবে আজ যাদের নাম খবরের কাগজওলারা ছাপতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাদের নাম পর্যন্ত শোনা যায়নি। শুনতে পাই অনেকে নাকি জেল খেটেছে। আমাদের যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তার তুলনায় প্রথম শ্রেণীর বন্দী হয়ে জেলখাটা স্বর্গ-বাসের তুল্য। তবে ওসবের জন্য আমার ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। খানিকটা স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তাকে ভাল করে, আমরাই আবার দেশের মঙ্গলের কাজে তৈরি করে নেব। আমাদের কষ্টের জন্যে আমরাই দায়ী। রবীন্দ্রনাথ বলে' গেছেন—এ আমার এ তোমার পাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে। করছিও—"

যাকে মুখচোরা মনে করেছিলাম সে যে এতবড় বক্তৃতা দিয়ে ফেলবে তা প্রত্যাশা করি নি। দেখলাম তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে, ঠোঁট কাঁপছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত।

বললাম, "প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপ স্খালন হয় শুনেছি। কিন্তু ভাঙা রাস্তা মেরামত করবার সময় পাথরের টুকরোর বদলে হীরের টুকরো দিলে কি সেটা সুবুদ্ধির পরিচয় হবে ? কেমিস্ট্রি ফিজিক্সে কৃতবিদ্য লোক কুলির কাজ করছে, এটা কি দেশের পক্ষে মস্ত বড় ক্ষতি নয় ?"

"আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমাদের দেশে বিজ্ঞানীদের চাকরি করতে হয়, তারা পরীক্ষা পাস করাবার জন্য কতকগুলো বাঁধা গৎ ছেলেমেয়েদের মুখস্থ করায়। অর্থাৎ তারাও প্রায় কেরানী। বিজ্ঞানের যেটা আসল অর্থ বিশেষরূপে জ্ঞান-লাভ করা, তার সুযোগ বড় একটা কেউ পায় না। যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরাও অপরের তাঁবেদারি করেন। সুযোগ পেলে আমিও হয়তো তাই করতাম। তবু এখন আমি যা করছি তাতেও কিছু কাজ হচ্ছে"

"কি রকম—"

"এখন যারা আমার সহকর্মী তারা কুলি-মজুর ফেরিওলা জাতীয় লোক। তারা নিরক্ষর। কিন্তু তা বলে' তাদের বুদ্ধি কম নয়। আমি তাদের নিয়ে একটা আখড়া

করেছি। সন্ধ্যের পর সেখানে আমরা জুটি। বস্তির ভিতর একটা বারোয়ারি উঠোন আছে। সেখানে বিড়ি, তামাক, পান এমন কি গাঁজা পর্যন্ত চলে। তাড়িও খেয়ে আসে দু'একজন। আমি কিছু খাই না বলে' আমাকে খুব সমীহ করে ওরা। আমি ওদের বিজ্ঞানের নানারকম গল্প বলি। ওরা মন দিয়ে শোনে। বুঝিয়ে দিলে সব ওরা বুঝতে পারে। গ্রেগরি সাহেবের লেখা ডিস্কভারি (Discovery) বইটা থেকে অনেক গল্প শুনিয়েছি ওদের। ওরা এমন অকৃত্রিম কৌতূহল নিয়ে শোনে যে মনে হয় ছোটখাটো একটা ল্যাবরেটরি করে' ওদের যদি হাতে-কলমে কিছু দেখাতে পারতুম, তাহলে হয়তো ওদের উৎসাহ আরও বাড়ত। কলেজের ভদ্রসন্তানদের মধ্যে এ উৎসাহ দেখিনি। সাঁইবাবা কিছু টাকা দেবেন বলেছেন।"

"সাঁইবাবা কে?"

"তিনি একজন বাউল। একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ান। চালটাল-ফলটল যা পান তাই খেয়ে থাকেন। কিন্তু পয়সা-কড়ি যা পান তার একটিও খরচ করেন না, সব জমিয়ে রাখেন। তিনি যেখানে গান ধরেন সেখানে ভীড় জমে' যায়। অনেক পয়সা পড়ে সেখানে। সে-সব তিনি জমিয়ে রাখেন। আমাকে একশ' টাকা দেবেন বলেছেন। বলেছেন—"যে জাদুকরীর কুহকে আমরা সবাই ঘুরছি তার নতুন রূপ যদি দেখাতে পার টাকা দেব। সাঁইবাবা অদ্ভুত লোক। হেঁয়ালীতে কথা বলেন"

আমি অবাক্ হয়ে শুনছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম এই উপেক্ষিত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাতদের নিয়ে যদি একটা দল গড়ি, কেমন হয় তাহলে। এরাই তো দেশের মেরুদণ্ড। এরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে। যে কর্মপ্রবাহ নিখিল বিশ্বকে প্রাণময় করে রেখেছে এরা তো সেই প্রবাহেরই তরঙ্গমালা। আমরা তথাকথিত ভদ্রলোকেরা তো সমাজের অলংকারমাত্র, অধিকাংশক্ষেত্রেই বাজে অলংকার, সমাজের সচ্ছল অবস্থায় হয়তো আমরা বেমানান নই, কিন্তু এখন তো আমরা অবান্তর। কিন্তু এদের যদি কাছে ডাকি, এরা আমার কাছে আসবে কি? আমরা তো 'বাবু-ভেইয়া', আমরা তো ওদের আপনজন হ'তে পারিনি। একটা মেকি বিলিতী কালচারের দেওয়াল তুলে আমরা তার ওপার থেকে হয় ওদের শোষণ করেছি, না হয় ওদের অনুগ্রহ বিতরণ করেছি; 'এস' বললেই কি ওরা আসবে? ওদের প্রতি দরদ দেখিয়ে, ওদের পাশবিকতাকে উত্তেজিত করে আমাদেরই মতো ভদ্র তথাকথিত শিক্ষিত এক দল ভদ্রলোক নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সব দল গড়েছে—যে দলের অন্তর্নিহিত সুর পরশ্রীকাতরতা, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, স্বার্থপরতা ছাড়া যারা আর কিছু ভাবতে পারে না, সে সব দলেই ওরা ভীড়ে যাচ্ছে আমাদের নেতাদেরই সর্বগ্রাসী লোভের ধাক্কায়। অনাহারক্লিষ্ট নানা অভাবে পীড়িত গরীব নিম্নমধ্যবিত্তরা যখন আমাদের নেতাদের এরোপ্লেনে উড়ে যেতে দেখে, যখন তাদের রাজকীয় বিলাসের পরিচয় পায়, তখন তারা ভাবতে পারে না যে ওরা আমাদের আপন লোক; তখন তারা আপন লোক বলে' তাদের পাশেই এসে ভীড় করে যারা তাদের সুখের আশ্বাস দেয়, যারা বলে তোমাদেরই তালুক-মুলুক পাইয়ে দেব, তোমরা রুখে দাঁড়াও। এ মিথ্যে আশ্বাসে তারা বিশ্বাস করতে দ্বিধা করে না। তাদের দোষ দিই না, তাদের প্রতি অনেক অত্যাচার হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তারা খেতে পর্যন্ত পাচ্ছে না। ফুটপাথে শোয়।

পাতিতুণ্ডিকে বললাম—"তোমাদের আখড়ায় আমাকে ভরতি করে নেবে? আমিও ওদের অনেক গল্প শোনাব?"

"আপনি সত্যিই এখানে থাকবেন?"

"থাকব, তোমার যদি অসুবিধা না হয়। রাত্রে তোমার আখড়ায় আড্ডা জমাব আর দিনের বেলায় কিছু রোজগার করব। তবে তোমার মতো কুলিগিরি করতে পারব না। প্রাইভেট ট্যুশনি করব। আমি ইংরিজি, অঙ্ক, বাংলা, লজিক, ফিলজফি, ইতিহাসে এম-এ ক্লাসের ছাত্রকেও পড়িয়ে দিতে পারব। তুমি যদি কিছু ছাত্র জোগাড় করে দাও—"

"তা অনায়াসেই পারি। ছাত্র অনেক আছে, ভালো শিক্ষকই নেই। সব ব্যবসাদার—"

"আমার সত্য পরিচয়টা কিন্তু গোপন রাখা চাই"

"কি বলব সকলের কাছে তাহলে বলে' দিন—"

"বলতে পার আমি একজন সংসারত্যাগী প্রফেসার। তোমাদের বস্তিতে এসে বাস করছি। বস্তির গরীবদের সাহায্য করবার জন্যে কিছু অর্থোপার্জন করতে চাই—"

"কিন্তু কোথায় পড়াবেন আপনি?"

"জায়গা অনেক আছে কোলকাতা শহরে। এতগুলো স্কোয়ার আছে, পার্ক আছে, লাইব্রেরী আছে, ফ্রী রিডিং-রুম আছে। যখন যেখানে সুবিধা হয় ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে। যা টাকা রোজগার করব তা গরীব আর নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্যই খরচ করব ঠিক করে ফেলেছি। ওরাই তো দেশ, ওরা যদি বাঁচে তাহলেই দেশ বাঁচবে। এখন তুমি রাজি হলেই লেগে পড়তে পারি"

পাতিতুণ্ডি চুপ করে রইলো। বুঝলাম ওর মন খুঁতখুঁত করছে। আমার এই ছদ্মবেশটা ওর যেন পছন্দ হচ্ছে না। আমি নির্নিমেষে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম, "আমি বুঝতে পারছি তোমার মন সায় দিচ্ছে না এই লুকোচুরিতে। বেশ, তা হলে এক কাজ করি। ধরা দিয়ে বরং জেলেই চলে' যাই দিনকতক। তোমার চক্ষে তাহলে হয়তো নিষ্কলঙ্ক হ'য়ে যাব। তোমার দেখছি প্রায়শ্চিত্তে খুব বিশ্বাস—"

"না, আমি প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি যে টাকাটা আপনি কলেজ ফাণ্ড থেকে নিয়ে খরচ করেছিলেন, সে টাকাটা কি আগে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়?"

"উচিত। নিশ্চয়ই উচিত। আমি দেবও। কিন্তু হাতে তো এখন অত টাকা নেই। তাহলে এক কাজ করা যাক্। আমার যদি বেশী ছাত্র জুটে যায় তাহলে যা রোজগার করব তা জমা ক'রে রেখে দেব। দশ হাজার টাকা জমলেই কলেজ ফাণ্ডে ফেরত দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। মোটকথা তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

পাতিতুণ্ডি মুচকি হেসে বললে—"বেশ। দেখি আমি কি করতে পারি—"

"একটা কাজ তুমি অনায়াসেই করতে পার। তুমি যদি পাইলট মুখার্জি সেজে অমিলার কাছে আমার একটা চিঠি নিয়ে যাও, তাহলে সে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে"

"অমিলা কে—"

অমিলার স্বামীর নামটা বললাম। অমিলার স্বামী যে পরিবেশে বিচরণ করেন, সে পরিবেশে ও নাম বিখ্যাত নাম, কিন্তু পতিতুণ্ড চিনতে পারলে না। অথচ অ্যাটর্নিদের জগতে উনি প্রখ্যাত পুরুষ। নাম ঠিকানা বলতে হল।

পতিতুণ্ড বললে—"এমনিই চলে যাচ্ছি। পাইলট মুখার্জি সাজবার দরকার কি—"

"দরকার এই জন্যে যে, কলকাতায় আমার পরিচিত মহল জানে যে আমি আমেরিকায় প্রফেসারি করছি। এই মিথ্যা-প্রচারটা কিছুদিন থাক, এইটে আমার ইচ্ছে। আমার পরিচিত মহল যদি হুড়মুড়িয়ে এখানে এসে পড়ে, তাহলে তুমিও বিপদে পড়বে, আমিও পড়ব। আমরা যে কাজ করতে চাইছি তা করতে পারব না। আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের বস্তিতে বাস করতে চাই। যে মুখসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য চালিয়াত সমাজে এতকাল আমি বাস করেছি তারা যদি এসে পড়ে তাহলে তারা আমাকে এখানে থাকতে দেবে না। সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। তাই আত্মপ্রকাশ করবার ইচ্ছে নেই। অমিলা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে (ভালবাসে কথাটা আর বললুম না)—সে আমার খবর পেলে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে আমাকে। একবার গিয়েই দেখ না কি হয়—"

পতিতুণ্ড হেসে বলল—"পাইলট মুখার্জি সাজতে হলে একটা ফরসা প্যাণ্ট, ফরসা হাফশার্ট, আর ভদ্রগোছের জুতো চাই এক জোড়া—তা তো আমার নেই—"

"কিনে নাও। আমার কাছে এখনও কিছু টাকা আছে। টাকার জন্যে ভাবনা নেই, তুমি কিছু ছাত্র জুটিয়ে দাও টাকা রোজগার করে ফেলব। গাছতলাতেই কলেজ খুলে বসব—"

পতিতুণ্ড হেসে ফেলল।

হঠাৎ ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ পাওয়া গেল। উঠে পড়লুম।

"চল দেখা যাক্, ক্ষেন্তি কি করছে—"

দেখলাম একটা জীর্ণ রান্নাঘরে দুটো উনুন জ্বালিয়ে ক্ষেন্তি রান্না করছে। আত্মহারা হয়ে পড়েছে যেন। আমাকে দেখে বলল—"সরষে বাটা দিয়ে ইলিশের মাছ ঝাল করলাম। আপনার জন্যে ভেজেও রাখছি কয়েকখানা। রুইমাছের ঝোল রাঁধব ? আপনি ঝোল ভালবাসেন ?"

"তুমি যা ভালবাস তাই কর। তোমার জন্যেই তো এনেছি সব"

"চারখানা মাছ সোনাকে দেব ?"

"সোনা কে—"

"পাশের বাড়িতে থাকে। আমার বন্ধু—"

"নিশ্চয় দেবে। তুমিই তো বাড়ির মালকাইন্, তুমি যা করবে তাই হবে—"

ক্ষেন্তির মুখে অপূর্ব হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল একটা। ছবিতে তার যে হাসিটা দেখেছি একটু আগে, সেইটে যেন আত্মপ্রকাশ করল।

ক্ষেন্তি সেদিন যা রান্না করেছিল তার বর্ণনা করে' সময় নষ্ট করব না। তা 'অপূর্ব" বললে ঠিক বলা হবে না। এক কথায় বলতে হলে একটা ইংরিজি কথা ব্যবহার

করতে হবে, ওয়াণ্ডারফ্‌ল অ্যাণ্ড ইউনিক (wonderful and unique) ঃ সে রান্নায় শ্‌ধ্‌ ন্‌ন-তেল-মশলাই ছিল না, ছিল ক্ষেন্তির চরিত্র ও নিপ্‌ণতা।

সেদিন খাওয়াদাওয়া শেষ করে' যখন উঠলাম তখন চারটে বেজে গেছে।

ক্ষেন্তিকে বললাম—"রাত্রে আমি আর কিছ্‌ খাব না—"

"আমরা খাই তো রাত বারোটায়। আমি তো বিকেলে কাজ করতে যাব। দ্‌' জায়গায় কাজ করি। ফিরতে রাত্রি ন'টা হ'য়ে যাবে। তারপর এসে তো রান্না করব। ততক্ষণ ক্ষিধে পেয়ে যাবে আপনার। আপনি বেশী তো খাননি। রাত্রে ল্‌চি ভেজে দেব আপনাকে। ল্‌চি আর মাছের তরকারি। মাছ কিছ্‌ রেখে দিয়েছি।"

"দেখ, আমার সঙ্গে যদি এভাবে লৌকিকতা কর তাহলে তো আমাকে চলে যেতে হবে। তোমরা রাত্রে যা খাও আমি তাই খাব।"

ক্ষেন্তি নতম্‌খে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক ম্‌হ্‌র্ত। তারপর হঠাৎ নেংচে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল।

"আমি যেখানে কাজ করি সেখান থেকেই খাবার নিয়ে আসি। তারা এঁটো কাঁটা মিশিয়ে খানিকটা মোটা চালের ভাত, জোলো ডাল আর তরকারি দেয়। তাই আমি খাই। সে খাবার আপনাকে আমি দিতে পারব না। দাদার জন্যে চারখানা র্‌টি আর ডাল তরকারি সিদ্ধ করে' রাখি। তাও আপনাকে দিতে পারব না। আপনাকে ল্‌চি খেতে হবে—"

"ঘি পাবে কোথা—"

"আমার বন্ধ্‌ সোনা দেবে। তার স্বামী ডেয়ারিতে চাকরি করে—"

"সে কি করে' ঘি পায় ?"

আবার নতম্‌খে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষেন্তি। তারপর আবার নেংচে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। দেখলাম তার দ্‌ষ্টি থেকে রোষবহ্নি বিচ্ছ্‌রিত হচ্ছে।

"পায় না, চুরি করে। সবাই চুরি করে। ওপরওলা থেকে কুলি পর্যন্ত সবাই চোর। চোর না হ'লে ওখানে চাকরি করা যায় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু সোনার স্বামী ভালো লোক। আমাকে বিনা পয়সায় ঘি দিতে চায় যখন দরকার পড়ে। আমি কিন্ত্‌ নিই না। দাম দিয়ে দি। না দিলে ওদের সংসারই বা চলবে কি করে ?"

পাতিত্‌ণ্ডি এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। হাসিম্‌খে চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হ'ল ক্ষেন্তির উদার আতিথিপরায়ণতা বোধহয় তাকে বিব্রত করছে।

বললাম, "বেশ ল্‌চিই হোক। সবাই ল্‌চি খাব। আমিই আজ খাওয়াই তোমাদের। ভাল ব্‌টের ডালও কর। কাল থেকে তোমরা যা খাও তাই খাব কিন্ত্‌। আমি তোমাদের কাছেই থাকতে চাই, রোজ আমার জন্যে যদি পোশাকী বন্দোবস্ত কর তাহলে তো থাকতে পারব না। আমাকে যদি তোমাদের আপন লোক করে' নিতে না পার তাহলে এখনি আমাকে চলে' যেতে হয়। তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবার ইচ্ছে আমার নেই। যদি কিছ্‌ রোজগার করতে পারি সেটা তোমাদেরই দেব, সেটা সবাই ভাগ করে' খাব। প্‌থিবীতে আমার আপনার লোক কেউ নেই। তোমাদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছি। তোমরা যদি আপন করে' না নিতে পার তাহলে চলে' যেতে হবে"

ক্ষেন্তি ঘাড় ত্‌লে আমার ম্‌খের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ

বলল—"অচেনা লোকের সঙ্গে ভদ্রতা করা সহজ। তাকে আপন করা সহজ নয়। তার জন্যে সময় চাই। হঠাৎ পারব না—"

বলেই ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বেরিয়ে গেল সামনের দুয়ারটা দিয়ে।

"কোথায় যাচ্ছিস ?"—পতিতুণ্ডি ডাক দিল।

"আসছি এখুনি—"

পতিতুণ্ডি বলল—"ক্ষেন্তি অনেক সময় বিজ্ঞের মতো কথা বলে। আপনি কি কোথাও বেরুবেন এখন ?"

"চল, পাড়ার সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও আমার"

"এখন কেউ বোধহয় নেই, সকলেই কাজে বেরিয়ে গেছে। তবু চলুন দেখা যাক—"

ক্ষেন্তি ফিরে এল একটি ঝাঁকড়া চুল যুবককে নিয়ে। তার হাতে একটা প্যাঁচকসু আর কয়েকটা স্ক্রু। লোকটিকে ভদ্র বলে' মনে হল।

পতিতুণ্ডিকে দেখে সে হেসে বললে—"আমার একটা প্যাঁচকস ছিল, কয়েকটা স্ক্রু (screw) কিনে নিয়ে এলাম। ক্ষেন্তি-দি তো ছাড়বে না, এখনি কপাটটা ঠিক করে' দিতে হবে। মিস্ত্রি পাইনি"

পতিতুণ্ডি বললে—"ইনিই ডেয়ারিতে কাজ করেন। নাম বিশ্বেশ্বরবাবু। ক্ষেন্তির বন্ধু সোনার স্বামী। আজ আপিসে যাওনি ?"

"আজ রবিবার যে—"

"তাহলে চলুন অনেকের সঙ্গে দেখা হবে হয়তো। আজ রবিবার সেটা খেয়াল ছিল না—"

পতিতুণ্ডির সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

রাস্তায় যেতে যেতে পতিতুণ্ডি বললে, "বিশুদা বিহারী। ওর উপাধি যাদব। ওর ঠাকুরদা কলকাতায় এসে খাটালে গরু রেখে দুধের ব্যবসা শুরু করেছিল। তারপর থেকে ওরা কলকাতাতেই থেকে গেছে। বিশুদা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এস-সি. পাস করেছে। দুধ আর ঘি সম্বন্ধেও পড়াশোনা করেছে। ডেয়ারিতে কাজ করে, কিন্তু ওর যত মাইনে পাওয়া উচিত ছিল, যে পোস্ট পাওয়া উচিত ছিল তা পায়নি। একজন হোমরাচোমরা ভি. আই. পি.-র গবেট ভাগ্নে সুপারিশের জোরে ওর উপরওলা। ওর কিন্তু এজন্যে রাগ নেই, ও আশ্চর্যরকম সন্তুষ্টচিত্ত লোক—"

পাড়ায় ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গেই আলাপ করলাম সেদিন। দশরথ, ভরথা, মিনুবাবু, রোখন মিশির, ভোজুয়ার মা, সাঁইবাবা, এরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা জগৎ। প্রত্যেকেই মুখে যদিও ভদ্রতা করল আমার সঙ্গে কিন্তু প্রত্যেকের চোখেই অবিশ্বাসের দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলুম। যা ক্ষেন্তির মুখে ভাষা পেয়েছিল একটু আগে তাই যেন এদের হাবভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে অনুভব করলাম। পতিতুণ্ডি আমার পরিচয় প্রসঙ্গে বললে—ইনি এখানে আমাদের পাড়াতেই বাস করতে চান। খুব বিদ্বান লোক। এখানে একটা ইস্কুলের মতো খুলবেন, গরীবের ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াবেন।

সাঁইবাবা বললেন—খুব ভালো কথা। মাছ অনেক আছে। কিন্তু মাছ ধরবার কায়দাটা জানা আছে তো ? প্রেমের জাল চাই। রুই কাতলা খলসে পুঁটি, এমন কি সাপও উঠবে সে জালে।

বলেই তিনি দু'লাইন গান গেয়ে দিলেন—"প্রেমের জালের ব্যাপার চমৎকার। সে জালে রুই কাতলা খলসে পুঁটি—সাপ ব্যাং সব একাকার।"

আমি একটা নাটকীয় কাণ্ড করে' বসলাম। ওই ময়লা গেরুয়া-লুঙি-পরা সাঁইবাবাকে প্রণাম করে' ফেললাম একটা। বললাম—"আমার কোন কায়দাই জানা নেই। আমার একমাত্র কায়দা আপনাদের কাছে এসে পড়েছি। এখানেই থাকব।"

সাঁইবাবা প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে। তাঁর সে প্রসন্নদৃষ্টি আজও প্রসন্ন আছে।

ভাই, চিঠি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তুমি হয়তো বিরক্ত হচ্ছ। কারণ এত বকবক করার পরও আসল কথাটা তোমাকে বলতে পারিনি। এখনি সেটা বলতেও চাই না। গোড়ায় যা বলেছি এখনও সেইটুকুই আবার বলছি। তোমার কাছে যেতে যাই। যাবার অধিকার অর্জন করেছি কি না সেটা তুমি ঠিক কোরো, আমার কেতাবের পাণ্ডুলিপিটা পড়ে'। সেটাও এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমি নিয়মিত লিখি না। মাঝে মাঝে লিখি। তারিখও দিই না। কারণ তারিখ অনেক সময় মনেও থাকে না, আর যখন থাকে তখন মনে হয় আমার তুচ্ছ জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলোকে তারিখের চিহ্নে চিহ্নিত করে' ইতিহাসের মর্যাদা দেবার প্রয়োজনই বা কি। এর থেকে তুমি আমার বর্তমান জীবনের মোটামুটি আভাস পাবে। অনেকের পরিচয় পাবে যাদের তুমি চেন না, অথচ যাদের সম্বন্ধে কবিতা লিখেছ, "আমাদের দেশ" বলে' যাদের সম্বন্ধে তোমাদের নেতারা বক্তৃতার খই ফুটিয়েছেন। এদের পরিচয় কেউ জানে না, এদের ব্যথা কেউ বোঝে না কারণ এদের সঙ্গে কেউ বাস করেনি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'মাস' (mass) নামক অচেনা আইডিয়া পিণ্ডকে নিয়ে অনেক খেলোয়াড়ই লোফালুফি করেছে কেবল। এদের পরিচয়ের মধ্যেই তুমি আমার পরিচয় পাবে। বিচিত্র এবং জটিল কাজের জালে জড়িয়েছি নিজেকে। বিরাট এক ছাত্রছাত্রী বাহিনী গড়ে' তুলছি। তাদের অনেককেই পড়াই পার্কে পার্কে, কাউকে দুপুরের খালি ট্রামে এসপ্ল্যানেড থেকে বেয়ালা যেতে যেতে, গড়ের মাঠে গাছের তলায় আসে কয়েকজন, আমাদের পাড়ার আখড়ায় খুব বড় ক্লাস খুলেছি একটা ছোট ছেলেমেয়েদের। তাছাড়া ক্ষেন্তির ওই ভাঙা ঘরেও আসে অনেকে। সবাই আমাকে ভক্তি করে। কারণ তাদের কাছে আমার একমাত্র দাবি, তোমরা ভালো হও। ন্যায় ও সত্যের জন্য প্রাণবিসর্জন করতে প্রস্তুত হও। অন্যায় আর অসত্যে দেশ ভরে গেছে—তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরই লড়তে হবে। টাকাকড়ির দাবি কিছু করি না। তারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ক্ষেন্তিকে বা পতিতুণ্ডিকে যা দেয় তাই আমার রোজগার। প্রচুর রোজকার হয়। ক্ষেন্তিকে আর রাঁধতে দিই না। তাকেও ঘরে পড়িয়ে পড়িয়ে বি-এ পাস করিয়েছি। সে খুব ভালো বক্তা হয়েছে। আমাদের পাড়ার সভায় সে যখন বক্তৃতা করে, আগুন ছুটিয়ে দেয়। খুব ভালো মেয়ে হয়েছে সে। আমাদের স্কুলের সে-ই প্রধান শিক্ষিকা। সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে' দিয়েছে সে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য। ভাই, জীবনে দুটি জিনিস বুঝেছি। নিঃস্বার্থ ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে' দিতে না পারলে কোনও বড় কাজ করা যায় না। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যে মানুষ হচ্ছে না তার প্রধান কারণ তাদের মানুষ করবার জন্যে কেউ জীবন উৎসর্গ করেনি। শিক্ষকরা অধ্যাপকরা সবাই চাকুরে।

তারা চাকরি করে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার দায়িত্ব তাদের নেই, সে সুযোগও তারা পায় না। তারা আপিসের কেরানী, রেলের বাবু, সাব-ডেপুটি, ডেপুটি, দারোগা বা ম্যাজিস্ট্রেটের দলভুক্ত হয়ে গেছে, তারা নিজেদের আস্ফালন করে, বাগাড়ম্বর করে, আর শাসন করে—শিক্ষা দেবার যোগ্যতা তাদের নেই। তারা জীবন উৎসর্গ করে না। যদি করত দেখতে পেত কি সম্মান, কি আদর, কি শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর তাদের মা বাবারা তাদের মাথায় করে' রাখত। কিন্তু সে রকম শিক্ষক-শিক্ষিকা দেশে নেই। তাই মানুষ তৈরি হচ্ছে না। আজকালকার শিক্ষক-শিক্ষিকারা কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের প্রতিমূর্তি। কেউ বিলাসের বিগ্রহ, কেউ কঠিন পাথর। এরা ফসল ফলাতে পারবে না। ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে আমরা রাগ করি, রাগ হয়ও, কিন্তু এটা বুঝেছি দোষ তাদের নয়, দোষ আমাদের। যে সব সরল নিষ্পাপ শিশুর দল আমাদের ঘরে ঘরে রোজ জন্মাচ্ছে, তাদের আমরাই কুটিল, পাপী, মূর্খ, বাঁদরের দল তৈরি করছি। বাঁদর তৈরি করবার কারখানা আমাদেরই ঘরে ঘরেই রয়েছে। কিন্তু বলে দিচ্ছি এই বাঁদর সেনারাই একদিন লঙ্কাজয় করবে। রাক্ষসদের প্রতিষেধক বাঁদর, মহর্ষি বাল্মীকি এই মহাসত্য একদিন দিব্যচক্ষে দেখে তাঁর অমর কাব্যে সেটা লিখে গেছেন। আমরা যদিও প্রাণপণে চেষ্টা করছি বাঁদরদের মানুষ করবার, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি, হবেও না। কারণ বিধাতার অভিপ্রায় তা নয়। জগতে রাক্ষসদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে—তাদের উৎখাত করবার জন্য তাই বাঁদর পাঠিয়েছেন তিনি। রাক্ষসরা নিশ্চিহ্ন হলে বাঁদররা নিজেরাই কিষ্কিন্ধ্যাতে গিয়ে অন্তর্ধান করবে। দেখ, কথায় কথায় আবার অন্য কথায় এসে পড়েছি। হ্যাঁ, কি বলছিলাম সবাই আমাকে ভক্তি করে। এদের—যাদের আমরা ছোটলোক বলি—তাদের ভক্তি করবার ক্ষমতা অসীম। আমি আগে তোমাদের যে ভদ্রসমাজে বাস করতুম, সে সমাজে কেউ কাউকে ভক্তি করে না। অবশ্য আমি ভক্তিভাজন লোক ছিলুম না। কিন্তু ভক্তিভাজন যাঁরা আছেন তাঁরাই কি তোমাদের ভক্তি আকর্ষণ করতে পেরেছেন? আমাদের বর্তমান সমাজে গুণীকে প্রশংসা বা ভক্তি করবার রেওয়াজ আর নেই। তারা বড়জোর অভিভাবকী ভঙ্গীতে আলতো আলতো তোমার পিঠ চাপড়ে তোমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে পারে। ইংরেজিতে ওকে বলে পেট্রনাইজ্ (patronise) করা। প্রশংসা কেউ করবে না। কাউকে ভাল রেঁধে খাওয়াও, ভাল লেখা পড়ে' শোনাও, ভাল ছবি এঁকে দেখাও, ভাল গান গেয়ে শোনাও—বাঃ বলে' কেউ তোমাকে কৃতার্থ করবে না। বড়জোর একটু মাথা নাড়বে কিংবা মুচকি হাসবে। আমাদের দেশের বড় বড় সমালোচকদেরই বা কি মনোভাব? তারা তো সব কুমীর। পুরোনো পচা মড়া খেয়ে পেট মোটা করে' ডিগ্রী পেয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে মধুকর কি একটাও দেখেছ? আজকাল কেউ কিছু লিখতে পাচ্ছে না এই বাক্য আউড়ে তাঁরা ভারী একটা মুরুব্বিয়ানা ক'রে বেড়ান কিন্তু আসলে হয় তো তাঁরা পরশ্রীকাতর, সমসাময়িক লেখকের ভালো লেখার প্রশংসা করতে তাঁদের বুক ফেটে যায়, কিংবা তাঁরা মূর্খের শিরোমণি—কিছু পড়েন না, ভালো বই কোথায় বেরুচ্ছে তারও খবর রাখেন না। যারা তাঁদের খোশামোদ করে তাদেরই পিঠ চাপড়ান কেবল। এরই নাম সমালোচনা। তথাকথিত সুধী সমাজেই এই

অবস্থা। অর্থাৎ ও সমাজে ডিগ্রীধারী মানেই বিদ্বান, অহংকারী পাজি নিন্দুকেরাই তোমাদের সংস্কৃতির কচুবনে এরণ্ড। আমার মতো পাজি দুশ্চরিত্র লোকও ও সমাজে একদিন নামী অধ্যাপক ছিল। কিন্তু কেউ আমাকে শ্রদ্ধা করত না। কিন্তু এখন আমি যে সমাজে বাস করছি সে সমাজে কেউ জানে না আমার ডিগ্রীর দাম কত, কিন্তু তবু আমি সত্যিই শ্রদ্ধার আসন পেয়েছি এখানে। এটা আমার কৃতিত্ব নয়, ওদেরই কৃতিত্ব। গুণাকে ভক্তি করবার ওদের একটা সহজ প্রবণতা আছে। ওদের এই সরল সহজ প্রবণতার সুযোগ নিয়ে অনেক ধাপ্পাবাজ গুরু ওদের দলে টেনেছে। আমার দলেও ওরা জুটে গেছে। আমি অবশ্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করছি কিসে ওদের ভালো হয়। কিন্তু আমার এই চেষ্টাটাকে ওরা যদি শ্রদ্ধার সম্মান না দিত তাহলে এও কি আমি করতে পারতাম? ভালো করবার আন্তরিক চেষ্টা এবং ভালো হবার ঐকান্তিক আগ্রহ—এই যোগাযোগই মণিকাঞ্চন যোগাযোগ। ঠিক সে রকমটা ষোল আনা হয়তো হয়নি কিন্তু যতটুকু হয়েছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তুমি নিখুঁত—মানে খুঁতখুঁতে—আদর্শবাদী লোক। তোমাকে খুশি করতে পারব কি না জানি না। তবে তোমার ডাক পেলেই তোমার কাছে যাব। তোমার কাছে যাওয়ার জন্যে তোমার অনুমতি চাইছি কেন, সোজাসুজি গেলেই তো পারতাম, এ কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে হচ্ছে। মাত্র চারি চক্ষুর মিলনের জন্য তোমার কাছে যেতে চাইছি না, তোমার সারাজীবন ধরে' যে সহস্রচক্ষু (কিংবা তারও বেশী) তোমার সত্তায় বিকশিত হয়েছে, তোমার সেই সহস্রচক্ষু দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে চাইছি আমার জীবনের সহস্রচক্ষুর সঙ্গে মিলন কামনা করে'। এই যে সহস্রচক্ষুর কথা বলছি এর সবগুলোর অস্তিত্ব তুমি হয়তো জান না, আমিও জানি না, কিন্তু জানি ওরা আছে। ওরা নিষ্পলক, নির্মম, নির্ভীক। বহুবর্ণের, বহুমেজাজের। ওদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট হয়েছে সেই অদৃশ্য কষ্টিপাথর যেখানে সব সোনা যাচাই হয়, যেখানে নকল সোনার দাগ পড়ে না। আমার কষ্টিপাথর থেকে আমি বলতে পারি তুমি আসল সোনা। তোমার মধ্যে কোনও খাদ নেই। আমাকে তোমার ওই কষ্টিপাথরে যাচাই করতে তুমি সম্মত হবে কি না, আমার মতো পাষণ্ডের জীবন কাহিনী নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কি না, তুমি আমার চিঠি যদি এতদূর পড়ে' থাক বাকিটা পড়বে কিনা, যে পাণ্ডুলিপিটা তোমাকে পাঠাচ্ছি তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে তোমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠবে কি না—শিউরে ওঠা অসম্ভব নয়, কারণ ওতে যাদের কথা লিখেছি ভদ্রলোকদের অভিধানে তাদের নাম 'ছোটলোক'। ওদের মধ্যে বেশ্যা আছে, মানে খোলাখুলি বেশ্যা, সতীত্বের লোক-দেখানো ঘোমটা তাদের নেই —ওদের মধ্যে চোর আছে, পকেটমার আছে, ভিখারী আছে, খুনীও আছে দু'-একজন, মাতাল আছে, আমার মতো চূর্ণবিচূর্ণ-চরিত্র লোক আছে, সাঁইবাবার মতো ভালো লোকও আছে, আর আছে অসংখ্য রাস্তার ছেলেমেয়েরা যারা রাস্তাতে জন্মায়, রাস্তায় বড় হয়, রাস্তা যাদের ঘর বাড়ি, রাস্তার অলিগলি, মানুষ, জানোয়ার, রিক্সওলা, ফেরিওলা, সমস্ত রাস্তা যাদের নখদর্পণে—এদের আমি পড়াই, এদের আমি অর্থসাহায্য করি, এদের আমি খাওয়াই, এদের দুষ্টুমি করবার জন্যে, খেলা করবার জন্যে প্রায়ই পয়সা দিই—এরা আমার বন্ধু, এরাই আমার সৈন্যবাহিনী, এদের সাহায্যেই আমি আমার জীবনের সেই সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যটি করব ঠিক

করেছি—এদের কাহিনী তুমি পড়তে রাজি হবে কি না, রাজি হলেও আমার জীবন-বীণার সুরে তোমার জীবনবীণা ঝংকৃত হয়ে উঠবে কি না এটা জানতে না পারলে তোমার কাছে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। আমি অবশ্য সশরীরে যাব না। দ্বিতীয় আর একটা চিঠিরূপে যাব। কুশলার কাছে সশরীরে যাওয়ার সাহস নেই। আমি তার কাছে অপরাধী হ'য়ে আছি, আমার অপরাধ সে ক্ষমা করেনি। আমি অতি খারাপ লোক তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তবু অমিলা আমাকে ভালবাসে এবং প্রশ্রয় দেয়, কুশলাও আমাকে ভালবাসে (আমার মন একথা বরাবর বলেছে, এখনও বলে, এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই) কিন্তু সে আমাকে প্রশ্রয় দেয়নি। নিষেধের একটা তীক্ষ্ণ খড়্গ সে বরাবর উদ্যত করে' রেখেছে আমার সামনে। দশবছর ধরে' সেই উদ্যত খড়্গের ঝলক আমার মনের আয়নায় ঝকমক করছে। সশরীরে তার কাছে যাওয়ার সাহস নেই। বৌদি যদিও মারা গেছেন তবু তাঁর অর্ধচন্দ্রটা অস্ত যায় নি, বরং মারা গেছেন বলেই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেটা। তাই সশরীরে যাওয়া যাবে না ভাই। সশরীরে নাই বা গেলাম। শরীরটা অতি বাজে জিনিস—মলমূত্র-পঙ্কিল, কামনার নরককুণ্ড একটা—শাস্ত্রকারদের এ বচন আমি আওড়াব না, কারণ এই শরীরকে কেন্দ্র করেই অনেক বহূৎসবের মহিমা উপভোগ করেছি, শরীরটা ছিল বলেই তোমাদের নাগাল পেয়েছি। ফোন যন্ত্রটা এমন কিছু জিনিস নয় কিন্তু ওর ভিতর দিয়ে অনেকের নাগাল পাওয়া যায় তাই ওটাকে তুচ্ছ করতে পারি না। শরীরটাও তুচ্ছ করবার নয়, শরীরের ভিতর দিয়েই সেই তীব্র সুখ সেই তীব্র দুঃখ অনুভব করেছি, তাই একদিন হয়তো সেই পরমসত্যের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে আমাকে যা মনুষ্যজীবনের একমাত্র কাম্য। রাবণ বধ করবেন বলেই ভগবানও নরদেহ ধারণ করেছিলেন। সুতরাং দেহটাকে তুচ্ছ করছি না। তবু তোমার কাছে সশরীরে যাব না। প্রথমত কুশলা আছে, দ্বিতীয়ত আমার যে রূপ তোমাকে দেখাতে চাই তা আমার দেহে নেই, মনে আছে। চিঠির ভিতর দিয়েই আমার সেই মনটাকে মেলে ধরতে চাইছি। যে পাণ্ডু-লিপিটা পাঠাচ্ছি, তার ভিতরেও আমাকে পাবে। আর একজনও ওতপ্রোত হ'য়ে জড়িয়ে আছে, আমার সঙ্গে তাকে কিন্তু পাবে না। তার কথা লিখে প্রকাশ করা যায় না বলেই লিখিনি কিছু। লিখলে সে হয়তো আপত্তি করত না। স্তুতি-নিন্দার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে সে। অমিলার কথা বলছি। তার কথা শোনবার তোমার হয়তো কিছু কৌতূহল জেগেছে এতক্ষণ। আর তার কথা না বললে আমার কথা সবটা বলাও হবে না। সে আর আমি অভিন্ন হ'য়ে গেছি। না, কথাটা ঠিক বলা হ'ল না। সে ভিন্নরূপেই আছে, কিন্তু দিবারাত্রি সর্বদা আমার সঙ্গে আছে, দিনের বেলা আলোর মতো রাত্রে অন্ধকারের মতো সর্বদা আমাকে ঘিরে আছে সে। স্বামীর সঙ্গে সে থাকে না, আমার সঙ্গেও না। স্বামীর সঙ্গে সে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে নি, সে তার কাছ থেকে চলে এসেছে শুধু। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবার তার প্রয়োজনই নেই, কারণ মানুষের তৈরি আইনের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে সে। সে বুঝেছে যেখানে তার মিলন তীর্থ, সে তীর্থে সমাজের আইন অচল, শুধু অচল নয়, কুৎসিত কদর্য বাধা। আমাদের অধিকাংশ আইনেরই এলাকা দেহ বা স্বার্থের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। অমিলা ও দুটোর সীমাই পার হ'য়ে গেছে। ও আমাকে কিছুদিন আগে যে চিঠিটা লিখেছে তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি ঃ

"আমি এখন এলাহাবাদে আছি। বাবার একমাত্র উত্তরাধিকারিণীরূপে বাবার যে সম্পত্তি আমি পেয়েছি তাতে আমার স্বচ্ছন্দে চলে' যাবে। আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে এসেছি। সে খারাপ লোক নয়। কিন্তু আমার পক্ষে তার সঙ্গে থাকা সম্ভব নয় বলেই এসেছি। কেন নয় তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমার সেজন্য কোনও কষ্ট হচ্ছে না। আমার বাবা বড় ডাক্তার ছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন তাঁর নির্বাচন তাঁর ডায়োগনোসিস্ ভুল হয়েছিল। সুপাত্র বলে' যাঁর হাতে তিনি আমাকে সমর্পণ করেছিলেন—সামাজিক দিক দিয়ে হয়তো তিনি সুপাত্রই—কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর বনল না। আমি যে মানুষ, আমারও যে আলাদা একটা জীবন্তসত্তা আছে, এটা তিনি বুঝলেন না। মানতে চাইলেন না। তাই চলে' এসেছি। ওর জন্যে কোনও কষ্ট নেই আমার। আমার প্রধান কষ্ট তোমার জন্যে। আমার ফরমাশ মতো তুমি চলবে না, তোমার দুর্দম রথ দুর্গম পথেই চলবে চিরকাল। তোমার সঙ্গে যদি থাকতাম তোমার দুঃখকষ্টের সঙ্গিনী হ'য়ে হয়তো সান্ত্বনা পেতাম কিছু। কিন্তু ইচ্ছে করেই আমি নিজেকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছি। লোক-চক্ষে তোমাকে হেয় করতে চাই না। তবে আমার ভয় হয় অর্থাভাবে হয়তো তুমি কষ্ট পাচ্ছ। তাই একটা চেক বুকের প্রত্যেক পাতায় সই করে' পাঠিয়ে দিচ্ছি পাইলট মুখার্জি'র হাত দিয়ে। তোমার যখন যেমন দরকার টাকা বার করে' নিও। ওই ব্যাংক আমার পঁয়তাল্লিশ হাজার টকো আছে। ওর শেষ কপর্দক পর্যন্ত তুমি নাও। কষ্ট করে' থেকো না। দারিদ্র্যে তুমি অভ্যস্ত নও। আমার এই অনুরোধটি তুমি রেখ। পাইলট মুখার্জি তোমার কথা কিছুই বলতে চান না। মনে হয় তিনি সব জানেন, অথচ কিছু বলবেন না। তোমার খবরটা যেন মাঝে মাঝে পাই। তুমিই এখন সেই অদৃশ্য রজ্জু যা আঁকড়ে ধ'রে আমি মহাশূন্যে ঝুলছে।······নিরবলম্বন হবার সাধনা করিনি আমি······"

এই চিঠি থেকে অমিলার কিছু খবর এবং কিছু পরিচয় পাবে। তার চেক বুকটা আমার কাছে আছে। কিন্তু একটা চেকও এখনও কাটিনি। দরকার হয়নি। যা রোজকার করি তাতে আমাদের তিনজনের রাজহালে চলে' যাচ্ছে। ক্ষেন্তি রোজ মাছ খাচ্ছে। মাসে একটা করে' ফিস্ট' (feast) হয়, তাতে বস্তিসুদ্ধ সবাই খায়। রাস্তার ছোঁড়াগুলোকে প্রায়ই আইসক্রীম খাওয়াই। মুঠো মুঠো লজেন্স্ বিতরণ করি। একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার জগজিৎ সিংয়ের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। তাকে 'নান্' আর মাংস প্রায়ই খাওয়াই হোটেলে। তারই মধ্যস্থতায় আমি কলকাতার পাঞ্জাবী আনডার-ওয়ার্ল্ডের (under-world) সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সে জগতের অধিবাসীরা বলিষ্ঠ, ভয়ঙ্কর, নির্ভীক, নিষ্ঠুর—কিন্তু মাহাপুর্সজির (মহাপুরুষজির) জন্যে তারা সব করতে প্রস্তুত। ওরা সবাই আমাকে মহাপুরুষজি বলেই ডাকে। বুঝেছি নিঃস্বার্থ ভালবাসায় পৃথিবী জয় করা যায়। আমি আরও দুটো বিদ্যে ওদের জন্যেই শিখেছি—হোমিওপ্যাথী আর হাত-দেখা। কোনটাতেই তেমন বিশেষ যে পটুত্ব অর্জন করতে পেরেছি তা নয়। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ি, মাঝে মাঝে লেগে যায়। এতেই ওরা খুশি। যখন লাগে না তখনও ওদের বিশ্বাস টলে না। কারণ ওদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত আমার বিদ্যের উপর নয়, ভালবাসার উপর। আমি যে জগতে এখন আছি সেখানে মেকি কিছু নেই। আছে জীবন-যুদ্ধের আপোষবিহীন

নির্মম সংগ্রাম, আর তারপরে আছে নিখাদ ভালবাসার আর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অজস্র অসংযত প্রকাশ। ভালবাসাটা নিখাদ কিন্তু তোমাদের মাপকাটিতে হয়তো অনাবিল নয়। তোমরা অনেক সময় তোমাদের হাস্যকর নিয়মের নিক্তিতে ওজন করতে গিয়ে হিমালয়কেও বাতিল করে' দাও, কারণ তা তোমাদের নিক্তিতে আঁটে না। দোলের সময় যে কাণ্ড করে ওরা তাকে তোমরা 'বীভৎস' বলবে, তাড়ি খেয়ে জগদেও যে ধরনের খিস্তি করে, মদ খেয়ে দিনু রিক্শাওলা যে ভাবে হাউ হাউ করে' কাঁদে তা তোমাদের সভ্য নাসাগ্রকে কুঁচকে দেয়, কারণ তোমাদের মতে ওসব ভালগার (vulgar)। সাজানো ড্রইংরুমে বসে' পরস্ত্রীদের সঙ্গে সভ্য সমাজের ভদ্রসন্তানরা মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অথবা কচুরি সিঙাড়ায় কামড় দিতে দিতে যে সব ন্যাকা ন্যাকা মুখস্থ-করা বুলি আওড়াও এবং তার সঙ্গে দু'একটা রবীন্দ্রনাথের গান বা দু'একজন বিদগ্ধব্যক্তির বক্তৃতা জুড়ে দিয়ে যে কাণ্ড কর, 'সংস্কৃতি' আখ্যায় সে সব বার্তা নামজাদা খবরের কাগজে ছাপা হয় হয়তো। আমার মতে জগদেও আর দিনুর স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাস ওই একধরনেরই জিনিস এবং মেকি নয় বলে' তার একটা সত্য রূপ আছে। সে রূপ দেখবার দৃষ্টি তোমরা হারিয়েছ, তোমরা ছোট্ট একখানা ঘর বার বার মুছে তার চারিদিকে বাজার-থেকে-কেনা নানারকম জিনিস সাজিয়ে তথাকথিত যে সুরুচির পরিচয় দাও সে সুরুচি অত্যন্ত ঠুনকো, তা প্লাস্টিকের ফুল প্লাস্টিকের পাখী দেখে বাহবা বাহবা করে কিন্তু আসল ফুল আসল পাখী চেনে না। প্যান্ট শার্ট পরে' সারাদিন ভীড়ে ধাক্কাধাক্কি করে' তথাকথিত সভ্যলোকেরা সন্ধ্যের পর তাদের ফ্ল্যাটের খাঁচায় ফিরে দু চারটে বাজে সাময়িক পত্রিকার পাতা উলটে অথবা রেডিওর গান শুনে অথবা মাঝে মাঝে সিনেমা থিয়েটার দেখে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করে কিন্তু তা অস্বাভাবিক অবাস্তব কাল্পনিক আত্মপ্রসাদ, তারা নিজেকেই ঠকায়, ভাবে তাদের আত্মা এতে বুঝি প্রসন্ন হচ্ছে, কিন্তু অত সহজে আত্মা প্রসন্ন হয় না। যে আত্মা ভূমাকামী তা সংকীর্ণতার মধ্যে আনন্দ পায় না। ওই ভদ্রসন্তানদের মধ্যে সুস্থ প্রাণের প্রকাশ দেখিনি। বরং ওই জগদেও, দিনু, জগজিৎ, রাস্তার ওই দুষ্টু ছোঁড়ারা, ক্ষেন্তি, নবুর মা (এ পাড়ার ঝিদের নেত্রী) ঢের বেশী প্রাণবন্ত। এদের নিয়েই দশ বছর কাটল আমার। আমি বুঝেছি এরাই দেশের শক্তি। যে মধ্যবিত্ত সমাজ আগে দেশের মেরুদণ্ড ছিল সে মধ্যবিত্ত সমাজ চোখে ঠুলি বেঁধে দাসত্বের ঘানিতে ঘুরে ঘুরে নিজের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমানদের রাজত্বকালে এই মধ্যবিত্ত সমাজ আর একটু জীবন্ত ছিল, কারণ মুসলমানদের অত্যাচারটা খোলাখুলি অত্যাচার ছিল, তারা মন্দির ভাঙত, মন্দিরের দেবতাদের নিয়ে গিয়ে মসজিদের সিঁড়ি বানাত, জিজিয়া কর আদায় করত, হিন্দুকে কাফের বলত, হিন্দুর মেয়ে বউকে টেনে নিয়ে গিয়ে জোর করে' হারেমে পুরত—এই প্রচণ্ড মারের বিরুদ্ধে যে প্রবল একটা প্রতিবাদ ঘনিয়ে উঠেছিল মধ্যবিত্ত সমাজের মনে তার প্রকাশ নানারকম হয়েছে। রাজা গণেশ প্রমুখ হিন্দু জমিদারদের বিদ্রোহে আর অস্পৃশ্যতার কট্টর কঠোরতায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবও মুসলমানযুগে, তা-ও বিদ্রোহ, নূতন ধরনের বিদ্রোহ, হাত বাড়িয়ে শত্রুকে বুকে টেনে নেবার আন্দোলন। যদিও তাতেও শেষ পর্যন্ত কিছু হয়নি। তারপর ইংরেজ এল। যতক্ষণ তারা শত্রু ছিল ততক্ষণ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের মন জীবন্ত শজারুর মতো কাঁটা উঁচিয়ে তাদের

কাছে ঘেঁসতে দেয় নি। কিন্তু ইংরেজ চতুর ব্যবসায়ীর জাত। তারা অবিলম্বে ভোল বদলে ফেললে। আমাদের হিতৈষী সাজল তারা। আমাদের ইংরেজি শেখাল, আমাদের চাকরি দিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হ'য়ে আমরা গদগদ এবং বিগলিত হ'য়ে যা যা করলাম তা অবশ্য সাময়িক মোহ। ইংরেজের স্বরূপ আবিষ্কার করতে দেরি হয় নি আমাদের। কংগ্রেস আমরাই গড়লুম। তারপর এল লর্ড কার্জনের প্রচণ্ড পদাঘাত—বাংলা দু'ভাগ হ'য়ে গেল। এসব ইতিহাস তো তুমি জানই। কিন্তু এর শেষ ফল কি হয়েছে? আমরা স্বাধীনতা-নামধেয় কিছু একটা পেলাম বটে, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু যা নিয়ে হয়েছিল সেই বঙ্গভঙ্গই করে' দিয়ে গেল ওরা শেষ পর্যন্ত। আর আমাদের নেতারা সেটা মেনে নিয়ে হুড়মুড়িয়ে গদিতে উঠে বসলেন। শুনতে পাই মহাত্মা গান্ধী নাকি দেশভাগে আপত্তি করেছিলেন, যদি করেও থাকেন সেটা ক্ষীণ আপত্তি, তিনি অত্যন্ত সব তুচ্ছ কারণে প্রায়োপবেশন করতেন, এটাতেও যদি তিনি ফাস্ট আনটু ডেথ (fast unto death) করবেন বলে' মনোবল সংগ্রহ করতে পারতেন তাহলে হয়তো দেশ-ভাগ হত না। তা তিনি করেন নি। দেশভাগের ফলে বাঙালীরা—যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল—তারাই আজ সব দিক থেকে মার খাচ্ছে। তারা প্রাণপণ করে' যে দই সংগ্রহ করেছিল নেপোরা তা খাচ্ছে। তাদের মন ভেঙে গেছে তাই। হতাশা আর ব্যর্থতার ক্ষোভে আচ্ছন্ন হ'য়ে তারা আধুনিক কবিতা লিখছে এখন, তাদের চরিত্র নষ্ট হ'য়ে গেছে। কিন্তু যাদের মধ্যে আমি এখন বাস করছি তারা ততটা নষ্ট হয় নি। তাদের দেখে আমার আশা হয়েছে, মনে হয়েছে এরাই আবার গড়বে নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ। এদের মধ্যেই আবার দেখা দেবে নূতন রামমোহন, নূতন বঙ্কিম, নূতন ক্ষুদিরাম, নূতন বাঘা যতীন, নূতন চিত্তরঞ্জন, নূতন নেতাজি। পুরাতন মধ্যবিত্ত সমাজ পচে' গেছে। বহুকালের দাসত্ব, ইয়োরোপের চোখে নিজেদের আধুনিক প্রমাণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা, নানারকম হুজুকের অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন, বিষতুল্য বিলাসের মারণক্রিয়া, মেকি সভ্যতার অন্তর্নিহিত পশুত্ব এদের জীর্ণ করে' ফেলেছে। এদের দ্বারা আর কিছু হবে না। কিন্তু যে নূতন সমাজ আমি আবিষ্কার করেছি, মনে হয় তারা কিছু করতে পারবে। তাদেরই কিছু খবর আমার এই পাণ্ডুলিপিতে পাবে। ভাই, আসল কথা রাবণ বধ করতে হবে, তারপর সীতা উদ্ধার। আগে বানরবাহিনীর পরিচয়টা নাও। ওরা আর কিছু না পারুক বিকট একটা আর্তনাদ করবে, যা তোমরা পার নি। পাপীকে সাজা দেবার জন্য একটা যে বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল বোমারু বারীনের দল, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে মনোভাবের উজ্জ্বল প্রকাশ 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি'—এদের মধ্যেও সেই মনোভাবের প্রদীপ্ত রূপ দেখছি ঘনকৃষ্ণ মেঘের কোলে সূর্যোদয়ের মতো। এদের নিয়ে নূতন অনুশীলন সমিতি গড়েছি আমি এত বড় দম্ভ বাক্য উচ্চারণ করবার সাহস নেই আমার। কিন্তু যা করেছি তা যে নিতান্ত তুচ্ছ নয় এর প্রমাণ আশা করি তোমাকে দিতে পারব একদিন। পতিতুণ্ডিত মতো সৎ মহৎ এবং বৃহৎ লোক আমি বেশী দেখিনি। ও খুব কম কথা বলে, কিন্তু যেটা বলে সেটা সত্য কথা এবং কাজের কথা। ওকে মনুষ্যরূপী ডায়নামো বলে' মনে হয়। ডায়নামোর মতই নীরব, ডায়নামোর মতই শক্তিধর। মাঝে মাঝে এ-ও মনে

হয় ও বোধ হয় নির্বিকার সন্ন্যাসী, ওর মন সেই উঁচু পর্দায় বাঁধা যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলতে পারে—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অনুভব করতে পারে 'শিবোহম্ শিবোহম্', যার স্বাভাবিক প্রবণতা অনাসক্ত অনাড়ম্বর কর্তব্যপরায়ণতার দিকে। ও গীতার অর্জুনের মতো লোক। বিবেকই ওর শ্রীকৃষ্ণ। এই বস্তির মধ্যে সত্যি সত্যি ও ছোটখাটো ল্যাবরেটরি তৈরি করেছে। প্রতি রবিবারে নানারকম 'এক্‌স্‌পেরিমেন্ট্ (experiment) করে' দেখায় পাড়ার ছেলেদের। আমিও যাই ওর ক্লাসে। লাল লিট্‌মাস্ (litmus) গোলা জল যখন উৎসাকারে একটা নল দিয়ে একটা শূন্য ফ্লাস্‌কে (flask) ঢুকে নীল হয়ে গেল তখন অবাক্ হয়ে গেলাম আমরা। পরে শুনলাম ওই শূন্য ফ্লাস্‌ক্‌টা শূন্য ছিল না, অ্যামোনিয়া গ্যাসে (Ammonia Gas) ভরতি ছিল। সেটা না কি অ্যালকালি (alkali) যার সংস্পর্শে এলে লাল লিট্‌মাস্ নীল হ'য়ে যায়। কিন্তু লাল জল ওই অ্যামোনিয়া-ভরা ফ্লাস্‌কে ঢুকল কি করে'? প্রশ্ন করল রিক্‌শাওলা রামেশ্বর। পতিতুণ্ডি জবাব দিলে—আমি ওর উপরে বরফ জল ছিটিয়ে দিলুম যে। ঠাণ্ডায় সব জিনিস সংকুচিত হয়। অ্যামোনিয়া গ্যাসটাও সংকুচিত হ'য়ে গেল, ভিতরে খানিকটা জায়গা খালি হল, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন ভ্যাকুয়াম (vacuum)। প্রকৃতি কোথাও খালি জায়গা থাকতে দেন না, তাই ওই লাল লিটমাসগোলা জল তার ভিতরে ঢুকে নুন যেমন জলে গুলে যায়, অ্যামোনিয়া গ্যাসও তেমনি। জল ঢুকতেই অ্যামোনিয়া গ্যাস জলে গলে' গেল, আরও ভ্যাকুয়াম হ'ল, আরও জল ঢুকতে লাগল। আমরা তো অবাক। চুম্বক নিয়েও নানারকম এক্‌স্‌পেরিমেন্ট দেখায়। একটা ব্যাটারি কিনেছে, ইলেকট্রিসিটিরও নানা লীলা দেখছি আমরা। তাছাড়া ও বম্ (bomb) তৈরি করেছে। জিগ্যেস করলে বলে—একটা বিয়ের জন্যে করছি। কার বিয়ে? জিগ্যেস করতেই ও হেসে উত্তর দিলে—"এ বিয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক দিনে আগে লিখে গেছেন।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ হে মোর মরণ
তাঁর কত মত ছিল আয়োজন
ছিল কতশত উপকরণ
তাঁর লটপট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে
তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ
তাঁর বিষাণে ফুকারি ওঠে তান
ওগো মরণ হে মোর মরণ।"

বিলোচন আর একবার বিবাহ করতে আসবেন। তখন এই বোম্ ফোটাব।"

"বিলোচন আবার তৃতীয় পক্ষ করবেন না কি?"

এর উত্তরে গান গেয়ে উঠলেন সাঁইবাবা—

পাখীর থাকে দুটি পক্ষ
বিলোচনের পক্ষ নাই
লক্ষ পাখায় উড়ে বেড়ান
পক্ষাপক্ষে লক্ষ্য নাই।

এ হেঁয়ালী তখন বুঝতে পারি নি। এখন ক্রমশ বুঝছি। শিবহীন দক্ষযজ্ঞেরও আসল অর্থ সাঁইবাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন একদিন। বলেছেন শিবহীন যজ্ঞ পণ্ড হবেই। যা শিবহীন অর্থাৎ মঙ্গলহীন, যাতে কারো ভালো হয় না তা শিবই ধ্বংস করেন। শিবহীন যজ্ঞের মধ্যেই সে ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে। আরও অনেক কিছু বুঝেছি। তার কিছুটা তোমাকেও বোঝাবার চেষ্টা করেছি এতক্ষণ ধরে'। নিজের উপলব্ধি অপরের মনে সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত করা যায় না এটা আমি জানি, তবু চেষ্টা করছি একটি আশায়। কারণ এটাও আমি জানি প্রেম নিঃশব্দে প্রেমাস্পদের কাছে প্রণয়ীর মর্মবাণী বহন করে। তোমাকে ভালবাসি, ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, এটা মিথ্যা কথা নয়, অলীকও নয়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার মনোভাব কি এ খবরটা কুয়াসায় ঢাকা এখনও। তাই সন্দেহ হচ্ছে আমার উপলব্ধিটা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে কি না। একদিন অবশ্য স্পষ্ট করবই সেটা। আমার যে কথাগুলো বুদ্বুদের মত ফুরফুর করে' উড়িয়ে দিচ্ছি সেগুলো আসলে যে বুলেট তার নিঃসংশয় প্রমাণ তোমাকে একদিন দেবই। এখন এখানেই থামি। যদিও থামতে ইচ্ছে করছে না। অফুরন্ত ধারায় ব'য়ে যেতে ইচ্ছে করছে তোমার দিকে—তোমার ধৈর্যের যে একটা সীমা আছে একথা মন মানতে চাইছে না। তবু থামলাম এখন। সময় করে' পাণ্ডুলিপিটি নিশ্চয় পোড়ো।

তিন

পাণ্ডুলিপিটি খুলিয়া পড়িতে যাইতেছিলাম এমন সময় কুশলা আসিয়া প্রবেশ করিল। কুশলা একটা কলেজে প্রফেসারি করে। সে-ও নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় সে জগৎ রুটিনের (routine) জগৎ, প্রাণহীন যন্ত্রের নিয়মেই সে চলে, সেখানে কোমলতার বা দুর্বলতার স্থান নাই। আমরা এক বাড়িতেই বাস করি, কিন্তু তাহার সহিত আমার ক্বচিৎ দেখা হয়, কথাবার্তা প্রায় হয়ই না। আমার এক ছেলে এক মেয়ে। কুশলাই তাহাদের অভিভাবক। কুশলার ব্যবস্থাতেই তাহারা হস্টেলে থাকে। কুশলার মতে হস্টেলে থাকাও একটা ট্রেনিং। তাছাড়া আমার স্ত্রী যখন বাঁচিয়া নাই, তখন উহাদের দেখাশোনা কে করিবে। আমি যে দেখাশোনা করিতে পারি তাহা কুশলা বিশ্বাস করে না। তাহার মতে পুরুষরা এসব পারে না। এসব মেয়েদের কাজ। কুশলার সঙ্গে তর্ক করি নাই। তর্ক করিলে বলিতে পারিতাম বোর্ডিং হস্টেলের দেখাশোনাও তো পুরুষে করে। এমন কি মেয়েদের হস্টেলের নেপথ্যেও একাধিক পুরুষের কর্তৃত্ব বর্তমান। তর্ক কিন্তু করি নাই, কারণ জানি তর্ক করিলে কুশলার জেদ আরও বাড়িয়া যাইবে। আর একটা

কারণও আছে। কুশলা আমার ছেলেমেয়ের ভার লওয়াতে আমি যেন বাঁচিয়া গিয়াছি। নির্বিঘ্নে তাহাই করিতেছি যাহাকে ভদ্র ভাষায় সাহিত্যসেবা বলা হয়। যতটা পারি সাহিত্যের সেবা অবশ্য করি, কিন্তু কুলিগিরি কেরানীগিরিও করিতে হয়। সাহিত্যের বাজারেও কুলি কেরানীরা আছে এবং তাহাদের বাজার দর সাহিত্যসেবকের বাজার দর অপেক্ষা বেশী। বস্তুত বিশুদ্ধ সাহিত্যসেবকদের বাজার দর প্রায় নাই বলিলেই চলে। তাই লোকের—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের এবং লাইব্রেরির পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য এমন জিনিসও লিখিতে হয় যাহা খুব উঁচুদরের সাহিত্য নহে। একটা দৈনিক পত্রিকার সহিতও যুক্ত হইয়া আছি। তাহতে নানারকম রিপোর্ট লিখি, মাঝে মাঝে আধুনিক হইবার চেষ্টা করি, মাঝে মাঝে অতি-বিজ্ঞ সাজিয়া মূর্খতার পরিচয় দিই। কিন্তু এসব না করিলে রোজকার হয় না। আগে একটা সাহেবের আপিসে ভালো চাকরি করিতাম। সেখানে ভাল মাহিনা ছিল, ইজ্জতও ছিল। এখন সাহেবরা তাঁহাদের ব্যবসায় গুটাইয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবসায় দেশী লোকের হাতে পড়িয়াছে। তাহারা অভদ্র। মাহিনা কম দেয়। ইজ্জতও নাই। তাই সে চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছি। সাহিত্যের হাটেই ঘুরিয়া বেড়াই, যখন যাহা পাই রোজকার করি। মোটামুটি সুখেই আছি। অবান্তর কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। নিজের কথা সাতকাহন করিয়া বলিবার সুযোগ পাইলে আমরা ছাড়িতে চাই না। আশ্চর্য, আমাদের স্বভাব।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপির পুলিন্দাটি খুলিতে যাইব এমন সময় কুশলা প্রবেশ করিল।

"একটু আগে কে এসেছিল দাদা—"

"পাইলট মুখার্জি। বুজু এই সব পাঠিয়েছে—"

কুশলার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। যে তীক্ষ্ম তীব্রতা ইদানীং তাহার চোখেমুখে সর্বাঙ্গে প্রকট হইয়া থাকিত তাহা সহসা যেন তীক্ষ্মতর হইয়া উঠিল। সে নীরবে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "ওকে তুমি আর প্রশ্রয় দিও না দাদা—"

"ও চিঠিতে যা লিখেছে তার থেকে মনে হয় ইচ্ছে করলেও ওকে আর প্রশ্রয় দিতে পারব না। ও আমার নাগালের বাইরে চলে' গেছে"

কুশলা নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ আমার মনে হইল—ভিতরে-ভিতরে ও যেন পুড়িতেছে। ওর চোখমুখের প্রখরতা যেন অন্তনিরুদ্ধ দহনের দীপ্তি। প্রফেসার ঘোষাল উহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু কুশলার সম্মতি মেলে নাই। প্রফেসার ঘোষাল আমাকে বলিয়াছিলেন, "ওর মনের মধ্যে একটা মশাল জ্বলছে। সেই মশালকেই ও আঁকড়ে ধরে' আছে। সাইকো-এনালিসিস (psycho-analysis) করলে হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে—হয়তো ও সহজ হতে পারবে"

সাইকো এনালিসিস করিবার সুযোগ তিনি কিন্তু পান নাই।...বুজুর পাণ্ডুলিপিটা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলাম। মনে হইল চিঠিতে যাহা সে লিখিয়াছে তাহারই বাস্তব রূপ সম্ভবত সে ইহাতে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

পড়িতে শুরু করিলাম।

চার

পাণ্ডুলিপি

আমি ডায়েরি লিখিতে বসি নি। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটিকে সুন্দর করে ফোটাবারও সামর্থ্য আমার নেই। বড় বড় লেখকরা 'জার্নাল' নাম দিয়ে যা লেখেন তত বড় মর্যাদাও এ লেখার নেই। আমি যে জীবন আজকাল যাপন করছি, যারা আমাকে ঘিরে আছে সদা-সর্বদা, তাদেরই কথা লিখছি। তাতেও আমি যে খুব সফলকাম হয়েছি তা-ও মনে হয় না। কারণ যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছি তাদের এত রং, এত রূপ, এত বৈচিত্র্য, তাদের চরিত্রের এত বিভিন্ন দিক, এবং সমস্তটা মিলিয়ে এমন একটা অপরূপ অভিব্যক্তি, তার প্রচ্ছন্ন মহিমা এত ভাস্বর যে তা বর্ণনা করবার শক্তি থাকলে আমি বড় লেখক হতে পারতাম। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা যেমন বিরাট একটা ব্যাপারের আনাচে-কানাচেতে ঘুরে দু'একটা স্ন্যাপ্-শট্ (snap-shot) ফোটো তুলে আনে, আমিও অনেকটা তাই করেছি। এতে ওদের খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে মাত্র। ওদের সঙ্গে না মিশলে ওদের পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না।

শীতলের কথাই প্রথমে বলি। শীতল রোগা লম্বা লোক। মাথার সামনের দিকটায় চুল নেই। পিছনের দিকে লম্বা চুলে জটা হয়ে গেছে। রোগা মুখটায় দাড়ি গোঁফও আছে খাবছা-খাবছা। নাকটা খাঁড়ার মতো। আজানুলম্বিত বাহু, কিন্তু বাহু দুটো খুব শীর্ণ, পা দুটোও তাই। মনে হয় রক্তমাংসের নয়—কাঠের বা বাঁশের যেন। প্রকাণ্ড ঢোল্লা কালো একটা জামা গায়ে দেয়, সেটা আলখাল্লার মতো। হাঁটু পার হয়ে পায়ের গোছের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝুলে থাকে সেটা। কাপড় না পরলেও চলত, কিন্তু তবু কাপড় একটা পরে। কখনও কাপড়, কখনও কৌপীন, কখনও হাফপ্যাণ্ট। যখন যা জোটে। কোনও ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলে ও ভালো স্কেয়ার-ক্রো (scare-crow, যাকে চলতি বাংলায় বলে কাকতাড়ুয়া) হ'তে পারত। কিন্তু ও কোথাও দাঁড়ায় না, সমস্ত দিন হেঁটে বেড়ায় কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায়, যা পায় কুড়িয়ে নেয়, ওর খাওয়া দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ সমস্তই কুড়িয়ে-পাওয়া। সেকালে যে উঞ্ছবৃত্তি-ধারী সন্ন্যাসীদের উচ্চসম্মান দেওয়া হ'ত—শীতল সেই শ্রেণীর লোক—কিন্তু এ যুগে ধূর্ত বণিকরা উচ্চসম্মান পেয়ে থাকে, শীতলরা তুচ্ছ হ'ছে গেছে। আমরা তুচ্ছ করলেও কিন্তু শীতলরা তুচ্ছ হয়ে যায় নি। কারণ তুচ্ছ-উচ্চ একটা তুলনামূলক ব্যাপার, কার চেয়ে তুচ্ছ বা কার চেয়ে উচ্চ এই হ'ল সাধারণ মাপকাঠি, ও মাপকাঠিতে শীতলকে মাপা যায় না, কারণ সে কারও চেয়েই উচ্চ নয়, কারও চেয়েই তুচ্ছ নয়। সে জীবনের নিম্নতম স্তরে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এমন একটা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত যে-সিংহাসন অটল, কারণ তা কারও কৃপার উপর দাঁড়িয়ে নেই, তা দাঁড়িয়ে আছে নিজের জোরে নিজের পায়ে। তোমরা না খেয়ে না গায়ে দিয়ে যা রাস্তায় ফেলে দাও তাই তার সম্বল। আর এ সম্বল অফুরন্ত। কারণ রাস্তায় ফেলে দেওয়ার প্রবৃত্তি তোমাদের কোনও কালে কমবে না, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তোমরা রাস্তায় জিনিস ফেলে দেবে ক্রমাগত।

কাক-শকুনিদের কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, শীতলদের কাছেও থাকা উচিত। শীতলের ভাব ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। রবিবার দিন সে খবরের কাগজের তৈরি প্রকাণ্ড একটা নৌকোর মতো টুপি মাথায় দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিছিল বার করে—মার্চের তালে তালে বলে, চলো চলো সামনে চলো, সামনে চলো, সামনে চলো। 'সামনে'টা মাঝে মাঝে 'সামলে' হয়ে যায়। ছেলের পাল নিয়ে মাঝে মাঝে সে বড় রাস্তাতেও বের হয়। ছেলেমেয়েরা ওকে ভালবাসে কারণ ও রাস্তা থেকে নানারকম জিনিস কুড়িয়ে এনে ওদের দেয় রোজ। কাচের টুকরো, খেলনা-ভাঙা, চমৎকার ছুরির বাঁট, টিনের কৌটো, আয়নার টুকরো, রঙীন ফিতে, ছবি, বাঁশী, ব্যাট-ভাঙা, ফাটা রবারের বল—আরও কত কি। মাঝে মাঝে ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিছিল বার করে। উদ্দেশ্য খানিকটা হৈহৈ করে' ঘুরে আসা। শীতলের আর একটা কাজ হচ্ছে রাজলক্ষ্মী ঠাকরুনের গোদ-ওলা পায়ে গরম তেল মালিশ করা। এর পরিবর্তে রাজলক্ষ্মী ঠাকরুন ওকে নিজের ঘরের বারান্দাটায় বিনা পয়সায় শুতে দেয়। রাজলক্ষ্মী ঠাকরুন এ বস্তির একজন বাড়িউলি। স্থূলাকৃতি মহিলা, মুখটাও হাতির মতো। প্রকাণ্ড নাকটাকে শুঁড়েরই অপভ্রংশ বলে' মনে হয়। দু'পায়ে গোদ, কোমরে বাতের ব্যথা। শীতল ওর পায়ের গোদে তেল মালিশ করে। একদিন বলেছিল—কোমরটাতেও একটু তেল দিয়ে দেব? ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল রাজলক্ষ্মী—পোড়ারমুখ হাড়হাবাতে, আস্পর্ধা তো কম নয় তোর। আমার কোমরে হাত দিতে চাস। তোর পেটে পেটে এত কুমতলব। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে' দেব, জানিস? শীতল রাগ করে নি। হেসে বলেছিল, দাও না, কাল থেকে কেষ্ট মুদির বারান্দায় গিয়ে শোব। রোজই ডাকে সে। যাই না তোমার জন্যে। তীব্রতর ঝঙ্কার দিয়ে রাজলক্ষ্মী বলে ওঠে—দূর হ, এখনি দূর হ তুই, ঘাটের মড়া, যমের অরুচি, উনি আমার জন্যে যান না! যা, যেখানে খুশি যা—এক্ষুনি যা—। শীতল হাসি মুখে বসে থাকে, কোথাও যায় না। রোজই সন্ধেবেলা রাজলক্ষ্মী ঠাকরুনের পায়ে তেল মালিশ করে। হঠাৎ একদিন দেখলাম রাজলক্ষ্মী সদয় হয়েছেন, কোমরটাও পেতে দিয়েছেন, শীতল হাসিমুখে দলাইমলাই করে' যাচ্ছে। শীতল একদিন এসে আমাকে জিগ্যেস করল—আপনি ছেলেমেয়েদের পড়ান শুনেছি। কেন পড়ান? তার মুখে এ প্রশ্ন প্রত্যাশা করি নি। এর উত্তরও হঠাৎ মুখে জোগাল না আমার। খানিকক্ষণ নীরবে তার মুখের দিয়ে চেয়ে রইলাম। শীতলের চোখের দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য জ্বলজ্বল করছিল, অনুভব করলাম উত্তর না দিয়ে উপায় নেই। যে উত্তর সবাই চিরকাল দিয়েছে সেই উত্তরটা দিয়ে কিন্তু বেকুব হ'য়ে গেলাম; বললাম—লেখাপড়া শিখলে জ্ঞান হয়। শীতল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল—জ্ঞান কি? মুশকিলে পড়ে' গেলাম। মাথা চুলকে বললাম—জ্ঞান মানে, সব বিষয়ে জানা। মানে—। শীতল প্রশ্ন করলে, বিষয় কি? আবার মাথা চুলকে বললাম—যা আমরা দেখি, শুনি, ভাবি তাই বিষয়। সেই-সবকে আরও ভালো করে' জানা, আরও ভাল করে' শোনা, আরও ভালো করে' ভাবার নাম জ্ঞান। শীতল বললে—আরও ভালো করে' কি জানা যায়? ওই ভাঙা পাইপটার সম্বন্ধে আরও ভালো করে' কি জেনেছেন আপনি, আর জেনে থাকলেই বা লাভ কি। ও পাইপ আগে কি ছিল আর পরে কি হবে তা জেনে সময় নষ্ট করে' কি হবে। তার চেয়ে যা যেমন আছে, যার যতটুকু দেখছি বুঝছি তাই মেনে নেওয়াই তো

ভালো। আমি থতমত খেয়ে গেলাম ওর কথা শুনে। হঠাৎ কুয়াসার ভিতরে পড়লে লোকে যেমন দিশাহারা হয়ে যায়, আমারও অনেকটা তেমনি হল। মনে হল আমাদের 'লজিক' দিয়ে ওকে বোঝাতে পারব না। একটা কথা মনে পড়ে গেল। দিন কয়েক আগে আমাদের বস্তির কাছে একটা যাত্রা হয়েছিল—পালা 'রাবণবধ'। লক্ষ্য করেছিলাম শীতল সেই পালা তন্ময় হয়ে উপভোগ করছিল এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বললাম—কথাটা অন্যভাবেও বলতে পারি। লেখাপড়া শিখলে রাবণবধ করা যায়। রামই জ্ঞান। আর সীতা আমাদের প্রাণ। রাবণ বধ না করলে সীতাকে উদ্ধার করা যাবে না। রাক্ষস রাবণ আমাদের প্রাণকে বন্দী করে' রেখেছে লঙ্কার গারদে, অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে, তিলে তিলে মেরে ফেলছে। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওই রাবণকে মেরে সীতা উদ্ধার করবার জন্যে। রামেরই আর একটা নাম জ্ঞান। রাজা দশরথ যজ্ঞ করে' তবে রামচন্দ্রকে পেয়েছিলেন। যজ্ঞ মানেই তপস্যা। তপস্যা না করলে জ্ঞানলাভ হয় না। আমি যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি তারও ওই উদ্দেশ্য, রামকে পাওয়া। রাবণবধ করে' সীতা উদ্ধার করতে হবে।

কথাটা শুনে শীতলের চোখ দুটো নির্নিমেষ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে—ও, তাই বুঝি। এতক্ষণে বুঝলুম। কিছুদূর গিয়েই সে ফিরে এল আবার। জিগ্যেস করল—রাবণ কোথায় থাকে। লঙ্কায়? লঙ্কা কোথায়? বললাম—লঙ্কা এখানেই আছে, এই কলকাতায়। শীতল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল—তাই নাকি! আচ্ছা। বলেই চলে' গেল।

দিনকতক পরে একটা নয়া পয়সা এনে আমাকে দিয়ে বললে, 'আপনার ইস্কুলে দিলাম!' তারপর থেকে সে যখনই পয়সা কুড়িয়ে পায় আমাকে দিয়ে যায়। আর একটা প্রশ্ন সে জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে একদিন। বলেছিল, আচ্ছা, একটা ধন্ধ আমার মিটছে না। রাম তো রাবণকে মেরে ফেলেছিল। আবার সে এল কি করে'! বললাম, সে রাবণ তো মরেই গেছে। এ নূতন রাবণ। কোথাও ময়লার স্তূপ জমলে যেমন সেখানে পোকা জন্মায়, তেমনি যেখানে পাপ জমে সেখানেই রাবণ জন্মায়। তাকে মারবার জন্যে রামকে আবার নতুন করে' ডাকতে হয়। তাকে ডাকবার জন্যেই তো লেখাপড়ার আয়োজন। শীতল ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর জিগ্যেস করল, পাপ কি? এর সহজ উত্তর দেওয়া সহজ নয়। একটু ভেবে বললাম—আমাদের মনের কুমতলবগুলো যখন আমাদের সুবুদ্ধিকে মেরে ফেলে তখনই পাপের জন্ম হয়, আর সেই পাপ থেকে রাবণ জন্মায়। শীতল আবার প্রশ্ন করল—কুমতলব কি? বললাম—যে মতলবের পাল্লায় পড়লে আমাদের নিজেদের অনিষ্ট হয়, অপরেরও অনিষ্ট হয় তাই কুমতলব। পণ্ডিতরা ওই মতলবগুলোকে আমাদের শত্রু বলেছেন। ছ'টা শত্রু আছে আমাদের। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। শীতল বলে উঠল—শক্ত শক্ত কথার মানে বুঝি না! তবে খানিকটা বুঝলুম। শীতল সেদিনও মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। শীতল নির্বোধ নয়। ওই সেই 'সব পেয়েছি' দেশের লোক যেখানে কোনও চিন্তা বা প্রশ্নের জটিলতা জীবনের প্রবাহকে বাধা দেয় না। চিন্তা বা প্রশ্ন যে আসে না তা নয়, মেঘের মতো আসে, আবার মেঘের মতো চলে যায়। শীতলকে প্রায়ই দেখতে পাই

না, ও সমস্তদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। যখন পয়সা কুড়িয়ে পায় তখনই সেটা আমাকে দিয়ে যায়। সেদিন একটা ছেঁড়া কার্পেটের আসন নিয়ে এসেছিল। বললে, এটা দামী জিনিস, এর উপর বসেই আপনি পড়াবেন। তাই পড়াই।

শীতলকে সম্মান করি। মনে মনে ভয়ও করি। অনুভব করি ও আমার চেয়ে অনেক বড়।

ক্ষেন্তির বন্ধু সোনা একটি আশ্চর্য মেয়ে। ছেলেপিলে হয় নি। আঁট-সাঁট যৌবন সর্বাঙ্গে এখনও অম্লান। ঝি-গিরি করে। একটা অদৃশ্য নিষেধের বেড়া ঘিরে আছে তাকে। আমার দিকে চেয়ো না, আমার দিকে এগিয়ো না, আমার দিকে হাত বাড়িও না, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিও না—এ ধরনের অনেক রকম অদৃশ্য বিজ্ঞপ্তিও টাঙানো আছে সে বেড়ার গায়ে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেরই সেটা দেখতে পাওয়া উচিত। কিন্তু সোনা জানে যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের মধ্যেও পাজি লোকেদেরও অভাব নেই। তাই পেট-কাপড়ে সে একটা ছোরা নিয়েও বেড়ায়। আমি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করি নি। বরং তাকে এড়িয়েই চলেছি বরাবর। ক্ষেন্তির কাছে সে আসে, দূর থেকেই তাকে লক্ষ্য করি। দূরত্বটা অবশ্য মানসিক দূরত্ব, অতটুকু বাড়িতে দৈহিক দূরত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু সে মানসিক দূরত্বটুকুও ঘুচে গেল একদিন। ক্ষেন্তি এসে বললে—সোনাকে আমি অ আ ক খ থেকে পড়িয়েছি। ও বাংলা মোটামুটি পড়তে পারে। খবরের কাগজ, শরৎবাবুর বই বেশ গড়গড় করে' পড়ে। অঙ্কও কিছু কিছু শিখেছে। ইংরেজি পড়াতেও শুরু করেছি ওকে। কিন্তু ওর ইচ্ছে হয়েছে বাড়িতে পড়ে' ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার। আপনি কোনও ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন? ঝি-গিরি করতে ওর আর ভালো লাগছে না। বিশুর মাইনে কিছু বেড়েছে, দুধ-ঘি-ছানার কণ্ট্রোল হওয়াতে উপরিও বেশ পাচ্ছে আজকাল। ও বলছে, সোনা যদি পড়তে চায় পড়ুক যা খরচ লাগে আমি দেব। বিশুর ইচ্ছে আপনিই ওর ভারটা নিন। আমার সাহস হ'ল না। কারণ আমি নিজেকে চিনি। অন্তরের পশুটা এখন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে আছে বটে কিন্তু কখন যে সে তড়াক করে' লাফিয়ে উঠে গর্জন করবে সে বিষয়ে তখন ততটা নিশ্চিন্ত ছিলাম না এখন যতটা হয়েছি। সোনা আমাদের পাড়ার সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মোহিনী, তার সান্নিধ্যে আসার সাহস হ'ল না। ঘি আর আগুনের উপমাটা যে অর্থহীন নয় তা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই জানতুম। তাই দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলাম। যেখানে আমি একটা আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করছি, সেখানে আমিই যদি পা পিছলে পড়ে যাই বড়ই হাস্যকর হবে সেটা। বললাম, সোনার ভার আমি নিতে পারব না। ওর অন্য ব্যবস্থা কর। নিবারণবাবুকে বল না, উনি তো কোন ইস্কুলের হেডমাস্টারের বাড়িতে রোজ পাঁউরুটি দেন শুনেছি। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হলে তো প্রাইভেটে 'টেস্‌ট' দিতে হবে, তুমি তো জানই। ওই স্কুলের মাস্টাররা যদি ওকে প্রাইভেট পড়ায়, টেস্‌টে পাস করে' যাবে। আমি তোমাকে যখন কোচ করেছিলাম তখন আমার অনেক সময় ছিল, এখন তো সময় নেই। সকালে দেশবন্ধু পার্কে যেতে হয়, দুপুরে বেহালার ট্রামে কয়েক জন ছেলেমেয়েকে পড়াই, তাছাড়া দুপুরে স্কুল আছে, রাত্রে দু'জন ছেলে আসে পড়তে। সময় কই। সোনার কথা তুমি নিবারণবাবুকে বল গিয়ে। ক্ষেন্তি সোজা হ'য়ে নেংচে দাঁড়িয়ে উঠল। সাপের ফণাটা উদ্যত হ'য়ে রইল ক্ষণকাল। তারপর সে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে

চলে' গেল। মনে হল একটা ঢেঁকি যেন আমার প্রস্তাবটার উপর মুষল প্রহার করতে করতে চ'লে গেল। দুদিন পরে শুনলাম বিশু একজন প্রফেসারের শরণাপন্ন হয়েছে। তিনি না কি বিলেতফেরত। একজন বড়লোকের পোষ্যপুত্র, আর একজন বড়লোকের ঘরজামাই, তাছাড়া বাংলা সংস্কৃতির সুন্দরবনে একটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার না কি তিনি। সভায় সভায় ক্রমাগত ল্যাজ আছড়ে আছড়ে চীৎকার করেন—এই দেখ, জার্মানির আধুনিক সাহিত্য, এই দেখ আফ্রিকার আধুনিক আর্ট, এই দেখ ইংল্যাণ্ডের নিও-রিয়্যালিজম্—এই দেখ হেন, এই দেখ তেন। তোমরা এখনও বঙ্কিম রবীন্দ্র নিয়ে বসে' আছ ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘেঁটুবনে। ও দেশে টলস্টয়, গ্যয়েটে, দান্তে, ডিকেন্স বহুদিন আগে বাতিল হ'য়ে গেছে। অর্থাৎ রত্ন একটি। শুধু রত্ন নয়, জহুরীও। সোনার ভার নিতে তিনি রাজী হয়ে গেছেন শুনলাম। চোঙা-প্যাণ্ট-পরা ঠোঁটে-ধবল কালো সুটকো ছোকরাটিকে দেখেছিলাম একদিন। একটা কাঁধ সর্বদাই যেন উঁচু হয়ে আছে, ঠোঁটের একটা কোণও উঁচু। বিদেশী সভ্যতার ডাস্টবিন থেকে এই সব মাল আমাদের সমাজে সর্বদাই আবিভূর্ত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নানাবেশে আবিভূর্ত হয়ে নানারকম গোলমাল করছে, আর আমরা সেইসব কুৎসিত কদর্যতাকে মাথায় তুলে নাচছি। এইটেই আজকাল আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আমাদের স্বদেশী মহামান্য মহামহোপাধ্যায়দের খাতির করি না, খাতির করি এই সব ওঁছা-ছোঁচাদের। দিনকতক পরে লক্ষ্য করলুম সোনাকে একটা গাড়ি এসে নিয়ে যায়। সেখানে ওই বিলাতফেরত ছোকরার তত্ত্বাবধানে দু'জন শিক্ষক নাকি তাকে পড়ায়। আমি মনে মনে ভয় পেয়ে গেলুম। কিন্তু ক্ষেন্তিকে কিছু বলতে সাহস হ'ল না আমার। সে তো প্রথমে ওকে আমার কাছেই এনেছিল। বিশুকে একদিন জিগ্যেস করলুম, সোনার লেখাপড়া কেমন হচ্ছে। বিশু কোনও উত্তর না দিয়ে নীরবে চেয়ে রইল আমার দিকে। লক্ষ্য করলাম সে হাত দুটো মুঠো করছে আর খুলছে। এর দ্বারা সে কি প্রকাশ করতে চাইছে বুঝলাম না। তার চোখের দৃষ্টিতে মনে হ'ল একটা কাতরতা যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। বললাম, কি, ব্যাপার কি। সোনার লেখাপড়া—। হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বললে, সোনা পড়তে চায় না, উড়তে চায়। আমি বাধা দিই নি, কারও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন হ'তে আমি চাই না। সোনা যেন না মনে করে যে, আমি তাকে বিয়ে করেছি ব'লে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করব। আমি তার স্বামী, তার পায়ের শিকল নই। আবার সে তার হাত দুটো মুঠো করে' করে' খুলতে লাগল। বললাম, কিন্তু স্বামী হিসেবে তোমার একটা কর্তব্য আছে। স্ত্রী যদি বিপথে যায়—। আবার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বিশু বললে, —কোন্‌টা বিপথ, কোন্‌টা সুপথ তা ঠিক করবার আমার অধিকার নেই। আমি ঘুস নি', দুধে জল মিশিয়ে দুধ চুরি করি, খাঁটি ঘি-এ ভেজিটেবল অয়েল মেশাই। আমারও পদস্খলন হয়েছিল, সিফিলিস হয়েছিল, গণোরিয়া হয়েছিল। সেই জন্যেই সোনার ছেলেপিলে হয় নি। ছেলেপিলে হ'লে সোনা হয়ত সুখে থাকত। এই বস্তির নোংরামির মধ্যে একা একা ওর দম আটকে আসছে। ও ভাবছে লেখাপড়া শিখে বাইরের জগতে গিয়ে ও শান্তি পাবে। ক্ষেন্তিদি ওকে উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন,—বাইরের আকাশ অনেক বড়। বড় আকাশে উড়ে দেখুক, শেষ পর্যন্ত তো আমি আছি। বাইরের আকাশ বড় সন্দেহ

নেই, কিন্তু সে আকাশের ঝড়ঝাপটাগুলোও বড়। সে আকাশে বাজ ওড়ে, সে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে' শিকারীরা গুলি ছোঁড়ে উড়ন্ত পাখী মারবার জন্যে। বিশু আর কিছু বলতে পারল না, ক্রমাগত হাত মুঠো করে' করে' খুলতে লাগল সে। দেখলাম তার মুখে একটা অপ্রস্তুত হাসি সম্ভবত তার অজ্ঞাতসারেই ফুটে রয়েছে। আমি বললাম—আমি ওর পড়ার ভার নিতে পারতাম, কিন্তু আমার যে মোটে সময় নেই, দেখতেই তো পাচ্ছ, ভোর থেকে উঠেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হয়। বিশু বলল—আপনার সময় থাকলেও ও আপনার কাছে থাকত না। ও রোজই আমার কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করত আমার পড়ার ব্যবস্থা করে' দাও। আমি বাইরের দুনিয়াটা একটু দেখতে চাই। বাইরের দুনিয়াটা দেখবারই ওর কৌতূহল বেশী। ওই যে প্রফেসারের কাছে ওঁকে দিয়েছি সেই প্রফেসার আমার কাছ থেকে খাঁটি দুধ, খাঁটি মাখন, খাঁটি ঘি নিয়ে যান, আমি যে চুরি করে' ওসব বেচি তা জেনেও নিয়ে যান, যদিও খুব বিদ্বান বিলেত-ফেরত অধ্যাপক, কিন্তু চোরাই মাল কিনতে ওঁর দ্বিধা হয় নি একদিনও। আমার স্ত্রীর কথা শুনে উনি বললেন, নিয়ে আসুন তাঁকে, দেখি একটু আলাপ করে'। আলাপ করলেন। তারপর বললেন, আমি ব্যবস্থা করে' দেব। খুব ভালো ব্যবস্থা। ব্যবস্থা ভালোই করেছেন। একটা ক্রাইসলার গাড়ি এসে ওকে নিয়ে যাচ্ছে। দু'জন মাস্টার ওকে পড়াচ্ছে। আমি তাদের মাইনে দিতে চেয়েছিলাম, দিতে পারি নি। মাইনে নিচ্ছে না। রোজ বড় গাড়িটা আসছে। সোনাকে জিগ্যেস করলুম—পড়া কেমন হচ্ছে। 'খুব ভালো' বলে' হাসলে সে একটু। কিন্তু দেখলাম ওর চোখ দুটো জ্বলছে। ওর জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ ও আরও জোরে হেসে উঠল। বলল—ভয় নেই। —আমি নিজেকে বাঁচাতে পারব। আমি জানি ও পারবে। কিন্তু—। আবার হাত মুঠো করে' করে' খুলতে লাগল বিশু।

সোনার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। ক্ষেন্তির সঙ্গেও হয় না। খুব ভোরে ওর জন্যে গাড়ি আসে, অনেক রাত্রে সে বাড়ি ফেরে। বস্তিতে ওকে নিয়ে একটা ফুসফুস গুজ্‌গুজের সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ি-উলি রাজলক্ষ্মী না কি শোভাকে বলেছে—প্রথম প্রথম ওরকম মোটর-টোটর আসে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তোর মতই রাস্তায় হেঁটে হেঁটেই ভাত-কাপড় জোটাতে হবে। শোভা খিলখিল করে' হাসে। শোভা রূপ-জীবা। কিন্তু বেচারীর রূপই নেই। তবু পাউডার পমেড রুজ কাজল মেখে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন মন্দ দেখায় না। খুব রোগা বলে' মনে হয় বুঝি কিশোরী। শোভার ভালই প্র্যাক্‌টিস। কিন্তু ওর প্রধান গুণ—ও রাঁধে ভাল। আমাকে বাবা বলে, মাঝে মাঝে ওর রান্না নিয়ে আসে আমার জন্যে। ওর হাতের কাঁকড়ার ঝাল, ডিমের শুকনো শুকনো ডালনা, ওর হাতের লাউচিংড়ি অপূর্ব। ওর এ গুণের কদর কেউ করে না। পাতানো-বাবাকে মাঝে মাঝে খাইয়ে আর তার মুখে অজস্র প্রশংসা শুনে ওর নারীজন্ম যেন সার্থক হ'য়ে যায়। ক্ষেন্তি একদিন বলল—ওকে বেশী প্রশংসা কোরো না। ও নিজে না খেয়ে তোমার জন্যে রেঁধে নিয়ে আসে। বললাম—ও নিয়ে এলে আমি তো 'না' বলতে পারব না, ওর দামও দিতে পারব না। তুই বরং ওকে রঙীন শাড়ি-টাড়ি কিনে দিস মাঝে মাঝে। ক্ষেন্তি মনে হ'ল এতে একটু অসন্তুষ্ট হ'ল। কিন্তু অবাধ্যতা করে নি, গজগজ করতে

করতে দুটো শাড়ি কিনে দিয়েছিল শোভাকে। কোন মেয়ে আর কোনও মেয়ের প্রশংসা সহ্য করতে পারে না।

ভর্থা (ভারতের অপভ্রংশ সম্ভবত) সেদিন ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে পড়ল আমার ঘরে।

—আমাকে লুকিয়ে ফেলুন শিগ্‌গির, তা না হ'লে ওরা মেরে ফেলবে আমাকে।

আমি প্রকাণ্ড একটা বড় সিন্দুক তৈরি করেছিলাম। পতিতুণ্ডির যে ফাটা গদিটা আমি দখল করেছিলাম সেই মাপেরই করিয়েছিলাম সিন্দুকটা। সিন্দুকের ভিতর থাকত আমার সংসার। বই, খাতা, বালিশ, পাখা, শতরঞ্জি, আরও নানা জিনিস। তাড়াতাড়ি গদিটা সরিয়ে ভর্থাকে ঢুকিয়ে দিলাম ওই সিন্দুকের ভিতর। তারপর গদিটা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে বসলাম তার উপরে গদিয়ান হ'য়ে। ভর্থা বাঁই বাঁই করে' ছুটতে পারে। যারা তার পিছু-পিছু ছুটছিল তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। একটু পরেই এসে হাজির হ'ল তারা।

'কোথায় গেল শালা—এইদিকেই তো এল'।

আমার ঘরে একজন উঁকি মেরে বলল—"দেখেছেন এইদিকে একটা ছোঁড়া ছুটতে ছুটতে এল—"

বিস্ময়ের ভান করে' বললুম—কই না!

কসাই রহিম মিঞা গর্জন করে' উঠল—কি সব হাল্লা মাচাচ্ছেন বেফজুল মশাইরা। এটা ভদ্দরলোকের পাড়া। কোনও ছোঁড়া ফোঁড়া আসেনি এদিকে। কেটে পড়ুন। জনতার ভিতর থেকে একজন বললে—একটি ভদ্রমহিলার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে ছোঁড়াটা। ব্যাগটার ভিতর পার্স ছিল। সেই পার্সটা নিয়ে ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই দেখুন সেই ব্যাগটা। ভদ্রলোক একটা ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে দেখালেন। আমি বললাম, না, এদিকে কেউ আসে নি। রহিম মিঞা চোখ পাকিয়ে এমনভাবে চাইলে তাঁর দিকে যে তিনি আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। ভীড় ক্রমশ কমে' গেল। রহিমের চোখের অগ্নিদৃষ্টিই ছত্রভঙ্গ করে' দিলে তাদের। রহিমের বলিষ্ঠ চেহারা, হামদো মুখ, চেক-চেক লুঙ্গী পরা, ময়লা ছেঁড়া-ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে। আমাদের বস্তিতে এসে মাংস বিক্রি করে রোজ, যদিও সে এ-বস্তির লোক নয় কিন্তু এদের হিতৈষী সে। আমি তার বাঁধা খদ্দের, তাই আমাকে খাতির করে। নিউ মার্কেট থেকে মাঝে মাঝে ভালো 'মাটন' (mutton) দিয়ে যায় আমাকে। সবাই যখন চলে গেল তখন রহিম এসে বললে—এবারে ছেড়ে দিন শালাকে। সিন্দুক থেকে ভর্থাকে বার করে' দিতেই রহিম তার গালে ঠাস্ করে' একটা চড় মেরে বললে—আর একটু হ'লে তো গিয়েছিলিরে শালা। ধরতে পারলে ওরা তোকে ছাতু করে' দিত যে। বেকুবের মতো একি করলি। যখন হাতসাফাই নেই তখন আমার দোকানে বসে' মাংস বিক্রি কর। ক্রুদ্ধ ভিমরুলের মতো তেড়ে গেল তাকে ভর্থা। যে হাত দিয়ে রহিম তাকে চড় মেরেছিল সেই হাতটা সে কামড়ে ঝুলতে লাগল। রহিমের কিল চড় ঘুসি সব ব্যর্থ হয়ে গেল। আর্তকণ্ঠে চেঁচাতে লাগল রহিম—ছেড়ে দেরে হারামির বাচ্চা। তোকে আমি খুন করব। ভর্থা তবু ছাড়ে না। আবার ভীড় জমে' গেল। ভর্থার মা কিকুনি (সম্ভবত কৈকেয়ীর অপভ্রংশ) এসে হাউ হাউ করে' চেঁচাতে লাগল। গোদা পা ফেলে ফেলে রাজলক্ষ্মী ঠাকরুনও

এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, ওরে পোড়ারমুখো, ও যে তোর বাপ্, বাপের হাতে কামড়ে ধরেছিস। বাঘ ভাল্লুকেও তো অমন করে না। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—। ভর্থা তবু ছাড়ে না। শেষে কিক্নি একগাছা ঝাঁটা এনে সপাসপ্ বসাতে লাগল তার পিঠে। আমিও এগিয়ে গিয়ে বললাম—ভর্থা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ঝাঁটার প্রতাপেই হোক বা আমার কথাতেই হোক ভর্থা ছেড়ে দিলে। ছুটে এসে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। রহিমের হাত দিয়ে দরদর করে' রক্ত পড়ছিল। তবু সে মারমুখী হয়ে ছুটে এসে আমার ঘরের কপাটে লাথি মারতে লাগল। কিক্নির হাতে তখনও ঝাঁটা—সে তীক্ষ্ম রিনরিনে কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠল—খবরদার, আমার ছেলের গায়ে তুমি হাত দিও না বলছি। রহিম থেমে গেল, বিড়বিড় করে' অস্ফুটকণ্ঠে বলল—"কস্বি হারামজাদী"—তার পর নিজের মাংসের ঝুড়িটা মাথায় তুলে' চলে যাচ্ছিল, আমি ডাকলুম তাকে। টিঞ্চার আইয়োডিন লাগিয়ে তার হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে' দিলাম আমার পাঞ্জাবির খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে। রহিমচোখ বড় বড় করে' চেয়ে রইল নিঃশব্দে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হ'য়ে গেলে নিঃশব্দে চলে গেল। সবাই চলে' গেল আস্তে আস্তে। কলকাতা শহরে এইরকমই হয়। তুচ্ছ কারণে ভীড় জমে' যায়, আবার একটু পরেই সরে' পড়ে সবাই। ভীড় ধোঁয়ার মতো আসে, ধোঁয়ার মতো চলে' যায়। দেখলুম—কিক্নি কেবল বসে' আছে আমার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে। 'ও ভর্থা, কপাট খোলো। কেউ নেই। সবাই চলে' গেছে।' ভর্থা তবু কপাট খোলে না। 'খোল না বাবা—' কাতর মিনতি ফুটে ওঠে কিক্নির কণ্ঠে। তবু কপাট খোলে না। আমি এগিয়ে গিয়ে কপাটে ধাক্কা দিলুম। 'ভর্থা কপাট খোল'। ভর্থা ভিতর থেকে জবাব দিলে—'ওকে চলে যেতে বলুন'। কিক্নি এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর উঠে গেল। কিক্নি যে ভর্থার মা আর রহিম যে ভর্থার বাবা, এ খবর আমি জানতুম না। এধরনের খবরে আগে বিস্মিত হতাম। এখন হই না। এখন বুঝেছি পৃথিবীতে সব রকম হয়, সব রকম হতে পারে। আমি এখন যে পরিবেশে আছি সেখানে কে কার ছেলে কে কার বাবা এ সব খুঁটিনাটি খবর মূল্যহীন মনে হয়। যে মানুষটাকে হাতের কাছে পেয়েছি সে কেমন লোক এইটেই আমার কাছে এখন বড় কথা। সেদিন ভর্থার একটা বড় পরিচয় পেয়ে গেলাম অপ্রত্যাশিতভাবে। ভর্থা এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা আছে। তাদের নানারকম আবদার আমি সহ্য করি। টিকিট কিনে ফুটবল ম্যাচ দেখতে নিয়ে যাই। সিনেমা দেখবার জন্য প্রায়ই পয়সা দিই। তাছাড়া টুকিটাকি নানারকম খাবার প্রায়ই ওরা পায় আমার কাছে। ওদের খুশী করা খুব সহজ। এক ঠোঙা চানাচুর, বা দু' একটা লজেনস্ পেলেই ওরা মহা খুশী। ওরা সভ্যসমাজের ভদ্র নর-নারীর মতো বস্তুতান্ত্রিক নয়, ওরা কোনও উপহার পেলে সে জিনিসটার দাম কত তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, ভাবগ্রাহী জনার্দন ওরা, উপহারদাতার মনের ভাবটি ধরতে পারে, ভালবাসার দান যত তুচ্ছই হোক তা নিয়ে আত্মহারা হ'য়ে যাওয়ার ক্ষমতা ওদের আছে। আমাদের (মানে, ভদ্রলোকদের) তা নেই। আমরা আত্মহারা হ'তে ভুলে গেছি। আমরা কোনও জিনিসের প্রাণখুলে প্রশংসাও করতে পারি না। কিক্নি চলে' যাওয়ার পর ভর্থা কপাট খুলে মুখ বাড়াল। মা চলে গেছে দেখে কপাটটা সম্পূর্ণ খুলে বেরিয়ে এল। সেই প্রথম আমার চোখে

পড়ল—ছেলেটা বড্ডই রোগা। বুকের হাড় পাঁজরা গোনা যায়, কণ্ঠার হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। প্রথম যেদিন ওকে দেখেছিলাম সে দিনের কথাও মনে পড়ল। রাস্তার একটা হাইড্রাণ্ট থেকে ময়লা জল উৎসাকারে ছিটিয়ে পড়ছিল চারদিকে, তাতেই উলঙ্গ ভর্থা মহানন্দে স্নান করছিল হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর এই অত্যন্ত স্বাস্থ্যহানিকর স্নানলীলা দেখছিলাম মুগ্ধ হ'য়ে। এমন সময় একটা ট্যাক্সি পিছন থেকে এসে আমাকে ধাক্কা দিল। জোরে ধাক্কা দিলে মরে' যেতাম, কিন্তু অদৃষ্টে মৃত্যু ছিল না, তাই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। তারপর যা হল তা অভাবনীয় কাণ্ড। ভর্থা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ট্যাক্সি ড্রাইভারের টুঁটিটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে' এমন চীৎকার শুরু করে' দিলে যে বিরাট ভীড় জমে' গেল একটা। লিংস (Lynx) নামে একরকম নেউলজাতীয় জানোয়ার আছে। সে জানোয়ার আমি চোখে দেখিনি, তার ছবি দেখেছি, ভর্থাকে সেদিন ওই লিকলিকে সরু লিংসের সমগোত্র মনে হয়েছিল। ভর্থা চীৎকার করে' বলছিল—আমাদের গুরুজিকে এই খুনে ড্রাইভারটা এখুনি মেরে ফেলেছিল। আমার কোথাও তেমন লাগেনি, কিন্তু দেখলাম ট্যাক্সি ড্রাইভারের গাড়ির একখানা কাচ ওরা চূর্ণবিচূর্ণ করে' দিয়েছে। ভীড়ের হাত থেকে আমিই বাঁচালাম ড্রাইভারটাকে। তারপর ভীড় যখন কমে' গেল ভর্থাকে জিগ্যেস করলাম, তুমি আমাকে চেন নাকি? ভর্থা বললে, বাঃ, আমি তো ওই পড়াতেই থাকি। আমার বন্ধুরা—মিগু, কোটো, খাটাস্, হুতুম সবাই সন্ধ্যেবেলা যায় আপনার কাছে। আমিও গেছি দু' একদিন। আপনি কি চমৎকার চমৎকার গল্প বলেন। কাস্‌বাংকার গল্পটা খুব ভাল লেগেছিল আমার। ক্যাসাবিয়াঙ্কার গল্পটা বলেছিলাম ওদের একদিন। সেদিন কপাট খুলে যখন ভর্থা বেরিয়ে এল তখন বললাম—তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন। কি খাস সমস্ত দিন। ভর্থা হেসে উত্তর দিলে—যা পাই তাই খাই। ফুলুরি, বেগনি, চানাচুর, এই সবই বেশী খাই। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে একবার কেক আর চা খেতে চেয়েছিলাম। আমি যে দাম দিয়ে খাব তা বিশ্বাসই করলে না লোকটা। বললে—ভাগ শালা। বলে' হি হি করে' হাসতে লাগল। দুলে দুলে হাসতে লাগল। আমার কাছে সন্দেশ ছিল কিছু। নামী দোকানের দামী সন্দেশ। বললাম—এইগুলো খা। কেকের চেয়ে অনেক ভালো। গপ্ গপ্ করে' খেতে লাগল। গোটা দশেক সন্দেশ ছিল। জিগ্যেস করলে—সবগুলো খাব? বললাম—খা। খাওয়া শেষ করে' সে তার ছেঁড়া হাফপ্যাণ্টের পকেট থেকে ছোট্ট রঙীন পার্স বার করলে একটা। বললে—এইটে নিন। আপনার স্কুলের ফাণ্ডে চাঁদা দিলুম। পার্স খুলে দেখি তাতে একশ' টাকার নোট রয়েছে একটা। আর একটা ছোট কার্ড। কার্ডে ঠিকানা লেখা রয়েছে—রানী বিশ্বাস, নিউগী পুকুর লেন। নম্বরটা গোপন রাখলাম। নিউগী পুকুর লেন? একটা মেয়ের ছবি ফুটে উঠল মনে। ভর্থাকে জিগ্যেস্ করলুম—এতে কত টাকা আছে জানিস? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না—না, খুলে তো দেখি নি। 'একশ' টাকা আছে'। সবটাই আপনি নিয়ে নিন। ফের আমি রোজকার করে' নেব। ভর্থা ভদ্দরলোক নয়, পকেটমার। কিন্তু টাকা সম্বন্ধে ওর মোহ নেই দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। আমি চুপ করে' আছি দেখে ভর্থা আবার বললে—আমি আরও টাকা এনে দেব আপনাকে। আরও

এনে দিবি ? টাকা নিয়ে কি করিস রোজ ? জুয়া খেলি, সিনেমা দেখি। খাটাস আর হুতুম বড় পাজি। আমার চেয়ে গায়ে জোর বেশী তো। মাঝে মাঝে আমার টাকা কেড়ে নেয়। আর আমাদের ওস্তাদ রোখোন মিশিরকেও দিতে হয় রোজ দু'টাকা করে'। ধরা পড়লে' ওই আমাদের বাঁচায়। ও নাকি পুলিসকে ঘুস খাওয়ায়। পুলিসরা নাকি আবার তাদের উপরওয়ালাদের খাওয়ায়। আমাদের পকেট-মারা টাকাটা সবাই ভাগাভাগি করে' নেয়। আমরা চোর, আর সবাই সাধুপুরুষ। আবার দুলে দুলে হাসতে লাগল ভর্থা। ভর্থা আমার প্রধান অস্ত্র। ও নানা জায়গা থেকে নানারকম খবর যদি এনে না দিত তা'হলে আমি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যটি করতে পারতাম না। ওর বন্ধুরা—মিগু, কৌটো, খাটাস আর হুতুমও আমার সহায় হয়েছে। ওরা এমন সব খবর এনে দিয়েছে যা ওরা ছাড়া আর কেউ পারত না। ওরাই রাবণের খবরটা এনে দিয়েছে আমাকে—যে রাবণ দেশের প্রাণলক্ষ্মীকে বন্দী করে' রেখেছে অশোক বনে নয়, কুবেরের কারাগারে; আজ দেশের ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য বরুণ যে রাবণের মাথায় ছাতা ধরে' আছে, যে রাবণ যথেচ্ছাচারী কিন্তু যার মুখে ধর্মের মুখোশ……।

একটা দোকানে পান কিনছিলাম সেইখানেই বীরেশ বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হ'য়ে গেল। দেখলাম তিনি আমাকে ভোলেন নি। নমস্কার করে' বললেন, মহাপুরুষের আবার যে দেখা পাব তা প্রত্যাশা করি নি। কোথায় থাকেন ? বললাম, সর্বত্র। প্রশ্ন করলেন, হাওয়ার মতো ? উত্তর দিলাম না, ধুলোর মতো। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। তারপর পকেট থেকে একটা নিমন্ত্রণ-পত্র বের করে' দিলেন আমার হাতে। বললেন, যদি যান সুখী হ'ব। দেখলাম একটা নামজাদা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটা সভা হবে নাকি সন্ধ্যাবেলা। বীরেশ বিশ্বাস সেখানে প্রধান বক্তা। সভাটা যেখানে হচ্ছে সেটা কোনও নামজাদা 'হল' নয়, মনুমেণ্টের নীচেও নয়। জায়গাটা গলির গলি তস্য গলিতে। বললাম—এ জায়গায় সভা করেছেন কেন ? ভালো 'হল' বা 'স্টেডিয়ম' পেলেন না ? বীরেশ বিশ্বাস হেসে বললেন, না, ও সব জায়গায় আমাদের স্থান নেই। খবরের কাগজের পাতাতেও আমাদের সংবাদ ছাপা হয় না। আজকাল যাঁরা ওসব 'হলে' বক্তৃতা করেন বা সংবাদপত্রের শিরঃসংবাদে যাঁরা বিরাজ করেন—তাঁদের অধিকাংশেরই নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে, কিন্তু—কি ব'লব—বিধাতা এরকম পরিহাস হামেশাই করছেন। ওই দেখুন না বিরাট জগদ্দল লরিটা চমৎকার ওই গাড়িটার পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওইটেই এখন এই পথ-সংবাদপত্রের হেডলাইন। কিছুক্ষণ পরে ও অবশ্য থাকবে না। ওর কথা লোকের মনেও থাকবে না। গলিটার দেখে ঘাবড়াবেন না। গলিটা একটা নরক বিশেষ। কিন্তু ওই নরকই আমরা ্জার করে' ফেলব একটা ছোট্ট ঘরে ঘেঁসাঘেঁসি বসে'। আপনি গেলে খুব হব। ধর্ম-প্রতিষ্ঠান দেখে চমকাবেন না। সবাই প্রায় মুর্গি খাই, কিন্তু থ্যে কথা বলি না। আপনি এলে সত্যিই আনন্দিত হব। আপনি সেদিন যে ফুলিঙ্গের কথা বলেছিলেন সেটা মনে এখনও জ্বলছে। প্রতিশ্রুতি দিলাম যাব। করলাম আমাদের পাড়াতেও আপনার পায়ের ধুলো দিতে হবে।

ব্রজেশ বিশ্বাস বললেন—ধুলো তো নেই, পাঁচের দাগ আছে। সেটা চামড়ার মর্মে গিয়ে ঢুকেছে। সহজে তা দেওয়া যাবে না, দিতে চাইও না।

বিকেল চারটেয় ব্রজেশ বিশ্বাসের সভায় গিয়েছিলাম। ব্রজেশ বিশ্বাস যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন সেটি পরে ছাপা হয়েছিল সাইক্লোস্টাইলে। আমিও এক কপি পেয়েছিলাম। উদ্ধৃত করছি তার থেকে—

আপনাদের এ সভায় বক্তৃতা করবার চাপরাস আমার নেই। আমার বয়স যদিও সত্তরের কাছাকাছি তবুও কোনও গুরুর কাছে আমি মন্ত্র নিই নি, কোনও ধর্মসংঘের খোঁয়াড়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখবার প্রেরণা পাই নি। নানা মাঠে আমি যথেচ্ছ চরে' বেড়িয়েছি। বিশেষ করে' সাহিত্যের মাঠে। যে আনন্দ, যে প্রেরণা, আমরা ধর্মের কাছে প্রত্যাশা করি, সাহিত্য-চর্চা ক'রেই তা আমি প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি। কিন্তু আমাদের সমাজে বাস করতে গেলে ধর্মকে এড়িয়ে চলবার উপায় নেই। আমার কপালে যে হলদে রঙের ফোঁটাটা দেখছেন সেটা আমার পিসিমা পরিয়ে দিয়েছেন ষষ্ঠীপুজোর আশীর্বাদস্বরূপ। আপনাদের অনেকেই এখনি বললেন যে, আমাদের দেশ থেকে ধর্ম লোপ পেয়েছে। আপনাদের সংঘের খাতায় যাঁরা নাম লেখান নি তাঁরা যদি অধার্মিক হন তাহ'লে আমার ব'লবার কিছু নেই। কিন্তু যা আমাদের ধরে' রাখে বা যাকে আমরা ধরে' থাকি তাই যদি ধর্ম হয় তাহ'লে তা আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে আছে। বস্তুত ও ছাড়া আর কিছু নেই বোধ হয়। সে ধর্মের চেহারা অবশ্য নানারকম, কিন্তু ধর্মের ছাপ-মারা একটা নীতি-নির্দিষ্ট পথ ধরেই চলতে আমরা অভ্যস্ত। আর সে ধর্মের মূল লক্ষ্য, বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকাটাই অধিকাংশ লোকের কাছে একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা বন্য পশু ছিলেন, তাঁরাও বেঁচে থাকবার জন্যে নখ-দন্ত প্রস্তর-লগুড়ের সহায়তায় যা করতেন, এই অতি-আধুনিক সভ্যযুগে আমরাও তাই করছি। আমরা দাবি করি আমাদের 'প্রগতি' হয়েছে—সে প্রগতি আমাদের ওই সাবেক অস্ত্রগুলোর রূপ-পরিবর্তন করতে সমর্থ করেছে, তাদের সংহার শক্তিও আমরা বহুগুণ বাড়াতে পেরেছি, এ সমস্তকে আবৃত করে' একটা নীতি-সুগন্ধী ধর্মের আবহাওয়াও আমরা সৃষ্টি করেছি। হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডন (White man's burben) পীসফুল কো-একজিসটেন্স্ (Peaceful co-existence), শাদা পায়রা উড়িয়ে শান্তির অমৃতময় বাণী ছড়িয়ে দেওয়া, প্রকাণ্ড সশস্ত্র বাহিনী রেখে অহিংসার ঢং করা—এই ধরনের প্রগতির মহিমা খবরের কাগজে, রেডিওতে, নেতাদের বক্তৃতায়, নানারকম সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনে নানা সুরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষরা ওসব ধাপ্পায় ভুলি না। মুখে যাই বলি মনে মনে একটি ধর্মকেই আমরা আঁকড়ে থাকি—সেটি হচ্ছে জীব-ধর্ম। বাঁচতে হবে। মাদুলী পরে' হোক মানত করে' হোক, সিন্নি দিয়ে হোক, চাকরি করে' হোক, খোশামোদ করে' হোক, ঘুস দিয়ে হোক, যেমন করে' হোক বাঁচতে হবেই। জ্ঞানী শাস্ত্রকাররাও আমাদের কথায় সায় দিয়ে বলেছেন—আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে বেদ হিন্দুধর্মের মূল বলে' কীর্তিত সেই বেদের অগ্নি দেবতার মাধ্যমে যজ্ঞস্থলের আবহনীয় বেদীতে ইন্দ্র-বরুণ-অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি শক্তিধর দেবতাদের আহ্বান করে' বৈদিক ঋষিরা যে

প্রার্থনা জানিয়েছেন সে প্রার্থনারও সারবস্তু—আমাদের বাঁচাও, আমাদের শতায়ু কর, অমিতবীর্য কর, আমাদের দেহমনে শক্তি সঞ্চার করবার জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আমাদের অনুকূল কর। পর্জন্য বৃষ্টিধারা বর্ষণ করুক, বসুন্ধরা ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক, আমরা যেন শতায়ু হ'তে পারি, আমরা যেন শত্রু-বিজয়ী হ'তে পারি। সোমরসের অমৃতধারা আমাদের ম্রিয়মাণ উৎসাহকে যেন বারংবার সঞ্জীবিত করে। ভালোভাবে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাকেই সেই অনাদিকাল থেকে অধিকাংশ মানুষই এখনও ধর্মরূপে অবলম্বন করে' আছে। আমরা সাধারণ লোকেরাও তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে যে প্রার্থনা প্রত্যহ নানা মন্ত্রে জানাই তারও মর্ম—আমরা বড় অসহায়, বড় আর্ত, হে শক্তিমান দেবতা তুমি আমাদের শোক থেকে, দুঃখ থেকে, রোগ থেকে রক্ষা কর। আমাদের অন্ন দাও, শক্তি দাও, রূপ দাও, পুত্রকলত্র দাও—এই দেহি দেহি রবই অধিকাংশ লৌকিক ধর্মের ভিত্তি। এই উদ্বাহু ভিখারীর দলকে মাঝে মাঝে বিশ্ববিশ্রুত ধর্মাচার্যগণ অন্য রকম উপদেশও দিয়ে গেছেন। বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনব্যাপী সাধনার যে বাণীমূর্তি আজ আমাদের কাছে দেদীপ্যমান তা অতি সরল, অতি সহজ, তার শোভা অতিশয় সহজবেদ্য, অত্যন্ত মনোহারী। ও'রা বলেছেন—তোমরা সংসার জ্বালায় জর্জরিত তা ঠিক, কিন্তু তবু তোমাদের অনুরোধ করছি তোমরা একটু ভদ্র হও। মিথ্যা কথা বোলো না, চুরি কোরো না, পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরো না, পরশ্রীকাতর হোয়ো না, যতটা পার পরের উপকার কর, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখবার চেষ্টা কর। সবাইকে ভালবাস। ভালবাসাই একমাত্র চাবি যা দিয়ে সকলের হৃদয়-দ্বার খোলা যায়। সে চাবি তোমার মনের মধ্যেই আছে, সেই চাবিটির সন্ধান কর। ভদ্র হও। কিছু ত্যাগ না করলে ভদ্র হওয়া যায় না। যতটা পার পরের জন্য ত্যাগ কর। তোমরা সবাই দুঃখী, পরস্পরকে সাহায্য করলেই তোমাদের দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। সবাই ভদ্র হ'লে এই দুঃখের অন্ধকারে সুখের আলো ফুটবে। এরই নাম ধর্মাচরণ, এই ভদ্র আচরণই জীবনকে সার্থক করে। এই সহজ সরল আটপহুরে ধর্মকে আমরা যদিও মনে মনে মান্য করি কিন্তু ষড়রিপুর দাপটে এটাও জীবনে রূপায়িত করতে পারি না। কারণ আমাদের মনে কামনার যে রং লেগেছে—এ রং কে যে লাগিয়ে দিয়েছে তা জানি না—সে রংটা খুব পাকা। বহু বহু শতাব্দীর ধোলাই সত্ত্বেও এ রং ওঠে নি। মানবসভ্যতার বাইরের প্রসাধনটাই একটু চাকচিক্যময়, ভিতরে ভিতরে আমরা অধিকাংশ লোকই এখনও সেই আদিম পশুই আছি। পশুদের চেয়েও হীনতর বলতে পারেন। সত্যিই পশুদের চেয়েও বেশী ভয়ংকর আমরা। পশুরা পশুত্বের প্রয়োজন-অনুসারে সহজবুদ্ধি-চালিত যে জীবন যাপন করে, তা মানব-পশুর জীবনের মতো অত ভয়ংকর নয়। পশুরা প্রয়োজনের সময় বা আত্মরক্ষার জন্য হিংস্র হয় কিন্তু আমরা কারণে-অকারণে পিশাচ। তথাকথিত আধুনিক মানব-সভ্যতা পিশাচ সভ্যতা। রাবণরা এখনও সীতাহরণ করছে, কংসের কারাগারে কৃষ্ণ-জননী দেবকী এখনও বন্দিনী, কুরুসভায় এখনও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করবার প্রচেষ্টা চলছে, এখনও দুর্যোধনেরা ষড়যন্ত্র করছে পঞ্চ পাণ্ডবের বিরুদ্ধে—অবশ্য সবাই হচ্ছে ভিন্ন নামে, ভিন্ন মুখোশের তলায়, আধুনিক শ্লোগান এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সমারোহ-সজ্জার অন্তরালে। ধর্মের প্রসঙ্গে যদি ইতিহাসের কথা স্মরণ করি তাহ'লে দেখব

ধর্মের নামে যত পাশবিকতা, যত রক্তপাত, যত নারীধর্ষণ, যত শিশু-হত্যা হয়েছে এমন আর কিছুতে হয় নি। আজও যে-সব যুদ্ধ হচ্ছে তাও ধর্মের নামে, ন্যায়ের নামে। ওই ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে যে, ওই সব ধর্মের শেষ পর্যন্ত যে পরিণতি হয়েছে তা-ও ভয়াবহ। খৃস্টান ধর্মের ইন্‌কুইজিশন্ (Inquisition), পোপেদের অত্যাচার, এবং পরে ভণ্ড পাদরিদের রাজ্য-অপহারক বণিকদের আওতায় বিদেশে গিয়ে হিদেনদের (heathen) আলোকদান করা, আর সেই ছুতোয় প্রতি দেশে আত্মকলহের বীজবপন করা—এসব কথা আজ আর গুপ্ত কথা নয়। আমাদের দেশেই বুদ্ধধর্মের ন্যক্কারজনক পরিণতি হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ধর্ম জঘন্য ব্যভিচারের আবিলতা সৃষ্টি করেছিল, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করে' মুখোশ-পরা ঘোর সংসারী তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এখনও, আমাদের যুগেও, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে' যেসব দল গড়ে' উঠেছে, নানা মিশনে, নানা ধর্মসঙ্ঘে আমাদের চোখের সামনেই যা ঘটছে তাতে স্বচ্ছ-দৃষ্টি লোকেরা যা দেখতে পাচ্ছেন, তা ওই কামনার পাকা রং, তা সেই সনাতন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের প্রসাধন-লীলা, সেই সাবেক ষড়রিপুর অত্যাধুনিক কৌশল সংস্কৃতি নামধেয় ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রলে ধর্মকে জৈব-প্রবৃত্তিরই একটা উচ্ছ্বাস বলে' মনে হয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সাধারণ লোকসমাজে ধর্মের একটা ভদ্র প্রভাব আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভদ্র বিবেকী লোক যে একেবারে বিরল তা নয়। তারা সাধারণ সংসারীর জীবনযাপন করে, সমাজের দায়-দায়িত্ব বহন করে, মানীকে শ্রদ্ধা করে, পূজ্যকে প্রণাম জানায়। পূজা-পার্বণে রাস্তায় তারাই দল বেঁধে বের হয়, গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে, মন্দিরে মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য সাজায়। ভগবান কি, আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, এ-সব প্রশ্নের উত্তর তারা হয়তো দিতে পারবে না, কিন্তু তাদের বিশ্বাস-পবিত্র চোখ-মুখের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হবে যে, শত কুসংস্কার সত্ত্বেও ওরাই বোধ হয় জেনেছে ধর্ম কি। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যের ধারা ফল্গুর মতো ওদের মধ্যেই বোধ হয় বইছে। আমাদের সাধারণ জীবনে ধর্মের এইটেই সাধারণ চেহারা—এ-ধর্ম নিষ্কাম নয়, সকাম। এ নিজেদের জন্য এবং সকলের জন্যই ভগবানের করুণা প্রার্থনা করে। কিন্তু এ ছাড়াও ধর্মজগতে আর একটা জিনিস আছে যা সাধারণ নয়, যা অসাধারণ। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে যা বিস্ময়কর। তাঁরা যেন মানুষ নয়, তাঁরা যেন মূর্তিমতী আকুলতা। আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথা যাব, সত্য কি, ব্রহ্মই বা কি, ব্রহ্মকে জানবার পথ কি—এইরকম অসংখ্য প্রশ্ন তাঁদের পাগল করে' তোলে। শুধু ধর্মজগতে নয়, সত্য-সন্ধানের যত রকম জগৎ আছে—যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান—সে-সব জগতেও এঁদের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের কেউ বলেন প্রতিভাশালী, কেউ বলেন সাধক, কেউ বলেন পাগল। এঁরাই সন্ন্যাসী, নিজেদের সাংসারিক অস্তিত্ব লোপ করে' এঁরাই যুগে যুগে অজানা পথে সহসা বেরিয়ে পড়েন একদিন। সমাজের সাধারণ আইনকানুন এঁদের বাঁধতে পারে না। এঁরাই প্রকৃত বিদ্রোহী। মনের জোর, চিত্তের একাগ্রতা, মনোবৃত্তিকে একীভূত করবার অদ্ভুত ক্ষমতা—চলতি ভাষায় যাকে বলে 'যোগ' এই এঁদের সম্বল। ধন, মান, প্রতিপত্তি, যোগলব্ধ বিভূতি কোন কিছুই চান না এঁরা, এঁদের একমাত্র লক্ষ্য সত্য। এঁরাই

সত্যদ্রষ্টা, এঁরাই মানব-সমাজের পথপ্রদর্শক। এঁরা অসাধারণ। এঁদের বাইরের চেহারা একরকম নয়। কেউ খাপে-ঢাকা ইস্পাতের তলোয়ার, কেউ বিষধর সাপের মাথার উপর জ্বলন্ত মানিক, কেউ গভীর সাগরজলের তরঙ্গবিলাসী মুক্তা-গর্ভ শুক্তি, কেউ প্রস্ফুটিত শতদল, কেউ প্রজ্বলন্ত অগ্নি-শিখা, কেউ আকাশচুম্বী পর্বত, কেউ রহস্যময় নিবিড় অরণ্য, কেউ শান্ত স্থির, কেউ অশান্ত উন্মাদ, কেউ সুন্দর, কেউ ভয়ঙ্কর। বাইরের চেহারায় সবাই মানুষ, কিন্তু মনের ভিতর প্রবেশ করুন দেখবেন দু'জন সত্যদ্রষ্টা একরকম ন'ন। বামাক্ষেপা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহর্ষি রমণ, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা বিস্ময়কর জগৎ। একই সূর্যকে কেন্দ্র করে' হয়তো সবাই ঘুরছেন, কিন্তু মরকতশ্যাম বুধের সঙ্গে জ্যোতির্বলয়শোভিত শনির কোনও মিল নেই। সাধারণ লোকেরা ওঁদের নকল করতে গিয়ে ভণ্ডে পরিণত হয়। কারণ কারও নকল করে' সত্যকে জানা যায় না। নিজের জানা দিয়ে, নিজের উপলব্ধি দিয়ে, নিজের সমস্ত সত্তাকে দিয়ে সত্যকে জানতে হয়। সে 'জানা' নিজের নিঃসংশয় অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া চাই—এ ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলে না। সত্যকে জানবার হয়তো অসংখ্য পথ আছে, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারেরা মাত্র তিনটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। জ্ঞানের পথ, ভক্তির পথ, আর কর্মের পথ। বিপুল অধ্যয়ন, বিশাল প্রতিভা, বিবিধ গবেষণা, কঠিন অধ্যবসায় জ্ঞানের পথে পাথেয়। এই পাথেয় অবলম্বন করে' জ্ঞানীরা সাগর মরু পর্বত পার হ'ন। তারপর সত্যের দেখা পান। যখন পান তখন তাঁর সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত গবেষণা, সমস্ত উপকরণ তুচ্ছ হয়ে যায়, যেমন তুচ্ছ হয়ে যায় সিঁড়িটা ছাতে ওঠবার পর। সাধারণ লোকের পক্ষে জ্ঞানের পথ সুগম নয়, কারণ এর জন্য যে মেধা, যে একনিষ্ঠ চরিত্রবল আবশ্যক, তা সকলের আয়ত্তাধীন নয়। ভক্তির পথও সকলের জন্য নয়। ভগবানের বিশেষ দয়া না থাকলে কারও মনে ভক্তি জাগে না। আমি কবি হ'ব ব'ললেই যেমন কবি হওয়া যায় না, তেমনি আমি ভক্ত হ'ব বললেই ভক্ত হওয়া যায় না। ভগবান যেমন বিশেষ বিশেষ মানুষকে রূপ দেন, প্রতিভা দেন, শৌর্য, বীর্য মহিমা দেন, তেমনি বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে অচলা ভক্তির বিপুল বিশ্বাসও তিনিই সঞ্চারিত করেন। শাস্ত্রে বলেছে ভগবান ভক্তের দাসানুদাস। কিন্তু সে রকম ভক্তি সকলের হয় না। অবিশ্বাসের প্রদাহে, স্বল্পজ্ঞানের অহংকারে, ভক্তির সুকুমার চারা জ্বলে পুড়ে যায়। যিনি প্রকৃত ভক্ত, তিনি নিঃসংশয়, নিঃসন্দেহ। তিনি জানেন ভগবান তাঁর কাছে আসবেনই। তাঁকে আসতেই হবে। তাঁর মাটির ঘরে, তাঁর খোড়ো-চালের বারান্দাতেই আসবেন তিনি, তাঁর সিংহাসনের আসন থেকে নেমে। তিনি জানেন, তাঁকে নইলে তাঁর সৃষ্টির লীলা ব্যাহত হবে। একটি কথা কিন্তু তিনি জানেন না। তিনি জানেন না, কখন কিভাবে তিনি আসবেন, গভীর রাত্রে না নির্জন দ্বিপ্রহরে, ভিখারীর বেশে না রাজার রূপ ধরে, জনতার মধ্যে, না একাকী কোন্ ছদ্মবেশে কোন্ মুহূর্তে যে তিনি আসবেন তার তো ঠিক নেই। তাই তিনি সর্বদাই তাঁর জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা করেন, প্রতি মুহূর্তেই তাঁর দেহ, তাঁর মন, তাঁর পরিবেশকে শুচি সুন্দর পবিত্র করে' রাখেন। গভীর বিশ্বাস নিয়ে প্রতীক্ষা করাই ভক্তের সাধনা। তাঁর এ প্রতীক্ষা নিষ্ফল হয় না। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন একদিন না একদিন ঘটেই। কিন্তু এই পরমাশ্চর্য

অলৌকিক অবিশ্বাস্য ব্যাপার আপনার আমার জীবনেও ঘটবে এ প্রত্যাশা করতে পারি কি? আমরা ক্ষণভঙ্গুর যুক্তি-তর্কপটু অগভীর জলবিহারী শফরীর দল। ভক্তি আমাদের সোফিস্টিকেটেড্ (sophisticated)। মনে কোনও সাড়া জাগাতে পারে না। তাই সাধারণ লোকের পক্ষে কর্মের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু কর্ম তো আমরা সবাই করছি কিন্তু কই আমাদের সত্য দর্শন তো হচ্ছে না। গীতা বলেছেন কর্মটি নিষ্কাম হওয়া চাই। নিষ্কামকর্ম মানে উদ্দেশ্যহীন ফল-বিবর্জিত কর্ম নয়। কর্মের অনিবার্য পরিণতি ফলে। গীতার উপদেশ ফললোলুপ হয়ে কর্ম করলে দুঃখ পাবে, তোমার কর্মের প্রেরণা হ'বে তোমার কর্তব্য। ফল যাই হোক সেদিকে তোমার লক্ষ্য থাকবে না, সেকথা তুমি চিন্তাও করবে না। কর্তব্যই হ'বে তোমার একমাত্র লক্ষ্য। এই কর্তব্যের চেহারা যুগে যুগে বদলায়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে খল কপট আত্মীয়নিধনই ছিল অর্জুনের কর্তব্য। ধর্মকে জয়ী করবার জন্যই অধর্মের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিন্তু সে যুদ্ধ নিষ্কাম হওয়া চাই, তার ফলাফল তোমাকে যদি প্রভাবিত ক'রে তাহ'লে তোমার কর্মের মহাকাব্যে বার বার ছন্দপতন হবে। এই নিষ্কামকর্ম করতে করতে 'আমিত্ব' ক্রমশ লোপ পায়, কামনার কলুষ অপসারিত হ'লে সেই বিরাট সত্যের, সেই ব্রহ্মের আভাস পাওয়া যায়, যিনি সর্বত্র স্বয়ম্প্রভ, কিন্তু চোখে কামনার ঠুলি বাঁধা থাকে ব'লে যাঁকে আমরা দেখতে পাই না। নিরাসক্ত-অনুভূতির উজ্জ্বল পটভূমিকাতেই তিনি প্রতিভাত হন। যিনি 'নিত্যোহ নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্', যিনি শাশ্বত, যিনি অক্ষত অমলিন চৈতন্যস্বরূপ, তাঁকে উপলব্ধি করতে হ'লে নিজের মতে দৃঢ় থেকে নিজের পথে অবিচলিত চরণে চ'লে আকুল হৃদয়ে, উন্মুখ অন্তরে সদাসর্বদা সমনস্ক জাগরূক থাকতে হবে তবেই হয়তো তাঁকে পাওয়া যাবে। সত্যের সন্ধান, সত্যের উপলব্ধি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পথ অনেক, মতও অনেক। হিন্দু দার্শনিক বলেছেন, যে-কোনও পথে, যে-কোনও মতে চললেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। হিন্দুধর্ম বহুর মধ্যে 'এক'কে পাওয়ার সাধনাই করেছে, নাস্তিত্যবাদও এদেশে মুক্তিলাভের পথ ব'লে স্বীকৃত। হিন্দুধর্ম শুধু ধিক্কার দিয়েছে ভীতুকে, ভণ্ডকে আর মিথ্যুককে। নির্ভীক সুস্পষ্ট সত্যসন্ধীই প্রকৃত হিন্দু। যুগে যুগে এদের সংখ্যা কমেছে বেড়েছে, কিন্তু এরা কখনও একেবারে লোপ পায় নি। যে মিথ্যার পলি মানব-সমাজকে বারবার ঢেকে দিচ্ছে, এরাই সেই পলি পরিষ্কার করে যুগে যুগে। এরাই সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গুলির সামনে এগিয়ে যায়, ফাঁসিকাঠে ঝোলে, তবু নিঃশেষ হয় না। এরকম হিন্দু শুধু ভারতবর্ষেই নেই, পৃথিবীর সর্বত্র আছে। এরাই মানবজাতির আশা।

সভার পর বেশ ভালো খাওয়া হ'ল। মুর্গির দো-পিঁয়াজি আর পাঞ্জাবি নান রুটি। যে ধর্ম-সংঘের উদ্যোগে সভা হ'ল তাঁরা বড়লোক এবং গোঁড়া নন। তাঁদের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা বললেন—সভা করা ছাড়া এখন আর কিছু করবার নেই তাঁদের। উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে চিন্তাশীল লোকদের দিয়ে বক্তৃতা করানো। রাস্তায় বেরিয়ে বরুণ বিশ্বাসকে ব'ললাম, আপনার বক্তৃতাটি ভালো লাগল।

বরুণ বিশ্বাস উত্তর দিলেন—খারাপ লাগলেও কিছু আসত যেত না। কারণ আমি টাকা নিয়ে বক্তৃতা করি এবং টাকা অগ্রিম নিয়ে নি'। এটা আমার পেশা।

হেসে বললুম, কিন্তু নেশারও আমেজ পেলাম যেন।

"আমার একটি মাত্র নেশা আছে—"

"কি সেটা ?"

"পর-চর্চা"

"আপনি যা যা ব'ললেন তাতে আপনার বিশ্বাস নেই ?"

"ও তো সব মুখস্থকরা কেতাবী কথা উগরে দিলুম। বিশ্বাস আছে একটি জিনিসে। সেটি এই—"

তাঁর হাতে একটি মোটা লাঠি ছিল, সেইটি তুলে দেখালেন। তারপর হেসে বললেন—"কাদের ভক্তি করি জানেন ? যারা রোজ সকালে 'হোজ' পাইপ দিয়ে রাস্তা ধোয়। আর ভয় করি ছারপোকা মশাদের। ওদের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়া ডিফেন্স অ্যাক্টও অচল। ওরা বেপরোয়া রক্ত-শোষক।"

"ভক্তি আর ভয়ের খবর পেলাম। ভালবাসেন না কাউকে—"

"বাসি বইকি। কিন্তু তারা ভদ্র নয়। কানাই ময়রাটা একটা চোর কিন্তু কি চমৎকার জিলিপি যে করে। কানা কুঁজো গোবরার 'রজনীগন্ধা' কেবিনে গিয়ে তার হাতের তৈরি এক কাপ চা যদি খেয়ে আসেন, তাহ'লে তাকে আপনিও ভালবেসে ফেলবেন। ঘোর মিথ্যেবাদী ব্যাটা, সিফিলিস গণোরিয়ার আড়ত একটি, কিন্তু চা করে চমৎকার। যেদিন মেজাজে থাকে সেদিন অপূর্ব কাটলেটও করে। ওদের ভালবাসি। আর ভালবাসি রেমোকে—ভালো ফোটো তোলে, ভাল ছবি আঁকে, কিন্তু খেতে পায় না। অর্থাৎ শিল্পীদেরই ভালবাসি। উঁচুদরের শিল্পী সাহিত্যিকরা আমার নাপালের বাইরে, তাঁদের ভালবাসতে পারি না, ভক্তি করি। আমার স্বভাব হচ্ছে যাদের ভালবাসি তাদের গাল দি', তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি। তাদের সঙ্গে খুনসুড়ি করতে না পারলে আমার ভালবাসা চরিতার্থ হয় না। ও গড়—নিজের কথাই ক্রমাগত বলে' যাচ্ছি। আর নয় থামলুম।"

থেমে গেলেন বীরেশ বিশ্বাস। আবার চলতে লাগলেন। লক্ষ্য করলাম তিনি ঈষৎ খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। সেইজন্যই বোধ হয় লাঠি ব্যবহার করেন।

খুঁড়িয়ে হাঁটছেন দেখছি, পায়ে ব্যথা আছে না কি।"

বাঁ পায়ের হাড়টা একদা ভেঙে গিয়েছিল"

"ফুটবল খেলতেন ?"

"না—"

"ক্রিকেট ?"

"তা-ও নয়। আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারব না, মাপ করবেন"

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন। আমার কৌতূহল ক্রমে ক্রমে অদম্য হয়ে উঠল। হঠাৎ বললাম "বুঝেছি। দাঁড়ান। আপনাকে প্রণাম করব—"।

সত্যিই প্রণাম করলাম তাঁকে। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে বুরেশ প্রশ্ন করলেন—"এর মানে ?"

"মানে আমারও পা ভাঙা, শুধু পা নয়, সর্বাঙ্গ। আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ ব্যক্তি। অনেক দেওয়াল ডিঙোতে গিয়ে অনেকবার মার খেয়েছি—"

"কিন্তু আপনি তো খুঁড়িয়ে হাঁটছেন না।"

"আমার সে পা বাইরের পা নয়। আমার সে বিচূর্ণিত সত্তা বাইরে দেখানো যাবে না।"

বীরেশ বিশ্বাস আরও কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন,—"নারীঘটিত ব্যাপার না কি। বুঝেছি—"

আবার চলতে লাগলেন।

বললাম, "নারীঘটিত ব্যাপার তো বটেই, তাছাড়া আরও অনেক ব্যাপার আছে। সমাজের মাঠে সবাই আমাকে ফুটবলের মতো লাথিয়েছে, ক্রিকেট বলের মতো ঠেঙিয়েছে। দোষ ঠিক আমার নয়। আমার মনে হয়, কামনার পাকা রং যে লাগিয়েছিল দোষটা তারই। কিন্তু তাকে ধরবার ছোঁবার উপায় নেই। সবাই আমাকে ধরেই ঠ্যাঙাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকে সামনাসামনি পেলে দুর্যোধনের মতো আমিও বলতে পারতুম—জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি, ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সামনাসামনি পাওয়ার মতো ভক্তি আমার নেই। আপনার খোঁড়া পা দেখে কেন জানি না আমার মনে হ'ল যে, ওই কামনারই কোনও প্যাঁচে পড়ে' আপনার পা-টাও ভেঙেছে। তাই প্রণাম করতে ইচ্ছে হ'ল। আপনি কথাটা গোপন রাখতে চান রাখুন, আমি জোরজবরদস্তি ক'রব না। করবার অধিকার এখনও অর্জন করিনি। একটি কথা শুধু জেনে রাখুন কামনা-জর্জরিত লোকদেরই আমি ভালবাসি। আমি যেখানে থাকি সেখানে সবাই অত্যন্ত নীচুস্তরের এবং সবাই কামনা-জর্জরিত। কেউ বেশ্যা, কেউ ভিকিরি, কেউ বাড়ি-উলি, কেউ চোর, কেউ পকেটমার, কেউ গুন্ডা। ওরা সবাই আমার আপন লোক। ওদের মধ্যেই আমি সেই দুর্লভ জিনিস পেয়েছি যাকে আপনারা নিষ্কাম প্রেম বলেন। আমার কেন জানি না মনে হল, আপনিও বোধ হয় ওদের সমগোত্র তাই প্রণাম করে' ফেললুম। প্রেমকে প্রণাম ক'রেই অভ্যর্থনা করতে হয়।"

বীরেশ বিশ্বাস আরও দু' এক মিনিট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার।

আমার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "আমার খোঁড়া হওয়ার কারণও প্রেম—"

আবার প্রণাম করলাম তাঁকে।

"এ আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। নারীর প্রেম যাকে খঞ্জ করে সেই খঞ্জই পৌরুষের গিরি-লঙ্ঘন করে শেষে"

"আমার প্রেম নারী-প্রেম নয়। দেশ-প্রেম"

তাঁর চোখমুখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল সহসা। মনে হ'ল সমস্ত মুখটা যেন জমে' পাথর হয়ে' গেল। মনে হ'ল যেন স্ফিংসের (sphinx) দিকে চেয়ে আছি। স্ফিংস বলল—"আমি সেই বিধ্বস্ত বাহিনীর এক অখ্যাত সৈনিক যারা একদিন বোমার ঘায়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু একথা কাউকে বলবেন না। এ নিয়ে আর বাহাদুরি করবার কিছু নেই। আমরা হেরে গেছি। আমরা হারিয়ে গেছি। বিষধর গোক্ষুর এখন লাউ হ'য়ে গেছে। যে পুলিস বীরেশ বিশ্বাসের গায়ে গুলি ক'রেও তাকে ধরতে পারে নি, সে পুলিসও নেই, সে বীরেশ বিশ্বাসও নেই। বীরেশ বিশ্বাস এখন লাইফ ইনসিওরেন্সের দালাল, বীরেশ বিশ্বাস এখন পেশাদার বক্তা। সে যা বক্তৃতা করে তা সব সময়ে বিশ্বাস করে না। বুড়ো

বয়সে বিয়ে করে' এক যক্ষ্মাগ্রস্ত স্ত্রীর গর্ভে একটা হ্যাংলা ছেলের জন্ম দিয়ে সে এখন এলোপাথাড়ি সবাইকে গাল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি কাকে জানেন? নিজেকে। যমের অরুচি আমি, মরতে পারি নি। যে স্বাধীনতার জন্যে আমার বন্ধুরা ফাঁসি-কাঠে ঝুলেছে, সে স্বাধীনতার এই রূপ দেখবার পরও বেঁচে আছি। আত্মহত্যা করতে পারি নি, এখনও মরতে ভয় পাই। তুবড়ির মসলা ফুরিয়ে গেছে, পথের ধারে ভাঙা খোলাটা পড়ে আছে তার। চললুম। গুড বাই।"

আবার হাঁটতে লাগলেন। আমি কিন্তু সঙ্গ ছাড়লাম না। আমিও পিছু-পিছু হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূরে গিয়ে আবার দাঁড়ালেন বরুণ বিশ্বাস।

"আপনি কোথা যাবেন"

"আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি। আপনি কোথায় থাকেন"

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন বরুণ বিশ্বাস।

বললেন—"হাওড়ায়—"

চলুন। আপনার আস্তানাটা দেখে আসি"

বরুণ বিশ্বাস কোনও উত্তর দিলেন না। নীরবেই দু'জনে হাঁটলাম খানিকক্ষণ। কিছুক্ষণ পরে আবার থেমে গেলেন বরুণ বিশ্বাস।

"সত্যি কথা শুনবেন? আমার কোন আস্তানা নেই। আমি একটি ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে শুই। আমি এখন হাওড়ায় যাচ্ছি একটা লাইব্রেরিতে। সেখানে ফ্রি রিডিং রুমে বসে' দশ বারোটা খবরের কাগজ নিয়ে পর-চর্চা ক'রব। তারপর সময়ে কুলুলে যাব লাইফ ইন্সিওরেন্সের এক খদ্দেরের কাছে। তারপর যাব ময়দানের এক গাছতলায়, সেখানে পড়ব আর রাত্রের খাওয়াটা শেষ করব। তারপর ফিরব মঙ্গল সিংয়ের বাইরের ঘরে। সে একটা খাটিয়া দিয়েছে, তার উপরেই শুয়ে পড়ব। কিন্তু ঘুম আসবে না। অসংখ্য ছারপোকা, অসংখ্য মশা—। আপনি আমার সঙ্গে কত ঘুরবেন। ফিরে যান—"

কিন্তু আমি ফিরলাম না।

বললাম—"ফিরতে ইচ্ছে করছে না—"

"বেশ, চলুন তবে। অনেক হাঁটতে হবে। ট্রামে বাসে যাওয়ার পয়সা আমার নেই"

আরও কিছুদূরে হেঁটে বললাম—"আমার প্রতি একটু কৃপা করবেন?"

"কি বলুন—"

"আমার কাছে পয়সা আছে। যদি একটা ট্যাক্সি ডাকি—"

"পরের পয়সায় আমি ট্যাক্সি চড়ি না—"

আরও হন হন করে' হাঁটতে লাগলেন তিনি। মনে হ'ল আমার কাছ থেকে পালাতে চাইছেন। পালাতে কিন্তু পারেন নি। রাস্তায় আর বিশেষ কথা বলবার সুযোগ অবশ্য পাই নি। হাওড়ার লাইব্রেরিতে তিনি যখন গিয়ে ঢুকলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। লাইব্রেরির বারান্দায় একটা বেঞ্চি ছিল আমি তাতেই বসে রইলাম। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখছিলাম তিনি খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেছেন। ঘণ্টাখানেক নানারকম খবরের কাগজ উলটে-পালটে শেষকালে তিনি লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

"এ কি, আপনি এখানেও এসেছেন—!"

স্মিতমুখে চুপ করে' রইলাম।

"নাছোড়বান্দা লোক দেখছি আপনি—"

চুপ করেই রইলাম।

"এ কি আপনার জুতোর স্ট্রাপ্‌টা (strap) ছিঁড়ে গেছে দেখছি। আমি গড়ের মাঠে যাব। আপনিও পিছু পিছু যাবেন না কি আবার। এ জুতো পরে' যাবেন কি করে' ?"

"জুতো হাতে করে' নেব"

হাওড়া স্টেশনের কাছে এসে বরুণ বিশ্বাস একটু সদয় হলেন।

"আচ্ছা, চলুন ওই বাসটায় ওঠা যাক—"

আমি যখন টিকিটের পয়সা দিতে গেলাম আমাকে বাধা দিলেন। নিজেই টিকিট কিনলেন দু'খানা। কিনে ভ্রূকুঞ্চিত করে' বসে' রইলেন। আমার বলবার সাহস হ'ল না যে আপনার পয়সায় আমি বাসে চ'ড়ব কেন যখন আপনি আমার পয়সায় ট্যাক্সি চ'ড়তে চান নি। চৌরঙ্গীতে পেঁছে তিনি এক ঠোঙা চিনে বাদাম কিনে বললেন—"আপনি খাবেন ?"

"খাবো"

আর এক ঠোঙা কিনলেন।

"চলুন এবার একটা চায়ের দোকানে ঢুকি—"

ঢুকলাম। চায়ের পয়সাটাও তিনি দিলেন।

তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—"আজ আর সে লাইফ ইনসিওরেন্সের খদ্দেরকে ধরা যাবে না। সে এতক্ষণ" থেমে গেলেন, চীৎকার করে উঠলেন—"হেল্ (hell)!"

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি ব্যাপার ?"

"সে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটার সময় তার রক্ষিতার কাছে চলে' যায়। আজ তাকে ধরা যাবে না। মাঠে গিয়েই বসা যাক। আচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে ঘুরছেন কেন শুধু শুধু বলুন তো—"

"আপনাকে পাব বলে'। আপনাকে ভালো লেগেছে। সেই ভালোলাগাটা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে আমাকে। আমি নিরুপায়—"

"তাহ'লে তো আমার পড়াশোনার দফাও গয়া হ'য়ে গেল আজ। এই মোটা বই সাতদিনের মধ্যে পড়ে' ফেরত দিতে হবে"

দেখলাম গান্‌থারের (Gunther) ইনসাইড এশিয়া (Inside Asia) বইটা এনেছেন তিনি।

মাঠে গিয়ে একটা গাছতলায় বসলাম দু'জনে।

সভয়ে জিগ্যেস করলাম—"আপনার ফ্যামিলি (family) কোথায় আছে—"

"স্ত্রী আছে স্যানাটোরিয়ামে। ছেলেটা আছে মামার বাড়িতে। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি বাদাম ভাজা আর চা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। যা রোজকার করি তার বেশীর ভাগ দিতে হয় ওই স্যানাটোরিয়ামে। ছেলেটার জন্যেও মাঝে মাঝে দিতে হয় কিছু। তারও শুনছি ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে। তারও হয়তো টি. বি. হবে"

"আপনি যার ওখানে শোন সে আপনার কে হয় ?"

"কেউ হয় না। সে বাঙালীও নয়, বিহারী। নাম মঙ্গল সিং। একজন রিটায়ার্ড পুলিস অফিসার বৃটিশ আমলের লোক। অনেক টেররিস্টকে নির্যাতন করেছিল লোকটা। আমি যখন জেলে ছিলুম তখন আমাকে ফ্লগ (flog) করেছিল একবার। সে হঠাৎ আমাকে রাস্তায় চিনতে পারলে একদিন। বললে, বাবু সাহেব, আপনারা এতো তকলিফ করে' স্বরাজ আনলেন, এখন রাস্তায় হাঁটছেন। গদ্দিতে গিয়ে বসুন। আপনার দোস্তরা সব তো প্লেনে উড়ছেন। বললাম, ওরা আমার দোস্ত নয়। আমার দোস্তরা ফাঁসি-কাঠে ঝুলেছে, আন্দামানে মরে গেছে, জেলে পাগল হয়ে গেছে। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। আমার মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। কখনও শিয়ালদ প্ল্যাটফর্মে, কখনও হাওড়া প্ল্যাটফর্মে, কখনও হুগলি ব্রিজের জেটিতে, কখনও কারো বাড়ির বারান্দার তলায় শুয়ে রাত কাটাই। মঙ্গল সিং হঠাৎ আলিঙ্গন করলে আমায়। বললে, বাবুজি আমার বাড়িতে বাইরের বারান্দায় টুটা-ফুটা একটা ঘর আছে, তাতে খাটিয়াও আছে একটা। আপনার যদি 'হিনছা' হোয় সেখানে আপনি শুতে পারেন। মঙ্গল সিং ইচ্ছাকে 'হিনছা' বলে, আরও অনেক বাংলা কথা বেঁকিয়ে বলে—কিন্তু সে লোক খারাপ নয়। যে একদিন আমাকে ঠেঙিয়েছিল সে-ই আজ আমাকে বুকে টেনে নিয়েছে। কোনও বাঙালী আমাকে আশ্রয় দেয় নি, কিন্তু ওই 'মেড়ো'টা দিয়েছে। আমাকে খেতে দিতেও চেয়েছিল—প্রথম দিনরাত্রে তার নাতনী রুকমিনিয়া রুটি আর ভুজিয়া এনেছিল আমার জন্যে। তখন যদিও ক্ষুধেয় আমার পেট জ্বলছে তবু আমি বলেছিলাম রাত্রে আমি খেয়ে আসি, আমার জন্যে খাবার ব্যবস্থা কোরো না। অর্থাৎ ওদেরও আমি আপন করতে পারি নি। আসল কথা কি জানেন কারও মধ্যে ভালো কিছু দেখতে পাই না! মাঝে মাঝে মনে হয় মঙ্গল সিং বোধ হয় আমাকে বিনা-পয়সার পাহারাদার হিসেবেই রেখেছে। কারণ ও রাত্রে কীর্তন শুনতে চলে যায় এক জায়গায়, ফেরে অনেক রাত্রে। আমি ওর বাড়ির বাইরের ঘরে মশা ছারপোকার কামড়ে বিনিদ্র নয়নে ছটফট করি। খাটটা বার করে' দিয়েও সুবিধে হয় নি। দেওয়াল বেয়ে ছারপোকা নামে। মঙ্গল সিংয়ের উপরও প্রসন্ন হ'তে পারি না। এর মানে কি জানেন? আমি নিজেই লোকটা অত্যন্ত খারাপ। মনটাই এমন হয়ে গেছে যে চারিদিকে ময়লা আর ধুলো ছাড়া কিছু দেখতে পাইনা। এখানকার শিশুদের মুখেও সরলতা দেখতে পাই না, এখানকার জলও বিষাক্ত মনে হয়, ফুলগুলোও যেন ধুলোমাখা! আমি ঘৃণ্য লোক, আমার সংসর্গ পরিত্যাগ করুন। আপনি সেদিন যে স্ফুলিঙ্গের কথাটা বলেছিলেন তা আমার মনে আছে। আপনার কথা শুনে সেদিন মনে হয়েছিল আপনি অসাধারণ লোক। এই অন্ধকারের যুগে এখনও অগ্নির স্বপ্ন দেখতে পারেন। আমি পারি না, আমি দেখি সব অঙ্গার, অগ্নি নেই। আমার সঙ্গে থাকলে আপনার অগ্নিও নিবে যাবে। আপনি এবার যান। আমি বইটা শুরু করি—"

"আমার কথাটাও শুনুন তাহলে। আমি অসাধারণ তো নইই, আপনার পায়ের নখের তুল্যও নই। আপনি অগ্নি-যুগের বীর, আমি অতি সাধারণ দুশ্চরিত্র লোক একটা। আপনি ভেঙে গেছেন তা ঠিক কিন্তু আপনি ভগ্ন মহারথ, আর আমি একটা দোমড়ানো মোচড়ানো মরচে-ধরা বিস্কুটের খালি কৌটো। আপনার সঙ্গে আমার

তুলনা হয় না। তবু দয়া করে' আমার জীবনকাহিনীটা শুনুন আপনি। আমার ঠিকানাটাও রেখে দিন। যদি একদিন যান কৃতার্থ হব"

"আমাকে আপনার জীবনকাহিনী শোনাতে চাইছেন কেন। ও শুনে আমার লাভ কি—"

"আপনার লাভ নেই। কিন্তু আমার লাভ আছে। আমি এখন জীবনের যে স্তরে এসে পেঁাছেছি সেটা বাইরে কুৎসিত কিন্তু ভিতরে খাঁটি। আমার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, হয়তো সেটা দুরাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার কবল থেকে নিজেকে কিছুতেই আমি ছাড়াতে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে যে, হয়তো এদের সাহায্যেই আমি আমার জীবনের মহোত্তম কাজ করতে পারব। কিন্তু সেটা যে কি, তা আমার মনে স্পষ্ট হয় নি এখনও। দূর থেকে গন্ধ পাচ্ছি, মনে হচ্ছে বুঝি নন্দনকাননের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি, আবার সন্দেহ হচ্ছে তা কি সম্ভব। ছাত্রজীবনে ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রশান্ত যামে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে গভীর স্তব্ধতার মধ্যে আসন্ন উষার যে পদধ্বনি একদিন শুনেছি, এখন যেন সে পদধ্বনি আবার শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে একটা কিছু হবে। কিন্তু কি হবে, কেমন করে' হবে, এ যুগের মহোত্তম কর্ম কি, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট হয় নি এখনও। আপনি হয়তো আমাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।"

বুরুশ বিশ্বাস গানথারকে বাঁ হাঁটুর তলায় চেপে আমার মুখের দিকে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে চেয়ে ছিলেন। বললেন, "আপনি সেণ্টিমেণ্টাল কবি একজন। কবিরা প্রায়ই কর্মী হয় না। ফেনার উপর ইমারতের ভিত্তিও গাঁথা যায় না।' আচ্ছা বলুন, শুনি। সংক্ষেপে বলুন, বেশী ফ্যানাবেন না"

নাম ধাম গোপন রেখে বললাম সব। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। নমস্কার করে' বললেন, 'ব্রজেনবাবু, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন একটি। আপনার নাম আমি শুনেছি। শেক্‌সপীয়রের উপর আপনার বইখানাও পড়েছি। আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হবে তা প্রত্যাশা করি নি। বোমারু বীরেশ বিশ্বাসেরও যে এ দশা হবে তা কে ভেবেছিল ? হেঃ, হেঃ, হেঃ হেঃ"

অদ্ভুত হাসি হাসলেন একটা, তারপর বললেন—"এ যুগের মহোত্তম কাজ কি জানেন ? শুধু এ যুগের নয়, সব যুগেরই ওটা মহোত্তম কাজ। পারবেন সেটা করতে ?"

বুরুশ বিশ্বাস উত্তেজিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বসে' পড়লেন আবার। আবার দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে হাতটা নাড়তে নাড়তে বললেন—"না, আপনি পারবেন না। আপনি বড্ড বেশী বাক্যবাগীশ, আমরা সবাই বাক্যবাগীশ, আমরা কেবল কথাই বলি, কাজ করতে পারি না। আপনি পারবেন না"—আবার বসে' পড়লেন।

"কাজটা কি বলুন না—"

"বহুপূর্বে আদি কবি বাল্মীকি ওর নাম দিয়েছিলেন রাবণবধ। ওই রাবণই আরও নানা নামে বার বার জন্মেছে এবং নিহত হয়েছে আমাদের পুরাণে। বেন, কংস, হিরণ্যকশিপু, দুর্যোধন—এসব নাম আমাদের পরিচিত। আধুনিক ইতিহাসের কাইজার, হিটলার, বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিস্টরা, রাশিয়ার অত্যাচারী জারেরা,

তৈমুর, নাদির, নেপোলিয়ন—সব ওই রাবণ। যুগে যুগে ওদের উত্থান হয়েছে, পতনও হয়েছে। ওদের পতন হয়—হবেই—এইটেই আমাদের মস্ত আশ্বাস। ইতিহাসের দিকে চেয়ে বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব আজ জোর গলায় বলতে পারছে, রাবণরা যত প্রতাপশালীই হোক না কেন, তাদের আমরা ধ্বংস করবই। বস্তুত রাবণদের উত্থান-পতনকে কেন্দ্র করেই আমাদের সভ্যতার ইতিহাস। বর্তমান যুগে রাবণের ভাই কুবেরই রাবণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সে কোথাও কোটিপতি, কোথাও অর্বুদপতি, কোথাও বৃন্দপতি। টাকা দিয়ে, সে এ-যুগের ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য বরুণ অন্ন বস্ত্র হাওয়া আলো সব কিনে ফেলেছে। এ যুগের জ্ঞানী গুণীরা তারই কারাগারে বন্দী। এ যুগের সতীত্বকে সেই উলঙ্গ করে' অট্টহাস্য করছে নানা প্রেক্ষাগৃহে, এ যুগের কর্ণ দ্রোণ ভীষ্ম কৃপরাও তারই দলে, তারই প্ররোচনায় এ যুগের অশ্বত্থামা জয়দ্রথরা বধ করছে অভিমন্যুদের, হত্যা করছে দ্রৌপদীর শিশুপুত্রদের, আর্ত পীড়িতদের হাহাকারে চতুর্দিক আজ পরিপূর্ণ, এ যুগের ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আর্তনাদ করছেন, তাঁর মুখে কি শান্তির বাণী মানায়? তাই তাঁকে উপহাস করে' চীৎকার করছে ভুষণ্ডীর কাকের কর্কশ কণ্ঠ—ধ্বংস কর, ধ্বংস কর, রক্তের আশায় আমি ঠোঁট ফাঁক করে' বসে আছি, শেষ করে' দাও সব। এই কুবেররা পৃথিবীর সর্বত্র আছে। এখানে ওদের নাম ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। কালোবাজারী। গদি পাওয়ার আগে জওহরলাল বলেছিলেন, ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওদের nearest lamp post-এ hang করবেন। লটকে দেবেন রাস্তার থামে। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পর তিনি তা করেন নি। আপনি পারবেন? ওইটেই এ যুগের মহোত্তম কাজ। পারবেন আপনি?"

বরুণ বিশ্বাস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়ে রইলেন। আমিও নিষ্পলক হ'য়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। গলার কাছটা কেমন ব্যথা-ব্যথা করতে লাগল, গুরগুর করে' উঠল বুকের ভিতরটা। তারপর হঠাৎ চমকে উঠলাম। 'হুংক্, হুংক্, হুংক্'—একটা প্রকাণ্ড মোটরের তীব্র ইলেকট্রিক হর্নের শব্দ যেন চাবুকের মতো পড়ল আমার মুহ্যমান চেতনার উপর। হেঁট হয়ে বরুণ বিশ্বাসের পদধূলি নিলাম আবার। কথা বলতে যাচ্ছিলাম, বরুণ বিশ্বাস মানা করলেন।

"না থাক। কিছু বলতে হবে না। মনেই থাক ওটা। অপ্রকাশিত সংকল্পই দৃঢ় হয়। প্রকাশ করলেই হালকা হ'য়ে হাওয়ায় উড়ে যায় সেটা।"

বললাম—"আপনি একটু আগে যে বক্তৃতাটা দিলেন তার অর্থ আরও যেন স্পষ্ট হল আপনার পরিচয় পেয়ে। ওটা নিতান্ত পেশাদারী বক্তৃতা নয়"

বরুণ বিশ্বাস হেসে বললেন—"একদম পেশাদারী। আচ্ছা, এবার সরে' পড়ুন। আমি প'ড়ব। আপনার ঠিকানাটা জানা রইল। হঠাৎ একদিন গিয়ে পড়ব। গেলে দুপুরের দিকে যাব। সে সময় বাড়ি থাকেন তো?"

"থাকি"

ড্রাইভার জগ্‌জিৎ সিং হঠাৎ এসে বললে একদিন, "মাস্টারবাবু, সব তো খতম্ হো গয়া। শালা চোট্টা লুটেরা লুট লিয়া সব্। আপকো রুপিয়া ভি ডুব গ্যয়া—মগর আপকা রুপেয়া ম্যয় দে দুঙ্গা"

কি হ'ল।"

জগ্‌জিৎ সিং যা বললে তা শুনে অবাক হ'য়ে গেলাম। জগ্‌জিৎ আমার ব্যাংকার। স্কুল ফাণ্ডের যত টাকা জোগাড় করতে পারতাম তা জগজিৎকেই দিতাম। সে সেটা নিজের নামে কোনও ব্যাংকে রাখত এই আমার ধারণা ছিল। তিন হাজার টাকা তুলেছিলাম আমি। জগ্‌জিৎ বলল—ও সেটা ব্যাংকে রাখত না। রাখত এক শালা কালোবাজারী কুত্তার কাছে। সে মাটির নীচে নাকি টাকা পুঁতে রাখে ইনকাম্‌ ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে। তার কাছে টাকা রাখলে বেশী সুদ পাওয়া যাবে এই লোভে টাকা রাখত তার কাছে জগ্‌জিৎ। জগ্‌জিৎ লরি চালিয়ে যা রোজগার করত তা-ও রাখত ওই কুত্তাটার কাছে। সুদও পেত নিয়মিত। কিন্তু কুত্তা এখন হঠাৎ বলছে তার পোঁতা টাকা নাকি চোরে চুরি করে' নিয়ে গেছে।

"চোর চুরি করে নি—ওই চুরি করেছে। ওই উল্লুকা পাঠ্‌ঠাই আত্মসাৎ করেছে অনেকের টাকা—" তারস্বরে বলতে লাগল জগ্‌জিৎ।

"টাকা দিয়ে কোনও রসিদ নিতে না—"

"নিতাম। কিন্তু এ রসিদের কোনও 'কিমৎ' আদালতে দিবে না। দেখিয়ে না—"

দেখলাম একটা লম্বা খাতায় হিন্দীতে লেখা আছে কোন্‌ তারিখে কত জমা করা হয়েছে। সবসুদ্ধ দেখলাম পঁচিশ হাজার টাকা জমা করেছে জগ্‌জিৎ। সুদও পেয়েছে প্রায় দু' হাজার খানেক টাকা। কোথাও কারও সই নেই। মুখ তুলে জগ্‌জিতের মুখের দিক চাইতেই মনে হ'ল একটা সিংহ যেন আমার দিকে চেয়ে আছে।

"ইস্‌কা বদলা ম্যয় লে লুঙ্গা মাস্টার সাব্‌। আপকা রুপৈয়া ভি লৌটা দুঙ্গা"

(এর প্রতিশোধ আমি নেব মাস্টার-মশাই। আপনার টাকাটাও ফেরত দিয়ে দেব)

সেইদিনই বিকেলে জগ্‌জিৎ তিনহাজার টাকা নিয়ে হাজির।

"টাকাটা উদ্ধার করতে পারলে!"

সত্যি অবাক হয়ে গেলাম আমি।

"পত্নীকী সব্‌ জেবর বেচ ডালা—"

(স্ত্রীর সব গয়না বিক্রি করে' ফেললাম)

স্তম্ভিত হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর বললাম, "বেশ, চল তাহলে আমার সঙ্গে—"

"কাঁহা ?"

"গয়নার দোকানে"

"কাহে—"

আমার পুত্তহুর জন্যে গয়না কিনে দিই—"

জগ্‌জিৎ সিংহের চোখ দুটো দপ্‌ করে' জ্বলে উঠল যেন।

"ইয়ে ক্যা বাত হ্যয়—"

"বাত ঠিকই হ্যয়। হামরা স্কুল গাড্‌ডেমে যায় ইস্‌কা লিয়ে হমরা কুছ পরোয়া নেহি। মগর হম পুত্তুহুকো গহনা বেচ কর স্কুল নেহি বানায়েংগে—চলো দোকানমে—"

"আপ তো কামাল কিয়া মাস্টার সাব্‌—"

["কি বলছেন আপনি—"

"ঠিকই বলছি। আমার স্কুল ডুবে যাক আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু এটা ঠিক পুত্রবধূর গয়না বিক্রি করে' আমি স্কুল বানাব না। চল দোকানে চল—"

"এ তো আপনি অদ্ভুত কাণ্ড করলেন, মাস্টার সাহেব!"]

জগজিৎ সিংয়ের সিংহের মতো মুখটা চাপা আনন্দে সেদিন ভীষণতর হয়ে উঠেছিল। চাপ দাড়ির গোছা কাঁপছিল, চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল মোটরের হেড লাইটের মতো। সেদিন দোকানে গিয়েছিলাম। জগজিতের গয়নাগুলো রেখে টাকা দিয়েছিল যে স্বর্ণকার সে তখনও সেগুলো হাত-ছাড়া করে নি। ফিরে পাওয়া গেল প্রত্যেকটি। যে লোকটা আমাদের টাকা আত্মসাৎ করেছে তার নামও সেদিন বলেছিল আমাকে জগজিৎ। শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। নামজাদা ধনী একজন। সে এই রকম চুরি করেছে?

জগজিৎ বললে—"চোরি করকে, গরীব কা খুন চোষকে উহ্ শালে কুত্তা আজ শের বানা হ্যয়। মগর উসকো হাম ঘায়েল করেঙ্গে"

[চুরি করে' গরীবের রক্ত শোষণ করে' ওই শালা কুকুর আজ বাঘ হয়েছে। কিন্তু ওকে আমি ঘায়েল করব]

ওই কালোবাজারীর নাম তোমরা সবাই জান। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রায়ই ওর কীর্তিকলাপ ছাপা হয়। উনি বিখ্যাত লোক। ওঁর নামটা আমি উহ্য রাখলাম। রাবণ বলেই ওঁর উল্লেখ করব।

জগজিৎকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ও তোমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে সুদ দেয় তাতো ব্যাংকের সুদের চেয়ে অনেক বেশী। ওর পোষায় কি করে'?"

জগজিৎ বললে, "ও আমাদের টাকা নিয়ে গরীব নিরুপায়দের সেই টাকা 'চোটা' সুদে ধার দেয়। এই পাড়াতেই সাইকেল চড়ে' ওর এজেণ্ট আসে। টাকাপিছু রোজ এক পয়সা সুদ দিতে হয়। রোজ সেটা দেওয়া চাই। না দিতে পারলে সুদের উপর সুদ চড়ে। শেষে ঘটিবাটি গয়না-গাঁটি যা পায় কেড়ে নিয়ে যায়। রোখন মিশিরের সঙ্গে লোকটার যোগসাজস আছে। তারই মারফত ওর চর ওই সাইকেলওলা মিনুবাবু ধারের জাল পেতেছে এই বস্তিতে। মিনুবাবু লোকটাকে আমি দেখেছি। মুখমিষ্টি অমায়িক প্রকৃতিক লোক। শোভনার বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি তাকে মাঝে মাঝে। তাই মনে হয়েছিল সম্ভবত ও শোভনার খদ্দের একজন। জগজিতের কাছে ওর এ-পরিচয় পেয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম একটু। রাবণের চর ও?

রোখন মিশির একটি গম্বুজাকৃতি ব্যক্তি। টাইট্ ভুঁড়ি, ছোট্ট গর্দান, মাংসল বুক। হাত-পা ছোট ছোট। মনে হয় ছোট্ট গম্বুজ একটি। মাথায় টাক। কপালে ত্রিশূলাকৃতি তিলক। গলায় তিন হালি রুদ্রাক্ষের মালা। রোখন মিশির উত্তর প্রদেশবাসী। উত্তর প্রদেশে অন্নসংস্থান করতে না পেরে একদা কলকাতা শহরে এসেছিল। আর ফিরে যায় নি। শুনেছি আগে ও নাকি ফেরি করত। তখন বাড়ি-উলি রাজলক্ষ্মী ঠাকরুনের নাকি যৌবন ছিল। পায়ে গোদ হয় নি। তখন রোখন মিশির না কি ওর প্রণয়ী ছিল। সেই প্রণয়ের পথেই এই বস্তিতে এসেছিল রোখন মিশির। এখনও বোধ হয় কিঞ্চিৎ প্রণয় আছে। কিন্তু রূপান্তরিত হয়েছে সেটা। আগে তারা পরস্পরকে কি ভাষায় সম্বোধন করত জানি না কিন্তু এখন খোলাখুলিভাবে রাজলক্ষ্মী ওকে বলে—মুখপোড়া গুজরাটি হাতী, আর রোখন

মিশির বলে 'গোদরানী'। রোখন যে ঘরটায় থাকে সেটাও রাজলক্ষ্মীর। লোকে বলে রাজলক্ষ্মী সে ঘরের ভাড়া নেয় না। কিন্তু ভাড়ার দাবি সে ছাড়ে নি। ভাড়ার তাগাদা দেবার ছুতোয় মাঝে মাঝে সে গালাগালির তুফান বইয়ে দেয় তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। বলে—"ওরে পোড়ারমুখো, অলপ্পেয়ে হাড়হাবাতে, এটা মানুষের বাস করবার ঘর, হাতীর পিলখানা নয়! তুই গুজরাটি হাতী, তুই ও-ঘরে মৌরসী-পাট্টা করে' জগ্ গেড়েছিস কেন। একটি পয়সা তো ভাড়া দিস না, যত ছিঁচ্কে চোর আর পকেট-মার নিয়ে কারবার ফেঁদেছিস। কপালের উপর রক্তচন্দনের ত্রিশূল কেটে আমাকে ভোলাবি হারামজাদা—রাজি বামনীকে ভোলানো অত সহজ নয়—।"

রোখন মিশির কোন উত্তর দেয় না। চোখটি বুজে ছোট ছোট হাত দুটি জোড় করে' দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে'। তবু থামে না রাজলক্ষ্মী। থপ থপ করে' এগিয়ে গিয়ে তার মুখের সামনে দু'হাত প্রসারিত করে' চীৎকার করে' ওঠে।

"কেন থাকিস তুই এখানে? যা টাকা কামাস, শুনেছি তাতে তো চৌরঙ্গীর গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে থাকতে পারিস। এখানে পড়ে আছিস কেন গিনিপিগমুখো বাঁদর? এখানে কি গুড় আছে—"

রোখন মিশিরের জোড়-হাত খুলে যায়। মিটি মিটি চেয়ে মৃদুকণ্ঠে সে বলে, "তুমি যে এখানে আছ গোদরানী। তোমাকে রোজ দেখতে পাব বলেই—"

কথা শেষ করতে পারে না রোখন। গগন-বিদারী চিৎকার করে' ওঠে রাজলক্ষ্মী—"চোপরও হারামজাদা—"

সঙ্গে সঙ্গে রোখনের চোখ বুজে যায়। জোড়হস্তে আবার নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে সে।

রাজলক্ষ্মীর চীৎকারটা গগন-বিদারী হলেও তার প্রকাণ্ড নাকটার নীচে মিশি-মাখা দাঁতের উপর কালোমেঘে বিজলীর মতো যে হাসিটা চকিতের জন্য ফুটে ওঠে তার ভাষা অন্যরকম।

যে দৃশ্যটা বর্ণনা করলাম এটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, আমি নিজেই দেখেছি একদিন। রোখন মিশিরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই নি কোনদিন। অবশ্য যখনই তার সঙ্গে দেখা হ'ত সে আমাকে নমস্কার করত। আমিও বলতাম—"কি মিশিরজি, ভালো আছেন তো?" মিশিরজি ঘাড়টা আরও ঝুঁকিয়ে বলত—"আপনার কৃপা—"। আলাপ এর বেশী এগোয় নি। জগ্‌জিতের কথা শুনে তার সঙ্গে আর একটু আলাপ করবার ইচ্ছে হ'ল। একদিন দেখলাম রোখন তার ঘরের বারান্দায় মোড়ায় বসে' খইনি ডল্‌ছে। আমি যেতেই খইনিতে থাপ্‌পড় মেরে মুখবিবরে ফেলে দিয়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল সে।

"আসুন মাস্টার-মশাই। কি সৌভাগ্য, আসুন, আসুন—" রোখন চমৎকার বাংলা বলে।

"একটু বিপদে পড়ে' এসেছি আপনার কাছে মিশিরজি—"

"বলুন, বলুন—"

"আমি এই বস্তির ছেলে-মেয়েদের জন্য ছোটখাটো একটা ইস্কুল করব ভেবে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। আপনিও আট আনা চাঁদা দিয়েছিলেন—"

"হাঁ হাঁ, মনে আছে—"

"টাকাটা রাখতাম জগ্‌জিতের কাছে। ওই আমার সব টাকাকড়ি রাখে। আমার ধারণা ছিল ও টাকা ব্যাংকে জমা করে। কিন্তু এখন বলছে ও টাকাটা রাখত একজন

কালোবাজারী শয়তানের কাছে বেশী সুদের লোভে। সে আবার নাকি ইনকম্ ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে টাকা পুঁতে রাখে। আমাদের টাকাও না কি পুঁতে রাখত। এখন বলছে পোঁতা টাকা চুরি হ'য়ে গেছে।"

খুব তেতো ওষুধ খেলে যে রকম মুখভাব হয় রোখনের মুখভাব সেই রকম হয়ে গেল। বললে—"আপনি জগ্‌জিতের গলায় গামছা লাগিয়ে মোচড় দিন। গলায় গামছা না দিলে—"

বললাম—"জগ্‌জিৎ স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে' টাকা আমাকে এনে দিয়েছিল, কিন্তু সে টাকা আমি নিই নি। আমি সেই কালোবাজারীটার কাছে যেতে চাই। আপনি তার ঠিকানা বলতে পারবেন?"

"নামটা জানেন?"

নামটা বললাম। শুনেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল রোখন মিশিরের মুখ। বললে—"ওর ঠিকানা কেউ জানে না। ও এক জায়গায় থাকেও না। আজ দিল্লী, কাল বম্বে, পরশু লণ্ডন, তার পরদিন নিউইয়র্ক যাচ্ছে। প্লেনে চড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে অনবরত। ও হয়তো জানেও না যে আপনার টাকা ও চুরি করেছে। নানারকম সুড়ঙ্গপথে ওর ব্যাংকে টাকা জমে, ও জানেও না কোথা থেকে কত জমছে। ওর ম্যানেজাররা জানে কিম্বা তাদের অধীনে যারা কাজ করে তারা। কিন্তু তাদের সংখ্যা কম নয়। আমি ওদের দলের মিনুবাবুকে চিনি। কিন্তু তিনি মাইনে-করা চাকর। এই বস্তিতে টাকা ধার দিয়ে সুদ আদায় করেন।"

"তাহ'লে তার সঙ্গে দেখা হবে না?"

"মন্ত্রীরা তার কাছে যেতে পারলে বর্তে যান। দেখা করতে হ'লে অনেক দিন আগে থেকে তার প্রাইভেট সেক্রেটারির মারফত আবেদন নিবেদন জানান। কারো আবেদন মঞ্জুর হয়, কারো হয় না। একটি বিষয়ে ও'র দুর্বলতা আছে শুনেছি। ভদ্রঘরের সতী স্ত্রীদের উপর ও'র না কি ভারী লোভ। মিনুবাবু ও'র জন্যে দু' একটি জিইয়ে রাখে। উনি যখন কলকাতায় আসেন তখন ভোগ চড়ায়। আর একটি বিলেত-ফেরত প্রফেসার আছে, যে ওই সোনাকে পড়ানোর ভার নিয়েছে। সে-ও একটি দালাল। আমি বিশুকে সাবধান করে' দিয়েছি। কিন্তু ও ছোকরা কেমন যেন ভ্যাবলা গোছের। খালি পরের দুধে জল মেশাতে ব্যস্ত। তার ঘরের দুধ যে বেহাত হয়ে যাচ্ছে সেদিকে—আরে এ আমি করছি কি।" হঠাৎ চোখ বুজে জিভ কেটে ফেললে রোখন। তারপর নিজের গালেই নিজের ছোট ছোট হাত দিয়ে ঠাস্ ঠাস্ করে' চড় মারতে মারতে বলতে লাগল—"কি করলি রে উল্লুক। জানাজানি হ'য়ে গেলে যে তোকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে, টুকরো টুকরো করে' ডালকুত্তাকে খাইয়ে দেবে, জন্মের মতো লোপাট হ'য়ে যাবি। একি বেকুবি করে' ফেললিরে হতভাগা"

তারপর হঠাৎ আমার হাত দুটি ধরে' সানুনয়ে সাশ্রু-লোচনে বলে' উঠল, "দোহাই মাস্টার-মশাই, এসব যে আপনি আমার কাছ থেকে শুনেছেন তা যেন ঘুণাক্ষরে না প্রকাশ পায়। পেলে ওরা আমাকে আর আস্ত রাখবে না। লোপ করে' দেবে, গিলে ফেলবে। আপনি আমাকে অভয় দিন মাস্টার-মশাই—"

রোখন থর থর করে' কাঁপতে লাগল। এটা যদি ওর অভিনয় হয় তাহ'লে ওকে উঁচুদরের অভিনেতা বলতে হবে। কিন্তু আমার মনে হল ও সত্যি ভয় পেয়েছে।

মনে হ'ল সেই ভীষণ হিংস্র কদর্য শক্তিমান দৈত্যটার মূর্তি সত্যিই ওর মানসপটে ফুটে উঠেছে যার নিশ্বাসে বিষ, ভ্রূকুটিতে বজ্র, যার দৃষ্টিতে পিশাচের নিষ্ঠুরতা ; টাকার অ্যাটম্ বম্ (atom bomb) ফেলে যে যাকে-যখন-খুশী নিশ্চিহ্ন করে' দিতে পারে, দেশের শাসকরা যার বশম্বদ ভৃত্য, যে এক-মুণ্ড হয়েও সহস্র-মুণ্ড যার বহু বাহু বহু দিকে প্রসারিত হ'য়ে বহু অসহায় কণ্ঠকে টিপে ধরেছে, যার বৃহৎ মাংসল স্থূল পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট হচ্ছে অগণিত আর্ত আতুর স্বল্পবিত্তের দল, আধুনিক যুগের সেই সর্বশক্তিমান রাবণের ছবিটা সত্যিই বোধ হয় তখন ফুটে উঠেছিল রোখনের কল্পনানেত্রে।

বললাম, "আমার মুখ দিয়ে তোমার নাম কখন বেরুবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আর একটা কথাও বলতে পারি, আমার প্রাণ থাকতে তোমার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আমি যদি মরেও যাই তাহ'লে আমার দল তোমাকে বাঁচাবে।"

"আপনার দল আছে না কি—"

"যাদের উপর অত্যাচার অবিচার হচ্ছে, যাদের সবাই দু'-পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে—তারা সবাই আমার দলে। আপনিও আমার দলে। ওই যে মিনুবাবুর কথা বললেন, তিনি হয়তো এটা জানেন না, কিন্তু তিনিও আমার দলে। তাঁর সঙ্গে যেদিন দেখা হবে সেদিনই সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন তিনি। ওই কালোবাজারীটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতেই হবে। কি করে' তা পারব সে উপায় আপনিও ভাবুন। কিন্তু এটা জেনে রাখুন দেখা ক'রবই আমি—"

রোখন হাত জোড় করে' বলল, "আমাকে বাদ দিন মাস্টার-মশাই। আমি কম-জোর লোক। শিবমন্দিরে পূজারীর কাজ করে' আর সামান্য দালালি-টালালি করে' কোনক্রমে দিন গুজরান করি"

"শুনেছি পুলিসের সঙ্গে আপনার খাতির-টাতির আছে—"

এ শুনে ব্যায়ত-আনন হয়ে গেল রোখন। তারপর ঢোক গিলে বললে—"এ খবর কে আপনাকে বললে—"

"যেই বলুক, কথাটা সত্যি কিনা"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে শেষে বলল—"সত্যি—"

বলেই বলল, "তাহলে সব কথা শুনুন আমার। বিশ বছর আগে আমি যখন এখানে আসি তখন ফেরিওলা হয়েছিলাম। নানারকম জিনিস ফেরি করতাম। তখনই দেখলাম মাঝে মাঝে পুলিসদের ঘুস না দিলে তারা নানাভাবে জ্বালাতন করে। নির্বিঘ্নে ফেরিও করা যায় না। দিতাম ঘুস। থাকতাম একটা মোটরের গারাজে। গারাজটা আমাদেরই দেশের লোক রঘুবীর প্রসাদের। নানারকম মোটর সেখানে সারাবার জন্যে আসত। রোজই একটা-না-একটা মোটরে শুতে দিত আমাকে রঘুবীর প্রসাদ। তাঁকে আমি "মামাজি" বলে' ডাকতাম। তিনি একদিন বললেন—"তুই ফেরিওলার কাজ ছেড়ে মোটরের কাজ শেখ। আখেরে ভাল হবে।" তাই শিখতে লাগলাম। মামাজি আমাকে খেতে দিতেন। চার বছর কাজ শেখবার পর ভালো মেকানিক তো হলামই, ড্রাইভারিটাও শিখে ফেললাম। লাইসেন্স পেয়ে মামাজির একটা ট্যাক্সি চালালাম দিনকতক। সে সময়ও দেখলাম পুলিসকে ঘুস দিতে হয়। তারপর ভালো চাকরি জুটে গেল আমার একটা। এক বড় পুলিস অফিসারের গাড়িতে বাহাল হ'য়ে গেলাম। আড়াইশ' টাকা মাইনে। গোঁফে চাড়া দিয়ে—তখন আমার গোঁফ

ছিল—আর চোখ পাকিয়ে হুমকি দিয়ে বেড়াতাম সবাইকে। কিন্তু কপালে দুঃখ লেখা ছিল। ওই পুলিস অফিসারের জোয়ান মেয়েটা আমাকে চোখ মারত। আমিও তার জবাব দিতাম। হঠাৎ একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে' গিয়ে আমার চাকরি গেল। আমার লাইসেন্সটাও গেল। ওই পুলিস সাহেব আমার বিরুদ্ধে এমন কড়া রিপোর্ট করলেন যে, দ্বিতীয়বার আর লাইসেন্স রিনিউ (renew) করতে পারলাম না। এসব শুনে মামাজিও ক্ষেপে গেলেন। বললেন, তুই পাপী, তোর আর মুখদর্শন করব না। দূর হ। আমি পাপী তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু ওই পুলিস সাহেব আর মামাজিও নিষ্পাপ ছিলেন না। আমি জানতাম ওই পুলিস সাহেব ঘুস নিতেন আর মামাজি মোটর পার্টসের চোরা-কারবার করতেন। কতকগুলো ছোঁড়া রোজই কোন-না-কোন মোটর পার্টস চুরি করে' এনে বিক্রি করত তাঁর কাছে। সেই সময়েই কতকগুলো ছিঁচকে চোর আর পকেটমার ছোঁড়াদের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। তাদের মধ্যে ছিল গোদরানীর দূর সম্পর্কের ভাই কেউটে। খলিফা চোর ছিল সে। তবু সে একদিন ধরা পড়ে গেল। পুলিসদের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম আগে থাকতেই ছিল। কিছু ঘুস কবুল করে' ছাড়িয়ে নিলাম তাকে পুলিসের হাত থেকে। কেউটেই আমাকে নিয়ে আসে এ বস্তিতে। কেউটের সুপারিশেই গোদরানী—তখন নাম ছিল ঝাঁসির রানী—আমাকে আশ্রয় দেয় এখানে। তখন আমার কাইজারি গোঁফ ছিল, ব্যাক্ ব্রাশ করা চুল ছিল, খাকি সুট আর মিলিটারি বুট ছিল। বাঁ হাতের কব্জিতে রিস্টওয়াচ বাঁধতুম। কেউটে বললে—তুমি যদি পুলিসের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পার তাহলে তোমার একটা রোজকারের রাস্তা বাতলাতে পারি। এ পাড়ার চোর আর পকেটমাররা পুলিসের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে রোজ তোমাকে প্রিমিয়ম দেবে। সেই প্রিমিয়মই তখন আমার রোজকার। তার অর্ধেকটা অবশ্য দিতে হয় পুলিসদের। তাদের বলা আছে—'রোখন' নাম বললেই তারা তাদের ছেড়ে দেবে। এই এখন আমার জীবিকা মাস্টার-মশাই। আমি বেনারসের ছেলে, শিব-ভক্ত। ঘরে একটি লিঙ্গ রেখেছি, তারই পুজো করি দু'বেলা। আর প্রতি সপ্তাহে একবার তারকেশ্বরে যাই। রোজই বাবাকে হাত-জোড় করে' বলি—বাবা আমি মহাপাপী, কিন্তু তুমি তো নীলকণ্ঠ, বিষের জ্বালা যে কি তুমি তো বোঝ, তুমি রণরঙ্গিণী কালীকে বুকে ঠাঁই দিয়েছ, তোমার গলায় বিষধর ফণী, তুমি কি না পার! রণরঙ্গিণী কালীকে উমা করতে পার, বিষধর ফণীকে রূপান্তরিত করতে পার পারিজাতের মালায়। সমুদ্র-মন্থনের বিষ তোমার কণ্ঠে গিয়ে অমৃত হয়ে আছে। আমার মতো মহাপাপী পাষণ্ডকে তুমিই উদ্ধার করতে পার, আর কেউ পারবে না—"

রোখন মিশিরের চোখ বুজে এল। দেখলাম দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা নামছে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে আবার বললে—"মাস্টার-মশাই, আমি পাপী হতে পারি, মূর্খ হতে পারি, কিন্তু আলোকে আলো বলে' চিনতে আমার ভুল হয় না কখনও। আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার সাহস পাই নি, কিন্তু আপনি যে পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পাঁকের মধ্যে কি করে' পাঁকাল মাছ হয়ে থাকতে হয়, তা আপনি রোজ দেখিয়ে দিচ্ছেন। অকপটে সব কথা আপনাকে বললুম। কিছুতেই জিভকে রোধ করতে পারলুম না। আপনার পুণ্যের চুম্বক আমার পাপের লোহাকে টেনে বার করে' নিলে।"

বললাম, "ভাই রোখন, তোমাকে আর আপনি বলব না। এখন থেকে তুমি আমার ভাই হলে। তুমি আমাকে যত বড় পুণ্যাত্মা মনে করছ তত বড় পুণ্যাত্মা আমি নই। আমি জানি তুমিও ষোলআনা পাষণ্ড নও। আমরা সবাই অবস্থার দাস। দাসরা কখনও কলঙ্কহীন হয় না, হতে পারে না। তুমি শিব-ভক্ত এ কথা শুনে বড় আনন্দ হয়েছে। এখন শিব-ভক্তই চাই আমাদের। এ যুগের দক্ষরা শিবহীন যজ্ঞের যে সাড়ম্বর আয়োজন করেছেন চতুর্দিকে সে যজ্ঞ ধ্বংস করবার জন্যে শিব-জটা থেকে বীরভদ্রের আবির্ভাব একদিন হবেই। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে, তাঁর তাণ্ডবে যোগ দেবার জন্যে শিব-ভক্তদেরই প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি শিব-ভক্ত এটা তাই বড় সুখবর। তোমাকে সেই দলে থাকতে হবে রোখন। তুমি নির্ভাবনায় থাকো, তোমার কোনও কথা প্রকাশ পাবে না আমার মুখ থেকে। তুমি আমার আত্মীয়, তুমি আমার দলের লোক—"

রোখন মিশির আমাকে প্রণাম করে' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বীরভদ্র সত্য কি আবির্ভূত হবেন ?"

"হবেন। যেদিন সতীর মৃত্যু হবে সেইদিন—"

রোখন হাত জোড় করে' চোখ বুজে ফেলল।

সাঁইবাবা এক-তারা বাজিয়ে গান গাইছিলেন—

মাকালকে তুই করবি রসাল
বরফ দিয়ে জ্বালবি মশাল
তোর যে দেখি আস্পা বড়
তোর যে দেখি উচ্চ আশা
ওরে মূর্খ ওরে চাষা
মরুর বুকে ফলিয়ে ফসল
তুলবি বাড়ি মস্ত মহল
আগে থাকতে বায়না দিয়ে
কিনে বসলি খাম্বা বড়
তোর যে দেখি আস্পা বড়।

গান থামলে জিগ্যেস করলাম—"আস্পা করাটা কি অন্যায় সাঁইবাবা ?"

আবার গান গেয়ে তাঁর উত্তর দিলেন সাঁইবাবা—

"ন্যায়ের বিচার কোথায় আছে
মনের বিচার জগৎময়
অন্যায়কে ন্যায় বানিয়ে
সেই তো করে জগৎ জয়
মনকে চেন।
কণ্টকে সে কুসুম ভাবে
চিনিকে দেয় বালির দাম
সদসতের শতদলে
মানুষেরই মনস্কাম
মনকে চেন।"

সাইবাবা আমার দিকে মিটিমিটি চেয়ে হাসতে লাগলেন।

বললাম, "এ সব গান কি আপনারই রচনা? চমৎকার গান"

আবার হেসে দু'লাইন গানেই উত্তর দিলেন—

বুকের ভিতর যে কাঁদে
সেই তো বাবা গান বাঁধে"

অবাক হ'য়ে গেলাম। সাইবাবা সাধারণ বাউল ন'ন। 'হরে কৃষ্ণ চাট্টি ভিক্ষা দাও মা' এ বুলি তাঁর মুখে কখনও শুনি না। ভিক্ষা দিলে নেন, কিন্তু ভিক্ষা চান না কখনও। সাইবাবা রহস্যময়। কিন্তু এ রহস্য ভেদ করবার উপায় নেই। নিজের কথা কখনও বলেন না। মনে হল তবু চেষ্টা করতে হবে যদি ওঁকে চিনতে পারি। কিন্তু পারি নি।

ভর্থার অনেকদিন দেখা পাই নি। সে রাস্তায় রাস্তায় পকেটকাটার ফিকিরে ঘুরে বেড়ায়। আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় না। রহিম কশাই আমাকে মাংস দিয়ে যায়। তাকে একদিন ভর্থার কথা জিগ্যেস করেছিলাম।

"ভর্থাকে আজকাল দেখি না, কোথায় থাকে ছোঁড়াটা—"

রহিম তার অদ্ভুত ভাষায় যা বলেছিল তার সরল বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—"হুজুর, নেড়ি কুত্তীদের সঙ্গে নেড়ি কুত্তাদের রাস্তায় ভাব হয়। সবার সামনে দাঁড়িয়ে তারা যা করে তা আপনি জানেন। বাচ্চাও রাস্তায় হয়। মায়ের পিছু-পিছু ঘোরে দিন কতক। তারপর ছিটকে পড়ে এদিকে ওদিকে! কেউ না খেয়ে মরে, কেউ মোটরের তলায় চেপ্‌টে যায়, কেউ ঘেয়ো হ'য়ে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকে। ভর্থাও ওই দলের। চেহারাটা মানুষের মতো, কিন্তু আসলে কুত্তা। দেখুন না, আমার হাতটা কামড়ে ধরেছিল, শালার দাঁতের দাগ এখনও আছে। কুত্তা, কুত্তা, ওর খবর কুত্তারাই জানে—।" রহিম অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে পাঁঠার রাংটা থুড়তে লাগল।

বললাম, "খুব বড় খাসীর গোটা মুড়ো চাই আমার একটা। গর্দানাসুদ্ধ মুড়ো। দিতে পারবে তো?"

"দু' একদিন আগে বলবেন। এনে বানিয়ে দেব।"

"বানাতে হবে না। চামড়াসুদ্ধ গোটা মুণ্ডু চাই—"

"কেন, কি করবেন—?"

"দরকার আছে—বলব পরে"

তখন কিছু ভাঙলাম না। রহিম চলে গেল।

সেইদিনই ভর্থা আর তার বন্ধু—ভুতুম এসে হাজির হল একটু পরে।

ভর্থা বললে—"মাস্টার মশাই, ভুতুমের আজ ডিউটি ছিল নিউগী পাড়ার দিকে। সেই মেয়েটার সঙ্গে ও আলাপ করে' এসেছে তাকে। বলে এসেছে যে আপনি যদি আমাকে পুলিসে ধরিয়ে না দেন, তাহলে আপনার টাকা আর মনিব্যাগ আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাব। ভুতুমকে বললাম—কি বললে সে। 'বললে, আচ্ছা দিয়ে যেও। পুলিস ডাকব না। কিন্তু তেরছা চোখে চেয়ে এমনভাবে মুচকি হাসল যে আমার মনে হচ্ছে ঠিক ও আমাকে ধরিয়ে দেবে'—"

ভর্থা বললে—"তুই শালা ভীতু। আমাকে দিন, আমি দিয়ে আসব মাস্টার-মশাই। দিয়েই ছুটে পালিয়ে আসব"

ভুতুমকে জিজ্ঞাসা করলাম—"মেয়েটা কি রকম দেখতে? ফর্সা, না কালো—"

ভুতুম ফাজিল। সে এক কথায় জবাব দিলে—"মাল একটি। মালবাবুটিকেও দেখেছি। টেরিকাটা দিব্যি পুরুষ্টু পাঁঠা—"

"মেয়েটি ফর্সা, না কালো?—"

"এত পাউডার ক্রীম মেখেছে যে রং বোঝা গেল না। চোখ টানা-টানা, চোখের কোলে সুর্মা, সামনের দাঁত একটু উঁচু—"

বহুকাল আগে যে মেয়েটিকে দামী কাশ্মীরী শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম ভাবতে চেষ্টা করলাম তার চোখ টানা-টানা ছিল কি না, সামনের দাঁত উঁচু ছিল কি না, কিন্তু দেখলাম স্মৃতির পটে একটি লোভাতুরা মেয়ের অস্পষ্ট ছবি আঁকা আছে কেবল তার চোখ, মুখ বা দাঁতের কোনও ছাপ নেই সেখানে, আছে কেবল উন্মুখ লোভের একটা অস্পষ্ট প্রকাশ মাত্র। বললাম—"আমিই নিয়ে যাব ওটা। তোরা আমাকে নিয়ে চল"

ভুতুম বললে—"আজ তো আমাকে বাগবাজারে ঘুরতে হবে। কাল চিৎপুর। পরশু দিন যেতে পারি—"

"আমি আজই যাব। তোদের যাবার দরকার নেই—"

ভর্থার চোখদুটো কপালে উঠল। একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত সে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তার বোধ হয় মনে হল আমি চটেছি।

"আমি যাব আপনার সঙ্গে মাস্টার-মশাই। আমিও সে বাড়ি চিনি। তিন বার গেছি সেখানে, দেখা পাই নি। তাই ভুতুমকে ঠিকানাটা দিয়েছিলাম, ও যদি দেখা পায়। চলুন, এখুনি যাবেন?"

ভুতুমের কালো গোল মুখ, তার উপর বসন্তর দাগ। চোখ দুটোও গোল গোল। একটা চোখের তারায় সাদা দাগ। সে-ও নির্নিমেষ হ'য়ে গেল। তার মনে হ'ল ভর্থা তার উপর টেক্কা মারছে।

"তোর যে এখনি হাওড়া স্টেশনে ডিউটি। যাবি না? রামের বাবা জুতিয়ে লম্বা করে' দেবে যদি শোনে—"

"দিক। তবু আমি যাব—"

ভর্থা দমবার ছেলে নয়।

বললাম, "তোদের কাউকে যেতে হবে না। তোরা 'ডিউটি'তে যা। আমি একাই যাব—"

ভর্থার কণ্ঠে আবদারের সুর ফুটে উঠল। পা ঠুকে ঠুকে নাকিসুরে বলতে লাগল—'আমি যাব মাস্টার-মশাই'।

ভুতুম বললে—"আপনি যদি কৌশল্যার স্বামীকে একটু বলে' দেন তাহলে আমিও যেতে পারি। বড্ড মারে শালা—"

ভুতুমের বয়স প্রায় কুড়ি। শুনেছি কোনও স্কুলে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল। এখন পকেট মার হয়েছে। মহা ফাজিল। ওদের দলপতির নাম দশরথ। তাকে ও নানারকম নাম দিয়েছে—কখনও রামের বাবা, কখনও কৌশল্যার স্বামী,

কখনও কৈকেয়ীর ভেড়া ইত্যাদি। দশরথও আমার ভক্ত। সে-ও তার যে-সব চোরাই মাল তড়ি-ঘড়ি পাচার করতে পারে না সেগুলো আমার কাছে জমা রেখে যায়। এখনও একটা দামী বেনারসী শাড়ি আমার ওই সিন্দুকের ভিতরে আছে। দশরথের চেহারা নিরীহ প্রকৃতির। দেখলে মনে হয় ভালোমানুষ লোক। চাকর হিসাবে উৎকৃষ্ট। হেন কাজ নেই যা সে করতে পারে না, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। কোন-না-কোন গৃহস্থ বাড়িতে সর্বদাই সে চাকর হয়ে বাহাল থাকে, তারপর কোন একটা দামী গয়না, শাড়ি বা জামা হাতিয়ে নিয়ে অন্তর্ধান করে' আবার এক জায়গায় বাহাল হয়। কারণ কলকাতার মধ্যবিত্ত লোকেরা দাসানুদাস। অর্থাৎ তারা তাদের চাকরেরও দাস। একা হাতে বাসন মেজে, কাপড় কেচে, ঘর নিকিয়ে, ছেলেমেয়ে সামলে, নটার সময় স্বামী পুত্রের আপিসের ভাত দেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। তাই চাকর-চাকরানীদের কাছে জোড়হস্ত হ'য়ে থাকে তারা। দশরথরা সেই জোড়-হস্তের সুবিধাটা নেয়। দশরথ রোগা লোক, নিঃশব্দ-পদক্ষেপে হাঁটে, কথা কম বলে। এই পকেটমারদের সমস্ত পকেট-মারা পয়সা নিয়ে সেই বিলি ব্যবস্থা করে। প্রত্যেককে সমান সমান ভাগ করে' দেয়। রোখনকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়, নিজেও কিছু নেয়। কিন্তু নিজে যেটা নেয় সেটা নিজের জন্যে খরচ করে না। পাতিতুণ্ডির নামে যে পাশ-বুকটা আছে তাতেই জমা করে, আর ওই পকেটমারদেরই আপদে বিপদে খরচ করে সে টাকাটা। ভুতুমের যখম বসন্ত হয়েছিল তখন চিকিৎসার সব খরচ দশরথই চালিয়েছিল। তাই দশরথ ভোটের জোরে নয় গুণের জোরে, ভালবাসার জোরে ওদের দলপতি হয়েছে। এই হতভাগা ছোঁড়াগুলোকে ওই সত্যি ভালবাসে। বেচাল হ'লে নির্মম করে' মারে, কিন্তু ভালবাসে। রোজকার না করে' যদি ওরা ফাঁকি দেয় তাহলে ভয়ানক চটে' যায়। আমি যদি বলি আমি ওদের নিয়ে গিয়েছিলাম তাহ'লে ও কিছু বলবে না জানি, কিন্তু সেই জন্যেই আমার সংকোচ বেশী।

বললাম—"তোরা রোজ কত করে' রোজকার করিস—"

ভর্খা বললে—"তার কি ঠিক আছে। কোনও দিন একটাকা দু'টাকা, কোনও দিনও একশো দু'শো—"

"তাহলে এক কাজ কর, আমি তোদের পাঁচটাকা করে' দিচ্ছি—তোরা দশরথকে ওই টাকাটা দিয়ে বলিস আজ এই পেয়েছি—"

চোখ বড় বড় করে' ভর্খা বললে—"আপনিই না বলেছেন মিথ্যে কথা কখনও বলবি না, আপনিই মিথ্যে কথা বলতে শেখাচ্ছেন!"

ভুতুম বললে—"উনি তো পকেট মেরে পেয়েছি বলতে বলছেন না। শুধু 'পেয়েছি' বললে মিথ্যে কথা বলা হবে না"

হেসে উঠলাম তিনজনেই।

আমাদের আলোচনায় কিন্তু বাধা প'ড়ল। ক্ষেন্তি এসে ব'লল, "আজ একটি ছেলে খবর পাঠিয়েছে, তোমার কাছে আসবে বিকেলে। সে নাকি গলস্ওয়ার্দিকে নিয়ে একটা থিসিস্ লিখবে। তোমার পরামর্শ চায়—"

"কখন আসবে—"

"পাঁচটায়। আমি একটু আগে বাজারে বেরিয়েছিলাম, তোমার এক ছাত্রের সঙ্গে

দেখা হ'ল। খবরটা সেই তোমার কাছে দিতে আসছিল। আমি বললুম, আচ্ছা, আমি দিয়ে দেব, তোমার আর কষ্ট করে অতদূরে যাবার দরকার নেই—"

"এখন ক'টা বেজেছে ?—"

"বারোটা—"

"তাহ'লে তো এখনই আমাকে বেরুতে হবে—"

"কোথা যাবে এখন"

"নিউগীপুকুর লেনে। খাবার হয়েছে ? খেয়েই বেরুই"

"রুটি হয়েছে, কিন্তু মাংস সিদ্ধ হয়নি এখনও"

"যা হয়েছে তাই নিয়ে আই। একটু বেশী করে' আনিস, আমরা তিনজনেই খাব।"

আধসিদ্ধ মাংস আর গরম রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা তিনজন। রাস্তায় ঠিক হ'ল ওরা দু'জন গলির দু'প্রান্তে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। আমি কড়া নেড়ে বাড়িতে ঢুকে শ্রীমতী রানী বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ ক'রব। যদি দরকার হয় ওদের ডাকব। অর্থাৎ ওরা আমার বডি-গার্ড হ'য়ে থাকবে। এ সবের অবশ্য কিছু দরকার ছিল না। কিন্তু ওরা না-ছোড়।

কড়া নাড়তেই একটি ছোঁড়া-চাকর এসে কপাট খুলে দিল। ফর্সা গেঞ্জি গায়ে, ফর্সা খাকি প্যাণ্ট, দশআনা-ছআনা-চুলছাঁটা। চোখে বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি। ইংরেজিতে যাকে বলে স্মার্ট (smart)—তাই।

"কাকে চান ?"

"রানীর সঙ্গে দেখা করতে চাই—"

"কি নাম বলব গিয়ে। আপনার কি কোনও কার্ড আছে ?"

"না—"

"তাহলে এই শ্লেটে নামটা লিখে দিন"

শ্লেটে লিখলাম—"অনেকদিন আগে আমি তোমাকে একটা দোকান থেকে কাশ্মীরী শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম। আজ তোমার ঠিকানা জানতে পেরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তোমার একটা হারানো জিনিসও এনেছি, তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব—"

একটু পরেই আমার ডাক এল। আমি দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের আসবাবপত্রে সাজ-সজ্জায় সুরুচির পরিচয় দেখলাম। এক কোণে তে-পায়ার উপর চমৎকার একটি ফুলদানি রয়েছে, দেখতে ঠিক যেন ঊর্ধ্বমুখী একটি অঞ্জলির মতো। তাতে রক্তগোলাপ রয়েছে একগোছা। একটি মাত্র ছবি আছে—অজন্তার সেই ভিখারিনীর ছবিটা। রানী প্রবেশ করেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি যখন তাকে শাড়িটা কিনে দিয়েছিলাম, তখন আমার গোঁফ-দাড়ি ছিল না, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি ছিল। গোঁফ-দাড়ি-ওলা খদ্দরের আড়ময়লা লম্বা-কোট-পরা লোকটার সঙ্গে আগেকার-দেখা সেই ছবিটার কিছুমাত্র মিল নেই দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে আমার মুখের দিকে।

"কে আপনি—!"

আগে যা বলেছিলাম এবারও তাই বললাম।

"আমি তোমার বাবার বন্ধু। তোমার বাবা কোথায়"

"তিনি মারা গেছেন অনেক দিন আগে"

"ও ! তোমার মা—"

"তিনিও নেই। ওই ভ্যানিটি ব্যাগ আপনি কোথায় পেলেন"

"একটা পকেটমার ছোঁড়ার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলাম ওটা। ওতে তোমার রুমাল, কার্ড আর মনি-ব্যাগ ছিল। মনি-ব্যাগে একশ' টাকার নোটও ছিল একখানা। সেই ছোঁড়াটাকেই বলেছিলাম তোমাকে ওটা ফিরিয়ে দিয়ে যেতে। কিন্তু সে সাহস করে' আসতে পারল না, তার ভয় হ'ল পাছে তুমি তাকে পুলিসে ধরিয়ে দাও। তাই আমি এলাম—। নাও এটা।"

সামনের টেবিলে ব্যাগটা রাখলাম। রানী অবাক হ'য়ে থমকে দাঁড়িয়েই রইল। তারপর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল—

"আপনি গোঁফ-দাড়ি রেখেছেন কেন।"

হেসে বললাম—"যদি বলি প্রত্যহ কামাবার পয়সা নেই, তাহ'লে কি বিশ্বাস করবে সেটা—"

রানী কোনও উত্তর দিল না। চুপ করে' চেয়েই রইল আমার দিকে। আমার চোখ দুটোই সে দেখছিল নির্নিমেষে। চোখের মধ্যেই বোধ হয় মানুষের সত্য পরিচয় লেখা থাকে। সেইটেই সে খুঁজছিল। হয়তো সেটা পেয়ে গেল শেষকালে। এগিয়ে এসে প্রণাম করল আমাকে।

"সত্যি, আপনি এত বদলে গেছেন, প্রথমে চিনতেই পারি নি। কোথায় থাকেন আপনি, কি করেন"

"আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি হারিয়ে গেছি। তোমার খবর বল। বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—"

একটি সোফায় সে বসল। তখন লক্ষ্য করলাম তার পরনের শাড়িটাও বেশ শৌখীন সুরুচির পরিচয় বহন করছে। স্যাণ্ডালটিও।

মৃদু হেসে ব'লল—"আমিও হারিয়ে গেছি। যে মেয়েটিকে একদিন আপনি দামী শাড়ি জুতো দুল কিনে দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন, সে মেয়ে অনেকদিন আগে হারিয়ে গেছে। তার সেকালের সাধ আশা স্বপ্ন সবই হারিয়ে গেছে।"

"কি সাধ আশা স্বপ্ন ছিল তোমার—"

মেয়েটি নতমুখে চুপ করে' বসে' রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—"সব মেয়েরই যে সাধ আশা স্বপ্ন থাকে আমারও তাই ছিল। ছোট্ট একটি সংসার। কিন্তু আবার বাবা গরীব কেরানী ছিলেন, আমারও তেমন একটা চোখ-ঝলসানো রূপ ছিল না, তাই বিয়ের বাজারে অবিক্রীত অপছন্দ জিনিসের দলে পড়ে গেলাম। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, বাবাও কিছুদিন পরে মারা গেলেন। একা পড়লাম। তারপর—"

থেমে গেল মেয়েটি। আমিও চুপ করে' রইলাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল রাস্তায়-দাঁড়ানো সারি সারি রূপ-জীবার দল, ভেসে উঠল ধর্মান্তরিতা সেই সব মেয়েরা যারা মুসলমান বা খৃষ্টান হয়েছে অবস্থার চাপে পড়ে', যারা অসবর্ণ বিবাহ করে' গোঁড়া সমাজের সমর্থন পায় নি, যারা মা না হ'য়ে পুরুষের পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, আর ভেসে উঠল সেই পঙ্গু লোভী নিশ্চেতন পৌরুষহীন ভীরু সমাজের ছবি যে খালি উপদেশ দেয়, আর কিছু করে না, যে

অন্যায়ের প্রতিকার করে না, কেবল তারস্বরে চীৎকার করে আর গালাগালি দেয়।

"তারপর ?"

"তারপর আমি নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিলাম। আমি এখন অভিনেত্রী"

আবার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে' থেকে সে বলল—"আপনাকে কিন্তু আমি ভুলি নি। আপনার দেওয়া সেই শাড়ি দুল আর স্যাণ্ডাল আমাকে আমার নূতন জীবনে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে। ওইগুলো পরেই আমি অভিনয়-জগতে প্রথমে প্রবেশ করেছিলাম। এগুলো পরা না থাকলে আমার কু-শ্রী হয়তো ঢাকা পড়ত না। যিনি আমাকে প্রথমে অভিনয়-জগতে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হয়তো আমাকে পছন্দ করতেন না। আপনার দেওয়া ওই পোশাক আমি যত্ন করে' রেখে দিয়েছি। দেখবেন ?"

উঠে গিয়ে সে ফিরে এল দামী একটি ছোট সুটকেস নিয়ে। খুলে দেখাল তার মধ্যে রেশমের কাপড়ে মুড়ে সযত্নে আমার-দেওয়া জিনিসগুলি সে রেখে দিয়েছে।

বলল, "মাঝে মাঝে এই বাক্সটাকে প্রণাম করি। আপনাকেই প্রণাম করি। আপনি যে আবার ফিরে আসবেন এ আশাই করিনি কোন দিন—আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে সত্যি সত্যি আপনি এসেছেন—"

"ভাগ্যে ওই পকেটমার ছোঁড়াটা তোমার ব্যাগটা আমাকে দিয়ে গেল, তাই তো তোমার ঠিকানা জানতে পারলাম। তুমি বলেছিলে নিউগী পাড়া লেনে তুমি থাক। রানী বিশ্বাস, নিউগী পাড়া লেন—এই ঠিকানা দেখে তোমার সেই অনেকদিন আগেকার দেখা মুখটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। ভাববার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু কিছু মনে পড়ল না, দেখলাম স্মৃতি আবছা হ'য়ে গেছে। ওই ছোঁড়াটাকেই পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে এই ব্যাগটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে। সে যদিও তোমাকে দেখে গেছে কিন্তু সাহস করে' ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে পারে নি। আমিই চলে' এলুম তাই। মনে হচ্ছে এসে ভালই করেছি। অনেকদিন পরে হারানো মেয়েকে ফিরে পেলুম।"

"সত্যি কি আমার বাবার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল ?"

হেসে বললাম—"না, ছিল না। তোমার বাবাকে দেখিওনি কখনও। কিন্তু ওই মিথ্যে কথাটুকু না বললে সেদিন তুমি ও-জিনিসগুলো নিতে না। নিয়েছিলে বলেই আজ তোমাকে পেলাম। মিথ্যে কথা বলেছিলাম বলে' একটুও অনুতাপ হচ্ছে না আমার। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি। আবার আসব, কিম্বা চিঠি লিখব।"

"আমার ফোনও আছে। ফোন নম্বরটা লিখে দিচ্ছি—"

একটুকরো কাগজে সে ফোন নম্বরটা লিখে দিলে।

"এখুনি চলে যাবেন ? একটু বসবেন না ? একটু চা করতে বলি ?"

"না, কিছু খাব না। আমি খেয়ে এসেছি। আবার আসব"

"কোথায় থাকেন আপনি ?"

"যেখানে থাকি সেটা ভদ্রপাড়া নয়। চোর-ছ্যাঁচড়, পকেটমার, পতিতাদের পাড়া। সত্যিকার ভদ্রলোকও নেই যে তা নয়, কিন্তু তাদের বাইরের চেহারাটা বড্ড নোংরা। বড্ড গরীব ওরা।"

"আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন একদিন ?"

"তুমি সেখানে বেমানান—"

"না, তবু আমি যাব"

তারপর হঠাৎ বললে—"জানেন, আমার ভিতরটাও নোংরা। আমার বাইরেটাই ছিমছাম কেবল। আমার—"

বলতে বলতে চুপ করে' গেল। দেখলাম তার চোখ দুটো জ্বলছে। ঠোঁট থর থর করে' কাঁপছে। উঁচু দাঁত দুটো ঠোঁটের ঢাকনা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

"কোথায় থাকেন আপনি, আমি যাব সেখানে একদিন"

"আচ্ছা। নিয়ে যাব। আচ্ছা, চলি—"

উঠে পড়লাম। রানী প্রণাম করে' এগিয়ে দিলে আমাকে দ্বার পর্যন্ত।

আবার বললে—"আমি যাব কিন্তু একদিন—"

"বেশ যেও। নিয়ে যাব এসে—"

ট্যাক্সি করেই ফিরছিলাম। ভুতুম আর ভর্থা পিছনের সীটে ছিল। আমি বসেছিলাম ড্রাইভারের পাশে। পাঞ্জাবী ড্রাইভার। পুলিস একটা মোড়ে হাত তুলে গাড়ি থামিয়েছে। পিছনের একটা গলিতে মনে হ'ল সাইবাবা গান গাইছেন। ভর্থাও বললে—সাইবাবা। ট্যাক্সিওলাকে বললাম—তুমি একটু দাঁড়াও, দেখে আসি। ট্যাক্সিওলা বললে—দাঁড়াব না। ভর্থাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, —ভাড়াটা দিয়ে দে তাহলে। আমি সাইবাবার খবর নিয়ে আসি একটু। যদি আমাদের সঙ্গে যান তো তুলে নেব।

একটা গলিতে দেখলাম সাইবাবা একতারা বাজিয়ে গান ধরেছেন একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

ওরে মনের পাখী, শিকল কেটে
উড়বি কবে আকাশে
হাঁফ ছেড়ে তুই উড়বি কবে বলরে
বিরাট নভে মেলবি কবে ডানা
তুচ্ছ করে' সকল বিধি মানা
ডানা মেলে উড়বি কেবল উড়বি
ডানা দিয়ে সারা আকাশ জুড়বি
ওখানে সূর্য চন্দ্র তারার মেলা
তবু অনেক ফাঁকা সে—
উড়বি কবে আকাশে।

গান শুনেই বাড়ি থেকে একটি ছোকরা বেরিয়ে এল। দেখলাম আমারই ছাত্র মহাব্রত। আমার কাছে ইতিহাস পড়ে। এবার অনার্স দেবে। তার যে এখানে বাড়ি তা জানতাম না। এসপ্ল্যানেড টু বেহালা ট্রামে দুপুরে তাকে সপ্তাহে দু'ঘণ্টা করে' পড়াই। পতিতুণ্ডিই যোগাযোগ করেছে।

সাইবাবা তাঁর ময়লা গেরুয়া ঝোলা থেকে কাগজে মোড়া একটি গোলাকার জিনিস বার করে' বললেন—"তারকেশ্বরে গিয়েছিলাম। তোমার জন্যে একটি বেল এনেছি বাবা, নাও। বাবা তারকেশ্বর মহাকাল। তাঁর প্রসাদ মাথায় তুলে নাও—"

মহাব্রত বেলটি মাথায় ঠেকিয়ে সেটা নিয়ে ভিতরে চলে' গেল। আমি গলির ভিতর ঢুকি নি। দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। ভর্থা কখন যে আমার পাশে

এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাই নি। সে চুপি চুপি বললে, "ওটা বেল নয়। জীবনদা যে বোমা তৈরি করেন সেই বোমা। সাঁইবাবা ওই বোমা বিলিয়ে বেড়ায়। চিৎপুরেও একটা গলিতে ওঁকে এই বেল দিতে দেখেছি—"

"তাই না কি"

অবাক হ'য়ে গেলাম। জীবন যে এ কাণ্ড করছে তা জানা ছিল না। সাঁইবাবা গলির আরও ভিতরে ঢুকে গেলেন। তাঁর আর একটা গানের আর এককলি শুনতে পেলাম—"জীবনটা তো একটুখানি, মরণটা যে মস্ত!" তাঁকে ডাকা সমীচীন মনে করলাম না। ফিরে এসে দেখি সেই ট্যাক্সিটাই দাঁড়িয়ে আছে। আমি আসতেই সে মোটর থেকে নেমে আধা বাংলা আধা হিন্দীতে বললে—"আপনি জগৎজিৎ দাদার গুরুজি মহাপুরুষজি—এই ছোকড়ার কাছে মালুম হোলো। চলিয়ে—"

পৌঁছে দিয়ে ভাড়াও নিতে চাইছিল না লোকটা। জবরদস্তি করে' দিতে হল। যাবার সময় বলে গেল—"ময় জগৎজিৎ ভেইয়া সে আপকা বাত সব শুনা হুঁ। জরুরৎ পড়ে গা তো জান দে দুঙ্গা। খুন বহা দুঙ্গা।"

সে যখন চলে গেল তখনও আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। মনে হল অতি তুচ্ছ নগণ্য লোক আমি একটা, কিসের জোরে এদের হৃদয় অধিকার করেছি? ভালবাসার? কিন্তু কতটুকু ভালবেসেছি ওদের। কতটুকু জেনেছি ওদের সম্বন্ধে। কতটুকু সাহায্য করতে পেরেছি ওদের। শুধু চেষ্টা করেছি আর সম্মান করেছি ওদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বকে। যে লাঞ্ছনার জন্যে ওরা দায়ী নয় সে লাঞ্ছনা কিছু লাঘব করতে পেরেছি কি? কিছুই তো পারি নি। তবু ওরা আমাকে এত ভালবাসে?

একটা পুঁটুলি হাতে করে' শোভনা এল একদিন আমার বসবার ঘরটায়। তার ঠিক একটু আগে আমার একটি ছাত্র এসেছিল। আমিও বেরুব ভাবছিলাম। কারণ এর একটু পরেই দেশবন্ধু পার্কে দু'জন ছাত্রের আসবার কথা। শোভনা এসে বললে—"এইটে আপনার কাছে রেখে দিন, বাবা। তা না হলে ও মুখপোড়া কেড়ে নিয়ে যাবে—"

"কে—"

"ওই মিনুবাবু। পাঁচ বছর আগে ওর কাছে থেকে দেড়শ টাকা ধার নিয়েছিলাম। সুদই দিয়েছি দুশো টাকার উপর, তবু সে ধার এখনও শোধ হয় নি। বাঁদরটা মাঝে মাঝে সোহাগ জানাতে আসে আমার কাছে। কাল ঘরে ঢুকতে দিই নি। আজ হয়তো একটা সেপাই নিয়ে এসে আমার ঘর তছনছ করবে, আর যা পাবে তুলে নিয়ে যাবে—"

"সেপাই কোথা পাবে?"

"এ পাড়ার সব সেপাই ওর আর রোথন মিশিরের ক্রীতদাস। ওদের হাত থেকে নগদ টাকা পায় যে রোজ। এগুলো বাবা আপনি রেখে দিন আপনার কাছে। তা না হলে লুটেপুটে নিয়ে যাবে সব—"

"কি আছে ওতে—"

"আপনার দেওয়া সেই রঙীন শাড়ি দুটো। আর মায়ের কানের একজোড়া সেকেলে মাকড়ি। আর—"

থেমে গেল শোভনা।

"আর কি—?"

"আমার স্বামীর লেখা খান কয়েক চিঠি। আমার স্বামী কলেজে পড়তেন। আমার পোড়াকপাল, তাই অকালে তিনি চলে গেছেন আমাকে ফেলে। তারপর—যাক আমার জীবনের কথা আর নাই শুনলেন। এগুলো রেখে দিন আপনার কাছে। আজ কুচোচিংড়ি দিয়ে বেগুনের তরকারি করেছি। দিয়ে যাব আপনার জন্যে একটু? ক্ষেন্তিদির ভয়ে আসতে পারি না। বড্ড মুখঝামটা দেয়—"

"দিয়ে যেও। তুমি তো ভালই রোজকার কর। টাকা ধার করতে গেলে কেন?"

"যখন ধার নিয়েছিলাম তখন রোজকার বেশী ছিল না ডাইতে আনতে বাঁয়ে কুলুত না। খবর পেলুম আমার মামাতে বোন শৈলীর বিয়ে হচ্ছে নাকি বাগবাজারের একটি ছেলের সঙ্গে। সেই পাড়ার একটি লোক তখন আমার কাছে আসত। তার পকেটেই গোলাপী কাগজের উপর সোনালি অক্ষরে ছাপা নিমন্ত্রণপত্রটা ছিল। সে যেমনি রুমাল বার করতে গেল, অমনি বেরিয়ে পড়ল সেটা। পড়লাম চিঠিটা। বুঝলাম আমারই বোন শৈলীর বিয়ে হচ্ছে। খুব ভালবাসতুম শৈলীকে। ছেলেবেলায় একসঙ্গে দু'জনে তালপুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়তুম। ঘাটের ধারে জলে পা ডুবিয়ে বসে ছোট মাছের পোনাদের শ্যাওলার ফাঁক দিয়ে দিয়ে দেখতাম। গামছা দিয়ে ছেঁকে তুলতাম, কত রকম ফড়িং আর প্রজাপতি ধরতাম ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে ঘুরে। দুজনে মিলে কত কুল আর তেঁতুল জরিয়ে লুকিয়ে খেয়েছি। হিসেব না করেই লোকটাকে বললাম—এ আমার বোন। একে একটা হার পাঠাতে চাই। তুমি গিয়ে দিয়ে আসবে? বোলো কৈলি পাঠিয়েছে। আমার ডাক নাম—কৈলি। লোকটা রাজি হ'ল। সেই সময় মিনুবাবুর কাছে দেড়শ' টাকা ধার করেছিলাম। আজও শোধ হয়নি। হবেও না কখনও—"

বললাম, "মিনুবাবু কখন আসবে?"

"আজই আসবে হয়তো"

"এলে আমার কাছে নিয়ে এস। আর রোখন যদি থাকে তাহলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও এখুনি।"

"এগুলো কিন্তু আপনি রেখে দিন"

পুঁটুলিটা আমার সিন্দুকে ঢুকিয়ে রেখে দিলাম।

সিন্দুকটায় কত জিনিস যে জমেছে!

শোভনা চলে যাওয়ার পরই ক্ষেন্তি এল। সে পড়াতে গিয়েছিল। বললাম, "তোর কাছে টাকা আছে?"

"কত?"

"আড়াইশ' টাকা—"

"তোমার ছাত্ররা যা মাইনে দিয়েছে সবই তো আছে। তা প্রায় শ' পাঁচক হবে। আগের সব টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়েছি"

"সংসার চালাচ্ছিস কি করে"

ক্ষেন্তি মুচকি হেসে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে চলে' গেল। একটু পরে আড়াইশ' টাকা নিয়ে এসে বলল—"ক্ষেন্তিকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছ, সংসারের ভাবনা সে-ই

ভাববে এখন। তোমাকে ভাবতে হবে না। তবে বাজে খরচ করে' টাকাগুলো নষ্ট কোরো না।"

ক্ষেন্তিই আজকাল আমার গার্জেন। পতিতুণ্ডিরও গার্জেন সে। একটু পরেই রোখন মিশির এসে হাতজোড় করে' দাঁড়াল।

"আজ্ঞা করুন"

"মিনুবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে চাই। শুনলাম তিনি একটু পরে শোভনার ঘরে আসবেন। তুমি তাঁকে নিয়ে এস। কি খেতে ভালবাসেন তিনি? জানা আছে সেটা?"

"তা তো জানি না। শোভনার ঘরে বসে' বেগনি পেঁয়াজি চপ কাটলেট খান দেখেছি"

"মদ খান?"

"খান বই কি!"

"তাহলে এক কাজ কর"

মনিব্যাগ বার করে' দেখলাম ক্ষেন্তি যে আড়াইশ' টাকা দিয়ে গেল তাছাড়া আরও কুড়িটা টাকা রয়েছে আমার কাছে। সেই কুড়িটা টাকা রোখনের হাতে দিয়ে বললাম, "ওই ময়নার দোকানেই তো সব পাওয়া যাবে?"

"যাবে—"

"এখন তো পেঁয়াজি বেগনি ভাজবার সময় নয়।"

তবু আপনার নাম শুনলে ভেজে দেবে। তাছাড়া আমি যখন অর্ডার দেব তখন না ভেজে কি উপায় আছে ওর? লুকিয়ে মদ বেচে। পুলিসদের আমিই সামলাই"

"বেশ তাহলে ব্যবস্থা করে' ফেল। কুড়ি টাকাতে হবে তো?"

"খুব হবে। এক বোতল 'রম্' (Rum) আছে ওর কাছে জানি। যদি কিছু বেশী লাগে পরে দিলেই চলবে—"

"তুমি তো ধার্মিক লোক। তোমার ওসব চলবে কি?"

"না, না। আমি বাবার প্রসাদ রাবড়ি খাই আর মাঝে মাঝে ভাং। আমি আসবই না। আমি থাক্‌লে আপনার আলাপ জমবে না। আমি ওকে পাঠিয়ে দেব। ময়নাকে বলে যাচ্ছি—"

ময়না এই বস্তির রেস্তোরাঁর মালিক। সব রকম জিনিসই রাখে। খাতা পেন্সিল কাগজও পাওয়া যায়, মশলা চাল ডালও রাখে, আবার বিকেলের দিকে বেগনি পেঁয়াজি চপ কাটলেট এবং ওসবের আনুষঙ্গিক উপচারও বিক্রি করে। ময়না দর্শনীয় ব্যক্তি একটি। কালোকোলো চেহারা। নাকটা বসা। মাথায় বাবরি চুল। বিনয়ের অবতার। গুনগুন করে আধুনিক গান গায়। সিনেমা-গগনের নক্ষত্রদের নির্ভুল জ্যোতিষী। সমস্ত খবর রাখে। সামনাসামনি হলেই মুখটা ফিরিয়ে নেয়, বোধহয় চ্যাপটা নাকটার জন্যে, কিন্তু আড়চোখে লক্ষ্য করে সব। বয়স ত্রিশের নীচেই। কোন কিছু বললেই তৎক্ষণাৎ বলে—"হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই" ঠিক আছে,—এইটে ওর মুদ্রাদোষ। নিতান্ত মূর্খ বলে' মনে হয় না। কারণ ওকে বার্নার্ড শ পড়তে দেখছি। আমি যে গল্পবলার আখড়াটা করেছি, তাতে ও মাঝে মাঝে আসে। আমার সঙ্গে দেখা হলেই নমস্কার করে' সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়—ওর চেপ্টা নাকটার জন্যে ও সর্বদাই যেন অপ্রস্তুত হয়ে আছে।

সেদিন একটা পুরোনো বইয়ের দোকানে যাব ভেবেছিলাম। যাওয়া হ'ল না, মিনুবাবুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিকেল নাগাদ মিনুবাবুকে নিয়ে রোখন মিশির হাজির হ'ল এসে। এসেই বলল—"আমাকে শিউজির মন্দিরে যেতে হবে একটু। আমি বসব না। মিনুবাবু আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন, তাই নিয়ে এলুম ও'কে। আপনারা গল্প করুন দু'জনে। মিনুবাবু মীনাকরা লোক। অনেক রং ও'র গায়ে। পরিচয় পেলে খুশি হবেন"

মিনুবাবুর পিছন থেকে রোখন মিশির বাঁ-চোখটা ঈষৎ কুঁচকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। তারপর শিউজির মন্দিরে চলে' গেল।

"আসুন, আসুন, আসুন। এই গদিটার ওপরই বসুন। আপনার মতো ভদ্রলোককে বসাবার মতো জায়গা আমার নেই। তবু কষ্ট করে' বসুন একটু"

মিনুবাবুর মুখে একটি মিষ্টি হাসি সর্বদাই ফুটে থাকে। সবিনয়ে বললেন, "আপনার যতটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে আপনার কাছে বসতে পারাটাই পরম সৌভাগ্য। আমাকে অত খাতির করছেন কেন, আমি সামান্য লোক"

"বসুন। আমিও সামান্য লোক। তাই আশা করি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'তে দেরি হবে না"

"আপনার বন্ধু হবার যোগ্যতা আমার নেই"

মিনুবাবু ক্রমাগত খোলসের উপর খোলস চড়াতে লাগলেন।

"আপনাকে যে জন্যে স্মরণ করেছিলাম সেই ব্যাপারটা আগে সেরে নি—"

আড়াইশ' টাকার নোটের তাড়াটা তাঁর সামনে ধরলাম।

"কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না। টাকা কিসের ?"

"অনেক দিন আগে শোভনা আপনার কাছে দেড়শ' টাকা নিয়েছিল, সেইটে শোধ করে দিচ্ছি। ওকে এ নিয়ে আর বিরক্ত করবেন না। আরও একশ' টাকা বেশী আছে এতে। সুদটুদ যদি বাকি থাকে কিছু তাও শোধ করে' দেবেন। ও বেচারী বড্ড গরীব—আর দিতে পারবে না"

মিনুবাবু নোটের তাড়াটা নিয়ে গুনে দেখলেন ঠিক আড়াইশ' টাকা আছে কি না, তারপর যখন দেখলেন ঠিক আছে তখন সেটা 'ইনার' পকেটে পুরে ফেললেন। তাঁর মুখে কোন বিস্ময় ফুটল না।

"রসিদ দেবেন কোনো ?"

"নিশ্চয় দেব। একটা কাগজ দিন"

কাগজ দিতেই সেটার উপর লিখে দিলেন—"শোভনার কাছে আজ পর্যন্ত যা পাওনা ছিল সব শোধ হ'য়ে গেল।" এই লিখে নীচে নাম সই করে' তারিখ দিয়ে দিলেন।

"শোভনা কি কোনও হ্যাণ্ডনোট দিয়েছিল ?"

"না। আমাদের সব কারবার মুখে মুখে। ওরা কখনও আমাদের ঠকায় না। আমরাও আমাদের পাওনা পেয়ে গেলে ওদের কিছু বলি না। অবশ্য মাঝে মাঝে কেউ কেউ দমবাজি করে, তখন পুলিস ডেকে বা গুণ্ডা ডেকে ঘরের জিনিসপত্তর যা পাই তুলে নিয়ে যাই—ব্যাপার ওইখানে মিটে যায়। তবে মাঝে মাঝে ঝামেলা হয়, এ পাড়ার নবুর মাকে বড় ভয় করি আমি। ও মেয়েছেলে নয়, ও গুণ্ডার। ও যদি

গাছকোমর বেঁধে ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়ায় তাহলে পুলিস, কাবলে, গুণ্ডা কেউ কিছু করতে পারে না। মাস দুয়েক আগে সেই ভজুয়ার মায়ের বাড়িতে যে হাল্লাটা হ'য়ে গেল, আপনি তো জানেন"

"জানি। নবুর মাকে আমিও ভয় করি—"

নবুর মা এ-পাড়ার ঝিয়েদের নেত্রী। বলিষ্ঠ, কালো, মহিষাকৃতি নারী। কচিৎ তার সঙ্গে দেখা হয়। ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়। রাত দশটায় ফেরে। ফিরেই তার পুত্রবধূর সঙ্গে কলহ করে খানিকক্ষণ। অশ্রাব্য অশ্লীল কথা অনর্গল খানিকক্ষণ চীৎকার করে' বলে যায়। ওইটেই ওর একমাত্র আরাম—ইংরেজিতে যাকে বলে রিল্যাক্সেশন (Relaxation)। রোগা ভালোমানুষ নবুর বউ কোনও উত্তর দেয় না। নবু হাঁপানির রুগী। খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে হাঁপায় আর মা-কে মাঝে মাঝে বলে—এইবার ক্ষ্যামা দে। খেটেখুটে এসেছিস, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় এবার। নবুর মার যতক্ষণ দম থাকে ততক্ষণ সে 'ক্ষ্যামা' দেয় না। আমার সম্বন্ধেও নবুর মার ধারণা ভালো নয়। আড়ালে বলে—বোকা বুজরুক একটা। সবার উপকার করতে চায় মুখপোড়া। ন্যাংটোর দেশে ধোপার দোকান খুলেছে। মরণ আর কি! কাগদের সামনে ভাত ছিটোচ্ছে। আমার সম্বন্ধে এইরকম মন্তব্য সে মাঝে মাঝে করে শুনেছি। নবুর যখন হাঁপানির টান বাড়ে তখন নবুর বউ আমার কাছ থেকে হোমিওপ্যাথী ওষুধ নিয়ে যায় এসে। সাময়িকভাবে কমে। আবার বাড়ে। অ্যালোপ্যাথী পেটেণ্ট ওষুধও এনে দি মাঝে মাঝে। নবুর মায়ের ধারণা কিন্তু বদলায় নি। সুযোগ পেলেই বলে—মুখপোড়া কাগদের সামনে ভাত ছিটোচ্ছে? কত ছিটোবে? আমার সঙ্গে মুখোমুখি হ'লে নবুর মা মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে হনহন করে' চলে যায়। তার সঙ্গে আলাপ হয় নি। নবুর মার কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ মিনুবাবু বললেন—"শোভনার জন্যে টাকা খরচ করছেন করুন, কিন্তু একটা খবর আপনাকে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি। মেয়েটা বড় ফিক্‌ল্‌ (fickle)। আজ আপনাকে আশা দিয়েছে কিন্তু কাল অন্য জায়গায় যদি বেশী টাকার লোভ দেখায় কেউ, সেইদিকে ঢলে' পড়বে—"

বললাম—"শোভনা আমার মেয়ে।"

"মেয়ে! কি রকম?"

"আপনি যেমন আমার ভাই। আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?"

"বলুন—"

"মেকি মুখোসটা খুলে ফেলে সত্যি আমার ভাই হোন। আপনার সুখ দুঃখের অংশীদার হবার সুযোগ দিন আমাকে।"

একটু হক্‌চকিয়ে গেলেন মিনুবাবু।

এক ঝলক মেকি হাসি হেসে বললেন—"মানে, বেশ তো! মেকি মুখোসের কথা বলছেন? ইচ্ছে করে' তো কোনও মুখোস পরিনি দাদা, মনিবের কাজ বাজাতে বাজাতে মুখটাই হয়তো মুখোসের মতো হ'য়ে গেছে। ওতো খোলা যাবে না। মায়ের কোলে একদিন যে সরল শিশু জন্মেছিল সে তো অনেকদিন আগেই চলে' গেছে, তার জায়গায় এসেছে এক তুখোড় মতলববাজ লোক, ঠিকই ধরেছেন দাদা, মুখটা মুখোসের মতোই দেখাচ্ছে—"

স্বৈরিণী ভজুয়ার মা ডগমগে রঙের একটা শাড়ি পরে' আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল আমার জানলার দিকে চাইতে চাইতে। ভজুয়ার মা নবুর মায়ের দল-ভুক্তা। দিনের বেলা ঝি-গিরি করে, রাত্রে বেশ্যাবৃত্তি। তার ছেলে ভজুয়া শৈশবেই মারা গেছে না কি। ভজুয়ার মায়ের চালতার মতো মুখ। কাজল-পরা চোখ দুটি বড় বড়। সে যখনই এদিকে আসে, আমার দিকে চাইতে চাইতে যায়। দৃষ্টির ফাঁদে আমাকে ফেলতে চায় সম্ভবত। কিন্তু আমি পোড়-খাওয়া পুরোনো পাজি, ওসবে বিচলিত হওয়ার মতো লঘুতা অনেকদিন আগে হারিয়ে ফেলেছি। ওসবে প্রবৃত্তিও আর নেই। সুতরাং নির্বিকার হ'য়ে থাকি। এই জন্যে ভজুয়ার মা আমার উপর চটা। তার অব্যর্থ বাণ ব্যর্থ হয়ে' যাচ্ছে এতে একটু অপমানিত বোধ করে সে। আমি এ পাড়ার সব মেয়েকেই মাতৃসম্বোধন করি। ভজুয়ার মা-কেও করি।

বললাম—"মা, তুই তো ওই দিকেই যাচ্ছিস, ময়নাকে একটু বলে' যা আমার খাবারগুলো যেন দিয়ে যায়। মিনুবাবু এসে গেছেন—"

ভজুয়ার মা ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়াল। তার দেহের মনোহারিণী, রেখাগুলি প্রকট হয়ে উঠল শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। সে বিহারিণী, স্বাস্থ্যবতী এবং লোভনীয়া। মিনুবাবু দেখলাম ঈষৎ চনমনে হ'য়ে উঠলেন। ভজুয়ার মায়ের কথায় ঈষৎ বিহারী টান আছে। কিন্তু সে বাংলাই বলে।

"কি বোলসেন—"

যা বলেছিলাম আবার বললাম।

"ময়নার সঙ্গে আমার 'কাজিয়া' (ঝগড়া) আছে। ওর সঙ্গে কথা বলি না"

হেলতে দুলতে চলে' গেল।

মিনুবাবু বললেন, "একের নম্বর খচ্চড় মাগী—"

হেসে বললাম, "আমরা কেউ খচ্চড়, কেউ ঘোড়া, কেউ হাতী, কেউ উট—সবই অবস্থার বিপাকে। আসলে আমরা কেউ খুব খারাপ লোক নই।"

হঠাৎ মিনুবাবুর মনের কপাট যেন খুলে গেল।

"নই ? আমার তো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। পেটের জন্যে এই নরকে ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে। অথচ আমি কত বড় বংশের ছেলে। বাবা অধ্যাপক ছিলেন, ঠাকুর্দা ছিলেন একজন সিদ্ধ যোগী—"

বললাম—"আপনি মোটেই খারাপ লোক নন। যে হাঁস সরস্বতীর বাহন সেও পাঁক থেকেই খাবার সংগ্রহ করে!"

"কিন্তু আমি তো দানবের বাহন। তার জন্যেই—"

বলেই থেমে গেলেন মিনুবাবু। হঠাৎ একটা বিরাট গহ্বরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন যেন।

আমি অন্য কথা পড়লাম। তাঁর পারিবারিক কথা, তাঁর ছাত্রজীবনের কথা। দেখলাম লোকটি সত্যিই ভালোবংশের ছেলে, ইংলিসে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছেন। চাকরিও করেছেন নানা জায়গায়, কিন্তু ভালো মাইনে কোথাও পান নি। দারিদ্র্যের দায়ে কলকাতার বসতবাটি অবাঙালীর কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই টাকা নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। সে ব্যবসাও ডুবে গেছে। স্ত্রী আত্মহত্যা করছেন। এই ধরণের নানা কথা।

হঠাৎ ময়নার দোকান থেকে একটা ছোঁড়া এসে বলল—"ভজুয়ার মা খবর পাঠিয়েছিল আপনাকে খাবার পাঠিয়ে দিতে। উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে, একটু পরেই আনছি সব ভেজে। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি—"

মিনুবাবু বললেন—"আমার জন্যে খাবার আনতে দিয়েছেন? কেন?"

বললাম—"ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—কারো হৃদয়ে যদি প্রবেশ করতে চাও, তাহলে উদরের পথে যেও। ওই মহাজনবাক্য যে মিথ্যা নয় তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি"

খাবার আসার পূর্বেই মিনুবাবুর হৃদয় দ্বার খুলে গেল। তিনি নিজের জীবনের অনেক কথাই বক বক করে' বলে যেতে লাগলেন তিনি কবিতাও লিখতেন নাকি। জীবনে অনেক বড় বড় আদর্শ ছিল। সব কিছু চুরমার হয়ে গেছে। এখন টাকার জন্যে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন। ওই দানবের পয়সায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকেন। দানবই তাঁর সব খরচ বহন করেন। অর্থাৎ যা যান, তাই পান। সব বলে' শেষকালে বলে উঠলেন—"কিন্তু দাদা, সুখ নেই, শান্তি নেই। বুকে দিনরাত চিতা জ্বলছে—কার চিতা তা জানি না, কিন্তু জ্বলছে, দিনরাত জ্বলছে।"

খাবার এসে পড়ল। গরম গরম বেগুনি, পেঁয়াজি, চপ, কাটলেট, ওমলেট, চা আর এক বোতল 'রম্'। তিনখানা রঙীন ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এল ময়না।

"আরো এসব কি কাণ্ড করেছেন দাদা!"

'রম্'এর বোতলটা তুলে দেখলাম।

"এসব জিনিস তো দুর্লভ আজকাল"

বললাম, "পয়সা ফেললে কিছুই দুর্লভ নয় কোলকাতা শহরে। দুর্লভ হচ্ছে 'প্রেম'!"

তিন পেগ খেয়েই টলমল অবস্থা হ'য়ে পড়ল মিনুবাবুর। চতুর্থ পেগে চুমুক দিতে দিতেই হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগলেন।

"আমি পাপিষ্ঠ, আমি নরাধম, সতীদের চোখের জলে যে পথ পিছল হয়ে গেছে সেই পথেই হাঁটছি আমি, পথের শেষে কুম্ভীপাক, না, রৌরব কি যে অপেক্ষা করে' আছে জানি না। ওই শালা, ওই রাক্ষস, ওই দানবটা চুলের মুঠি ধরে' হিড়হিড় করে' টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে—থামতে দিচ্ছে না, থামতে দিচ্ছে না—"

হু হু করে' কাঁদতে লাগলেন। এরপর রাবণের নাম-ঠিকানা জানতে অসুবিধা হ'ল না। নিজেই সব বলে' ফেললেন তিনি।

ক্ষেন্তি উত্তেজিত হয়ে ঘরে ঢুকল ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে।

"দাদা, সোনা কাল থেকে বাড়ি ফেরে নি।"

"বিশু কোথা? সেই প্রফেসারের কাছে গিয়ে খোঁজ নিক না।"

"বিশু গিয়েছিল। প্রফেসারের ঘরে অন্য ভাড়াটে। তারা বললে প্রফেসার নাকি আমেরিকা চলে' গেছে। কি করা যায় বল তো—"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লাম। ক্ষেন্তি কিন্তু আমাকে বিমূঢ় হ'য়ে থাকতে দিল না। সে নেংচে নেংচে ঘুরে বেড়াতে লাগল চারদিকে। কিছু বললে না, কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল ছটফট করে'। মনে হ'ল ওর যেন যন্ত্রণা হচ্ছে একটা।

"বিশু কোথায়?"

"সে আবার বেরিয়েছে"

"কোথায়"

"তা তো জানি না। আমার কেমন যেন ভয় করছে দাদা"

এরপরই ভর্থা ছুটে এল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—"পুলিস এসেছে, জীবনদাকে অ্যারেস্ট (arrest) করেছে। বিশুদাকে খুঁজছে—"

আমি বেরিয়ে এলাম।

যে পুলিস অফিসারটি এসেছিল দেখা করলাম তার সঙ্গে।

"কি ব্যাপার মশাই—"

তিনি বললেন, "এ পাড়ার একটি মেয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ছোরা মেরে খুন করেছে একটা লোককে।"

যার বাড়ির নাম করলেন সে রাবণ।

"বলেন কি!"

"খবর পেলাম এই জীবন নাকি তার দাদা, আর বিশু বলে' একটা লোক তার স্বামী। বিশু তো গা ঢাকা দিয়েছে দেখছি। আপনি কিছু খবর বলতে পারেন? তার নামেও ওয়ারেণ্ট আছে একটা—লোকটা ডেয়ারিতে কাজ করে শুনছি—"

"আমি তো কিছুই জানি না। ছোরা মেরেছে? কোথায় সে মেয়েটা?"

"সে-ও মারা গেছে। তার 'বডি' এখন মর্গে"

"বলেন কি!"

তিনি আমার কথার জবাব দিলেন না। একজন পুলিসকে হুকুম দিলেন—"জীবনকে থানায় নিয়ে যাও। আর দু'জন এখানে থাক। আমি সার্চ করব।"

বললাম—"আমার ঘরটাই আগে সার্চ করুন তা'হলে। আমি বেরুব একটু—"

"আপনি কি করেন এখানে"

"আমি ছেলেদের পড়াই—ছোট স্কুল আছে এখানে একটা—"

"কোথায় থাকেন?"

"জীবনেরই বাইরের ঘরটায়।"

"চলুন দেখে নি আপনার ঘরটা—"

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখলেন।

"এটা কি? ওই উঁচু মতন—?"

"ওটা একটা ছেঁড়া গদি। আমার বিছানা। একটা সিন্দুকের উপর পাতা আছে। সিন্দুকটা খুলে দেখাব?"

"সিন্দুকে কি আছে—"

"আমার বই-টই বালিশ চাদর এইসব আর কি। ওটা আমার ভাঁড়ার ঘর। খুলে দেখাব?"

"দেখান—"

ছেঁড়া গদিটা নামিয়ে সিন্দুকের ডালাটা খুললাম। বেশ কয়েকটা আরশোলা ফরফর করে' বেরিয়ে পড়ল।

"থাক, বন্ধ করে' দিন—। আপনি কোথা যাবেন এখন"

"টিউশান করতে—"

"আচ্ছা যান—"

বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে ক্ষেন্তির তীক্ষ্মকণ্ঠ শুনতে পেলাম।

"আমি জীবন্ত থাকতে আমার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেব না"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম বিষধর শঙ্খচূড়ের মতো ফণা উদ্যত করে' দাঁড়িয়ে আছে ক্ষেন্তি। তার হাতে একটা বঁটি। পাড়ার লোকেরা পিল পিল করে' ছুটছে দেখলাম ক্ষেন্তির ঘরের দিকে। আমি দাঁড়ালাম না। আমাকে মর্গে যেতে হবে। দেখতে হবে সোনার মৃতদেহটা। স্বচক্ষে দেখতে হবে মৃতদেহটা সোনারই কি না। মর্গে যখন পৌঁছলাম দেখলাম কেউ নেই। ডোমরা আছে খালি। আর আছে একটা পুলিস কনেস্টবল। দশ টাকাতেই কাজ হ'য়ে গেল। ঠান্ডা ঘরে দেখলুম উলঙ্গিনী সোনা শুয়ে আছে। মনে হল কতকগুলো শকুনে যেন তাকে ছিঁড়ে খেয়েছে। গালে বুকে উরুতের দুপাশে কালো কালো দাগ। চোখ দুটো খোলা, তাতে নির্নিমেষ বিস্মিত দৃষ্টি। যখন ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায় তিনটে। মনে হল সমস্ত পাড়াটা যেন থমথম করছে। ঝড়ের পূর্বাভাষ? ঝড় উঠবে কি? সত্যি উঠবে? বাসায় এসে দেখি কেউ নেই।

"ক্ষেন্তি—"

ভর্থা বেরিয়ে এল একটা বাড়ির পিছন থেকে।

"ক্ষেন্তিদিকে পুলিসে ধরে' নিয়ে গেছে। ক্ষেন্তিদি দারোগার কাঁধে বঁটির কোপ বসিয়ে দিয়েছিল—"

নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ শীতলকে দেখা গেল। সে তার শিশু-বাহিনীদের নিয়ে মার্চ করে' চলেছে—চলো, চলো, সামনে চল সামনে চল; সামনে চল। 'সামনে'টা মাঝে মাঝে 'সামলে' হয়ে যাচ্ছে। একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঝড় রাস্তার দিকে।

নির্বাক হ'য়েই দাঁড়িয়েছিলাম। কি যেন ভাবছিলাম, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

"বাবা—"

দেখি শোভনা এসে দাঁড়িয়েছে। আঁচল দিয়ে একটা থালা ঢেকে রেখেছে।

"আপনার খাবার এনেছি। খাবেন চলুন। সকাল থেকে তো কিছু খান নি"

বাড়িতে ঢুকলাম। দেখলাম উঠোনে জিনিসপত্র ছড়ানো। ক্ষেন্তিকে যে শাড়িগুলো কিনে দিয়েছিলাম সেগুলো উঠোনে কাদায় পড়ে আছে। আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল। উঠোনে প্যাচপেচে কাদা।

"এই বারান্দাতেই জায়গা করে' দি"—

শোভনা একটা আসন পেতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাবারের থালাটা রাখলে। দেখলাম অনেক রকম তরকারি। চিতি কাঁকড়ার ঝালও করেছে। তাছাড়া মাছ, আলুর দম, বুটের ডাল।

"এত সব তুই করেছিস্"—

"বুটের ডাল আর আলুর দম ভজুয়ার মা দিয়েছে। ওর তো খুব নিষ্ঠা, মাছ মাংস খায় না। বললে, আমার এসব দিতে লজ্জা করে, তুই নিয়ে যা—যদি খান—"

যন্ত্রচালিতবৎ বসলাম এবং খেয়ে ফেললাম সব। খেতে বসে' বুঝলাম খুব ক্ষিদে পেয়েছিল।

"মহাপুরুষ বাড়ি আছেন না কি—"

বুরুশ বিশ্বাসের গলা। খেয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম কি করব। কিছু করতেই হবে একটা—। বুরুশ বিশ্বাস আসাতে অকূলে কূল পেলাম যেন। ক্ষেন্তির জিনিসপত্র তখনও ছড়ানো ছিল চারদিকে।

"এ কি কাণ্ড। জিনিসপত্র ছড়ানো কেন"

"পুলিস এসেছিল—"

"আসবেই আন্দাজ করেছিলাম। জীবনবাবু পালাতে পেরেছেন? তিনিই বোমা তৈরি করেন তো?"

বিস্মিত হলাম।

"আপনি কি করে' জানলেন?"

"এক বাউল আমাকে একদিন দিয়েছিল একটা। বলেছিল আপনি বেল ভালবাসেন, তাই আপনার এক বন্ধু আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলে একটা। তার বেলগাছ আছে। —বাউলের মুখটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলাম তার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর মনে প'ড়ল। বীরেন গোস্বামীকে চিনতে পারলাম। বীরেন না কি? প্রশ্ন করতেই আমার পায়ের ধুলো নিলে সে। তারপর সব বললে। জীবন পাতিতুণ্ড বোমা তৈরি করে আর ও বিলি করে' বেড়ায় সেগুলো। এই তার কাজ এখন। পুলিস এসেছিল? আসবেই জানতাম। দু'জনকে ধরে' নিয়ে গেছে?"

"জীবনকে ধরে' নিয়ে গেছে। সাঁইবাবা এখানে ছিলেন না—"

"সাঁইবাবা আবার কে—"

"আপনি যাকে বীরেন গোস্বামী বলছেন আমরা ওঁকে সাঁইবাবা বলে' চিনি। কিন্তু জীবনকে বোমার জন্যে ধরেনি। আর এক কাণ্ড হয়েছে—"

"কি সেটা"

সব বললাম। শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন বুরুশ বিশ্বাস। বললাম—"রাবণের ঠিকানাটাও পেয়েছি। এখন কি ভাবে কি করা যায় বলুন তো—"

"মাঠে চলুন। বদ্ধ ঘরে বসে এ সব পরামর্শ করা চলে না—"

"চলুন"

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি আমার ঘরের সামনে একটা ভীড় জমে' গেছে। ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাড়ি-উলি রাজলক্ষ্মী। গোদা পায়ে থপ্ থপ্ করে' এগিয়ে এসে বলল, "কি হয়েছে আমরা সব শুনেছি। আমি সকলের হয়ে আপনাকে বলতে এসেছি—আমরা প্রাণ দিয়েও এর জবাব দেব। আপনি আমাদের আগ বাড়িয়ে নিয়ে চলুন। সোনাকে আমরা সবাই ভালবাসতুম। সে আমার মেয়ের মতো ছিল—"। হঠাৎ রাজলক্ষ্মী থেমে গেল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ভীড়ের ভিতর দেখলাম ভর্ণা, ভুতুম, দশরথ, রোখন মিশির, ভজুয়ার মা, নবুর মা, রিক্‌শওলার দল, ময়না, এ পাড়ার মুদি, দর্জি, নাপিত, মুচি, রমজান, কিকুনি, আরও বহুলোক এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের চোখে উৎসুক, উন্মুখ, জ্বলন্ত দৃষ্টি।

বললাম—"তোমাদের এ আদেশ আমি মাথা পেতে নিলুম। তা পালন করবার জন্যে দরকার হলে আমিও প্রাণ দেব।"

জনতা চীৎকার করে' উঠল—বন্দে মাতরম্!

বনফুল/২২/৭

বুরুশ বিশ্বাস হাতজোড় করে' উঠল—বন্দে মাতরম্।

বুরুশ বিশ্বাস হাতজোড় করে' প্রণাম করছেন দেখলাম। তারপর বললেন—"চলুন, মাঠে গিয়ে বসা যাক।"

ভীড় ক্রমশঃ কমে' যেতে লাগল। আমরা বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগলাম।

বললাম, "ট্যাক্সি ডাকব ?"

বুরুশ বিশ্বাস এবার আপত্তি করলেন না।

"ডাকুন। কিন্তু পাবেন কি ?"

"দেখি—"

ফুটপাথ ধরে' হাঁটতে লাগলাম দু'জনে। কিছুদূরে গিয়ে ডানহাতি একটা গলি থেকে সাঁইবাবার গান ভেসে এল। দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"দাঁড়ালেন কেন—"

"সাঁইবাবা গান গাইছেন। শুনি একটু—"

"গান তো অনেক শুনেছেন, রোজ শুনছেন। এখন কাজ করা দরকার—নষ্ট করবার মতো সময় নেই"

"আপনি ট্যাক্সি একটা দাঁড় করান না। আমি গলির মোড়েই দাঁড়িয়ে আছি—"

আমি গলির ভিতর একটু ঢুকে সাঁইবাবার গান শুনতে লাগলাম।

প্রলয় নাচন নাচার আগে
উলঙ্গিনী হবেন কালী
মুণ্ডমালা দুলবে গলায়
শিব থাকবে পায়ের তলায়
চন্দ্রহারের জায়গাটাতে
হাত-পা-গুলো ঝুলবে খালি।
চন্দ্র সূর্য পালিয়ে যাবে
ধূমকেতুরা আসবে ছুটে
ডাকিনীদের অট্টহাসে
যাবে মোহ-তন্দ্রা টুটে
নাগ উঠবে পাতাল ফুঁড়ে
বাজ বাজবে আকাশ জুড়ে
ওরে মহাপাষণ্ডেরা
তোদের গুড়ে পড়বে বালি
উলঙ্গিনী হবেন কালী।

সেদিন মাঠে অনেকক্ষণ ছিলাম। বুরুশ বিশ্বাস আমার সমস্ত পরিচিত লোকদের খুঁটিনাটি পরিচয় নিতে লাগলেন। রানী বিশ্বাসের কথাও বললাম তাঁকে। জগজিতের কথা বললাম। মিনুবাবু, রোখন মিশিরের কথাও বললাম। ভর্তা, ভুতুম, দশরথ, রিক্‌শওয়ালারা—সকলের কথাই শুনলেন তিনি। রাবণের দুর্বলতার কথাটা শুনে অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে' রইলেন বুরুশ বিশ্বাস। তাঁর চোখ দুটো বাঘের চোখের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে বললেন—"আচ্ছা, আপনাকে কাল একটা প্ল্যান দিয়ে আসব। আপনি টুকে নেবেন সেটা।

বর্ণে বর্ণে সেটা যদি পালিত হয় তা'হলে আপনি যা চাইছেন তা হবে। দিবা দ্বিপ্রহরেই করতে চান?"

"দিবা দ্বিপ্রহরেই—"

"চৌরাস্তার মোড়েই টাঙাবেন?"

"হ্যাঁ। সবাই যাতে দেখতে পায়—"

"বেশ। ভেবেচিন্তে প্ল্যান দিয়ে আসব একটা—"

এইখানেই আমার পাণ্ডুলিপি শেষ হল।

দ্বিতীয় আর একটা চিঠির রূপ ধরে' আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে যাব। তুমি যদি আস হয়তো আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু দেখতে পাবে তাদের প্রচ্ছন্ন মহিমা যাদের তোমরা এতদিন ঘৃণা করে' এসেছ।

বন্ধুর চিঠি এবং পাণ্ডুলিপি আমার টেবিলের উপর রাখা ছিল। হঠাৎ একদিন দেখিলাম সেগুলি নাই। খোঁজাখুঁজি করিয়া আবিষ্কার করিলাম কুশলা সেগুলি লইয়া গিয়াছিল। আমাকে আনিয়া দিল এবং বলিল—"আমি বন্ধুদার ঠিকানাটা জেনেছি—"

"কি করে'? ও তো কোন ঠিকানা দেয় নি"

"অমিলা চিঠি লিখেছে একটা—"

"ও"

আর কোন কথা হইল না। অনুভব করিলাম যে অদৃশ্য অগ্নি কুশলাকে ঘিরিয়া অহোরাত্র জ্বলিতেছে তাহা যেন প্রখরতর হইয়াছে। মনে হইল প্রত্যক্ষ অগ্নিশিখারূপে এবার বুঝি তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

৪

দ্বিতীয় চিঠি

ভাই কবি,

এ যুগে কালোবাজারীই রাবণ। তার সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্যের প্রতাপে আজ রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি, ব্যষ্টি, রাজনীতি, সাহিত্য বস্তুত মানব সভ্যতার সব কিছু ভীত, অভিভূত। সে টাকা দিয়ে সব কিছু কিনতে পারে, সব কিছু কিনতে চায়। তার কামনা অসতী রমণীকে ভোগ করেই তৃপ্ত নয়, সতী রমণীকে সে ধর্ষণ করতে চায়। আমি আগামী কাল এই রকম একটি রাবণকে প্রকাশ্য রাজপথে দিবা-দ্বিপ্রহরে ল্যাম্পপোস্টে লটকে

দেব। অভিনেত্রী রানী বিশ্বাস সতী রমণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হয়েছে। সে নিজের বাড়িতেই থাকবে। মিনুবাবু রাবণকে খবরটি দেবে। রাবণ তার বাড়িতে লুকিয়ে যাবে গভীর রাত্রে। প্রবেশ করবামাত্র জগজিতের দল ধরে ফেলবে তাকে। ধরে' মুখ বেঁধে নিয়ে আসবে আমাদের পাড়ায়। রাজলক্ষ্মীর কাছে মা কালীর একটা পট আছে। তার সামনে বলিদান দেওয়া হবে পশুটাকে। রমজান একটা গলা-শুদ্ধ খাসির মুণ্ড আনবে। জনার্দন মুচি সেই মুণ্ডটাকে সেলাই করে' বসিয়ে দেবে ওই কবন্ধের উপর। ওর মুণ্ডটা ওর কোমরে বেঁধে দেওয়া হবে। সেটা ঝুলবে ওর পায়ের তলায়। ভর্গা আর ভুতুম একটা লম্বা বাঁশের সিঁড়ি নিয়ে হাজির থাকবে ওই চৌমাথায়। জগজিৎ আর তার বন্ধুরা বড় বড় লরি নিয়ে চারটে রাস্তাই বন্ধ করে' দাঁড়িয়ে থাকবে। ট্রাফিক পুলিসটাকে ঘুস খাইয়ে বশ করবার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তা'হলে তাকে গুম করে' দেবার ব্যবস্থা করেছে ভজুয়ার মায়ের প্রণয়ী শিউলাল। সে একজন বিখ্যাত গুণ্ডা। তার দলবলও অনেক। প্রত্যেক লরিতে বোমা নিয়ে থাকবে এক একজন। পুলিস যদি আসে তাদের সঙ্গে লড়বে। শোভনা, রাজলক্ষ্মীও থাকবে বোমা নিয়ে। আমাদের পাড়ার প্রত্যেকে থাকবে। শীতল, সাঁইবাবা—সব। ছাগমুণ্ড কবন্ধটাকে বস্তায় পুরে নিয়ে আমিও সামনের একটা লরিতে থাকব তিরপলের তলায়। বুরুশ বিশ্বাস উপস্থিত থাকবেন একটা হুইস্‌ল নিয়ে। তিনি যখন হুইস্‌ল দেবেন তখন আমি বস্তাটা নিয়ে বেরিয়ে আসব কিছু শক্ত লাকলাইনের দড়ি বগলদাবা করে'। ভর্গা আর ভুতুম সিঁড়িটা ল্যাম্পপোস্টে লাগিয়ে শক্ত করে' ধরে' থাকবে। আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে রাবণকে ল্যাম্পপোস্টে টাঙিয়ে দেব। জানি পুলিস আসবে, গুলি চলবে, আমরা মরব, কিন্তু তবু যা ঠিক করেছি তা করব। ঘটনাটা কোথায় ঘটবে তার একটা ম্যাপ পাঠালাম এই সঙ্গে। তুমি যাবে কি? এই দেখ আমি এসেছি তোমার কাছে। ইতি—বুজু।

এই চিঠিখানা আমার টেবিলের উপর পাইলাম। খাম খুলিয়া কে যেন পড়িয়াছে। কখন আসিয়াছিল, কে দিয়া গিয়াছিল? কুশলাকে ডাকিলাম। চাকরটা বলিল সে অনেকক্ষণ আগে বাহির হইয়া গিয়াছে।

আমি যখন ঘটনাস্থলে পেঁছিলাম তখন যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে। পুলিসের গুলি চলিয়াছে। রাস্তায় অনেক মৃতদেহ। হঠাৎ কুশলার মৃতদেহটা দেখিতে পাইলাম। সে একটা জীর্ণ-শীর্ণ গোঁফ-দাড়িওলা মরা লোকের পাশে পড়িয়া আছে। এই কি বুজু? এই কি মহাপুরুষ? রক্তে তাহার সর্বাঙ্গ সিক্ত।

অজ-মুণ্ড রাবণটা তখনও ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিতেছিল।

পরদিন কাগজে দেখিলাম দোষী নাকি ধরা পড়িয়াছে। অমিলা চৌধুরী নাকি পুলিস কমিশনারের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছেন—এ ষড়যন্ত্র আমিই করিয়াছি, ইহার জন্য যে শাস্তি আমাকে দিতে চান দিন।

এরাও
আছে

সুপ্রসিদ্ধ শল্য চিকিৎসক

শ্রীকুমারকান্তি ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সাধু বলেছিলেন—"খবরের কাগজের শিরোনামায় রোজ যাঁদের নাম দেখ তাঁদের বাদ দিয়েও আমাদের দেশ অনেক বড়, অনেক বিচিত্র। খবরের কাগজ যাদের ঢাক পেটায় তারা সংখ্যায় দশ বিশটা, তারা না থাকলেও কিছু ক্ষতি হ'ত না দেশের। থাকাতেই বরং ক্ষতি হয়েছে অনেক। দেশের জনসাধারণ সামান্য লোক, কিন্তু একটু খোঁজ করলেই বুঝবে তারা সামান্য হলেও অসামান্য, নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করেও তাদের মধ্যে অনেকেই মহৎ থাকবার চেষ্টা করে। তারাই দেশের মেরুদণ্ড, তারাই দেশের ভরসা। তাদেরই খোঁজ করে তাদের কথা লেখ। বক্তৃতাবাজদের ভুয়ো বক্তৃতায় আমরা বারবার বিভ্রান্ত হয়েছি, ওদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আমাদের দেশের বহু ছেলে-মেয়ে প্রাণ দিয়েছে। ইংরেজ চ'লে যাওয়ার পর নানা বেশে নানা দুঃশাসন গদিতে বসে দেশকে ধর্ষণ করছে। ওদের কথায় কান দেওয়ার দরকার নেই। দেশের সেই সব লোকদের খোঁজ কর যারা এখনও অমানুষ হয়নি। এমন লোক অনেক আছে এখনও। তারা আছে বলেই সমাজ টিকে আছে। বিশ্বাস কর না তুমি এ কথা?"

বললাম—"করি। তাদের দেখেছিও, কিন্তু তাদের জাগাব কি ক'রে। তারাও তো নিজেদের স্বার্থে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—"

সাধু বললেন—"তাদের জাগাবার দায়িত্ব তোমার নয়। ভগবানের ইচ্ছা না হলে কেউ জাগে না। ভগবানের কাজ ভগবান যথাসময়ে করবেন। তোমার কাজ তুমি কর"

"আমার কাজ কি—"

"তুমি শুধু বল—এরাও আছে। এরাই সংখ্যায় বেশী। সমাজের এরাই সুদৃঢ় ভিত্তি, এরাই আদর্শবাদী, এরাই নমস্য—"

"তারপর—?"

"উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন তমসার পরপারে যে আদিত্যবর্ণ পুরুষ আছে তাকে আমি দেখেছি, জেনেছি। তুমিও তাই বল—"

বলেই সাধু উঠে চ'লে গেলেন।

ইতি ভূমিকা।

১

শশধর কুণ্ঠিত মুখে এসে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে। তার মুখ দেখে মনে হল যেন যা ঘটেছে তার জন্যে সেইই দায়ী। বিষ্ণুবাবুর মেজাজ সপ্তমে চ'ড়ে ছিল। সকাল থেকে চা খেতে পাননি। শশধরের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন—"দুধ পেলে না ?"

"আজ্ঞে না, গাইটা পিয়ে গেছে। বাছুরটাকে ভাল ক'রে বাঁধেনি"

"তোমার বউটা অকর্মার ধাড়ি দেখছি—"

বউয়ের সম্বন্ধে কেউ কটূক্তি করলে শশধরের মনে ব্যথা লাগে। বীণা বড়লোকের মেয়ে। অদৃষ্টের ফেরে তার হাতে পড়েছে। কিন্তু কোনদিন মুখ ভার ক'রে থাকে না। যথাসাধ্য করে সে। নিজের হাতে গোয়াল পর্যন্ত পরিষ্কার করে। রান্নাবান্না কাপড় কাচা বাসন মাজা এসব তো করেই। অন্য কেউ হলে সে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করত। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর মুখের উপর সে কড়া কথা বলতে পারল না। কেবল বলল—"দোষ আমারই। বাছুরের গলার দড়িটা আপনি খুলে খুলে যায়, আমাকে বলেছিল নতুন একটা কিনে আনতে কিন্তু আমি রোজই ভুলে যাই"

"কি ফেরি করিস অ জকাল—"

"আলুকাবলি"

"এখন চা খাই কি করে তাই বল। হনুমানটা যে আমাকে এমন বিপদে ফেলে যাবে তা আগে ভাবিনি। তাহলে ওকে ঘরের চাবি দিতুম না। একটি গোটা পাঁউরুটি আর এক টিন কনডেন্সড্ মিল্ক (condensed milk) সাবাড় ক'রে দিয়ে গেছে—"

"হনুমান কে ?"

"আমার মূর্তিমন্ত ভাগ্নেটি। ওই যে চোংপ্যাণ্টপরা ছেলেটা আসে মাঝে মাঝে আমার কাছে। দেখিস নি ? কাল ওয়ার্কশপে কাজ করছি এসে বলল—'মামা বাড়ি ফিরবে কখন ?' বললাম—'ডাক্তারবাবুর গাড়িটা স্টার্ট না ক'রে তো যেতে পারছি না। কি হয়েছে বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার ফিরতে দেরি হবে। কি চাস তুই ? বললে, 'আমি খানিকক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই। তোমার চাবিটা দাও তাহলে।' ও ছোকরা প্রায়ই একটা না একটা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে। আমাকেই শেষে উদ্ধার করতে হয়। দিয়ে দিলাম চাবিটা। বাড়ি ফিরলাম তিনটের সময়। জানিস তো ওয়ার্কশপের পাশেই হিরণ ঠাকুরের হোটেলেই খাই আমি। খাওয়াদাওয়া সেরেই এসেছিলাম। এসে দেখি ঘরে তালা বন্ধ। হাঁকাহাঁকি করতেই পাশের বাড়ির মকু মাসি এসে চাবিটা দিলে আমাকে। বললে—আপনার ভাগ্নে যাবার সময় আপনার ঘরের চাবিটা আমার হাতে দিয়ে বলল—আমি চন্দননগর যাচ্ছি, মামাকে চাবিটা দিয়ে দিও। এসেই শুয়ে পড়লাম। হিরণ ঠাকুর খাবার নিয়ে এসে আমাকে ওঠালে রাত্রি নটার সময়। খেয়েদেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়ালাম। তারপর কনডেন্সড্ মিল্কের টিনটা আনতে গিয়ে

দেখি টিনের তলায় একটা চিঠি রয়েছে। চিঠিতে লেখা—মামা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। তোমার ঘরে অন্য কোনও খাবার না থাকাতে এবং আমার কাছে চন্দননগরের ভাড়ার বেশী পয়সা ছিল না ব'লে কনডেন্সড্ মিল্ক দিয়ে পাউরুটিটি খেয়ে ফেললাম। অহিন শালা আমার পেছনে লেগেছে। বলছে আমার নাক কেটে দেবে। দেখা যাক কে কার নাক কাটতে পারে। আমি এখন চন্দননগর চললুম। পরে দেখা করব।' কাণ্ড দেখ! আজ রবিবার। সব দোকান বন্ধ। কনডেন্সড্ মিল্ক পাওয়া যাবে না। আশা ছিল তোমার গাই আছে তুমি একটু দুধ এনে দিতে পারবে। কিন্তু তোমার গাই তো পিইয়ে দিয়েছো। এখন উপায়। চা না খেয়েই বেরুতে হবে নাকি"

শশধর মাথা চুলকে বললে—"চায়ের দোকান থেকে চা এনে দি"

"দোকানের চা আমি খেতে পারি না। বমি হয়ে যাবে"

"তাহলে অন্য কোথাও দেখি একটু। হরি ময়রা সন্দেশের জন্য দুধ কেনে। যদি ছানা না কাটিয়ে ফেলে থাকে তো—"

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আধঘোমটা-দেওয়া একটি মেয়ে একটি ছোট্ট ঘটি এনে ঠুক্ ক'রে নাবিয়ে দিল দ্বারের সামনে।

"কোথা থেকে দুধ পেলি—"

মেয়েটি ফিসফিস ক'রে বললে—"ননুতি পিসির ছাগল আছে। সেখানেই গিয়ে পেলুম।"

বিষ্ণুবাবু জিগ্যেস করলেন—"কে ও মেয়েটি—"

অপ্রস্তুত মুখে শশধর উত্তর দিলে—"ও আমার বউ বীণা"

মেয়েটি ছুটে পালিয়ে গেল।

"বাঃ, খুব করিতকর্মা দেখছি। তোর চেয়ে ভালো। আমি চিনতে পারিনি"

শশধরের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে গেল।

"স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়া। তুইও চা খেয়ে যা। চার কাপ কর। তোর বউয়ের জন্যেও এক কাপ নিয়ে যাস টিপটে করে"। শশধর খুশী হয়ে স্টোভ জ্বালতে ব'সে গেল। তার উচিত ছিল এখন বাড়ি গিয়ে আলুকাবলি রাঁধতে বউকে সাহায্য করা, অন্ততঃ আলুগুলো ছাড়িয়ে দেওয়া—রোজই দেয়—কিন্তু বিষ্ণুবাবুকে চা না খাইয়ে এখন যাওয়া অনুচিত হঠাৎ এই কথাটা তার মনে হল।

শশধরের সঙ্গে বিষ্ণুবাবুর কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। আর্থিক বাধ্যবাধকতাও নেই কোনও। বিষ্ণুবাবু কিছুদিন আগে তাকে বলেছিলেন আমি তোকে শ'পাঁচেক টাকা যোগাড় ক'রে দিচ্ছি—তুই তোদের বারান্দায় একটা ফুলুরি, বেগুনী, আলুকাবলি, পেঁয়াজির দোকান কর। ভালো চলবে। শশধর রাজী হয় নি। ফেরিওলার কাজই তার পছন্দ। টো টো ক'রে ঘুরতে ভালবাসে। ঘুরতে ঘুরতেই একদিন সে দেখা পেয়েছিল বীণার একটা বাড়িতে। সেখানে তখন ভাড়াটে ছিল ওরা। শশধর তখন ঘুগনি ফেরি করত। বেণী দোলানো বীণার সঙ্গে সেই সময়ই তার আলাপ হয়। বীণা রোজ ঘুগনি কিনত তার কাছ থেকে। তারপর অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। বিয়ে করেছে সে বীণাকে। বিয়ের ব্যাপারে বিষ্ণুবাবু অনেক সাহায্য করেছিলেন। তিনি যে পুলিস অফিসারের গাড়ি সারান তাঁকে দিয়ে চাপ দিয়েছিলেন বীণার বাপের উপর। বিষ্ণুবাবুর কাছে শশধর কৃতজ্ঞ এ জন্য। শুধু এ জন্যই নয়,

আরও অনেক কারণে। বিষ্ণুবাবু খাম-খেয়ালী রগচটা লোক, কিন্তু উঁচু মন। বিয়ে করেন নি, রোজগারও কম করেন না, নামজাদা মোটর মেকানিক কিন্তু হাতে একটি পয়সা থাকে না। বিদ্যাসাগরের মতো স্বভাব কেউ এসে কেঁদে ধরলেই হল। যা থাকে দিয়ে দেন।

স্টোভ জ্বালতে জ্বালতে হঠাৎ শশধর জিগ্যেস করল—"আপনার ভাগনার নাম হনুমান ?" বলেই খিক খিক করে হেসে ফেলল সে।

"হনুমান নাম আমিই দিয়েছি। আসল নামটা আরও অদ্ভুত"

বিষ্ণুবাবু বিড়ি ধরালেন একটি। সিগারেটের চেয়ে বিড়িই বেশী পছন্দ করেন তিনি। বলেন ছেলেবেলায় যখন ভাগলপুরে ভমজবাবুর কারখানায় কাজ শিখেছিলাম তখন বিড়িই খেতাম। তখন পয়সার অভাবে খেতাম, এখন বিড়ি ছাড়া আর কিছু ভালই লাগে না। শশধর চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে চুপ ক'রে রইল। ভাগনের সম্বন্ধে আর কৌতূহল প্রকাশ করলে না। রগচটা মানুষ কখন কোন কথায় দপ ক'রে জ্বলে উঠবেন বলা যায় না।

বিষ্ণুবাবু বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"আমার ভাগনের আসল নাম শুনবি ? অনুমান কর"

"কি অনুমান করব"

"তার নামই অনুমান কর। কর ওদের উপাধি। নাম অনুমান। আমি সেটাকে হনুমান ক'রে দিয়েছি—"

"কর তো বাঙালীদের উপাধি। আপনি তো অবাঙালী—কর আপনার ভাগনে হ'ল কি ক'রে ? আপনার নাম তো বিষ্ণু দুবে। তাই না ?"

"ওর মা আমার আপন বোন নয়। ওর বাবা ভূপেন মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল যখন তখন তার মেয়ে মালতীর বয়স আট বছর। মা আগেই মারা গিয়েছিল। অনাথা হয়ে পড়ল মালতী। শেষে আমার ঘাড়েই পড়ে গেল। মানুষ ক'রে বিয়ে দিলুম। পাটনায় বিপিন কর আমাদের সঙ্গেই কাজ করত। তারই হাতে পায়ে ধ'রে মালতীর সঙ্গে বিয়ে দিলুম। তারই ছেলে ওই ছোকরা। বাপ মা নাম রেখেছিল গণপতি। কিন্তু ছোকরা বড় হ'য়ে সেকেলে নাম বদলে ফেলে অনুমান নাম রাখলে নিজের। মানে আধুনিক হ'ল। আসলে মস্তান হয়েছে একটি। মালতী বিপিন দু'জনেই মারা গেছে। হনুমানটাকে লেখা-পড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। পাটনা স্কুলে ভরতি ক'রে দিয়েছিলাম। একদিন স্কুলের মাস্টারের সঙ্গে মারা-মারি ক'রে বসল। রাসটিকেট করে দিলে। দূর ক'রে দিলে বোর্ডিং থেকে। আমি তখন পাটনা থেকে চলে এসেছি এখানে। ওকে খরচ দিয়ে বোর্ডিংয়েই রেখেছিলাম। এখানে এসে হাজির হল। মোটরের কাজ শেখাবার চেষ্টা করলাম। শিখল না। এইখানে সব বখা ছেলেদের সঙ্গে মিশে মস্তান হয়েছে। মাঝে মাঝে আমার উপর এসে হামলা করে। প্রায়ই পুলিস কেসে পড়ে। আমার জানাশোনা ওই পুলিস অফিসারটি আছে ব'লে বেঁচে যাচ্ছে তা না হলে এতদিন জেল হয়ে যেত—"

শশধর বললে—"ছেলেটি কিন্তু ভারি মিশুকে। কথা-বার্তা চমৎকার—"

"তুমি কিন্তু মিশো না ওর সঙ্গে। ও দেশোদ্ধার করতে চায়। তুমি ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না"

"না, আমি পাল্লা দিতে যাব কেন"

"তুমি ওর সঙ্গে কথাই বোলো না। রাজনীতি চোরা-বালির মতো জিনিস, কখন যে তলিয়ে যাবে বুঝতেই পারবে না।"

শশধর চুপ ক'রে রইল। বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে তর্ক করতে সাহস হল না তার। ও'র ভাগনের সঙ্গে তেমন আলাপও হয় নি। দূর থেকে দেখেছে দু'একবার। দেখে ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে বেশ 'স্মার্ট' ছেলেটি। কিন্তু ওর সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না বিষ্ণুবাবু। চা-পর্ব নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল। বিষ্ণুবাবু উবু হ'য়ে ব'সে তাঁর বড় গেলাসটিতে দু'কাপ চা খেলেন। সবচেয়ে ভালো চা কেনেন তিনি—খান কিন্তু গেলাসে। কাপ কেনবার শখ নেই। শশধর বীণার জন্যে চা নিয়ে চলে যাচ্ছিল বিষ্ণু-বাবু তাকে থামিয়ে বললেন—"একটু দাঁড়াও—"

শশধর দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আমার ওই জামাটার ইনার পকেটে হাত ঢোকাও। প'চিশটা টাকা আছে। ওর থেকে দশটা টাকা বের ক'রে নাও। বঙ্কিমের ওষুধের দোকান চেন তো? সেইখানেই গিয়ে বলো যে আমাকে তিনি যে ওষুধের কথা বলেছিলেন তা যেন দেন এক শিশি। ওই ওষুধ তোমার বীণাকে দাও গিয়ে। কপালে যে কাটা দাগটা আছে ওই ওষুধ রোজ লাগালে দাগ না কি থাকবে না। ওটা লাগাতে বল—"

"ওষুধের দাম দশ টাকা!"

"ঠিক জানি না। বাকি যা থাকবে তা বীণাকেই দিয়ে দিও, বোলো আমি দিয়েছি। দুধের দাম—"

বিষ্ণুবাবু মুচকি হাসলেন।

"আরও পাঁচটা টাকা নিয়ে যাও। একটিন দুধ, দু বাণ্ডিল বিড়ি আর কিছু হরতুকি কিনে এন—"

"তা আনব। ওষুধটা কিন্তু কিনবেন না"

"কেন-

"বীণা লাগাবে না। একটি কথাও শোনে না"

"শুনবে। আলবৎ শুনবে। আমার নাম ক'রে বোলো। অমন সুন্দর মুখে অমন বিশ্রী একটা দাগ কি ভালো দেখায়? ওটা শুনেছি ভালো ওষুধ। লাগাতে বোলো—"

"আমি আপনাকেই ওষুধটা এনে দেব। আপনি বলবেন ওকে লাগাতে। আমি বললে শুনবে না"

বিষ্ণুবাবু চোখ পাকিয়ে শশধরের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—"তোমার বউ তোমার কথা শোনে না একথা বলতে লজ্জা করে না তোমার"

চুপ ক'রে রইল শশধর।

বিষ্ণুবাবু বললেন—"অতিরিক্ত 'নাই' দিয়ে বউকে মাথায় তুলেছ। তাই কথা শোনে না। ঘোড়া সোয়ার বোঝে, বুঝলে?"

শশধর একটু মুচকি হেসে দাঁড়িয়ে রইল।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন। টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়। তুমি ফেরিতে বেরুবে ক'টার সময়—"

"দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম ক'রে বেরুব। আলুকাবলি বিকেলের দিকেই বেশি বিক্রি হয়—"

"আলুকাবলি রান্না করে কে? বীণাই না কি—"

"দু'জনে মিলে করি। কিন্তু আজ তো এখানে আটকে গেছি। আপনি আবার বাজারে যেতে বলছেন—"

"কিছু করতে হবে না তোমাকে। তুমি বাড়ি গিয়ে আগে নিজের কাজ কর। আমি শিবেকে দিয়ে আনিয়ে নেব, সে এক্ষুণি আসবে—

শশধর তবু দাঁড়িয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল।

"কি দাঁড়িয়ে রইলে যে!"

শশধর অপ্রস্তুত মুখে তবু দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল—"আমি ঝপ্ ক'রে গিয়ে কিনে আনছি। বেশী দেরি হবে না। যাই?"

"যাও। ছাড়বে না যখন, যাও। বীণার কাছে দেরির জন্যে আমাকে দায়ী কোরো না কিন্তু।"

"না তা করব কেন। আমি যাব আর আসব। আপনি তিনটের সময় কোথায় থাকবেন? ওয়ার্কশপে তো—"

"কেন—"

"তিনটের সময় আপনাকে আলুকাবলি খাইয়ে আসব"

শশধর মুচকি হেসে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শশধর চ'লে যাওয়ার পর বিষ্ণুবাবু সেই কাজটি করলেন যেটি তিনি আর কারও সামনে কখনও করেন না। কাজটি যে মন্দ তা তিনি জানেন—তাই ছেলেছোকরাদের সামনে ও কাজটি করেন না। ট্রাঙ্ক থেকে একটি হুইস্কির বোতল বের ক'রে গ্লাসে বেশ খানিকটা ঢেলে নির্জলাই পান ক'রে ফেললেন। বাইরে আওয়াজ পেয়েই বোতলটি তাড়াতাড়ি আবার লুকিয়ে ফেললেন ট্রাঙ্কে।

ডাক্তারবাবুর চাকর ধনুশা এসে হাজির হল।

"চলুন আপনি, গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না"

"আবার স্টার্ট নিচ্ছে না? কি হল আবার"

ধনুশা স্বল্পভাষী। সে কোনও উত্তর না দিয়ে চেয়ে রইল শুধু।

"কি হ'ল আবার! কথা বলছ না কেন"

"কি হল তাই জানবার জন্যেই তো বাবু আপনাকে ডাকছেন। আমি বাসন মাজি মোটরের কি হল কেমন ক'রে বুঝব। বাজে কথা জিগ্যেস করছেন কেন"

"আচ্ছা তুমি যাও আমি যাচ্ছি—"

"আপনার জন্যে ট্যাক্সি এনেছি আমি। ডাক্তারবাবুর গাড়ি ময়ূরগঞ্জে গিয়ে থেমে গেছে। তিনি বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলেন খাবার নিয়ে যেতে। সেই লোক আমাকে বললে ট্যাক্সি ক'রে আপনাকে নিয়ে যেতে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে চলুন—"

"আমাকে তো আগে ওয়ার্কশপে যেতে হবে। কিছু যন্ত্রপাতি নিতে হবে তো। ময়ূরগঞ্জে তো হবিব মিস্ত্রীর কারখানা আছে—"

"সে এসেছিল। বাবু তাকে গাড়ি ছুঁতে দেন নি। বলেছেন বিষ্ণু মিস্ত্রী ছাড়া

আর কাউকে গাড়ি ছ্‌ঁতে দেবেন না তিনি। হবিব মিস্ত্রীর ট্যাক্সিটাই ভাড়া করেছেন সমস্ত দিনের জন্য—সেই ট্যাক্সি নিয়ে আপনি যেখানে খ্‌শি যান। আমি চললাম, আমার এক কাঁড়ি বাসন মাজতে হবে এখন। কাল রাত্রে ভোজ হয়েছিল—আমি চলি —ট্যাক্সিটা রইল—"

"চল। আমি তোমাকে নাবিয়ে দিয়ে যাই। ওয়াক'শপ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে তারপর ময়্‌রগঞ্জে যাব—"

বিষ্‌ণবাব্‌ একটা কৌটো বার ক'রে কিছ্‌ লবঙ্গ এলাচ দারচিনি বার ক'রে ম্‌খে ফেলে দিলেন। ডাক্তারবাব্‌ ম্‌খে যদি মদের গন্ধ পান তাহলে কুর্‌ক্ষেত্র কান্ড করবেন।

ওয়াক'শপে গিয়ে বিষ্‌ণবাব্‌ দেখলেন একজন শাঁসালো ব্যক্তি তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্বয়ং মোহনদাস ঝুনঝুনিয়া।

"বিষ্‌ণবাব্‌, আমার গাড়ির ব্রেকটা ঠিক ক'রে দিতে হবে—"

"হালিম তুমি ব্রেকটা খোল। আমি ময়্‌রগঞ্জে যাচ্ছি—"

"ময়্‌রগঞ্জ, কেন?"

"ডাক্তারবাব্‌র গাড়ি সেখানে আটকে গেছে। সেখান থেকে ট্যাক্সি পাঠিয়েছেন"

"আমার কাজটা তাহলে—"

"হালিম খ্‌ল্‌ক না ততক্ষণ। আমি এসে পড়ব, নিজেই দেখে দেব—"

"কিন্তু আমার একট্‌ জর্‌রী দরকার ছিল। আপনি আমার কাজটা ক'রে দিয়ে যদি যেতেন—"

"আমাকে এখনই যেতে হবে সেখানে। আমি এসে আপনার ব্রেক ঠিক ক'রে দেব, হালিম খ্‌ল্‌ক না—"

মোহনদাস একট্‌ অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু সে ভাবটা চেপে রেখে বললেন—"আপনাকে বেশী মজ্‌রী দেব, যা চাইবেন তাই দেব, আমার কাজটা ক'রে দিয়ে তবে যান, প্লীজ—"

"মাফ করবেন। এখন পারব না।"

নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সি চ'ড়ে ময়্‌রগঞ্জের দিকে রওনা হলেন বিষ্‌ণবাব্‌। ড্রাইভার রবি বিষ্‌ণবাব্‌র চেনা লোক। বিষ্‌ণবাব্‌র চেনা মহল স্‌বিস্তৃত। রবির দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি ময়্‌রগঞ্জে আছ না কি আজকাল"

"হ্যাঁ, হবিব এ ট্যাক্সিটা কিনেছে, এইটেই চালাচ্ছি আমি—"

"লাইসেন্স পেয়েছ—"

রবি চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল—"না। হবিবের লাইসেন্স আছে আমি এখনও করতে পারিনি। তবে গাড়ি চালাতে শিখে গেছি। আপনি যদি এস-পি-কে অন্‌রোধ করেন আমার লাইসেন্সটা টপ ক'রে হ'য়ে যাবে"

"তুমি যদি আমার ওয়াক'শপে কাজ শিখতে তাহলে তোমার সব হ'ত। কিন্তু তুমি ওই বাগদীর মেয়েটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি ক'রে এমন একটা কান্ড বাধিয়ে তুললে— যে শেষকালে তোমাকে পালাতে হ'ল। আমিও আর তোমাকে রাখতে পারলাম না। যাক, হবিবের কাছে আশ্রয় পেয়েছ ভালই হয়েছে। দেখো ওখানে আবার পা হড়কে

যায় না যেন। মেয়েমানুষ তো সব জায়গায় গিজগিজ করছে। নিজেকে সামলে চলতে হবে—"

"বিষ্ণুদা আপনি বিশ্বাস করুন। আতুরি'কে ফাঁসিয়েছিল শ্রীনাথ উকিল। আমি শুধু দূত হয়ে গিয়েছিলাম। মাঝ থেকে আমাকে সবাই ধ'রে পিটিয়ে দিলে—"

"দেখ রবি আগেই তোমাকে আমি স্নেহ করতাম। এখন তোমার কথা শুনে স্নেহ উথলে পড়ছে—"

"তার মানে ?"

"মানে মনে হচ্ছে যার এমন অনর্গল মিথ্যে কথা বলবার ক্ষমতা তাকে প্রচুর স্নেহ করা উচিত। মনে হচ্ছে তুমি একজন উঠ্‌তি নেতা—"

"সত্যি বলছি বিষ্ণুদা, আপনি বিশ্বাস করুন। আমি—"

হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন বিষ্ণুবাবু—।

"চুপ কর শালা হারামজাদা। আতর আমাকে নিজে সব কথা খুলে বলেছে। তুমি যদি ব্যাটাছেলে হ'তে তাহলে ওই গরীবের মেয়েটাকে বিয়ে করতে, কুকুরের মতো পালাতে না। শশধর যেমন করেছে, সে মরদ্দাকা বাচ্ছা। তাকে আমি সাহায্য করেছিলাম, তোমাকেও করতাম তুমি কিন্তু শালা সটকে পড়লে—"

রবি চুপ ক'রে গেল। সামনের দিকে তাকিয়ে রইল বিস্ফারিত চক্ষে। বিষ্ণুর সঙ্গে আর বাক্যালাপ করতে সাহস হল না তার। লোকটার হাত চলে, হয়তো মেরেই বসবে।

একটু পরে বিষ্ণুবাবুই কথা কইলেন। এবার তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ স্নেহার্দ্র। রবির কাঁধে হাত রেখে বললেন "তোমার ভালোর জন্যেই বকলুম তোমাকে। তোমার বুড়ো বাবা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন, তুমি যদি বিগড়ে যাও তাহলে তিনি যাবেন কোথা। ট্যাক্সি চালাবার জন্যে হবিব তোমাকে দিচ্ছে কত করে—কতদিন ট্যাক্সি চালাচ্ছ—"

"এখনও একমাস হয় নি। বলেছে শেয়ার দেবে—"

"শেয়ারটেয়ারে ঢুকো না এখন। একটা বাঁধা মাইনে করে নাও। তোমার বাবাকে কিছু দিতে হবে। হিরণ ঠাকুর বলছিল তিন মাস তিনি হোটেল চার্জ দেননি।"

রবি কোন উত্তর না দিয়ে সামনের দিকেই চেয়ে রইল।

বিষ্ণুবাবু বললেন, "তোমাকেই দিতে হবে সেটা। তাই বলছি একটা মাইনে ক'রে নাও। তাঁকে মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিলেই খুশী হবেন তিনি। এর কমে তাঁর চলবেও না। হিরণ ঠাকুরকেই মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিতে হয়। আর পাঁচ টাকা হাতখরচ—"

এ খবরে রবির মুখে ভাষা ফুটল।

"হিরণ ঠাকুরের ওখানে শুনেছি দেড় টাকা ক'রে পার মিল (Per Meal)—তাহলে তো মাসে নব্বই টাকা হওয়া উচিত"

কিন্তু তোমার বাবা সেখানে একবেলা খান। রাত্রে। দিনের বেলা তিনি ঘোঁতাই মল্লিকের বাড়ি পুজো করেন, সেখানেই মায়ের প্রসাদ পেয়ে আসেন। তুমি কি তোমার বাবার খোঁজখবরও রাখ না নাকি আজকাল—"

রবি কোনও উত্তর দিল না, সামনের দিকে চেয়ে রইল।

"উত্তর দিচ্ছ না কেন হে"

একটা বাজারের ভিতর দিয়ে তারা যাচ্ছিল, রবি একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড় করাল।

"গাড়ি দাঁড় করালে যে—"

"পেঁয়াজ, গরমমসলা, জাফরান আর আলু কিনতে হবে। সেরখানেক ঘি আর সেরখানেক তেলও চাই। তেল ঘি কি করে নিয়ে যাব ভাবছি। বাসন আনতে ভুলে গেছি—"

"ওসব কি হবে—"

"হবিবের মেয়ে জামাই এসেছে। তাদের 'অনারে' ডাক্তারবাবু 'ফিস্ট' দিচ্ছেন। খাসী কাটা হয়েছে একটা। আমাকে এই মসলাগুলো নিয়ে যেতে বলেছেন—কিন্তু ঘি আর তেল নেব কি ক'রে ভাবছি। না নিয়ে গেলে—"

রবি মাথা চুলকোতে লাগল।

বিষ্ণুবাবু অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

"তেল ঘি কিনতে এসেছ, বাসন আন নি। ষাঁড়ের গোবর কোথাকার!"

নেবে পড়লেন বিষ্ণুবাবু।

সামনের একটা টিনের দোকানে অনেক খালি টিন ছিল নানা মাপের। সেই দিকে এগিয়ে গেলেন বিষ্ণুবাবু।

টিন সব পরিষ্কার আছে তো"

হ্যাঁ। সব টিন ধুয়ে রাখা আছে"

দুটো টিন বেছে কিনে ফেললেন তিনি। তারপর রবির দিকে ফিরে বললেন—"নাও। এইবার চটপট কিনে ফেল জিনিসগুলো—"

রবি বাজার করতে লাগল।

ময়ূরগঞ্জে গিয়ে বিষ্ণুবাবু দেখলেন ডাক্তারবাবু একটা গাছতলায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। আশেপাশে আরও দু'চারটি চেয়ার পড়েছে। পাড়ার লোকজনের সঙ্গে বেশ গল্প জমিয়েছেন ডাক্তারবাবু। স্থানীয় স্কুলের একজন শিক্ষকের দিকে চেয়ে তিনি বলছিলেন—"প্রগতি প্রগতি করছেন কিন্তু কথাটা খোলসা ক'রে তো বলছেন না। খাচ্ছেন দাচ্ছেন বিয়ে করছেন ছেলেমেয়ে হচ্ছে চাকরি করছেন ব্যবসা করছেন অর্থাৎ আপনার পূর্বপুরুষরা যা যা করতেন আপনারাও তাই করছেন এর মধ্যে প্রগতি কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কতকগুলো সামাজিক আইন-কানুন বদলেছে বটে—বামুনের ছেলে প্রকাশ্যে শোর গরু মুর্গি মদ খাচ্ছে, জাতিভেদ প্রথা ভেঙে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা যাকে খুশি বিয়ে করছে, ধর্ম না মানাটাই রেওয়াজ হয়ে পড়েছে—নানা কাণ্ড হয়েছে, ও রকম মাঝে মাঝে হয়েই থাকে—কিন্তু মূল সুরটা ঠিক আছে অর্থাৎ আহার নিদ্রা মৈথুনের সুর, ভোগের সুর। ওকে প্রগতি বলছেন কেন। আপনি গন্ধবণিক আপনার মেয়ে একজন কায়স্থের ছেলেকে বিয়ে করেছে। বেশ তো করেছে, আগেও এরকম কাণ্ড হয়েছে, সমাজে তা স্বীকৃতিও পেয়েছে। আমাদের দেশের রাধু ভট্চায্যির রক্ষিতাটি কি জাতের ছিল তা আমরা কেউ খোঁজ করি নি, কিন্তু যদিও তাদের রেজেষ্ট্রি ক'রে বিয়ে হয়নি তবু তিনি আমরণ রাধু ভট্চায্যির কাছে স্ত্রীর মতোই ছিলেন। আমরা তাঁকে জ্যাঠাইমা বলতুম। তাঁর গর্ভের ছেলেকে ভট্চায্যিমশাই বিষয়ের অংশও দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রগতি প্রগতি ব'লে তিনি

লাফালাফি করেননি। আপনি এটাকে প্রগতি বলছেন কেন। আগে আমরা কাঁসার থালায় খেতাম, এখন প্লেটে খাচ্ছি—এটা কি মস্ত একটা প্রগতি বলতে চান আপনি—আগে ক্ষীর খেতুম এখন পুডিং খাচ্ছি এটা কি প্রগতি—? প্রগতির সংজ্ঞা কি আগে সেটা স্থির করুন—"

গাড়িটা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল বিষ্ণু আর কালবিলম্ব না ক'রে গাড়ির হুড্‌টা তুলে দেখল একবার। তারপর স্টার্ট দিল হ্যাণ্ডল দিয়ে। কিছু হল না।

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন।

"ও বিষ্ণু এসে গেছ। ভেরি গুড। আজ তুমি খাবে এখানে। হবিবের জামাই এসেছে। হবিব গাড়িটা খুলতে যাচ্ছিল আমি খুলতে দিলুম না। বললুম তুমি ভালো বিরিয়ানি রাঁধতে পার তাই রাঁধ গিয়ে। আমি বিষ্ণুকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সে আমার গাড়ির ধাত চেনে—"

ডাক্তারবাবু কাছে আসতেই সে গাড়ির তলায় ঢুকে পড়ল। তার ভয় হল ডাক্তারবাবু হয়তো ব্র্যাণ্ডির গন্ধ পাবেন।

ডাক্তারবাবু আবার গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

ডাক্তারবাবু বসতেই স্কুলের শিক্ষক নিখিলবাবু বললেন—"প্রগতি কথাটার ডেফিনিশন তো ওই কথাটার মধ্যেই রয়েছে। যা প্রকৃষ্টরূপে গতি তাই প্রগতি—"

কোন দিকে গতি, সামনে না পিছনে—মনুষ্যত্ব থেকে পশুত্বের দিকে, না, মহামনুষ্যত্বের দিকে। দু' দিকেই প্রকৃষ্ট গতি হ'তে পারে—"

"সামাজিক আর্থিক সব বাধাকে এগিয়ে চলাই প্রগতি"

নিখিলবাবু এইবার জোরে এক টিপ নস্যি নিলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হল তিনি যেন দাবা খেলায় কিস্তি দিয়েছেন।

"মানুষ চিরকালই বাধাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। তার এই চেষ্টাই তার প্রাণধর্মের লক্ষণ, কিন্তু ইতিহাস বলছে যে একটা বাধা সরালে আর একটা বাধা এসে হাজির হয়। অন্নাভাব দূর ক'রে মানুষ যখন অন্ন-প্রাচুর্যের যুগে এসে পড়ল তখন তার সঙ্গে এল অন্ন-পরিপাক-সংক্রান্ত নানাবিধ রোগ, রোগ সারাবার জন্য নানারকম ওষুধের কাণ্ডকারখানা, কারখানাকে কেন্দ্র ক'রে শ্রমিকধনিক সংঘর্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভেবেছিলাম রাশিয়ায় বুঝি প্রগতি তার বাঞ্ছিত মূর্তি পেয়েছে। কিন্তু খবর পেলাম সেখান থেকেও লোক পালাচ্ছে, অনেক ভালো ভলো লোক অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করছে। আমার বিশ্বাস মানুষ যতক্ষণ পশু থাকবে ততক্ষণ তার সমস্যা মিটবে না। গোঁফ কামিয়ে, গোঁফ ছেঁটে কাপড়ের বদলে প্যাণ্ট প'রে, অসবর্ণ বিয়ে ক'রে আসল সমস্যাটা অর্থাৎ পশুত্বের সমস্যাটা মিটবে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশু আর আধুনিক পশুতে খুব বেশী তফাত নেই। প্রগতি প্রগতি ব'লে সেটা লোপ করা যাবে না, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি-মাত্রেই সেটা দেখতে পাবে। আমি কি বলি শুনবেন?"

"বলুন—"

"প্রগতি প্রগতি ব'লে লাফালাফি করবেন না। যা করছেন চুপচাপ ক'রে যান। আপনার মেয়ে বুদ্ধিমতী সে একটি ভালো ছেলেকে বিয়ে করেছে, বেশ করেছে। আশীর্বাদ করি সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করুক তারা। তবে ওটাকে প্রগতি বলবেন না। কোদালকে কোদাল বলাই উচিত।"

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে মাস্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে রইলেন। মাস্টারমশাই একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়েছিলেন। আর একজন বললেন, "কোদালকে কোদাল বললে অনেক সময় নিন্দে হয় যে। তাই ওটাকে আমরা সেতার বা গীটার ব'লে চালাতে চাই"

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন অনেকে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন তরুণ ডাক্তার বিনয় মল্লিক।

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করছি। আপনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন কেন—"

"আমার আর টাকার দরকার নেই। আমি বিয়ে করি নি, নিকট আত্মীয়ও নেই কেউ তেমন। তোমরাই আমার আত্মীয়। টাকা রোজগার ক'রে আর কি করব? বাবা যা বিষয়আশায় রেখে গেছেন আর আমি নিজে আগে যা রোজগার করেছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। টাকার পিছনে ছুটোছুটি ক'রে কি আর হবে?—"

গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এসে বিষ্ণু হুড্ খুলে কি দেখছিল। সে বলল—"কয়েকটা জিনিস কিনে আনতে হবে।"

"বেশ নিয়ে এস। ট্যাক্সিটা ক'রেই চলে যাও। ওটা আমি সমস্ত দিনের জন্যই ভাড়া করেছি। টাকা নিয়ে যাও—"

ডাক্তারবাবু পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করলেন।

"এই একশ' টাকার নোটটা নিয়ে যাও। ভাঙিয়ে এনো—"

বিষ্ণু ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন—"মোটরটা আমাকে বড্ড খরচ করায়। কিন্তু ওটকে ছাড়াতেও পারি না। ভালো অস্টিন গাড়ি পঁচিশ বছর আমার কাছে আছে, ওর উপর মায়া ব'সে গেছে একটা। আমিও বুড়ো হয়েছি আমার গাড়িও বুড়ো হয়েছে। ওই বুড়োকে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব—নতুন গাড়ি আর কিনব না"

ডাক্তারবাবুর বয়স এখন পঁয়ষট্টি। পঁচিশ বছর আগে তিনি যখন নূতন গাড়িটি কিনেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ। নূতন গাড়ি কিনে তিনি যাঁর ওখানে প্রথমে গিয়েছিলেন, এবং যিনি তাঁর গাড়ির প্রথম আরোহিণী হয়েছিলেন, তাঁর নাম মিস অমিতা রায়। তিনি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন। মার্জিতরুচি বিদুষী মহিলা। ডাক্তারবাবু এই রূপসী এবং তরুণী অমিতা রায়ের প্রেমে পড়েছেন এই গুজবটা নিয়ে অনেকের রসনা আন্দোলিত হয়েছিল তখন। অমিতা রায়কে প্রায়ই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ডাক্তারবাবুর গাড়িতে দেখা যেত। কিন্তু এ গুজবের অবসান ঘটল যখন হঠাৎ একদিন একটা ভালো চাকরি পেয়ে অমিতা দেবী দিল্লী চ'লে গেলেন। ডাক্তারবাবুর আচরণে এমন কিছু কেউ লক্ষ্য করল না যার জোরে গুজবটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ডাক্তারবাবু যেমন প্র্যাকটিস করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন, এতটুকু বিচলিত হয়েছেন ব'লে মনে হল না কারও। তারপর অমিতা রায়কে ভুলেই গেল সবাই। যে স্কুলের তিনি হেডমিস্ট্রেস ছিলেন সে স্কুলটাও উঠে গেল কিছুদিন পরে। ডাক্তারবাবু কিন্তু অমিতা রায়কে একেবারে ভোলেন নি। তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করতেন তিনি। সে সব পত্রে কি থাকত তা অবশ্য জানা যায় নি। ডাক্তারবাবু কখনও কাউকে বলেন নি সে কথা। কারণ ডাক্তারবাবুকে যদিও সবাই ভালবাসত, কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ কেউ ছিল না। তিনি ধনী দরিদ্র সকলের সঙ্গে মিশতেন, সবার উপকার করবার চেষ্টা

করতেন, কিন্তু আসলে একক জীবন যাপন করতেন তিনি। বাড়িতে তাঁর পুরোনো চাকর নটবর এবং পুরানো ঝি ক্ষেন্তির মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। নটবরই ছিল বাড়ির কর্তা আর ক্ষেন্তির মা ছিল গিন্নী। দু'জনে ঝগড়া হ'ত রোজই, দু'জনের ঝগড়ার মধ্যস্থতা করা ডাক্তারবাবুর একটা নিত্য কর্মের মধ্যে ছিল, কিন্তু একটা বিষয়ে তারা দু'জনেই একমত ছিল বরাবর—ডাক্তারবাবুর যাতে কোনও কষ্ট না হয়। দু'জনে মিলেই ঘরের সব কাজ করত তারা। রাঁধতও দু'জনে। ডাক্তারবাবু ইদানীং নিরামিষ তরকারি বেশী পছন্দ করতেন, সেগুলো রাঁধত ক্ষেন্তির মা, মাছ মাংস রাঁধত নটবর। নিরামিষ খেলেও ডাক্তারবাবু মাছ মাংস পরিত্যাগ করেন নি। নটবর মাছ মাংস পোলাও রান্নাতে একজন ওস্তাদ ছিল না কি। এদেরই তত্ত্বাবধানে ডাক্তার-বাবুর জীবন কাটত। এককালে ডাক্তারবাবুর ডাক্তার হিসাবে খুব নাম ছিল, ইদানীং কিন্তু রোগী দেখে আর পয়সা নেন না। হুজুগ নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন আজকাল। আজ যেমন হবিবের জামাই মেয়েকে খাওয়াবেন ব'লে মেতেছেন। তাঁর জীবনে আর দুটি প্রিয় লোক তাঁর ড্রাইভার লোচন আর মিস্ত্রী বিষ্ণু। হবিবকেও ভালবাসেন তিনি খুব, তাকে একবার সঙীন নিমোনিয়া থেকে তিনিই বাঁচিয়েছিলেন, কিন্তু হবিবকে তিনি নিজের গাড়ি ছুঁতে দেন নি কোনদিন। হবিবের ভাইয়ের বিয়ের সময় ডাক্তারবাবু নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়েছিলেন বিরিয়ানি-আর কোর্মা খেয়ে। বলেছিলেন এতো ভালো বিরিয়ানি তিনি না কি আর খান নি। হবির হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললে—আমিই রেঁধেছি বিরিয়ানি। 'তুমি!' অবাক হয়েছিলেন ডাক্তারবাবু—বলেছিলেন—"তাহলে মোটর সারাবার কারখানা করেছ কেন, ভালো একটা হোটেল খোল। তোমার রান্না খাওয়ার জন্যে লোকে ভিড় ক'রে আসবে।"

দিন দুই আগে ডাক্তারবাবু পান্না ঝিলে গিয়েছিলেন পিকনিক করতে পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে। খুব হৈ হৈ করেছিলেন তাদের নিয়ে। খাওয়া হয়েছিল খিচুড়ি, মাছ ভাজা আর বেগুন ভাজা। তার সঙ্গে ছিল চাটনি আর রসগোল্লা। ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি হয়েছিল, গানও হয়েছিল। প্রত্যেককে একটা করে প্রাইজ দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু।

তারও কিছুদিন আগে তিনি গাজিপুরের কুমোর-পাড়ায় গিয়ে সরস্বতী পুজো করেছিলেন এক কুমোরের বাড়িতেই। সব কুমোরদের খাইয়েছিলেন তিনি। আর তাদের গড়া প্রতিমা দেখে খুব তারিফ করেছিলেন তাদের, প্রত্যেককে একটি ক'রে বাসন্তী-রঙে-রাঙানো চাদর উপহার দিয়েছিলেন। প্রায় একশ'জন লোক খেয়েছিল কুমোরপাড়ার।

এই ধরণের হুজুগ নিয়েই আজকাল থাকতে ভাল-বাসেন তিনি। মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যান নানা জায়গায়, বিলে খালে পুকুরে গঙ্গায়, যেখানে যখন সুবিধে। যেখানেই যান নিজের মোটরে ক'রে যান সঙ্গে থাকে লোচন, নটবর আর ক্ষেন্তির মা। আর থাকে রান্নার জিনিসপত্র, বাসনকোসন, স্টোভ, কয়লার তোলা উনুন। যেখানেই যান সেখানেই একটা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যান আর সেখানকার ছেলে-মেয়েদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ান। অনেক রাখাল বালকও তাঁর দলে জুটে যায়।

এই সবই ভালবাসেন তিনি আজকাল।

বীণা মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল—"আমি ও ওষুধ লাগাব না"

শশধর মটরশুঁটি ছাড়াচ্ছিল, হেসে জবাব দিল—"বিষ্ণুদাকে বোলো সে কথা"

"তুমি বোলো"—আবার মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল সে। সে সাবু তৈরি করছিল। সাবুটা নাবিয়ে বলল—"আমি মানুতি মাসীকে সাবুটা দিয়ে আসি, আমার হয়তো একটু দেরি হবে, আমি মুকুজ্যে গিন্নীর কাছে যাব লেবু আনতে। একটু লেবু দিয়ে না দিলে মাসী সাবুটা খেতে পারবে না। তুমি ততক্ষণ আলু-গুলো ঠিক ক'রে রাখ—"

"বিষ্ণুদাকে বলেছি তিনটের সময় তাঁকে আলু-কাবলি দিয়ে আসব। তখন তিনি আমাকে জিগ্যেস করবেন তুমি ওষুধটা লাগিয়েছ কি না—"

"ব'লে দিও লাগাই নি, লাগাব না"

"লাগাবে না কেন। এর কোন মানে আছে—"

"কপালের এই কাটা দাগটা আমার বাবার স্মৃতিচিহ্ন। তিনি মেরেছিলেন বলেই দাগটা হয়েছে। তিনি এখন নেই, কিন্তু দাগটা আছে। ওটা থাক—"

সাবু নিয়ে বেরিয়ে গেল বীণা।

শশধরের মনে পড়ল বীণার বাবা একটা লোহার ডান্ডা দিয়ে বীণার মাথায় আঘাত করেছিলেন। বীণা চার দিন অজ্ঞান হ'য়ে হাসপাতালে ছিল। এবং এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে বিষ্ণুদা এস. পি'র সাহায্যে চাপ দিয়েছিলেন বীণার বাবার উপর। তাঁকে অ্যারেস্ট ক'রে থানায় পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন তোমার মেয়ের বয়স হয়েছে, সে যদি স্বেচ্ছায় কোনও গরীবের ছেলেকে বিয়ে করতে চায় তাতে বাধা দেবার তোমারও কোনও অধিকার নেই, এ জন্যে তাকে অমনভাবে মারবারও তোমার কোনও অধিকার নেই। এ জন্যে তোমার নামে 'কেস' করব আমরা। আর এ-ও বলে দিচ্ছি এ জিনিস যদি আদালতে গড়ায় তাহলে ভবিষ্যতে তোমার মেয়ের বিয়ে হওয়া মুশকিল হবে। পুলিসের বড় সাহেবের এই কথা শুনে সুশীলবাবু (বীণার বাবা) তার সঙ্গে বীণার বিয়ে দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। বীণার কপালের কাটা দাগটা তাদের বিয়েরও স্মৃতিচিহ্ন—শশধরের মনে হল। বিষ্ণুদা ওটাকে মুছে দেবার জন্য ব্যস্ত কেন ? তারপরই তার মনে হল বিষ্ণুদা চেষ্টা না করলে বীণার সঙ্গে তার, বিয়েই হ'ত না। বিষ্ণুদা বিয়ের সময় বীণাকে আড়াই'শ টাকা খরচ ক'রে একটা বেনারসী শাড়ি কিনে দিয়েছিল এটাও মনে হল পরক্ষণেই। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল বিষ্ণুদাকে সে তিনটের সময় আলুকাবলি খাইয়ে আসবে বলেছিল। বীণা বেরিয়ে গেল, কখন ফিরবে কে জানে। দেরি হলে সেই চড়িয়ে দেবে আলুকাবলি, কিন্তু বীণার হাতে রান্নাটা ভালো হয়। আর একটা কথা মনে পড়ল তার বীণা বলছে সে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটা পাঠশালা বসাবে তাদের বারান্দায়। বীণা ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল। অ আ ক খ তাদের শেখাতে পারবে নিশ্চয়ই। বলছে এক টাকা ক'রে মাইনে নেব ছেলেমেয়ে পিছু। যারা খুব গরীব তাদের কাছে কিছু নেব না। বীণার খুব একা একা লাগে। শশধর তো টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ায়। পাঠশালা করলে কিছু

আয়ও হতে পারে—এই সব নানা কথা মনে হ'তে লাগল শশধরের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বিষ্ণুদার ভাগ্নে অনুমানের কথা। একটিন কনডেনস্‌ড মিল্ক দিয়ে একটা বড় পাঁউরুটি খেয়ে ফেলেছে—বাহাদুরি দিতে হয় ছোকরাকে। এলো-মেলো নানারকম কথা ভিড় করতে লাগল তার মনে। শশধর একটা জিনিস নিয়ে বেশীক্ষণ একনাগাড়ে ভাবতে পারে না। তার মন নদীর স্রোতের মতো, কত রকম জিনিস ভেসে আসছে তাতে। হঠাৎ মনে পড়ল আগা সাহেবের কথাটা। প্রায় বছর দুই আগে তার কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার নিয়েছিল, প্রতি মাসেই চড়া হারে সুদ দিয়ে যাচ্ছিল, কাবুলিটা ঠিক তাকে রাস্তায় ধ'রে ফেলে, তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া শক্ত, প্রতি মাসে টাকায় এক আনা ক'রে সুদ দিতে হ'ত। দু' বছরে তিরিশ টাকা সুদ দিয়েছে। কিন্তু কুড়ি টাকা একসঙ্গে শোধ ক'রে দেওয়ারও সামর্থ্য নেই তার, আগা সাহেব টাকাটা নিতেও চায় না, সে সুদ চায়। সেদিন কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল, স্কুলের সামনেই আগা সাহেব ধ'রে ফেলল তাকে। তার কাছে পাঁচ সিকে পয়সা ছিল, ইচ্ছে করলে সুদটা দিয়ে দিতে পারত, কিন্তু হঠাৎ সে কেমন যেন মরিয়া হ'য়ে বলে ফেলল—"আগা সায়েব, মাপ কর আর আমি কিছু দিতে পারব না। আমি দু'দিক দিয়ে মার খাচ্ছি। তোমার কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে যে শাড়িটা কিনেছিলাম সেটা কাজে লাগে নি, অথচ তোমাকে প্রতি মাসে সুদ দিয়ে যাচ্ছি— !"

আগা সাহেব জিজ্ঞেস করল, "কাজে লাগেনি কেন।"

"আমার বউয়ের পছন্দ হয়নি সেটা"--বলেই সে আগা সায়েবের দিকে চেয়ে ফিক ক'রে হেসে বলল—"তোমাকে সেই শাড়িটাই এনে দিচ্ছি, আমাকে তুমি রেহাই দাও।"

আগা সায়েব তার দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বলল —"আচ্ছা ঠিক হায়। তুমহারা বহু কাহে নেহি পসন্দ কিয়া ?" শশধর বলল— "লাল রঙের শাড়ি তার পছন্দ নয়। হালকা সবুজ চায় সে। বড়া জিদ্দি আর খুঁতখুতে হ্যায়।"

বীণাকে লুকিয়ে আগা সায়েবকে তার পরদিন শাড়িটা দিয়ে দিয়েছিল সে। ভেবেছিল এইবার বুঝি রেহাই পেল। রেহাই কিন্তু পেল না। পরদিন সকালে আগা সায়েব তার বাড়িতে এসে হাজির। এসে হাঁকাহাঁকি করছে—"এই বহুমায়ি, তুমহারা বাস্তে শাড়ি লায়া হ্যায়। ই ভি নাপসন্দ করো তো হাম বড়া হুজ্জুৎ করেঙ্গে। হালকা সবজ্ হ্যায়—"

বীণা বেরিয়ে আসতেই আগা সাহেব তাকে সেলাম ক'রে তার হাতে শাড়ির বাক্সটা দিয়ে একমুখ হেসে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর বলল—"হামারা বিবি ভি বড়া জিদ্দি হায়। মগর উয় লাল রং পসন্দ করতি হে। তুম্-হারা শাড়ি উসিকো দেঙ্গে। তুম এই শাড়ি লেও—হালকা সবজ্ হ্যায়"

শশধর আগা সাহেবের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বীণাও কম অবাক হয়নি। এ কি কাণ্ড। একটা কাবুলিওলা এসে তাকে শাড়ি দিচ্ছে কেন সে বুঝতেই পারেনি প্রথমে। শশধরের দিকে চাইতে শশধর বললে—শাড়িটা নাও, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব ব্যাপারটা। শশধর পরে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

খুব খুশী হয়েছিল বীণা। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওলার মতো তার জীবনেও যে আর একজন কাবুলিওলা জুটবে এ তার কল্পনাতীত ছিল।

এখন রোজ একটু বেশী ক'রে আলুকাবলী করতে হয়, কারণ কাবুলিওলার সঙ্গে দেখা হলেই আলুকাবলি দিতে হয় তাকে। সে প্রথম দিন দাম দিতে গিয়েছিল কিন্তু শশধর নেয়নি। এখন আগা সাহেব তার বড়াভেইয়া হয়ে গেছে। আগা সাহেব একদিন হিং দিয়েছিল তাকে। বীণা হিংয়ের ফোড়ন দিয়ে কচুরি আর মাংস তৈরি করে খাইয়ে-ছিল আগাকে। আগা ভারি খুশী। বলেছে সে যখন দেশে যাবে তখন তার জন্যে একটা কাবুলি দোপাট্টা নিয়ে আসবে। আগার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ এখন এত সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে এটাকে আর আশ্চর্য-জনক ঘটনা ব'লে মনেই হয় না শশধরের।

আগার কাছে আর একদিন টাকা ধার চেয়েছিল শশধর। আগা বলেছিল তোমাকে আমি ধার দেব না। ভেইয়ার সঙ্গে ব্যবসা করি না আমি। কখনও ধার করবে না। যা রোজগার কর খরচ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ র্যাখতে হবে। যদি না পার আমাকে ভার দাও। আমি সব ঠিক ক'রে দেব। শুধু আলুকাবলি বিক্রির উপরই নির্ভর করতে হয় না শশধরকে। তার কিছু জমি আছে, সারা বছরের খাবার ধান হয়েও উদ্বৃত্ত থাকে অনেকটা। সেটা বিক্রি করে সে। ভাল দামই পায়। বীণার বাবা হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। উইল ক'রে যেতে পারেননি। তাঁর সম্পত্তি কিছু পেয়েছে বীণা। একটি ছোট বাড়ি পেয়েছে সে। ভাড়া মাসে পঞ্চাশ টাকা। এ টাকাটা বীণার হাত-খরচ। বসত বাড়িটিও শশধরের পৈতৃক বাড়ি। শশধরের বাবা মা দু'জনেই পরলোকগমন করেছেন। তার ভাইবোনও নেই কেউ। বাইরের দিকে একটা বড় বারান্দা এবং তৎ-সংলগ্ন ছোট একটি ঘর আছে। শশধরের ইচ্ছা ছিল ওখানে একটি ক্লাব করে। কিন্তু বীণার এতে ঘোর আপত্তি। বাড়ির বারান্দায় সে পাড়ার ছেলেদের আড্ডা বসাতে দেবে না। এখন ঠিক করেছে নিজেই ছোট্ট একটি পাঠশালা করবে বারান্দায়।

আগা সায়েব যেদিন এসে সংসারের ভার নিতে চাইল সেদিন সে সোজা বীণার কাছেই চলে এসেছিল। বলেছিল—শোশো হামার কাছে ফিন রূপিয়া করজা করতে চায়। হামি দিব না। হামি বলেছি, তোমার রোজগার আর সংসার হামার কান্ধা পর দিয়ে দাও, হামে সব ঠিক ক'রে দিব।

শশধরকে আগা সাহেব শোশো ব'লে ডাকে।

বীণা বলেছিল—আপনি ধার দেবেন না। ঠিকই বলেছেন আপনি। সংসারের জন্যে টাকার দরকার হয় না। ওর মাথায় নানারকম বাজে খরচের বুদ্ধি জোটে। একটা বাঁশী কেনবার অনেকদিন থেকে ইচ্ছে। তাই বোধহয় ধার চাইছে। ধার দেবেন না। আমি সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ওকে বাঁশী কিনে দেব।

আগা সায়েব হেসে জবাব দিয়েছিল—সাবাস্।

এসব কাহিনী পুরোনো। আগা সায়েব মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যায়—সব ঠিকসে চলতা কি নেই। কখনও খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করে না। অনেকদিন সে আসে নি। হয়তো অন্য কোথাও চ'লে গেছে। শশধর তার কথা

ভাবল একবার। তারপরই ভুলে গেল। মন দিল আলুর দিকে। অনেক আলু ছাড়াতে হবে। বীণা কখন আসবে কে জানে।

আলু ছাড়াতে ছাড়াতে তার আলুওলা জীবেনের কথা মনে হল হঠাৎ। জীবেন —শশধরের মতে—অতি সজ্জন। তাকে ধারে আলু দেয়, পেঁয়াজ লঙ্কা কাবুলি মটর সবই তার দোকান থেকে কেনে। দামের জন্য কখনও পীড়াপীড়ি করে না। বলে, যখন সুবিধে হয় দিও। শশধর হাতে পয়সা জমলেই তার ধার শোধ ক'রে দেয়। কিন্তু সে জীবেনের ভক্ত তার সুর-বোধের জন্য। কি সুন্দর বাঁশী যে বাজায়। শশধরের ছোট একটা বাঁশের বাঁশী আছে কিন্তু জীবেনের মতো সে বাজাতে পারে না। ভৈরবী, পূরবী, মালকোষ কি চমৎকারই না বাজায়। তার বাঁশীটা অবশ্য অনেক ভালো ক্ল্যারিওনেট। শশধরেরও একটা ক্ল্যারিওনেট কেনবার ইচ্ছে। জীবেন বলেছে তাকে সে শিখিয়ে দেবে সে যদি ক্ল্যারিওনেট কেনে একটা। নিজের বাঁশী সে বাজাতে দেয় না কাউকে। সে বলেছে শশধরকে কিন্তু শিখিয়ে দেবে।

এই নিয়েই কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল সে।

তারপর তার মনে পড়ল ভগবতী মাঝির কথা। সে বলেছে তাকে বিনা পয়সা খেয়া পার ক'রে দেবে, ওপারে গেলে আলুকাবলি বেশী বিক্রি হ'তে পারে। কারণ ওপারে কোনও ফেরিওলা যায় না। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল ভগবতীর ভাই জগন্নাথের কথা। হুজুগে প'ড়ে আর টাকার লোভে সে এক রাজনৈতিক মিছিলে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে। পুলিসের কাছে মার খেয়ে হাতটি ভেঙেছে। হাসপাতালে শুয়ে আছে এখন। হাসপাতালে গিয়ে তাকে একটু আলুকাবলি খাইয়ে এলে কেমন হয়। বিস্কুট খেতে ভালবাসে জগন্নাথ। হঠাৎ উঠে পড়ল শশধর। উঠে তার আলনায় টাঙানো কামিজটা থেকে মনিব্যাগটা বার করে দেখল। বিষণবাবু ওষুধ কেনবার জন্য যে দশটা টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে সাড়ে চার টাকা ফিরেছে। টাকাটা বীণাকে দিয়ে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু বীণাকে সে এ বিষয়ে কিছু বলেনি। এই টাকা থেকে জগন্নাথের জন্য ছোট এক টিন বিস্কুট নিয়ে গেলে কেমন হয়—বীণাকে পরে বললেই হবে।

বীণা কিন্তু এসে পড়ল।

এসেই বলল—মানতি মাসী কি বলে জান? তোর তৈরী আলুকাবলি আমাকে দিয়ে যাস বিকেলে। মুখটা একেবারে যেন পচে আছে। সাবু আর খেতে পারি না। আমি বলে এসেছি নিয়ে আসব। কিন্তু আমার মনে হল তার আগে শৈলেন-বাবুকে জিগ্যেস করা উচিত। তিনি চিকিৎসা করছেন। তিনি সাতদিন সাবু খাইয়ে রাখতে বলেছেন। আলুকাবলি খাইয়ে যদি ফের জ্বর আসে। গেলাম শৈলেনবাবুর ডিসপেন্সারিতে। বললাম, মাসি আর সাবু খেতে পারছেন না। বিকেলে একটু তরকারি দেব? হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন শৈলেনবাবু। বললেন —সাবুর বদলে বার্লি দিতে পার। একটু নুন আর লেবু দিয়ে ভালই লাগবে। তরকারি দেবে কি? মোটে চার দিন জ্বর ছেড়েছে।

বললাম—বার্লিও উনি খেতে পারবেন না। প্রথম দু'দিনই তাই দিয়েছিলাম, নুন লেবু দিয়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি খেয়েই ওয়াক তুলতে লাগলেন। আজ

অতি কষ্টে সাবুটা খাইয়েছি। ডাক্তারবাবু বললেন—হর্লিক্‌স্‌ দিতে পার। কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্রী নই, বললাম তার সঙ্গে যদি সামান্য একটু—ছোট্ট চামচের এক চামচ—তরকারী দিই তাহলে কি খুব ক্ষতি হবে। ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন, বললেন—বেশ দিও, নরম আলুভাজা দিও। কোনও মসলা যেন না থাকে। আর এক চামচের বেশী নয়। কিন্তু হর্লিক্‌স্‌ কোথা পাওয়া যাবে। মানতি মাসীর তো কেনবার সামর্থ্য নেই। আমার কাছে পাঁচটা টাকা আছে। তুমি দেখ তো কানাইয়ের দোকানে পাওয়া যায় কি না। দাম যদি পাঁচ টাকার বেশী হয় তাহলে ধারেই নিয়ে এস।

শশধরকে তখন বলতে হল—বিষ্ণুবাবু ওষুধ কেনবার জন্য দশটা টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে সাড়ে চার টাকা ফিরেছে। বিষ্ণুবাবু ও টাকা তোমাকেই দিয়েছেন, আমি ভেবেছিলাম ও টাকা দিয়ে জগন্নাথের জন্যে বিস্কুট কিনে নিয়ে যাব।

জগন্নাথ আবার কে—জিগ্যেস করল বীণা।

তখন জগন্নাথের কাহিনীটা বলতে হ'ল শশধরকে। বীণা জগন্নাথকে দেখেছে, কিন্তু পুলিসের ব্যাপারটা জানত না। শুনে বললে—বেশ হয়েছে। ছেলেটা অতি পাজী। জিতু কাকার লাউ চুরি করে পালাচ্ছিল একদিন। সমর ধ'রে ফেলেছিল হাতে-নাতে। ওকে বিস্কুট কিনে দিয়ে আসতে হবে না। তুমি হর্লিক্‌স্‌ কিনে নিয়ে এস। শশধর একটু মর্মাহত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও অনুভব করল প্রতিবাদ করা নিষ্ফল। হর্লিক্‌স্‌ কিনে আনতে হবে। বীণা আবার বলল, তুমি তো আলু কিছুই ছাড়াওনি দেখছি। সব আমি তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে ফেলি। তুমি যাও হর্লিক্‌স্‌টা নিয়ে এস। শশধর বেরিয়ে পড়ল। একটু দূরে গিয়েই কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। তার প্রাণের বন্ধু ন্যাড়া মাঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল দাঁড়িয়ে পড়ল শশধর।

"কি রে ন্যাড়া—"

"কে শশধর। একবার আয় না ভাই। লাটাইটা ধর তো। আমি চট্‌ ক'রে খেয়ে আসি। মা ডাকাডাকী করছে—"

মাঠের পাশেই তার বাড়ি। সে শশধরের হাতে লাটাইটা ধরিয়ে দিয়ে হনহন ক'রে বাড়ির দিকে চ'লে গেল। লাটাই ধরে দাঁড়িয়ে রইল শশধর।

"চট্‌ করে আসিস ভাই—"

"এক্ষুনি আসছি—"

শশধর লাটাই ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে বীণাকে বলল—"কানাইয়ের দোকানে হর্লিক্‌স্‌ ছিল না। আমি বোস ব্রাদার্স-থেকে কিনে আনলাম।" আর একটা কথা সে অবশ্য বলল না। ছোট এক প্যাকেট বিস্কুটও কিনেছিল সে। সেটা রেখে এসেছে ন্যাড়ার বাড়িতে। ফেরি করতে যখন বেরুবে তখন নিয়ে যাবে জগন্নাথের জন্য।

৩

হবিবের রান্নাবান্না শেষ হ'ল প্রায় বেলা বারোটার সময়। সে ডাক্তারবাবুকে এসে বলল—"এইবার আপনি স্নান করুন। আপনার গরম জল তৈরি হ'য়ে গেছে—"

"আমি ঠিক খাওয়ার আগে স্নান করব—"

"খাবার তো তৈরি—"

"আগে তোমার মেয়ে জামাইদের খেতে দাও, আমি তাদের ব'সে খাওয়াব। আমার কি আগে খেয়ে নিয়ে চলে!"

"বেশ তো একসঙ্গেই বসুন না—"

"অন্যান্য নিমন্ত্রিত যাঁরা আছেন, তাঁদেরও বসিয়ে দাও। আমি শেষে খাব। ক্ষিধেও খুব হয়নি এখন, সকাল বেলা খাওয়াটা বেশী হয়েছিল। নটবর একগাদা খাইয়ে দিয়েছে সকালে। আমি পরে খাব।"

আসল কারণটা কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন না। সকাল বেলা রোজ তিনি যা খান, আজও তাই খেয়েছিলেন। তাঁর ক্ষিধেও যে পায়নি তা নয়, কিন্তু তিনি খেলেন না কারণ বিষ্ণু এখনও খায়নি। সে জিনিসপত্র কিনে এনে গাড়ির নীচে ঢুকেছে। গাড়ির কাজ শেষ না ক'রে সে খাবে না। ডাক্তারবাবুও ঠিক করেছেন তার সঙ্গেই খাবেন, কিন্তু কথাটা ভাঙেননি। তিনি বিষ্ণুকে গিয়ে জিগ্যেসও করলেন না যে আর কত দেরি। কাজের সময় বিষ্ণুকে বিরক্ত করলে কাজ ভাল হয় না, বিষ্ণুও চটে যায়—এটা তিনি জানেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের চরিত্রের সঙ্গে বিষ্ণুর চরিত্রের মিল আছে। তাঁকেও কেউ তাগাদা করলে তিনি চটে যান। যখন প্র্যাকটিস করতেন তখন কেউ যদি জিগ্যেস করত জ্বরটা কবে ছাড়বে বা ব্যথাটা কবে কমবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন আমি গণৎকার নই ভগবানও নই, বলতে পারি না। আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতো চেষ্টা করছি যবে সারবার সারবে। তারপরই সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলতেন অত ঘাবড়াচ্ছো কেন, ঘাবড়ে কোনও লাভ আছে? এই কথাগুলি এমন আত্মীয়তার সুরে বলতেন যে তাঁর রূঢ় কথাগুলি কারও মনে ব্যথা দিত না। চেনাশোনা যাদের নিমন্ত্রণ করেছিল হবিব তারা সবাই খাওয়ার জন্য ভিতরের দিকে চ'লে গেল। ডাক্তারবাবু হবিবকে ডেকে বললেন মেয়ে জামাইকে যখন খেতে দেবে তখন আমাকে ডেকো। আমি তাদের সামনে ব'সে খাওয়াব। হবিব মুসলমান, তাদের বাড়িতে 'পরদা' আছে, কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথা স্বতন্ত্র। তিনি বাড়ির লোক। হবিব বললে চাচা সাহেব এলেই ওরা খেতে বসবে। চাচা সাহেবকে আনতে গাড়ী গেছে। হবিবের চাচা মীর সাহেব পাশের গ্রামে থাকেন। ডাক্তারবাবুর বন্ধুস্থানীয় লোক। বড় জোতদার। দিলদরিয়া মেজাজ। কিন্তু একটু ভীতু প্রকৃতির। হবিব তাঁকে আনতে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়েছে। মোটরে তিনি পারতপক্ষে চড়তে চান না। হবিবের ছেলে আবু তাঁকে আনতে গেছে। ডাক্তারবাবু পকেট থেকে সিগার কেস বার করলেন। তারপর অনেক বেছে বেছে একটি মাঝারি সাইজের সিগার ধরালেন। তাঁর সিগার কেসে কয়েক রকম সিগার থাকে। একরকম সিগার খেতে ভালোবাসেন না তিনি। খুব ছোট সাইজের

'সিগারও আছে, আবার খুব মোটাও আছে। একুট মাঝারি সাইজের সিগার ধরালেন তিনি। তারপর চেয়ে রইলেন বিষুণের পা দুটোর দিকে। মোটরের তলা থেকে বিষুণের পা দুটো বেরিয়ে ছিল। অপরিচ্ছন্ন ফাটা ফাটা পা, গাঁট গাঁট আঙুলগুলো ডাক্তারবাবুর মনে হল নিশ্চয়ই খালি পায়ে হাঁটতে হয়েছে ওকে অনেক দিন। বিষুণের অতীত জীবন কি ছিল তা তিনি জানেন না। কিন্তু তার পা দুটো দেখে শ্রদ্ধা হল তার উপর। 'স্ট্রাগল' করতে হয়েছে লোকটাকে, মনে হল তাঁর। মনে হল আমেরিকার মতো দেশে থাকলে আরও অনেক উন্নতি হত বিষুণের। অমন একটা ভালো লোক, ভালো মিস্ত্রী, কেউ ওর কদর করল না। কোনক্রমে একটা ওয়ার্কশপ ক'রে দিনগুজরান করছে। লোকটাও অদ্ভুত একগুঁয়ে ধরনের। কারো সাহায্য নিতে চায় না। ডাক্তারবাবু ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। নেয় নি। ডাক্তারবাবুর কাছে কোনও পয়সা নিতে চায় না। একদিন পীড়াপীড়ি করাতে বলেছিল, "ডাক্তারবাবু, আমি মহাপাপী, নিজের মা বাবাকে খেতে দিইনি, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম। একবার দুর্ভিক্ষ হল। তখন আমি দুমকায় একটা কারখানায় চাকরি করি। খবর পেলাম মা বাবা দু'জনেই মারা গেছেন। শেষ জীবনটায় তাঁরা ভিক্ষে করতেন না কি। দু'জনেই রাস্তায় ম'রে পড়ে ছিলেন। সম্ভবত অনাহারেই মারা গিয়েছিলেন তাঁরা। আমি তাঁদের একমাত্র ছেলে, তাঁদের খোঁজ নিইনি। আমি মহাপাপী। ভাল লোকদের সেবা ক'রে ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করছি সেই পাপের।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি ভালো লোক তাই বা তোমায় কে বললে। আমার তো নানান দোষ আছে।"

বিষুণ এর কোনও উত্তর দেয়নি। মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবু বিষুণকে কিছু উপহার দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষুণ তাও নেয়নি। একটা গরমের স্যুট করাবার জন্যে কাপড় কিনে দিয়েছিলেন, বিষুণ কিন্তু নিলে না সেটা। বললে, "এত দামী কাপড়ের জামা আমি কখনও পরিনি ডাক্তারবাবু। পরলে সোয়াস্তি পাব না। আপনি যদি অনুমতি করেন এই দিয়ে নরেশের জন্য কোট প্যান্ট করিয়ে দিই।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"নরেশ কে?"

"নরেশ শামু মিত্তিরের ছেলে—ছোট ছেলে—ওর আপনি চিকিৎসা করেছেন কতবার"—বিষুণ নরেশের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে শেষে বললে—"বড়-লোকের ছেলে, বদ্ ছেলেদের সঙ্গে মিশে লেখাপড়া শেখেনি—মিত্তিরমশাই মারা গেছেন—বড় ভাই দুটো ওকে দেখে না। আমার ওয়ার্কশপে এসেছে কাজ শিখতে। ছেঁড়া জামা পরে আসে। অথচ ওর গায়ে একদিন ভেলভেটের কোট দেখছি। আপনি অনুমতি দিলে—।

অনুমতি দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু তিনি মনে মনে একটু বিপদে পড়েছিলেন। বিষুণ তাঁর গাড়ির ধাত চেনে, তাকে দিয়েই তিনি গাড়ি সারাতে চান, অথচ সে কিছুতেই তাঁর কাছ থেকে কোনও মজুরি নেবে না, কোনও উপহার দিলে নেবে না—এ তো মহা মুশকিল। শেষকালে তিনি একটা কৌশল করেছেন। নিজের লাইফ ইন্সিওরন্স করিয়েছিলেন অনেক আগে। তার 'নমিনি' ঠিক করা

হয়নি। বিষ্ণুকে নমিনি ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিষ্ণু হাজার দশেক টাকা পেয়ে যাবে। তাঁর মতে বিষ্ণু ইজ্ এ গ্রেট ম্যান। বিষ্ণু যে মদ খায় তা তিনি জানেন। কিন্তু সেটা সে যে তাঁর কাছ থেকে লুকোতে চায় এটাই তাঁর মতে গ্রেটনেসের একটা লক্ষণ।

বিষ্ণু মিস্ত্রির পা দু'টোর দিকে চেয়ে এই সব ভাবছিলেন ডাক্তারবাবু। এমন সময় চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে একটা মোটর সাইকেল এসে হাজির হল। তাতে আবার একটা সাইড কারও রয়েছে। তাতে ব'সে আছে কালো গগল্‌স্ পরা এক ছোকরা। যিনি মোটর চালাচ্ছিলেন তাঁর চোখেও কালো গগল্‌স্। দু'জনেই চোঙ্ প্যান্ট পরা। দু'জনেরই গায়ে হাফশার্ট আর হাতে রিস্টওয়াচ। গাড়িটা ডাক্তারবাবু যেখানে বসেছিলেন তার সামনেই এসে থামল গর্জন করে। সাইড কারে যিনি বসেছিলেন তিনি নেমে এলেন, নিজের হাতঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, তারপর এগিয়ে এলেন ডাক্তারবাবুর দিকে। একটা নমস্কার পর্যন্ত না করে বললেন—"আমার মামা আছে এখানে?"

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন—"তুমিই বা কে, তোমার মামাই বা কে—"

"আমার মামা বিষ্ণুবাবু, মোটর মেকানিক, শুনলাম এখানে একটা মোটর ইনেসপেক্‌শন করতে এসেছেন—"

"ও বাবা, বিষ্ণুর যে এমন লায়েক ভাগনা আছে তা তো জানতুম না—"

"আমার মামা কোথায় বলতে পারেন—"

"সে আমার মোটরে কাজ করছে। কি দরকার তোমার"

"জরুরী দরকার। কোথায় তিনি—"

"ওই যে মোটরের তলায় শুয়ে আছে। বেরুবে একটু পরে, তারপর কথা বোলো। বস এইখানে"

একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন তিনি।

"আমার কিন্তু বসবার সময় নেই। আমাকে পাঁচটার মধ্যে চন্দননগর পেঁছিতে হবে। সাড়ে পাঁচটার সময় পার্টি মীটিং আছে। সেই জন্যেই আমি আমার বন্ধুর মোটর বাইক ক'রে এসেছি"

আবার সে মোটরে দিকে এগোতে যাচ্ছিল।

"ওদিকে এখন যেও না। কাজের সময় কথা ব'লে বিরক্ত কোরো না ওকে"

দাঁড়িয়ে পড়ল অনুমান কর। ডাক্তারবাবুর বলবার ভঙ্গীতে এমন একটা আদেশের সুর ছিল যে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজ মূর্তি ধারণ করল ছোকরা।

"আমি আমার মামার সঙ্গে কথা বলব আপনি তাতে বাধা দিচ্ছেন কেন। জরুরী দরকার আছে আমার—"

"কেউ মারাটারা গেছে নাকি। বিপদ হয়েছে কোনও? জরুরী মানে?"

"মারা যায় নি। কিন্তু বিপদে পড়েছি আমি। অবিলম্বে কিছু টাকা চাই।"

"অবিলম্বে তো হবে না। একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

"অপেক্ষা করা তো অসম্ভব। তাড়াতাড়ি হবে বলে আমি সুশীলদাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম, উনি ওঁর মোটর বাইকে লিফ্‌ট দিলেন আমাকে, ওঁকে আটকে রাখব কি করে! ওঁকে ফিরে গিয়ে পার্টি মীটিংয়ে বক্তৃতা দিতে হবে।"

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন—"কত টাকা দরকার তোমার"

"সুশীলদা কত টাকা দরকার"

সুশীলদা এগিয়ে এলেন এবং বললেন—"চাঁদা আদায় ক'রে পার্টি ফণ্ডে তোমার ৭৫্ টাকা জমা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তুমি ৫০্ মাত্র জমা দিয়েছ। বাকি ২৫্ আজকের মধ্যেই জমা না দিলে তোমার নাম কাটা যাবে। রণদা তোমার জন্যে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—"

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"রণদা কে"

"আমাদের অডিটার"

"ও। আচ্ছা, আমি তোমাকে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমাকে রসিদ দিয়ে টাকাটা নিয়ে যাও"

"রসিদ!"

"হ্যাঁ লিখে দাও যে আমি বিষ্ণুবাবুর ভাগনা ডাক্তার-বাবুর কাছ থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে গেলাম। লিখে তার নীচে নিজের নামটা সই ক'রে দাও—আর নিজের ঠিকানাটাও লিখে দাও"

"তার মানে?"

"মানে তো সোজা। বুঝতে পারছ না কেন। তোমার মামাকে দেখিয়ে বলব তোমার ভাগনে এই টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে"

"তার চেয়ে আমি ওঁকে গিয়ে সোজাসুজি বলি না—"

"না, এখন কাজের সময় ওকে বিরক্ত করতে পারবে না—"

"এ তো মহা জবরদস্তি দেখছি"

এর পরই অনুমান কর চীৎকার ক'রে উঠল—"মামা, ও মামা—"

হবিব সেই সময় বাইরে এসেছিল। ডাক্তারবাবু তাকে বললেন—হবিব এ ছোকরাকে বার ক'রে দাও তো এখান থেকে"

হবিব এগিয়ে এল। তার পিছু পিছু এল আরও গোটা দুই লোক।

"কি চান আপনি—"

"আমি মামার সঙ্গে দেখা করতে চাই"

ডাক্তারবাবু বললেন—"মামার সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়ে দেখা কোরো। এখানে দেখা হবে না"

হবিব বললে—"যান যান এখান থেকে—"

"জোর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন না কি!"

দরকার হ'লে তাই দেব। এটা আমার বাড়ি, এক ডাকে পাড়ার সবাই এসে হাজির হবে। হাঙ্গাম হুজ্জৎ না ক'রে মানে মানে স'রে পড়ুন—"

ডাক্তারবাবু আবার বললেন—"তোমার টাকার দরকার, টাকা তো দিচ্ছি বাপু, রসিদ দিয়ে নিয়ে যাও। তোমার মামার সঙ্গে বুঝে নেব আমি। এতে আপত্তি করছ কেন—"

অনুমান তখন বলল—"পঁচিশ টাকায় হবে না। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দরকার আমার।"

"বেশ তাই নাও। শুধু রসিদ লিখে দাও একটা—"

"কাগজ কলম তো সঙ্গে নেই"

"হবিব একে কাগজ কলম দাও তো—"

"আসুন আমার সঙ্গে—"

হবিবের পিছু পিছু চলে গেল অনুমান কর।

একটু পরেই ফিরে এল রসিদটা নিয়ে। ডাক্তারবাবু তাকে টাকা দিতে যাচ্ছেন এমন সময় বিষ্ণুণ বেরিয়ে এল মোটরের তলা থেকে।

"এ কি হনুমান তুমি এখানে!"

"আমি মামা তোমার কাছে এসেছিলাম। গোটা পঞ্চাশেক টাকার বড্ড দরকার পড়েছে—"

"আমি এক পয়সা দেব না তোমাকে, রাসকেল কোথাকার! বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ডাক্তারবাবু আপনি টাকা দিচ্ছেন নাকি—আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন—দেবেন না—"

"কি করব। ছোকরা যে নাছোড়, তোমাকে কাজের সময় বিরক্ত করতে যাচ্ছিল, তাই—"

বিষ্ণুণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অনুমানের দিকে।

অনুমান যেন চুপসে গেল।

হাত কচলে কচলে বলতে লাগল—"টাকা না পেলে আমার ইজ্জৎ থাকবে না মামা। দোহাই তোমার। সকাল থেকে অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছি, কোথাও টাকা পাইনি। পেলে তোমার কাছে এতদূর ছুটে আসতাম না—"

"লোফারকে কে টাকা দেবে। আমিও দেব না। তুমি যাও এখান থেকে—"

ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল অনুমান।

তাকে দেখে ডাক্তারবাবুর কষ্ট হ'তে লাগল।

"বিষ্ণুণ, ও তোমার ভাগ্নে তো—"

"আজ্ঞে হ্যা—"

"তাহলে দিয়ে দি ওকে টাকাটা। বিপদে পড়েছে বেচারা।"

তার পর অনুমানের দিকে চেয়ে বললেন, "তোমাকে একটি শর্তে কিন্তু টাকাটা দেব। তোমাকে আমার বন্ধু হ'তে হবে। খাওয়াদাওয়া হয়েছে তোমার—?"

"না। আমি সমস্ত সকাল টাকাটা যোগাড় করবার জন্য ঘুরছি"

"তাহলে এখানেই খেয়ে যাও। তোমার বন্ধুকেও ডাক। দু'জনেই খেয়ে যাও এখানে। হবিব এদের দু'জনকে খাইয়ে দাও। ওরা আমাদের দোস্ত হয়ে গেছে। হয়ে গেছ তো? না, মনে দ্বিধা আছে এখনও—"

অনুমান কোনও জবাব না দিয়ে মুচকি হেসে চুপ ক'রে রইল।

"আসুন—"

হবিব তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল।

বিষ্ণু ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে বলল—"ওকে আশকারা দিয়ে অন্যায় করলেন ডাক্তারবাবু। বারবার এসে জ্বালাবে আপনাকে। অকালকুষ্মাণ্ড একটি—"

"দেখা যাক না ওর দৌড় কতদূর। গাড়ি ঠিক হল"

"হয়েছে বোধহয়। দেখি এইবার স্টার্ট করে"

বিষ্ণু গাড়ির কাছে গিয়ে হ্যাণ্ডেল দিয়ে স্টার্ট করলে গাড়িটা। তারপর 'সেল্‌ফ' দিয়েও স্টার্ট করল অনায়াসে।

উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল ডাক্তারবাবুর মুখ।

"লোচন তুমি একবার চালিয়ে দেখে নাও।"

লোচন গিয়ে বসল গাড়িতে এবং গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রায়াল দেবার জন্যে।

ডাক্তারবাবু বিষ্ণুকে বললেন—"তুমি এইবার স্নান কর। একসঙ্গে খাব দু'জনে"

"শশধর শশধর—"

শশধরের বাড়ীর সামনে হাঁকাহাঁকি করছিল বিষ্ণুবাবু।

শশধর বাড়ি ছিল না। বীণা বেরিয়ে এল।

"উনি বাড়িতে নেই—"

"ও ফেরি করতে বেরিয়ে গেছে বুঝি। তুমিই তাহলে নিয়ে নাও এগুলো—"

"কি নেব—"

"বিরিয়ানি আর মাংস। ডাক্তারবাবু আজ ময়ূরগঞ্জে হবিবের বাড়িতে ফিস্ট দিচ্ছিলেন। খুব খেয়েছি আমরা। হবিব বললে অনেক বেঁচে গেছে সঙ্গে কিছু নিয়ে যাও। তোমার ওয়ার্কশপের লোকদের দিও। তাদের দিয়েও দেখলাম অনেকখানি বেঁচে গেছে, তাই তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম। এই বাসনগুলো থাক তোমার কাছে এখন, আমি পরে নিয়ে যাব। হবিবকে পাঠিয়ে দিতে হবে—"

বিষ্ণু ট্যাক্সি থেকে নেমে দুটো হাঁড়ি দিয়ে গেল বীণাকে।

বীণার ঘরে আধময়লা ছেঁড়া ফ্রক পরা একটি ছোট মেয়ে বসেছিল। বয়স বছর সাতেক হবে। তার দিকে চেয়ে বীণা বললে—"ঝুমরি তোর কপাল ভালো দেখছি আজ। তোকে পান্‌তা ভাত দেব ব'লে বসিয়ে রেখেছি—বিরিয়ানি এসে গেল তোর ভাগ্যে। নে খা—ওই কাঁসিটা নিয়ে আয়—"

কাঁসিটা নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে ঝুমরি দাঁড়াল এসে। বীণা যখন হাঁড়ি থেকে বিরিয়ানি বার ক'রে দিলে তখন ঝুমরি বলল—"এ সব কি। রং করা ভাত? আগে খাই নি কখনও"

"খেয়ে দেখ না। একে বিরিয়ানি ব'লে। মাংসও নে একটু—"

ঝুমরি একপাশে ব'সে খেতে লাগল।

"কেমন লাগছে—"

"খুব চমৎকার"

"তুই খেয়ে উনুনটা ধরিয়ে দে। এগুলো গরম করে রেখে দি। রাত্রে খাব—"

ঝুমরি চেটেপুটে সব খেয়ে ফেললে। তারপর কাঁসিটি মেজে যথাস্থানে রেখে দিলে। তারপর বাইরে থেকে কাঠ এনে উনুন ধরাতে বসল। ঝুমরি বীণার হাত নুড়কুৎ। ওর মা চাকরানীর কাজ ক'রে বেড়ায় চার পাঁচটা বাড়িতে। ঝুমরি বীণার কাছে এসে ব'সে থাকে। ছোটখাটো ফাইফরমাশ খাটে। তার বদলে বীণা ওকে একটু আধটু খেতে দেয়। পয়সাও দেয় মাঝে মাঝে। রোজ ওর জন্যে আলুকাবলি রেখে দেয় একটু। এতেই ঝুমরি খুব খুশী। বীণা বলেছে ওকে একটা নতুন ফ্রক কিনে দেবে। শশধরের সময় হচ্ছে না ব'লে কিনে আনা হচ্ছে না। উনুন ধরানো হলে বীণা এক গামলা জল চড়িয়ে দিল তাতে। তারপর মুখঢাকা দুটো অ্যালুমিনিয়মের কৌটোতে আলাদা আলাদা করে বিরিয়ানি আর মাংস রেখে গরম জলের উপর বসিয়ে দিলে সেগুলো একে একে।

ঝুমরি খালি হাঁড়ি দুটো মাজতে যাচ্ছিল।

বীণা বললে—"তুই পারবি না। আমি মেজে রেখে দেব। তুই বরং আলুর খোসাটোসাগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে আয়—"

আলুকাবলির জন্য যেখানে আলু ছাড়ানো হয়েছিল সেখানটা পরিষ্কার করে ফেললে ঝুমরি।

"এইবার মানতি মাসীর জন্যে একটু হর্লিক্‌স্‌ করি—"

গরম জলের গামলাটা নাবিয়ে ছোট একটা কেতলিতে গরম জল চড়িয়ে দিলে বীণা।

হর্লিক্‌স্‌ তৈরি করতে বেশী দেরি হল না তার। কেতলিতে করেই হর্লিক্‌স্‌ নিয়ে গেল সে। আর সামান্য একটু আলুকাবলি ছোট্ট একটি বাটি করে লুকিয়ে নিল আঁচলের আড়ালে।

"ঝুমরি তুই বোস। আমি মানতি মাসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি। আমি না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যাসনি যেন।

ঝুমরি ঘাড় নেড়ে জানাল সে ব'সে থাকবে। সে জানে বীণাদি এর জন্যে তাকে অন্ততঃ একটা পাঁচ নয়া দেবে।

বীণাকে দেখেই মানতি মাসী বললে—"কি আনলি আবার।"

"হর্লিক্‌স্‌ এনেছি। ডাক্তারবাবু সাবুর বদলে হর্লিক্‌স্‌ দিতে বললেন—"

"তুই মুখপুড়ি ডাক্তারের কাছে গেসলি না কি! ও ডাক্তার কিচ্ছু জানে না। হর্লিক্‌স্‌ আমি খাব না। মিষ্টি জিনিস মুখে আর রুচছে না আমার। আমাকে একটু তরকারি এনে দে। হর্লিক্‌স্‌ আবার কোথা থেকে পেলি তুই"

"ছিল আমার কাছে। একটু খেয়ে দেখো না। হর্লিক্‌স্‌ খেয়ে নাও, তারপর তরকারি দেব একটু। আলুকাবলি এনেছি, বেশী কিন্তু দেব না"

এক চুমুকে হর্লিক্‌স্‌ খেয়ে মানতি মাসী বললেন—"বিচ্ছিরি। কেন যে লোকে পয়সা দিয়ে এসব কিনে খায়। তোর কাছে ছিল? তুই খাস না কি"

বীণা মিথ্যা কথা বলল।

"মাঝে মাঝে খাই। আমার তো বেশ লাগে। শরীরে বেশ বল পাই। এটুকু তুমি খেয়ে নাও মানতি মাসী—"

"তুই আমাকে জ্বালালি মুখপুড়ি। ভাত ডাল তরকারি না খেলে শরীরে বল হয় না।"

"দুদিন পরে তাও খাবে। আজ এটা খেয়ে নাও। তারপর আলুকাবলি দিয়ে একটু ভালো মুখ কোরো—"

মানতি মাসী সহসা ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"তুই আমার জন্যে এত ক'রে মরছিস কেন। আমি তো তোর কেউ নই। আমি ম'রে গেলেই বা কি ক্ষতি হবে কার—"

"মাসী এইবার আমি রাগ করব। ওসব বাজে কথা বলছ কেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমার বাড়ি গিয়ে অনেক কাজ আছে—"

মাসী আর কিছু না ব'লে হর্লিক্‌স্ খেয়ে ফেললেন। তারপর আলুকাবলি খেয়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

"ওমা কি চমৎকার হয়েছে। মোটে এইটুকু এনেছিস"

"পরে বেশী দেব। আজ এই খেয়েই আবার জ্বর না এলে বাঁচি"

"কিচ্ছু হবে না। আর একটু আনলেই পারতিস। আলুকাবলি তো নয় যেন অমৃত"

মানতি মাসীকে খাইয়ে বীণা আবার বাড়ির দিকে ফিরল।

মানতি মাসী ছোট একটি ঘর ভাড়া করে থাকেন। এককালে নাকি অবস্থা ভালো ছিল। স্বামী পুত্র সব ম'রে গেছে। বিষয়-আশয় বিকিয়ে গেছে দেনার দায়ে। মানতি মাসী একাই থাকেন এখন। নানারকম কাজ জানেন। কাঁথা সেলাই, জামা সেলাই, উল বোনা, মোজা বোনা এইসব কাজ ক'রে রোজগার করেন কিছু। বড় লোকের বাড়িতে বিয়ে পৈতের সময়ও মানতি মাসীর ডাক পড়ে। খুব ভাল রাঁধতে পারেন তিনি। এই সব করেই যা রোজগার হয় তাতেই দিন কেটে যায় তাঁর। এককালে নাকি বড় পরিবারের মেয়ে ছিলেন, কিন্তু সে বড় পরিবার কালের অতলে কবে কোথায় তলিয়ে গেছে। মানতি মাসী যতদিন সুস্থ ছিলেন নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে কারও সাহায্য না নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, কিন্তু অসুখে পড়েই বিপদে প'ড়ে গেছেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা সবাই ভালবাসত তাঁকে। তাদেরই সাহায্যে আর ওই ডাক্তারবাবুর দয়ায় এ ধাক্কাটা সামলে গেলেন। শশধর আর বীণা—বিশেষ ক'রে বীণা তাঁর যে সেবাটা করেছে তা তাঁর আপনজনরাও করত না বোধহয়। কলকাতায় তাঁর কিছু কিছু আপনজন আছে কিন্তু তারা খবরটা পর্যন্ত নেয় না। বীণা তাঁর অসুখের সময় রাত জেগেছে, ওষুধ খাইয়েছে, এমন কি মলমূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করেছে। ডাক্তারের বাড়ি বার বার গেছে, বাড়ি থেকে পথ্য তৈরি ক'রে এনে খাইয়েছে। অথচ বীণার সঙ্গে তাঁর কতটুকু আলাপ। তাঁর কাছে উল বোনা শিখতে আসত। কয়েক রকম প্যাটার্ণ শিখিয়ে দিয়েছেন তাকে। বড় ভালো মেয়েটি। শশধরও ভালো। কিন্তু বীণার তুলনা হয় না। বীণা চলে যাওয়ার পর মানতি মাসীর মনে একটি বাসনা জাগল। বীণার জন্য তিনি মেরুন রঙের একটি উলের ব্লাউজ বুনে দেবেন ভালো হয়ে উঠে। কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছেন তিনি, বিপদে আপদের দিনে কাজে লাগবে বলে। বেশী নয় শ'খানেক টাকা। পোস্টঅফিসে জমা আছে। সেই টাকা বার করে উল কিনবেন তিনি

বীণার জন্য। পাড়ার হরিপদবাবু কলকাতা যান। তাঁর হাত দিয়েই উল আনান তিনি কলকাতা থেকে। কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে তাঁর একটি চেনা দোকান আছে, বেশ ভাল উল দেয়। মেরুন রঙের উলের স্যাম্পল তাঁর আছে। সেইটা দিয়ে দেবেন তিনি হরিপদবাবুকে ঠিক ওই রকম রঙের যেন হয়। বীণা চলে যাওয়ার পর এইসব কথাই ভাবতে লাগলেন মানতি মাসী।

মানতি মাসীর বাড়ি থেকে বেরিয়েই বীণার দেখা হয়ে গেল চোং প্যান্ট পরা বিকাশের সঙ্গে। ফক্কড় ছোকরা। শশধরের ফ্রেন্ড। রাস্তায় বীণাকে একলা পেয়ে একটু ইয়ার্কি করবার চেষ্টা করে। একটু এগিয়ে এসে বলল—"বীণা আজ কার বাড়িতে বাজতে গিয়েছিলে?"

বীণা কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল।

বিকাশ নাছোড়। পিছু পিছু এসে তার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে হেসে বলল—"এত রাগ কেন বান্ধবী—"

"রাস্তা ছাড়ুন"

"রাস্তা তো সকলের। তোমার একলার নয়—"

আর একটু এগিয়ে এল বিকাশ।

এর পর বীণা যা করল তা অপ্রত্যাশিত। সে বিকাশের গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে হনহন ক'রে এগিয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিকাশ। তারপর হেসে উঠল। চীৎকার ক'রে কবিতায় বলল 'তিরস্কারই পুরস্কার মোর।' এই ব'লে আবার তার পিছু পিছু আসতে লাগল দ্রুতবেগে। বীণা ছুটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু ডাক্তারবাবুর মোটরখানা এসে পড়াতে বীণা ছুটে গিয়ে তার সামনে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। মোটর থেমে গেল। ডাক্তারবাবু মোটরে ছিলেন। হবিবের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন তিনি।

"কি হয়েছে?—"

"ওই ছেলেটা আমার পিছু পিছু তাড়া করেছে—"

"কোন ছেলেটা"

বিকাশ তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। পালাবে কিনা ভাবছে।

"ওই ছেলেটা? দামোদরের ছেলে মনে হচ্ছে—ওহে শোন এদিকে—"

বিকাশকে এগিয়ে আসতে হল।

"কি কাণ্ড করছ তুমি। এর পিছু নিয়েছ কেন? ভদ্রলোকের ছেলে না তুমি! এসব কি কাণ্ড! এস গাড়িতে উঠে বস।"

বিকাশ ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল।

ডাক্তারবাবু তখন বীণার দিকে ফিরে বললেন—"তুমি কোথায় থাকো। তুমিও উঠে বস। তোমাকেও পৌঁছে দিচ্ছি। কোথায় থাক তুমি?"

"আমায় পৌঁছে দিতে হবে না। কাছেই আমার বাড়ি—"

"কার মেয়ে তুমি—"

"আমার বাবার নাম ছিল সুশীল। আমরা পাশের গাঁয়ে কুণ্ডু পাড়ায় থাকতাম। আমার বাবা মা কেউ নেই, দু'জনেই মারা গেছেন—"

"ওঠ গাড়িতে ওঠ, তোমার বাড়িটা দেখে যাই—"

একটু গিয়েই বীণা বললে—"থামান। এইটে আমার বাড়ি—"

"আরে এ বাড়ি তো আমার চেনা। শশধরের বাড়ি তো? তুমি শশধরের কে হও—"

বীণা লজ্জায় মাথা হেঁট করল।

শশধর বাড়ীতেই ছিল। বেরিয়ে এল সে।

"আরে, ডাক্তারবাবু যে। আপনি একে কোথায় পেলেন?"

"এ রাস্তায় আমার মোটর থামিয়েছিল। ওই ছোকরা বিরক্ত করছিল একে রাস্তায়। ওকে চেনো না কি?"

"চিনি বই কি। বিকাশ তো"

বিকাশ বললে—"আমি কিছু করিনি, শুধু একটু রসিকতা করেছিলাম। উনি চটাস ক'রে আমার গালে একটা থাপ্পোড় মেরে বসলেন। তারপরই ডাক্তারবাবুর মোটরটা এসে পড়ল। বিশ্বাস করুন—আমি—"

বীণা ভিতরে ঢুকে পড়েছিল।

"ও মেয়েটি তোমার কে হয়—"

"ও আমার বউ—"

ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন—"বাহাদুর মেয়ে তো—"

তারপর বিকাশের দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি পরের বউয়ের সঙ্গে রাস্তায় রসিকতা করতেই বা গেলে কেন। কাজটা ভাল করনি। মাপ চাও ওর কাছে। শশধর তোমার বউকে ডাক—"

শশধর ডাক দিতেই বীণা বেরিয়ে এল।

ডাক্তারবাবু আদেশের ভঙ্গীতে বললেন—"তুমি ওর পায়ে হাত দিয়ে বল, আমার দোষ হয়েছে আমাকে মাপ করুন। আর কখনও এমন করব না—"

বিকাশ ঘাড় গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"যা বলছি কর। তা না হলে সোজা তোমায় থানায় নিয়ে গিয়ে রমজান দারোগার কাছে দিয়ে আসব। সে অসভ্য লোকদের শায়েস্তা করতে জানে—"

বিকাশ দেখল বেগতিক। ডাক্তারবাবু চটেছেন। যা বলছেন তা না করলে ঠিক থানায় নিয়ে যাবেন।

বাধ্য হয়ে তখন সে বীণার পা ছুঁয়ে বলল—"আমায় মাপ করুন। আর কখনও এমন করব না।"

"দ্যাট্‌স্ গুড্"—সহর্ষে ব'লে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

তারপর শশধরের দিকে চেয়ে বললেন—"তোমার আলুকাবলি তৈরি হয়ে গেছে? দাও ওকে কিছু। আমি তো তোমার বাঁধা খদ্দের। রোজই কিনি। আজ যখন তোমার বাড়িতে এসে গেছি তখন আমার ভাগটা এখানেই দিয়ে দাও, আমার বাড়ি পর্যন্ত তাহলে আর হাঁটতে হবে না তোমাকে—এই নাও।"

ডাক্তারবাবু একটা টাকা বার ক'রে দিলেন।

"সবটাই ওকে দাও। আমার আজ গুরুতর খাওয়া হয়েছে হবিবের বাড়িতে। আজ আর কিছু খাব না"

বীণা ঘরে গিয়ে অনেকটা আলুকাবলি বার ক'রে দিল বিকাশকে। দেখা গেল

তার সঙ্গে দুটি সন্দেশও এনেছে সে। বিকাশের হাতে সেটা দিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এল সে। বিকাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেয়ে ফেললে সবটা।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"আলুকাবলি কেমন হয়েছে"

"চমৎকার"

"রোজই চমৎকার হয়। আমি তো ওর বাঁধা খদ্দের। কে রাঁধে, তুমি না তোমার বউ"

শশধর ঘাড় চুলকে বললে—"আমার বউ। ওই সব করে—"

"তাহলে তো ও মস্ত বড় আর্টিস্ট দেখছি। ওকে একটা প্রাইজ দিতে হয়।"

বীণা মুচকি হেসে ঘরের ভিতর চলে গেল।

ডাক্তারবাবু বিকাশকে বললেন—"চল তোমাকে তোমার বাবার কাছে জমা দিয়ে আসি। দামোদর একজন পণ্ডিত লোক, তাঁর ছেলে হ'য়ে তুমি এ কি কাণ্ড করলে বল দেখি—"

বিকাশ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলল—"বাবাকে কিন্তু কিছু বলবেন না যেন।"

হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

"না না আমি তত বেরসিক নই। কারো নামে চুকলি করি না। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে তুমি এবার ভদ্র হবে। নাও উঠে বস। লোচন চল এবার—"

ডাক্তারবাবুর গাড়ি চলে গেল।

বীণা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আলমারির পিছন দিক থেকে ঘরর ঘরর করে শব্দ হচ্ছে একটা। আলমারির পিছন দিকে গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। ঝুমরি নাক ডাকাচ্ছে। ঘেমে নেয়ে গেছে মেয়েটা।

শশধরকে বললে—"ঝুমরির কাণ্ড দেখ। আমি মানতি মাসীর ওখানে যাবার সময় ওকে ব'লে গেলাম—তুই বাড়ি পাহারা দে, আমি আসছি এখুনি। মেয়ের পাহারা দেবার ছিরি দেখ—"

শশধর বলল—"ওর দোষ নেই। আমি এসে দেখলাম ও বাইরের দরজার কাছে ব'সে ঢুলছে। আমি বললাম তুই বাড়ি যা। ও বললে দিদি আমাকে এখানে থাকতে ব'লে গেছে। আমি তখন বললাম তাহলে ঘুমো ওইদিকে শুয়ে—তাই আলমারির পিছনে গিয়ে শুয়েছিল—"

"ঝুমরি ঝুমরি ওঠ—"

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল ঝুমরি। ঘুমিয়ে পড়েছিল ব'লে লজ্জিত হয়ে পড়ল খুব।

"বাড়ি যা এবার। এই নে—"

পুজোর জন্যে সন্দেশ আনিয়েছিল বীণা। একটি অবশিষ্ট ছিল সেটি দিয়ে দিলে ঝুমরিকে। ঝুমরি খুশি মুখে সন্দেশটি খেয়ে চ'লে গেল।

"আমাকে খেতে দাও এবার"—শশধর বীণার দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে ফেললে এবং বীণা জিজ্ঞাসা করবার আগেই বলল—"আমার ফিরতে আজ দেরি হয়ে গেছে—"

"কি করছিলে, এতক্ষণ"

"সত্যি কথা বললে রাগ করবে না তো?"

"রাগ করব কেন—"

"ঘ্ড়ি ওড়াচ্ছিলাম। ন্যাড়া আমাকে একটা লাটাই আর ঘ্ড়ি যোগাড় ক'রে দিল। কেটে দিয়েছি ওর ঘ্ড়ি—"

"খেয়ে তো এখ্নি বেরোতে হবে ফেরি করতে। বিশ্রাম হবে না আজ। শরীরটি খারাপ না হয়—"

"কিচ্ছ্ হবে না। দাও খেতে—"

"আজ বিষ্ণ্বাব্ পোলাও মাংস দিয়ে গেছেন। ওই গরম জলে বসিয়ে রেখেছি। আর একট্ গরম করি দাঁড়াও"

"বিষ্ণদা দিয়ে গেছেন? হঠাৎ?"

"ডাক্তারবাব্ কোথায় না কি ফিস্ট করছিলেন—"

"ও। উনি মাঝে মাঝে ফিস্ট করেন। এবেলা কি খাব, ভাত না পোলাও—"

"ভাত ওবেলা খেও। ভাত এবেলা আর রাঁধি নি। মাছের ঝাল করেছি। ওবেলা গরম ভাত রেঁধে দেব—"

"বেশ, বেশ। খাসা হবে—"

খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে শশধর বললে—"কটা বেজেছে এখন?"

"সাড়ে চারটে—"

"তাহলে একট্ গড়িয়ে নি। বড্ড খাওয়া হয়ে গেছে। পাঁচটার সময় আমাকে উঠিয়ে দিও—"

শশধর বিছানায় শ্য়ে পড়ল।

৫

ডাক্তারবাব্ নিজের বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় ইজিচেয়ারে শ্য়ে 'ঠাকুমার ঝ্লি' পড়ছিলেন। শিশ্পাঠ্য বই পড়তে তিনি খ্ব ভালবাসেন। ধর্মগ্রন্থ বা খবরের কাগজ পড়েন না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের দিকেও ঝোঁক নেই। বলেন—ওসব আমার মাথায় ঢোকে না। তিনি বাংলা ইংরেজীতে যত শিশ্পাঠ্য বই আছে তা কিনেছেন। যে বইগ্লো ভালো লাগে বার বার পড়েন। Alice in Wonderland, কঙ্কাবতী, Mary Tood's Last Term—এই ধরনের বই তিনি এতবার পড়েছেন যে ম্খস্থ হয়ে গেছে। তাঁর বন্ধ্ রিটায়ার্ড মন্সেফ রঞ্জন সেন তাঁর র্চি পরিবর্তন মানসে একবার তাঁকে একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে দিয়েছিলেন। দ্'চার পাতা পড়েই ডাক্তারবাব্ আঁৎকে উঠলেন—ওরে বাবা এ যে খ্নজখমের ব্যাপার দেখছি। দশ পাতা পড়তে না পড়তেই দ্টো খ্ন হয়ে গেল—ও আমি পড়ব না, ওতে আমার তৃপ্তি হবে না। 'ঠাকুমার ঝ্লি'ও তাঁর অনেকবার পড়া বই। আবার পড়ছিলেন সেদিন।

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে অন্মান কর এসে হাজির হল। এসে প্রণাম করল না ম্চকি হেসে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তারবাব্ই শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন—"কি হে কি খবর তোমার বস বস—"

কাছে একটা চেয়ার ছিল, সেইটের উপর বসল অনুমান।

"তোমার পার্টির ঝামেলা মিটে গেছে ?"

"হ্যাঁ, ও পার্টি আমি ছেড়ে দিয়েছি। বড্ড বখেড়া করে, তাছাড়া ওদের আইডিয়ালের সঙ্গে আমার মিলছেও না আজকাল"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন—"তুমি কি কর—"

প্রশ্নটা শুনে একটু হকচকিয়ে গেল অনুমান।

তারপর ঢোঁক গিলে বলল—"আমাদের পার্টির জন্যে ক্যানভাস ক'রে বেড়াই—"

"কি পার্টি—"

"শংকরদা যে নতুন পার্টিটা করেছেন—অল ইণ্ডিয়া ইউথস লীগ—"

"কি কাজ সে পার্টির"

"দেশের উন্নতি করা। দেশ যে ডুবে যাচ্ছে দেখছেন না"

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, "দেশের সেবা করবার জন্যে কোন পার্টি গড়বার প্রয়োজন নেই। তোমার আশেপাশেই অনেক দুঃস্থ লোক পাবে তাদের সেবা করলেই দেশ-সেবা করা হবে। আমি জিগ্যেস করেছিলাম—তুমি কি কর। অর্থাৎ নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে কি ব্যবস্থা করেছ ? চাকরি, না ব্যবসা—"

"ব্যবসা করি না। আই হেট্ ব্যবসা। ব্যবসাদাররাই শেষে ক্যাপিটালিস্ট্ হয়। আমি দেশের সেবক হয়ে চিরকাল দেশের সেবা করব—"

"কিন্তু তোমার অন্নবস্ত্র যোগাবে কে"

"দেশই যোগাবে। যে পার্টি দেশের সেবা করছে তারাই আমাদের কিছু কিছু দেয়—"

"ও। তার মানে পার্টির চাকরি কর। মন্দ নয় এটা, পার্টি যদি নির্ভরযোগ্য হয়। গভর্নমেণ্ট চাকরিই অবশ্য সবচেয়ে ভালো। তুমি লেখাপড়া করেছ কত দূর"

চুপ করে রইল অনুমান।

তারপর বলল, "ছেলেবেলা থেকেই আমি দেশের কাজ করি। লেখাপড়ার দিকে তেমন মন ছিল না। সুযোগও পাইনি—"

ডাক্তারবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

"তোমার সব খবর আমি বিষ্ণুর কাছ থেকে পেয়েছি। তোমার সব খবর জানি আমি। মিথ্যে কথা বলছ কেন। মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ। আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই, তুমি যদি মহাপাপী হও তাহলে তো পারবো না। সকলের পড়তে ভালো লাগে না জানি, বদসঙ্গে মিশে অনেকে কুপথে চলে যায় এও মানি, দুঃখদারিদ্রের জন্যও অনেকে অকাজ কুকাজ করে এও কারও অজানা নয়। পৃথিবীতে এসব অহরহ হয়। সেই মানুষকেই আমি সেরা মানুষ বলি যে নিজের ভুল দোষ ত্রুটিকে স্বীকার করতে দ্বিধা করে না। পৃথিবীতে কার দোষ নেই ? সবারই একটু আধটু দোষ আছে। মিথ্যে কথা ব'লে নিজের দোষ ঢাকতে যাওয়াটাই কাপুরুষতা, ওইটেই মহাপাপ। এ কাজ আর কোরো না ভাই। তোমার পার্টি তোমাকে কত মাইনে দেয় ?"

"মাইনে ঠিক দেয় না। মাঝে মাঝে টাকা দেয়। গড়পড়তা মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা হয়ে যায়"

"খেতেটেতে দেয়—"

"রোজ দেয় না, মাঝে মাঝে দেয়"

"এ কাজ ভালো লাগে তোমার ? সত্যি কথা বল—"

অনুমান চুপ ক'রে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল—"ভাল না লাগলেও করতে হয়। এ ছাড়া আর কি করব বলুন। ক্লাস নাইন পর্যন্ত বিদ্যে। অন্য চাকরি কোথায় পাব ? মামা মোটরের কাজ শেখাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওই নোংরা কাজ শিখতে ইচ্ছে হ'ল না আমার। সর্বদা কালিঝুলি মেখে থাকতে হয়, তাছাড়া সর্বদা খাটুনি, রোদ নেই বৃষ্টি নেই—"

"ঠিক বলেছ। মোটরের কাজ সবাই পারে না। আমার লোচন তো এত বাবু যে একটি নাট্ বলটু পর্যন্ত ঘোরাবে না। সর্বদা ফিটফাট হ'য়ে থাকতে চায়। তবে ড্রাইভ করে চমৎকার। তুমি ওই পার্টির চাকরিই করবে বরাবর ঠিক করেছ না কি"

"তাছাড়া আর উপায় কি। কাজটাও ভালো, দেশের কাজ—"

"দেখ দেশের কাজ করছি ব'লে যারা হাটেমাঠে বক্তৃতা ক'রে বেড়ায় তারা দেশের কাজ কতদূর করে তা জানি না তবে নিজেরা শেষ পর্যন্ত বেশ হোমরাচোমরা হয়, বেশ গুছিয়েগাছিয়ে নেয়। দেশের দুর্দশা তো একটুও কমেনি কোথাও। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব, চাকরির অভাব, ভব্যতার অভাব,—নানারকম অভাবে দেশ মৃতপ্রায়। চোর ডাকাত গুন্ডাদের শাসন করবার লোক নেই। শাসনকর্তাও হয় অপটু, না হয় অসাধু। দেশের কাজ করবে এই মনে ক'রে তুমি যদি কোন পার্টিতে যোগ দিয়ে থাক তাহলে তোমার ভুল ভাঙতে বেশী দেরি হবে না। দেশের কাজ কেউ করে না, দেশকে কেউ ভালবাসে না। যারা ভালবাসে তারা কোন পার্টিতে যোগ না দিয়েই দেশের সেবা করতে পারে। একজন ক্ষুধার্তকে খেতে দেওয়া মানেই দেশ-সেবা, একজন আতুর সেবা করা মানেই দেশ-সেবা। কোনও পার্টিতে যোগ না দিয়েও ত করা যায়। আমি ভাবছি পার্টির চাকরি করলে তোমার স্বচ্ছন্দে চলবে কি না। যতদূর বুঝতে পারছি চলবে না। তোমাকে ওরা যে মাইনে দেয়, আমার বাড়ির চাকর তার চেয়ে বেশী মাইনে পায়। আমি একটা কথা ভাবছি, বিষ্ণুের সঙ্গেও কথা হয়েছে এ বিষয়ে। বিষ্ণুকে আমি খুব ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। তুমি যদিও তার নিজের ভাগনে নও, কিন্তু তবু তোমার জন্যে ও কি না করেছে বল। তোমাকে ভালও বাসে খুব। তাই ভাবছি—অবশ্য তার আগে তোমার মতটা জানা দরকার—"

"কি বলুন—"

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার এখানেই তুমি থাকতে পার। আমি তোমার খাওয়া-পরার সব ভার নিতে রাজী আছি। তাছাড়া তোমার ওই পার্টি তোমাকে মাসে মাসে যে পঞ্চাশ টাকা দেয় তাও দেব। তুমি আমার কাছে থাকবে আর আমার ফাইফরমাশ খাটবে। আমি বুড়োমানুষ সংসারে আমার কেউ নেই তোমরা পাঁচজন এসে আমার বাকি দিন ক'টা কাটিয়ে দাও—"

অনুমান বলল—"আমাকে কি কি করতে হবে—"

"প্রথমত তোমাকে অনেস্ট হতে হবে। মিথ্যে কথা বলা চলবে না। আমাকে নিজের লোক মনে করতে হবে, কোনও জিনিস মনে চেপে রেখে ভেতর-বুদে হয়ে থাকা চলবে না। মনের কথা সব খোলাখুলি বলবে আমাকে। আর কাজ? আমার ফাইফরমাশ খাটা। কোথাও ধর কোনদিন মাছ ধরতে গেলুম, তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত তোমাকে করতে হবে। কোথাও হয়তো ঘুড়ি-ওড়ানো কর্মাপিটিশন করলাম, কিংবা হয়তো চড়ুইভাতি করলাম তার ব্যবস্থা তুমি করবে। নানারকম খেয়ালে থাকি তো, একজন সহকারী পেলে ভালো হয়। লোচনটা সব পারে না, তাই একজন লোক খুঁজছি—"

হঠাৎ স্থানীয় দারোগা যতীনবাবু এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে একজন পুলিশ কনেস্টবল।

"এই যে এখানেই আছে দেখছি। আপনার নাম কি অনুমান কর"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। আপনি অহিন ব'লে একটি ছেলের নাকে ছুরি মেরেছেন, আপনাকে অ্যারেস্ট করলুম আমি—"

ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন—"সে কি! ওকে যে আমি কাজে বহাল করলুম এখুনি"

"করবেন না। ডেনজারাস ক্যারেকটার—"

"কিন্তু ক'রে ফেলেছি যে। তাহলে ওর হ'য়ে কেস লড়তে হয়—"

দারোগাবাবু কনেস্টবলকে বললেন—"তুমি একে থানায় নিয়ে যাও"

অনুমান হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—"আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু"

"ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তুমি থানায় যাও"

কনেস্টবলের সঙ্গে অনুমান থানায় চলে গেল।

যতীনবাবু ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করলেন—"এই লোফারটার উপর আপনার সহানুভূতি কেন"

"ও লোফার বলেই। দেশসুদ্ধ সবাই তো লোফার। স্বাধীনতার পর থেকে সারা দেশটাই লোফারের দেশ হয়ে গেছে। কারও ভদ্রভাবে সৎপথে থাকবার উপায় নেই। তাই চারদিকে নানা রকম পার্টি আর গুন্ডা বদমায়েশের দল। আর তাছাড়া আছে নানা ধরনের কালোবাজারি আর খোশামুদে। এরাই নাকি গভর্নমেণ্টকে হাত ক'রে রেখেছে শুনি। সত্যি মিথ্যে অবশ্য জানি না। এ ছোকরার অনেক দোষ আছে তা আমি জানি। সব জেনে শুনেই ওকে বাহাল করেছিলাম, ভেবেছিলাম নিজের কাছে রেখে সদ্ব্যবহার ক'রে যদি ওকে ভাল করা যায়। ও একজনকে ছুরি মেরেছিল? বলেন কি! কাকে ছুরি মেরেছে—"

"সে-ও একজন নামজাদা গুন্ডা। কিন্তু তাকে শাসন করবার অধিকার তো ওই ছোকরার নেই। সে অধিকার আমাদের—"

"কিন্তু আপনারা শাসন করতে পারছেন কি? রোজই তো চারিদিকে নানা ধরণের বে-আইনী কাণ্ড হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি—"

"আমরা যতদূর পারি করছি। আচ্ছা, উঠি এবার তাহলে। আমার কথা

যদি শোনেন এ ধরণের লোকের সংস্রবে আপনি থাকবেন না। আপনি ভালোমানুষ লোক, এদের চেনেন না—”

“খুব চিনি। ওরা অসহায়। আপনারা যদি ওর নামে কেস করেন আমি ওকে ডিফেন্ড (defend) করব। লোচন নরেনবাবু উকীলকে ডেকে আন তো। আপনার স্ত্রী কেমন আছেন দারোগাবাবু—”

“খুব ভাল আছে। খুব ভাল ওষুধ বাতলেছেন। বেল খাওয়ার পর থেকে পেটের আর কোনও কষ্ট নেই”

“ওইটেই চালিয়ে যান”

“আচ্ছা—”

লোচন বেরিয়ে এসে বলল—“গাড়িটা নিয়ে, না এমনিই যাবো”

“গাড়িটা নিয়েই যাও। যদি আসতে চান নিয়ে এস”

৬

বিষ্ণু একটা বড় গাড়ি খুলেছিল। তার ডিফারেনশিয়াল ঠিক করছিল। একজন বড়লোকের গাড়ি। অনেক টাকা দেবে। বিষ্ণু গাড়ির তলায় ছিল। এমন সময় থানা থেকে একজন কনেস্টবল এসে বলল—“বিষ্ণুবাবু আপ থানামে চলিয়ে—দারোগা সাহেব বোলাতে হে”

“থানায় ? এখন তো যেতে পারছি না। পরে যাব। ডাকছেন কেন—”

“আপকো ভাগনাকো অ্যারেস্ট কিয়া গিয়া হ্যয়। অগর আপ জামিন হোইয়ে তো উসকো ছোড় দিয়া যায় গা। আপ চলিয়ে—”

“আমার ভাগনা ? অনুমান ?”

“জি হাঁ—”

“আমি ওর জামিন হব না। তোমরা ওকে নিয়ে যা খুশি করো—”

“ই বাত ভি থানামে যাকে বোলনে পড়ে গা। আপ চলিয়ে—”

“এ তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। হালিম তুমি তাহলে এগুলো পেট্রল দিয়ে সাফ ক'রে রাখ। আমি থানা থেকে ঘুরে আসছি—”

বিষ্ণু শুধু গায়েই গাড়ীর নীচে ঢুকেছিলেন। গামছা দিয়া গা হাত পা মুছে কারখানার কালি-ঝুলি মাখা লম্বা কোটটা পরেই বললেন—“চল”।

থানায় গিয়ে দেখলেন—অনুমান থানার বারান্দায় ব'সে আছে একধারে। বিষ্ণুকে দেখেই ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল।

“মামা বিশ্বাস কর আমার কোন দোষ নেই। ওই অহিন একটা ছোরা নিয়ে আমারই নাক কাটতে এসেছিল, আমি তখন আত্মরক্ষার জন্য একটা পেন-নাইফ ওর মুখের দিকে ছুড়ে দি। তাতে ওর নাকে সামান্য একটু লেগেছে। ওই আমাকে প্রথমে মারতে এসেছিল—”

বিষ্ণু তার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দারোগাবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"এই যে বিষ্ণুবাবু আসুন। এই ছোকরা কি আপনার ভাগনে?"

"হ্যাঁ—"

"ও তো একটা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছে। ও অবশ্য বলছে যে আহিন ছোরা নিয়ে ওকে মারতে গিয়েছিল, ও সেল্‌ফডিফেন্সে একটা পকেট পেন-নাইফ ওর মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। তা যদি হয় তাহলে ওকে আমরা ছেড়ে দেব। সাজাও বিশেষ কিছু হবে না। তবে আপনাকে ওর জামিন হ'তে হবে। এস-পিকে ফোন করেছিলাম তিনি বললেন বিষ্ণুবাবু যদি জামিন হন ছেড়ে দিন। কোর্টে যেদিন মকোর্দমা হবে সেদিন কোর্টে হাজির থাকলেই চলবে"

বিষ্ণুবাবু বললেন—"এ ঝুঁকি আমি নেব কেমন ক'রে বলুন। ও ছেলে আমার কনট্রোলের বাইরে। কোথায় থাকে কি ক'রে কিছু জানি না"

"কিন্তু কেউ জামিন না হলে ছেড়ে দিই কি ক'রে। লক্‌আপে রাখতে হয়"

"তাই রাখুন—"

এমন সময় একটা গাড়ী এসে ঢুকল। ডাক্তারবাবুর গাড়ি। গাড়িতে নরেনবাবু উকীল আর ডাক্তারবাবু।

বিষ্ণুকে দেখেই তিনি বললেন—"কি কাণ্ড হয়েছে শুনেছ তো আমি তোমার ভাগনাকে বাহাল ক'রে নিয়েছি—"

"কিন্তু ওরা বলছে ওকে এখন ছাড়বে না"

"আমি আর নরেন দু'জনেই জামিন হব। ছাড়বে না মানে?"

ডাক্তারবাবু আর নরেনবাবু দারোগা সাহেবের ঘরে গেলেন।

দারোগা বললেন—"আপনারা যদি জামিন হন এক্ষুনি ছেড়ে দেব। তবে যেদিন মকোর্দমা হবে সেদিন ও যেন কোর্টে হাজির থাকে দেখবেন"

নরেনবাবু বললেন—"নিশ্চয় থাকবে, আমরা কথা দিচ্ছি—"

"বেশ"

বিষ্ণু সবিস্ময়ে দেখছিল সব।

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে এগিয়ে গেল সে ডাক্তারবাবুর কাছে। মৃদুকণ্ঠে বলল, "আপনি ডাক্তারবাবু এর জামিন হচ্ছেন নাকি"

"তাছাড়া আর উপায় কি। ও আমার কাজে বহাল হয়েছে—"

বিষ্ণু আর কিছু না ব'লে চুপ ক'রে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না।

ডাক্তারবাবুকে সে ভাল করেই চেনে।

ডাক্তারবাবুর গাড়ি চড়েই সকলে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ফিরে এলেন। অনুমানও এল।

ডাক্তারবাবু গাড়ি থেকে নেমেই অনুমানের হাতে দশটা টাকা দিয়ে বললেন, "কিছু ভালো মিষ্টি কিনে নিয়ে এস। আমি তোমাকে কাজে বহাল করলুম এবং পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হয়ে থাকব এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হলুম—এই ব্যাপারটাকে মিষ্টান্নসহযোগে স্মরণীয় করা যাক। কি বল নরেন—"

নরেনবাবু বললেন—"আমার ডায়াবিটিস আছে, আমি মিষ্টি খাই না"

"তাহলে কিছু নোনতা খাবারও এন"

"আমি পরে এসে খেয়ে যাব, এখন চললুম। আমার একজন মক্কেল এসে বসে আছে—"

"আচ্ছা তাহলে যাও। পরে এসো কিন্তু—"

"আসব"

নরেনবাবু চলে গেলেন।

বিষ্ণু একধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। চুপ ক'রেই রইলেন তিনি।

"বিষ্ণু অমন গুম হয়ে আছ কেন। কিছু বক্তব্য থাকে তো বলেই ফেল না"

"কাজটা আপনি ভালো করলেন না ডাক্তারবাবু। ওসব বখা ছেলেদের চেনেন না আপনি। আপনাকে হয়তো বিপদে ফেলে দেবে। কাজটা—"

বিষ্ণু থেমে গেলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন—"অবিবেচনার হল—এই তো? দেখ বিষ্ণু সারাজীবন ধরে আমি এই রকম অবিবেচনার কাজ করেছি। ওই যে মোটরটা নিয়ে তুমি প্রায়ই হিমশিম খাও সেটা বেচে দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ ছিল। আমি যা করি তার কোনটাই বুদ্ধিমানেরা করে না। কিন্তু এতেই আমার আনন্দ। দেখি না, ছোকরাকে যদি বাগাতে পারি। টোপ তো গিলেছে মনে হচ্ছে—"

"কিন্তু আমার সন্দেহ আছে বাগাতে পারবেন কি না। ও নানারকম খেল দেখাবে আপনাকে"

"দেখাক না। সেবার বোসমশায়ের দীঘিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। একটা রুই টোপ গিলেছিল বেলা দশটায়। কিছুতেই ওঠে না। সুতো ছেড়ে ছেড়ে অনেকক্ষণ খেলতে দিলাম। সমস্ত দিনই খেলল ব্যাটা। সন্ধ্যা নাগাদ টেনে তুললাম—ইয়া বড় দশসেরি রুই। দেখাই যাক না তোমার ভাগনা কি খেল খেলে। দেখ দুষ্টু ছেলেদেরই আমি ভালবাসি। ভালবাসার জোরেই তারা কাবু হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। তোমার ভাগনেও হবে—। খেলুক না কত খেলবে। আমিও তো খেলতে চাই। তুমি রাগ করছ না তো। তুমি রাগলেই বিপদ—"

"না, না আমি রাগ করব কেন। আমি ভাবছি আপনি না বিপদে পড়েন ওকে নিয়ে—"

"দেখাই যাক না। তুমি বস। খাবার খেয়ে তবে যেও। গাড়িটা তো ভালই চলছে। কতদিন চলবে—"

"কিছুদিন চলবে এখন"

লোচন কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলল—"হর্নটা ঠিক বাজছে না—"

"ও ঠিক করে দেব। কারখানায় নিয়ে যেও কাল"

ডাক্তারবাবু বললেন—"বিষ্ণু তুমি বস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

বিষ্ণু চেয়ারে বসলেন না। কাছেই একটি বেঞ্চি ছিল তারই উপর বসলেন।

ডাক্তারবাবু একটি ছোট সিগার ধরালেন।

"বিষ্ণু তুমি কেমন যেন মন-মরা হয়ে আছ মনে হচ্ছে। কাজকর্ম কেমন হচ্ছে তোমার ওয়ার্কশপে—"

"তা আপনাদের আশীর্বাদে ভালই। সব কাজ নিতে পারি না—"

"কেন"

"নিজের হাতে যতটা করতে পারি ততটাই নিই। খদ্দেরদের আমি ঠকাতে চাই না। বিশ্বাসযোগ্য কাজের লোক নেই। সব ফাঁকিবাজ আর চোর—"

ডাক্তার মুখার্জি হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—"দেখ বিষ্ণু এদেশ রাতারাতি ইংলণ্ড, জার্মানী বা আমেরিকা হয়ে যাবে না। তোমার কারখানাতেও যুধিষ্ঠির বা বিদুর, বুদ্ধ বা চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ এসে চাকরিতে বাহাল হবে না। হাতের কাছে যাদের পেয়েছ তাদের নিয়েই কাজ চালাতে হবে। সব দেশেই পাজী ফাঁকিবাজ লোক আছে, সব যুগেই ছিল, সব যুগেই থাকবে—এদের নিয়েই চলতে হবে। এদের নিয়েই যতটা পার আনন্দ ক'রে যাও—"

বিষ্ণু চুপ করে রইল।

"তোমার ভাগনেকে আমি বহাল করলুম ব'লে দুঃখিত হওনি তো"

"না, দুঃখিত হব কেন। আমার ভয় আপনাকেই ও বিব্রত করবে নানাভাবে। আমি ওর ভালো করবার চেষ্টা কম করিনি, কিন্তু কিছু হল না তো—"

"হবে হবে। দেখি দিনকতক বেয়ে চেয়ে—"

হবিবের ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল ডাক্তারবাবুর বাড়ির সামনে। ড্রাইভার রবি এসে একগোছা নোট ডাক্তারবাবুর হাতে দিয়ে বলল—"হবিব বললে সে আপনার কাছ থেকে ট্যাক্সির ভাড়া নেবে না"

"কি কাণ্ড! সমস্তদিন ওর গাড়িটা আটকে রাখলুম, ভাড়া নেবে না কেন! পেট্রলের দামটা অন্তত নিক—"

"ও কিছু নেবে না।"

তারপর রবি নেবে গিয়ে একটা কাগজের বড় বাক্স নিয়ে এল।

"এই শালটা আপনাকে উপহার পাঠিয়েছে হবিব। ওর মেয়ের প্রণামী এটা।

ডাক্তার বাবু নির্বাক হয়ে গেলেন।

হঠাৎ তাঁর চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠল।

বিষ্ণুর দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি একটু আগে বলছিলে এদেশের সবাই চোর, ভাল লোক নেই। হবিবকে তুমি কি বলবে? হবিবও ছেলেবেলায় গুণ্ডাপ্রকৃতির ছিল, মারপিট করে বেড়াত, আমিই দুবার ওকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়িয়েছি। সেই গুণ্ডা আজ কি হয়েছে দেখ—"

রবির দিকে ফিরে বললেন—"তুমি দাঁড়াও। আমি একটা চিঠি দিচ্ছি—"

ঘরের ভিতর ঢুকে একটা চিঠি লিখলেন হবিবকে।

"হবিব, আমি তোমার মেয়েকে একটা পাঁচশো টাকার চেক পাঠাচ্ছি। ওকে ওর পছন্দ মতো কিছু কিনে দিও। ইতি"

চিঠি আর চেক একটা খামে মুড়ে রবির হাতে দিলেন।

"এটা দিও হবিবকে"

বিষ্ণু উঠে দাঁড়ালেন।

"ডাক্তারবাবু, আমি এবার যাই। কাজ ফেলে এসেছি। রবি তুমি আমাকে নাবিয়ে দিয়ে যাও"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন না"

বিষ্ণু ও রবি চলে গেল।

ডাক্তারবাবু সিগারটা আবার ধরিয়ে টানতে লাগলেন। ছেয়ে রইলেন দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে। গাছটাকে মনে মনে বললেন, "তুই আর কত ফুল ফুটিয়েছিস, আমার মনে যে ফুল ফুটেছে তার সীমা সংখ্যা নেই—"

ধীরে ধীরে পা দোলাতে লাগলেন।

৭

বিষ্ণুবাবুকে পৌঁছে দিতে গিয়ে রবি কিন্তু বিপদে পড়ে গেল। দেখা হয়ে গেল তার বাবার সঙ্গে। তিনি বিষ্ণুর কারখানার একধারে সঙ্কুচিত হয়ে ব'সে ছিলেন। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি, পরণে একটা ছেঁড়া কামিজ। মাথার চুল তৈলহীন অবিন্যস্ত। সর্বাঙ্গে জরার প্রকোপ। মূর্তিমান দারিদ্র্য। উনিই যে ছিমছাম টেরেলিনের বুশশার্ট পরা রবির বাবা একথা ভাবা শক্ত।

বিষ্ণু নেবে তাকে নমস্কার ক'রে বললেন—"এই যে বিপিনবাবু এসে গেছেন দেখছি। ক'টাকা চাই আপনার—"

"হিরণ ঠাকুরকে আজ কিছু না দিলে সে খাওয়া বন্ধ ক'রে দেবে—"

বিষ্ণুবাবু রবির দিকে ফিরে বললেন—"তোর কাছে আছে কিছু?"

"আমার কাছে দশ টাকা আছে, কিন্তু পেট্রল কিনতে হবে। হবিবের টাকা—"

"ও টাকাটা তোমার বাবাকে দাও। ময়ূরগঞ্জে ফেরবার মতো পেট্রল আছে তো—"

"আছে"

"তবে আর কি। তুমি ময়ূরগঞ্জে ফিরে যাও। আমি হবিবকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। টাকাটা দিয়ে দাও তোমার বাবাকে"

রবি টাকাটা বিষ্ণুর হাতে দিয়ে আড়চোখে চাইতে লাগল তার বাবার দিকে। দেখল তার বাবা কাঁদছেন।

বিষ্ণু ভিতরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন আবার। তাঁর হাতে আরও দু'খানা দশ টাকার নোট।

"বিপিনবাবু, আপনি এই তিরিশ টাকা নিয়ে যান এখন। হিরণ ঠাকুরের সঙ্গে আমি কথা কইব। সব ঠিক হয়ে যাবে ভাববেন না"

বিপিনবাবু ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে গেলেন বিষ্ণুবাবুকে।

আঁতকে পিছিয়ে গেলেন বিষ্ণুবাবু।

"ছি ছি কি করেন, আপনি আমার বাবার বয়সী"

"তুমিই আমার বাবা—"

ঝরঝর ক'রে কাঁদতে লাগলেন বিপিনবাবু।

"আপনি এখন যান। আপনার ব্যবস্থা একটা হ'য়ে যাবেই। আচ্ছা আপনি লেখাপড়া কতদূর করেছিলেন—"

"আমি সেকালের এনট্রান্স পাস। নৈহাটিতে মাস্টারি করতুম। কিন্তু যখন স্বদেশী হাঙ্গামা শুরু হল তখন তাতে জড়িয়ে পড়েছিল আমারই একটি প্রিয় ছাত্র। সে নাকি বোমার আড্ডায় যাতায়াত করত। পুলিস যখন তাকে ধরতে এল, তখন আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ছেলেটা পালাল বটে, কিন্তু আমি ধরা পড়ে গেলাম। আমার চাকরী গেল। তারপর থেকে আর চাকরি পাইনি। ট্যুশনি ক'রে দোকানে খাতা লিখে সংসার চালিয়েছি। রবিকে মানুষ করবার চেষ্টা করে-ছিলুল, কিন্তু পারিনি। সবই অদৃষ্ট—"

"আচ্ছা আপনি যান—"

বিপিনবাবু চোখ মুছতে মুছতে চ'লে গেলেন।

বিষ্ণু তখন রবির দিকে ফিরে বললে, "হবিবকে কি লিখেছি, শোন। লিখেছি, —ভাই হবিব, তোমার ড্রাইভার রবির বাবা খেতে পাচ্ছেন না। তাই তুমি পেট্রল কেনবার জন্যে যে দশ টাকা ওকে দিয়েছিলে তা ওর কাছ থেকে নিয়ে ওর বাবাকে দিয়েছি। ওর বাবার জন্যে মাসে পঞ্চাশ টাকা দরকার। রবি তোমার কাছে কাজ করছে ওকেই দিতে হবে সে টাকাটা। আমি তোমার কাছ থেকে নিয়ে আসব প্রতি মাসে।

তুমি রবির পাওনা থেকে সেটা উসুল ক'রে নিও। কেমন? এখুনি যেতাম তোমার কাছে। কিন্তু হাতে কাজ আছে। পরে যাব। রবির বাবার খাবার ব্যবস্থা করতেই হবে তোমাকে। বিষ্ণুদা—

রবি অপ্রসন্ন মুখে চিঠিটা শুনল।

তারপর বলল—"আমার বাবার এক দূর সম্পর্কের দাদা আছেন কাশীতে। তিনি অবস্থাপন্ন লোক। বাবা তাঁর কাছে গিয়ে অনায়াসে থাকতে পারেন"

"তা হয়ত পারেন। কিন্তু যতক্ষণ তিনি এখানে আছেন ততক্ষণ তাঁর ভরণ-পোষণ তোমাকে করতে হবে। তুমি তাঁর ছেলে"

"কিন্তু আমার সাধ্যে না কুলুলে আমি কি করব"

"সাধ্যে যাতে কুলোয় সে ব্যবস্থা আমরা করব। হবিব যদি না পারে আমি করব। আমার এখানে তুমি যদি ভালোভাবে কাজ কর আমি তোমাকে মাসে একশ' টাকা ক'রে দেব। তার থেকে তুমি অনায়াসে পঞ্চাশ টাকা তোমার বাবাকে দিতে পার—"

রবি চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল সামনের দিকে। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে চলে গেল বোঁ করে।

বিষ্ণু আবার নিজের কাজে মন দিলেন। ঢুকে পড়লেন গাড়ীর নীচে। একটু পরে গাড়ির মালিক রামসদয়বাবু এলেন। বড় ব্যবসাদার তিনি। এখানেও তার গদি আছে একটা। রামসদয় বসাক ধনী লোক।

"বিষ্ণু, আমার গাড়ীর কত দূর। সব খুলে ফেলেছ দেখছি। দেরি হবে মনে হচ্ছে—"

বিষ্ণুবাবু বেরিয়ে এসে বললেন—"দিন দুই লাগবে—"

"দিন দুই আমি এখানে আছি। আমার এখানকার গদিতেও গরদা জমেছে অনেক। সেগুলো সাফ করতে অন্তত দু'দিন লাগবে। বিশ্বাসযোগ্য লোক তো পাই না, নিজেকেই সব করতে হয়। দশখানা চিঠির জবাবই দেওয়া হয়নি"

বিষ্ণুবাবু বললেন—"আপনি যদি রাখেন বিশ্বাসযোগ্য লোক আপনাকে দিতে পারি। লেখাপড়া জানে, সৎ লোক। কিন্তু বয়স হয়েছে, দৌড় ঝাঁপ করতে পারবেন না। তবে চিঠিপত্রের উত্তর দিতে পারবেন, আপনার গদিকে পাহারা দিতে পারবেন—"

"দৌড় ঝাঁপ করবার লোক আছে আমার। কিন্তু কেউ অনেস্ট নয়। আমার সন্দেহ হচ্ছে গোলা থেকে কয়েক বস্তা ছোলা পার হয়ে গেছে। অথচ কাউকে ধরবার উপায় নেই। ছেলে দুটো ইংল্যান্ড আমেরিকা ক'রে বেড়াচ্ছে। ব্যবসার দিকে তাদের মন নেই। আমি একা ক'দিক সামলাই বল—। তোমার লোকটি কি এখানকার লোক?"

"হ্যাঁ আপনিও চেনেন বোধ হয়। বিপিনবাবু। বলেন তো আপনার কাছে পাঠিয়ে দিই"

"বেশ দিও। কত মাইনে নেবে—"

"সে আপনি বিবেচনা করবেন। তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ উঠে গেলেই তিনি রাজী হবেন। লোকটি খুব ভালো—"

"বিপিনবাবু? এক বিপিনবাবু আমার ছোট ছেলেকে পড়াতেন। তিনিই কি? আচ্ছা পাঠিয়ে দিও আমার কাছে কথা কয়ে দেখব"

"উনি আগে প্রাইভেট টিউশন করতেন শুনেছি। হয়তো আপনার ছেলেকে পড়িয়েছেন। পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে—"

রামসদয়বাবু চলে গেলেন।

বিষ্ণুও আবার ঢুকে পড়লেন গাড়ির নীচে।

৮

বীণা মুশকিলে পড়েছিল। মানতি মাসীর আবার জ্বর হয়েছে। শৈলেনবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে সাহস হচ্ছিল না তার। মাসীকে দু'দিন আলুকাবলি খাইয়েছিল সে, যদিও খুব সামান্যই, কিন্তু তৃতীয় দিনেই কম্প দিয়ে জ্বর এল আবার। শৈলেনবাবুর কাছে যেতে সাহস হচ্ছিল না তার। ভাবছিল, বুড়ো ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বললে কেমন হয়। যদিও তিনি প্র্যাকটিস করেন না, কিন্তু প্রবীণ ডাক্তার তো। তাঁকে বললে তিনি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবেন একটা। ভাল লোক খুব। কিন্তু তাঁর কাছে যাবে কে। শশধর সেই যে বেরিয়ে গেছে এখনও ফেরেনি। অথচ মাসীর খুব জ্বর। ফিরলেও সে যেতে রাজী হবে কিনা সন্দেহ, বলবে শৈলেনবাবুর কাছেই আবার যাওয়া উচিত, তিনি গোড়া থেকে চিকিৎসা করছেন। বকুনি তো খেতেই হবে, আলুকাবলি খাওয়াতে গিয়েছিলে কেন। কিন্তু বীণা ঠিক করেছে সে শৈলেনবাবুর কাছে আর যাবে না। বারান্দায় বেরিয়ে দেখল একটা খালি রিক্‌শা যাচ্ছে রিক্‌শাটাকে থামিয়ে সে জিগ্যেস করল—বুড়ো ডাক্তারবাবুর বাড়ি সে চেনে কি না। রিক্‌শাওলা বলল—তাঁর বাড়ি কে না চেনে। আপনি যাবেন? বীণা বললে—যাব আবার ফিরে আসব। কত নিবি? দেড় টাকা

চাইছিল বিক্‌শাওলাটা। এক টাকায় বফা হল। বীণা ঘবে তালা লাগিযে বেবিযে পড়ল। ডাক্তাববাবুব বাড়িতে পৌঁছে দেখল বামসদযবাবুব সঙ্গে ব'সে গল্প কবছেন। বামসদযবাবুব মস্ত একটা পুকুব আছে, সেখানে না কি অনেক মাছ। ডাক্তাববাবু সেখানে আজ মাছ ধবতে যাবেন, তাবই আযোজন হচ্ছে। স্বযং বামসদয-বাবু এসেছেন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'বে নিযে যাবেন ব'লে। অনুমান কঁব চাব টোপ ছিপ, হুইল, সুতো প্রভৃতি ঠিক কবছে। নটবব আব ক্ষেণিতব মা খাস্তা কচুবি আব আলুব দম তৈবি কবতে ব্যস্ত হযে পড়েছে।

ডাক্তাববাবু বামসদযবাবুকে বলছিলেন—"আপনাব ও পুকুবে বড় বড় বুই কাতলা আছে শুনেছি। কিন্তু ওটা আপনার প্রাইভেট পুকুর, তাই ওখানে যাইনি কোনদিন। আপনিও তো এখানে থাকেন না যে আপনার কাছ থেকে অনুমতি নেব। আজ আপনি নিজে থেকে নিমন্ত্রণ করলেন এতে ভারি খুশী হয়েছি। কবে এসেছেন আপনি ?"

"আমি দিন চাবেক হ'ল এসেছি। আপনার মতো লোক আমার পুকুরে মাছ ধববে এতো আমাব পরম সৌভাগ্য। আমি না থাকলেও আপনি যখন খুশি যাবেন, আমি ব'লে দিযে যাব মালীটাকে। ওই ব্যাটারাই সব চুরি ক'রে খেয়ে ফেলে বুঝলেন না ? বলা রইল আপনি যখন খুশি যাবেন—"

বীণা বারান্দার নীচে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ডাক্তারবাবুর নজর পড়ল তার দিকে।

"কি গো, তুমি এখানে হঠাৎ। কিছু দরকার আছে না কি—"

"হ্যাঁ, মানতি মাসী বড় অসুস্থ। তাকে একবার দেখতে হবে। সেই জন্যেই আমি এসেছি"

"আমি তো আজকাল প্র্যাকটিস করি না। শৈলেনের কাছে যাও—"

"তিনিই তো দেখছিলেন। কিন্তু আবার [illegible]
আসছে—"

তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বললে—"আমারও দোষ আছে। [illegible] ভয়ে শৈলেনবাবুর কাছে যেতে পারছি না—"

"তুমি আবার কি দোষ করলে—"

"মাসী দাবু খাচ্ছিল খেতে পারছিল না তাই [illegible] দিয়েছি তাকে। [illegible]

[illegible]

"চণ্ডীতলার কাছে—"

"চল তাহলে দেখে আসি। লোচন গাড়ি বার কর—"

তারপর রামসদয়বাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিই—"

বীণা বলল—"আমি রিক্‌শাতে এসেছি। রিক্‌শাতেই চলে যাচ্ছি। আমি মানতি মাসীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকব"

"বিক্‌শায় যাওয়ার দবকার কি। গাড়িতেই চল না তুমি। আমাদের সব্বাইকে কুলিয়ে যাবে—"

বীণা রিক্‌শাওলার ভাড়াটা দিয়ে দিলে। [illegible]

রামসদয়বাবু বীণার সম্বন্ধে একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ফিসফিস ক'রে ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলেন—"কে মেয়েটি ?"

"ও হচ্ছে শশধরের বউ। ওই যে শশধর আলুকাবলি ফেরি করে বেড়ায়। ভারী ভালো মেয়েটি, ভারী তেজী—"

রামসদয় চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেখছিলেন বীণাকে।

অল্পবয়সী মেয়েদের সম্বন্ধে রামসদয়বাবুর একটু দুর্বলতা আছে। এই 'আলু'—দোষের জন্য তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিনি হেয়। তাঁর কর্মচারীরাও এই জন্যে তাঁকে শ্রদ্ধা করে না। তাঁর ছেলে দুটি তাঁকে ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে ব'সে আছে তারও কারণ না কি এই। স্ত্রী বেঁচে থাকলে এই ষাট বছরের বুড়োকে হয়তো শায়েস্তা করে রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। বুড়ো টাকার কুমীর। মেয়েদের পিছনে অনেক টাকা খরচ করেছেন, এখনও করতে পিছপাও নন।

তাঁর দৃষ্টি দেখে বীণার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল।

লোচন যখন গাড়ি বার করল তখন রামসদয় বললেন, "তুমি আমার পাশে এসে বস।"

"আমি এইখানে বসছি"

বীণা লোচনের পাশে গিয়ে বসল। রামসদয় ও ডাক্তারবাবু পিছনের সীটে বসলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন—"লোচন, আগে রামসদয়বাবুকে নামিয়ে দাও। রামসদয়-বাবু আমি তিনটে নাগাদ আপনার বাগানবাড়িতে যাব ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ যখন খুশি। মালীকে ব'লে দিচ্ছি সে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।"

"আপনিও মাছ ধরেন না কি"—জিগ্যেস করলেন ডাক্তারবাবু।

"না, ওসব বাতিক আমার নেই। ছেলেরা শখ ক'রে পুকুরে মাছ ছেড়েছিল, কিন্তু তারা তো সব বিদেশে। পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে, আমাকে এইখানেই নাবিয়ে দিন—"

চৌরাস্তায় নেমে গেলেন রামসদয়বাবু। যাওয়ার অগে আর একবার দেখে গেলেন বীণাকে তির্যক দৃষ্টি হেনে।

ডাক্তারবাবু বললেন—"এইবার চল শৈলেনের কাছে—"

বীণা বলে উঠল—"সেখানে কেন। তিনি তো আমাকে দেখলেই বকবেন। তরকারি খাওয়াতে মানা করেছিলেন তিনি—"

"না না বকবে না। আমি তোমার হয়ে ওকালতি করব—"

শৈলেনবাবুর ডিসপেন্সারির সামনে মোটর থামতেই বেরিয়ে এলেন তিনি।

"নমস্কার। আসুন—"

"আমি এখন আর নাবব না। তোমার একটা রুগীকে দেখতে যাচ্ছি তাই তোমার অনুমতি নিতে এলাম। এর মানতি মাসীকে তুমি দেখছিলে—"

"হ্যাঁ। প্যারাটাইফয়েড হয়েছিল। কেমন আছে ?"

বীণা ঘাড় হেঁট ক'রে বসে ছিল।

আবার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে বলছে। তাই সন্দেহ হচ্ছে হয়তো বি-কোলাইও আছে—"

"তা হতে পারে। এর জন্যে আপনার কাছে যাওয়ার দরকার ছিল না। আমাকে খবর দিলেই আমি দেখে আসতাম—"

"তা জানি। ও কিন্তু আমার কাছে এসেছে অন্য কারণে। তুমি তরকারি খাওয়াতে বারণ করেছিলে, কিন্তু দু'দিন ও তরকারি খাইয়েছে। তাই ভয়ে তোমার কাছে আর আসেনি"

"তরকারি খাওয়াতে গেল কেন!"

"না, না, ওকে বোকো না। আমাকে জিগ্যেস করেছিল—আমিই বলেছিলাম তা দাও না একটু তরকারি। একটু তরকারি খেলে কি এমন চন্ডী অশুদ্ধ হবে। আজকাল তো টাইফয়েড রুগীদের 'সলিড' খাবার খেতে দিচ্ছে—"

ডাক্তারবাবুর এই মিথ্যাভাষণ শুনে অবাক হয়ে গেল বীণা। শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে পড়ল তার মন। চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইল সে। ডাক্তারবাবু ব'লে যেতে লাগলেন—"বকতে হলে আমাকে বকো। ও বেচারীকে কিছু বোলো না।"

শৈলেনবাবু বললেন—"না, না, আমিও তো বলেছিলাম একটু তরকারি দিতে—আমি ওবেলা গিয়ে দেখে আসব"

"আমি যাচ্ছি দেখতে। তোমারই রুগী তোমাকে তো যেতেই হবে। এখন যেতে পারবে না?"

"চলুন তাহলে যাই। কাছেই তো ওদের বাড়ি"

শৈলেনবাবুকে নিয়ে ডাক্তারবাবু দেখলেন মানতি মাসীকে।

ডাক্তারবাবু ব্যবস্থা করলেন—চারটের সময় যখন কম্প দিয়ে জ্বর আসছে তখন সকালের দিকে একটু তরকারী খেলে আপত্তি নেই। ওতে কিছু হবে না। শৈলেন-বাবুও আপত্তি করলেন না এতে।

দু'জনে পরামর্শ করে ওষুধের প্রেসকৃপশনও লিখলেন।

"ওষুধ নিয়ে আসবে কে—"

বীণা বলল—"আমিই যাব। মাসীর তো আর লোক কেউ নেই—"

ডাক্তারবাবু নিমেষে হৃদয়ঙ্গম ক'রে ফেললেন ব্যাপারটা। বললেন—"তোমাকে তো নিজের ঘরসংসার দেখতে হবে"

মানতি মাসী বললেন—"ও-ই তো সব করছে বাবা। আর জন্মে ও আমার মা ছিল—"

গলাটা ধ'রে এল তাঁর।

ডাক্তারবাবু বললেন—"আমার ড্রাইভার লোচন আপনার ওষুধটা দিয়ে যাবে, খোঁজখবরও করবে। যা দরকার ওকে বলবেন—"

মানতি মাসী, বীণা দু'জনেই চুপ ক'রে রইল।

"এবার তবে যাই আমরা। শৈলেন 'বিজি' (busy) লোক, ওকে বেশীক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়। তুমিও যাবে না কি—"

বীণা বললে—"আমি একটু পরে যাব। আমার বাড়ি বেশী দূরে নয় এখান থেকে"

বীণা মানতি মাসীকে বলল—"আমি তোমার জন্যে ভেজিটেবল স্টু্য ক'রে আনি তাহলে মাসি। আলুকাবলি আর দেব না এখন। কি বল?"

"না, দরকার নেই। স্টু্য মানে ঝোল তো? ঝোলটা খুব পাতলা করিস না—"

"না, না ভাল করেই করব। একটু পরেই আসছি আমি। ওষুধটা এলে তুমি খেও একদাগ। আমি রান্নাটা করেই চ'লে আসব তোমার ঝোল নিয়ে—"

"আচ্ছা—"

বীণা ফিরে এসে দেখল শশধর আর বিকাশ বারান্দায় ব'সে আসে। শশধর বিড়ি খাচ্ছিল বীণাকে দেখে সেটা ফেলে দিল। বীণা বেশী বিড়ি খাওয়া পছন্দ করে না।

বীণা হেসে বললে—"আমি মানতি মাসীর ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম। বুড়ো ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে সব খুলে বললাম তাঁকে। কি ভালো লোক যে উনি, আমাকে শৈলেনবাবুর ওখানে নিয়ে গেলেন, বললেন আমিই তরকারি দিতে বলে-ছিলাম ওকে, দোষ আমারই। তারপর দু'জনে মানতি মাসীর বাড়িতে এসে সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গেলেন।"

বিকাশ একধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিনকার ঘটনার পর থেকে সে এখনও একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে। খুব সহজ হতে পারেনি। বীণা তার দিকে চেয়ে হেসে বলল—"আসুন। অমন ক'রে মুখ গোমড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন কেন—"

"না, আমি যাচ্ছি, আমার কাজ আছে—"

"একটু চা খেয়ে যান—"

হো হো ক'রে হেসে উঠল শশধর।

"সেদিন তোমার যে মূর্তি ও দেখেছে, তাতে আর সাহস পাচ্ছে না। ভাব তো হয়ে গেছে, তবে আর ভয় কি!"

বিকাশ ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—"ভয় আমি কাউকে করি না। তবে সামান্য একটা রসিকতাকে ও যে এমনভাবে নেবে তা আমি ভাবতে পারিনি!"

বীণা হঠাৎ গলবস্ত্র হ'য়ে হাত জোড় ক'রে বললে—"আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা করুন। আসুন, চা খেয়ে যান—"

"চল চল। লেট বাইগনস্ বি বাইগনস্"

শশধর বিকাশের হাত ধ'রে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল।

বীণা স্টোভ জ্বালতে বসল। বিকাশের দিকে হাসি-মুখে চেয়ে বলল—"আজ কিন্তু ঘরে খাবার নেই। মুড়ি আছে, খাবেন?"

বিকাশ হেসে বলল—"আর প্রতিবাদ করবার সাহস নেই। যা দেবে তাই খাব"

হো হো ক'রে হেসে উঠল শশধর।

৯

শশধরের বাড়ির সামনে যে ঘরটা অনেকদিন থেকে বন্ধ হ'য়ে পড়েছিল তার মালিক যে রামসদয়বাবু একথা বাজারের অনেকে জানত। অনেকে ঘরটা ভাড়া নিয়ে

দোকান করতে চেয়েছিল। কিন্তু রামসদয়বাবু মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া চাওয়াতে কেউ আর অগ্রসর হয়নি। ঘরটা খালিই পড়ে ছিল। হঠাৎ দেখা গেল সেই ঘরটার তালা খোলা হয়েছে, জন মজুররা সাফ করছে ঘরের ভিতরটা। চুনকামও করা হচ্ছে বাইরেটা। তারপর শোনা গেল রামসদয়বাবু নিজেই ওখানে কিসের একটা দোকান খুলবেন না কি। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল রামসদয় নিজেই সেখানে বসেছেন রাস্তার ধারে একটা চেয়ার পেতে। চেয়ে আছেন বীণার বাড়ির দিকে। বীণার সঙ্গে হঠাৎ একবার চোখাচোখি হ'য়ে যাওয়াতে বীণা জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলে। রোদে তবু বসে রইলেন তিনি। একটু পরে শশধর বাজার ক'রে ফিরল। রামসদয়বাবুকে সে চিনত। নমস্কার করল।

"এইটেই আপনার বাড়ি না কি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"তাহলে তো ভালই হল"

শশধর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। কেন ভাল হল তা বুঝতে পারল না সে।

"আপনিই তো আলুকাবলি তৈরি ক'রে ফেরি করেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"আপনার আলুকাবলির খুব নাম। সকলেই প্রশংসা করে। আমিও এখানে একটা তেলেভাজার দোকান দেব ভাবছি। ভালো লোক খুঁজছি একজন। আপনি তো এই লাইনের লোক, ভিড়ে যান না আমার সঙ্গে"

শশধর একটু অবাক হয়ে গেল।

"আমি?"

"হ্যাঁ, কেন নয়। আপনিই চালান দোকানটা। টাকা যা লাগে আমি দেব। আমি তো এখানে থাকি না, আপনিই মালিক হ'য়ে থাকুন না"

শশধর মুচকি হেসে চুপ ক'রে রইল।

"এখানে তেলেভাজার দোকান খুব ভালো চলবে। আপনিই চালান দোকানটা, সামনেই তো আপনার বাড়ি"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"খুব ভালো হবে। আপনি ফেরি ক'রে রোজ কত রোজগার করেন"

"টাকা চারেকের বেশী হয় না"

"বেশ, আমি আপনাকে দৈনিক চার টাকা ক'রে দেব—আপনিই এসে আমার দোকানটার ভার নিন। রাম-বাগানের মুনে ছোঁড়াটা এসব কাজে ওস্তাদ। তাকে বলেছি, কাজ করবে সে। আপনাকেই দোকানের মালিক ক'রে দেব, আপনার হুকুম মতো সেই সব করবে। আপনার আলু-কাবলি তৈরি করে কে, আপনি? খুব নাম—"

"আমি করি না, আমার বউ করে।"

"ও তাই না কি! তাহলে আপনার বউকেও নিয়ে আসুন না আমাদের কোম্পানির মধ্যে। তিনিই মালকাইন হোন। তাঁকেও মাইনে দেব। চলে আসুন আপনারা—"

শশধর বলল—"আমি পারব না। চাকরি করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। বিষ্ণুদা আমাকে একটা দোকান করে দিতে চেয়েছিলেন আমি রাজী হইনি।"

"ফেরি ক'রে আর কত রোজগার হবে—"

"আমার খুব বেশী রোজগারের দরকার নেই। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি, তাই ফেরি করি"

"বেশ, আপনি ফেরিই করুন আপনার বউ আমাদের দোকানের ভারটা নিন—আমাদের দোকানের জিনিসই ফেরি করুন আপনি"

"আচ্ছা, তাকে জিগ্যেস করি। সে একটা ইস্কুল করতে চাচ্ছে আমাদের বারান্দায়, বোধহয় রাজী হবে না"

শশধর ঢুকে পড়ল নিজের বাড়িতে।

ঢুকেই দেখা হয়ে গেল বীণার সঙ্গে।

"ও মিনসে কি বলছিল তোমাকে—"

"উনি এখানে একটা তেলেভাজার দোকান করবেন। আমাকে বলছিলেন আপনি এবং আপনার স্ত্রী এসে যদি দোকানটার ভার নেন—"

"আমাদের খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই ওঁর দোকানের ভার নিতে যাব! সকাল থেকে ওইখানে বসে আছে মুখপোড়া, আর বার বার জানলার ভিতর দিয়ে আমাকে দেখবার চেষ্টা করছে। আমি শেষে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলাম—"

"ও কে জান? রামসদয় কুণ্ডু। টাকার কুমীর একটি। আমরা যদি ওর দোকানের ভার নিতে রাজী হই আমাদের দু'জনকেই উনি ভালো মাইনে দেবেন বলছিলেন—"

"ঝাড়ু মারি ওর মাইনের মুখে। অতি পাজী লোক, ওকে আমোল দিয়ো না মোটে—"

"পাজী লোক তুমি জানলে কি করে"

"চোখের দৃষ্টি থেকে—নাও"

বীণা তাক থেকে কি একটা এনে শশধরের মুখে ধরল।

"কি ওটা—"

"নারকোল কোরা। আজ ছাঁচি কুমড়ো রাঁধছি, তাই নারকোল কুরেছিলাম। একটু বেঁচে গিয়েছিল—"

"তুমি খেলে না—"

"আহা! ওইটুকু তো বেঁচেছিল, ওতে ভাগ বসালে কতটুকুই বা থাকত। বাজারটা রেখে তুমি তাড়াতাড়ি চান ক'রে নাও। মা কালীর ওখানে পুজোটা দিয়ে এস। মানতি মাসীর জন্যে মানত করেছিলাম। মায়ের দয়ায় জ্বর আর আসেনি। তুমি ফিরে এলে তবে মাসীর জন্যে স্ট্যু আর ভাত নিয়ে যাব। চালগুলো বড্ড পুরোনো এনেছ তুমি, মানতি মাসী বলছিল মোটে স্বাদ নেই। আমিও আজ মুখে দিয়ে দেখলুম একেবারে বিস্বাদ"

"রোগীকে ওই চালই দিতে হয়—"

"তুমি স্নান ক'রে নাও"

শশধর নিকটবর্তী পুকুরে স্নান করে।

তেল মেখে সে যখন বেরুল তখনও রামসদয় ব'সে আছেন।

"গিন্নীকে জিগ্যেস করলেন ?"

"সে রাজী হল না। আমাদের দ্বারা হবে না"

শশধর আর দাঁড়াল না হনহন ক'রে এগিয়ে গেল।

রামসদয়বাবু একটু মুষড়ে পড়লেন। তিনি ভেবে-ছিলেন এই ফাঁদ পেতে তিনি চিড়িয়াটিকে ধরতে পারবেন। টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায় এই তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। তিনি ভাবতে লাগলেন কি উপায়ে টাকাটা খেলালে তাঁর মনস্কাম সিদ্ধ হবে।

তাঁর প্রধান ভৃত্য মাধব এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বললে—"বাবু ও মুনেকে দিয়ে কাজ হবে না। সে পেঁয়াজি বেগুনি ভাজে বটে, কিন্তু তার মা বলছিল ছোঁড়া তাড়িখোর। প্রায়ই তাড়ি খেয়ে প'ড়ে থাকে। তার মা-ই বললে ও ভদ্দরলোকের কাছে চাকরি করতে পারবে না"

রামসদয় ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন ক্ষণকাল।

তারপর বললেন—"হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও। দোকান একটা করতেই হবে এখানে। দেখি কি হয়—তুমি বিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলে ?"

"তিনি বললেন কাল গাড়ি দেবেন—"

"একটা রিক্‌শা ডাক তাহলে। এই রোদে আর হাঁটতে পারব না"

রামসদয়বাবু রিক্‌শা ক'রে যাচ্ছিলেন। পথে একটি লোক খুব ঝুঁকে প্রণাম করলেন তাঁকে। রিক্‌শা থামালেন রামসদয়।

"মাপ করবেন আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না তো"

"আমি দামোদর। ছোটখাটো টোল ছিল আমার—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। আপনাকে আমরা তো শিরোমণিমশাই বলেই জানতুম—"

বিষণ্ন হাসি হেসে শিরোমণি বললেন—"এখন আর শিরোমণি নই। এখন আমরা রাস্তার ধুলো। সবাই মাড়িয়ে যাচ্ছে—"

"সে কি কথা, সে কি কথা। আপনার টোল উঠে গেল কেন"

"কালের গতিকে। এখন আর সংস্কৃত পড়তে চায় না কেউ। তাছাড়া যে দশ বিঘে জমির আয়ের উপর নির্ভর ক'রে টোল চালাতুম সে জমির আয়ের উপর নির্ভর ক'রে টোল চালানো যায় না। আমার ছেলেটাকে ইংরেজী স্কুলে দিয়েছিলাম যদি দু'একটা পাসটাস ক'রে চাকরিবাকরি পায়, কিন্তু ছেলে ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করতে পারে নি। মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। সবই পূর্বজন্মের কর্মফল। অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম। ভালো আছেন তো—"

"যা যুগ পড়েছে এতে কারো ভালো থাকবার তো জো নেই।"

ব্যবসাতে নানা ঝামেলা। ট্যাক্স তো বেড়েই চলেছে। তার উপর ঘেরাও, শ্রমিকদের দাবি, মারধোর, হাঙ্গাম হুজ্জুৎ—এসব লেগেই আছে। কোনক্রমে চালিয়ে যাচ্ছি। আমার ছেলে দুটোওতো বিদেশে। তারা যে বুড়ো বাপের পাশে এসে দাঁড়াবে তারও তো কোনও লক্ষণ দেখছি না, কোনক্রমে চালিয়ে যাচ্ছি—আপনার ছেলে কি করে—বয়স কত ?"

"বয়স বছর চব্বিশ। করে না কিছুই। ফুটবল খেলে, ক্রিকেট খেলে, এখানকার লাই-ব্রেরির কিসে উন্নতি হয় তার জন্যে চেষ্টা করে—হাতলেখা কাগজের এডিটর হয়েছে, তাতে কবিতা লেখে!"

"লেখক না কি। তাহলে তো অনেক গুণ। কবিতা লেখে? বলেন কি। সে তো ভারী শক্ত কাজ মশাই। কি রকম কবিতা—"

"আমি তো প'ড়ে মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারি না"

"আপনার কথা শুনে একটা মতলব আমার মাথায় আসছে। আপনার ছেলের নাম কি—"

"বিকাশ—"

"বাঃ বেশ ভালো নাম, আধুনিক নাম। বিকাশকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে দেখি যদি কিছু করতে পারি। এখুনি পাঠিয়ে দিন—"

"সে কি বাড়িতে থাকে যে এখুনি গিয়ে দেখা পাব। কখন আসে, কখন যায় তা টেরও পাই না। আমাকে এড়িয়ে চলে, আমি যেন ওর শত্রু। তবে এখন খাওয়ার সময় হয়তো গিয়ে দেখা পেতেও পারি। কি মতলব আপনার মাথায় এসেছে বলুন তো—বলব তাহলে ওকে সেটা—"

"বাজারে আমার একটা ঘর বহুদিন থেকে খালি প'ড়ে আছে। কোনও ভাড়াটে জোটে না। তাই ভেবেছি নিজেই ওখানে ছোটখাটো একটা দোকান করব"

"কিসের দোকান—"

"প্রথমে ভেবেছিলাম তেলেভাজার দোকান করব একটা। কিন্তু তেলেভাজার দোকানের ভার নিতে পারে এরকম লোক তো দেখছি না। তাই ভাবছি একটা মনোহারির দোকানই খুলব ওখানে। এখানকার কোনও ছোকরা যদি দোকানটার ভার নেয় আমি রাজী আছি। আপনার ছেলে যখন কবি তখন মনে হয় মনোহারি দোকানের নাম শুনলে রাজী হবে। দোকানে যখন খদ্দের থাকবে না তখন কবিতাও লিখতে পারবে। আসল কথা একটি সৎ ভদ্র বংশের ছেলে চাই আমি, যে চুরিচামারি করবে না—"

"আচ্ছা, আমি ব'লে দেখব ওকে। যায় তবে তো—"

"জোর ক'রে পাঠিয়ে দিন। আমি কথাবার্তা বলে বাগ মানিয়ে নেব। জোর ক'রে জুতে না দিলে কি গরুতে জোয়াল টানে। জুতে দিন—"

"আচ্ছা। নমস্কার—"

"নমস্কার, নমস্কার"

১০

রামসদয়বাবুর পুকুরে ডাক্তারবাবু মহাসমারোহে মাছ ধরতে ব'সেছিলেন। বাড়ি থেকে তাঁর জন্যে একটি ইজি চেয়ার এনে পাতা হয়েছিল। আর সেই বৃহৎ ছাতাটিও গাড়া হয়েছিল চেয়ারের পিছনে। এ ছাতাটি তিনি অনেক-দিন আগে কিনেছিলেন একটা 'সেল' থেকে। যখন বাইরে বেরোন এটি নিয়ে যান। মাঠে

পুঁতে দিলে অনেকখানি ছায়া হয়। ডাক্তারবাবু রোদ সহ্য করতে পারেন না। একটি সিগার ধরিয়ে প্রকান্ড ছিপটি ফেলে ফাৎনার দিকে চেয়ে বসেছিলেন তিনি। অনুমান পাশেরই আমগাছতলায় একটা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। প্রথমে এসে সে ডাক্তার-বাবুর চেয়ারের পাশেই বসেছিল ফাৎনাটার দিকে চেয়ে। কিন্তু ডাক্তারবাবু একটু পরেই লক্ষ্য করলেন অনুমান ঢুলছে!

"কি হে ঢুলছ কেন"

"দুপুরে ঘুমোনো তো অভ্যাস অনেকদিন থেকে। তাই ঢুল আসছে—"

"ঘুমিয়ে নাও। গাড়িতে একটা রাগ আর কুশন আছে, ওই গাছতলায় পেতে শুয়ে পড়। শরীরকে কণ্ট দিয়ে লাভ কি। শুয়ে পড়—"

অনুমান সেই থেকে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দুপুরে মাছ মাংস প্রচুর খাওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু ভাত খাননি, চার-খানা রুটি খেয়েছেন কেবল। মালীর ঘরে ক্ষেন্তির মা আর নটবর লুচি আর আলুর দম নিয়ে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে চায়ের সরঞ্জামও আছে। এমন কি স্টোভ পর্যন্ত। ডাক্তারবাবু হুকুম করলেই চায়ের জল চড়িয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু হঠাৎ হাত থেকে সিগারটা ফেলে দিলেন। ফাৎনাটা ডুবেছে। দু'হাত দিয়ে খ্যাঁচকা মারলেন একটা। কিছু উঠল না। জলের ভিতর একটা প্রবল আলোড়ন দেখা গেল শুধু। বুঝলেন একটা বড় মাছ টোপ গিলেছে, বঁড়শিটাও তার গলায় বিঁধেছে সম্ভবতঃ। হুইল থেকে সুতো ছাড়তে লাগলেন, মাছটাকে খেলানো দরকার। অনুমানের দিকে চাইলেন একবার। দেখলেন তার নাক ডাকছে। নটবর মালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল তাকে ইশারা করে ডাকলেন। নটবরও একজন অভিজ্ঞ মাছ-শিকারী, সে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অনেক জায়গায় মাছ ধরতে গেছে, অনেক অভিজ্ঞতা আছে তার। নটবর আসতেই তিনি বললেন—"ওরে মনে হচ্ছে একটা বড় মাছ টোপ গিলেছে। দেখ তো—।"

ছিপটা তিনি নটবরের হাতে দিলেন।

নটবর ছিপটা হাতে নিয়ে একটু টানাটানি করে বলল—"এ যে বেশ বড় মাছ মনে হচ্ছে বাবু। খেলাতে হবে।"

"তুমি খেলাও তাহলে। আমি দুটান চুরুট খেয়ে নি ততক্ষণ।"

নটবর চেয়ারের সামনে বসে পড়ল। যে চুরুটটা ডাক্তারবাবু ফেলে দিয়েছিলেন সেইটে তুলেই আবার ধরালেন সেটা। পা দুলিয়ে দুলিয়ে টান দিতে লাগলেন সেটাতে। একটু পরেই বাগানের মালীটা সেলাম করে এসে দাঁড়াল।

"তুমি বাবুর কাছে কতদিন আছ মালী।"

"ছ মাস"

"তোমার বউ ছেলেমেয়ে কোথায়—?"

"সব রোজগার করতে বেরিয়ে গেছে হুজুর। একার রোজগারে সংসার চলে না। ছোট ছেলেটাকে পর্যন্ত কাজ করতে হয়। সে মজুমদার বাবুদের গরু চরায়—"

"ক'টি ছেলেমেয়ে তোমার—"

"আমার মেয়ে মারা গেছে হুজুর। তার একটি ছেলে আমার কাছেই মানুষ হচ্ছে! আর মেয়ে নেই। বাকি তিনটি ছেলে।"

"বাঃ। নটবর শুনে রাখ। ওরা কাজ থেকে ফিরবে কখন—"

"সন্ধ্যের আগে কেউ ফিরবে না। আমার নাতিটাও ওর বড় মামার সঙ্গে চ'লে যায়। আমার বড় ছেলে মাঠে জন খাটে, তার সঙ্গেই থাকে ও। মামাকে খুব ভালবাসে ছেলেটা"

"বাঃ, বাঃ"—অকারণ পুলকে ডাক্তারবাবু পুলকিত হয়ে উঠলেন। পকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে পা দোলালেন খানিকক্ষণ। তারপর জিগ্যেস করলেন—"তোমার নাতি কি ভালবাসে"

"সব ভালবাসে হুজুর। মুড়ি, বাতাসা, সন্দেশ, লুচি, রুটি, ফুলুরি, আচার—"

"আমি খাবারের কথা বলছি না। কি খেলনা ভালবাসে তোমার নাতি—"

"পুতুলটুতুল মেয়েলী খেলনা ওর পছন্দ নয়। একটা তিনচাকাওলা সাইকেল কিনতে চেয়েছিল একবার। দর ক'রে দেখলাম দশ টাকার কমে হয় না। অত টাকা কোথায় পাব হুজুর বললুম—পরে কিনে দেব"

ডাক্তারবাবু মনিব্যাগ থেকে একটি দশ টাকার নোট বার করলেন।

"এই নাও। কিনে দিও—"

মালী এটা প্রত্যাশা করে নি।

"না, না বাবু আপনি দিচ্ছেন কেন"

"দিচ্ছি, কারণ ও শুধু তোমার নাতি নয়, আমারও নাতি!"

মালী টাকাটা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল তবু।

"ইতস্তত করছ কেন, তুমি যে আপনার লোক। নাতিকে সাইকেল কিনে দিও"

মালী বললে—"আপনার বাড়িতে কোনও ছেলেপিলে দেখিনি তো বাবু। তারা কি সব বিদেশে থাকে"

হা হা করে হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

"আমার আপনার লোক নেই। তোমরাই আমার আপনার লোক"

মালীটা হঠাৎ সচকিত হ'য়ে উঠল।

"ওই বাবু আসছেন। চেয়ার নিয়ে আসি একটা"

ছুটে চলে গেল সে। ডাক্তারবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন রামসদয় আসছেন।

"নমস্কার। হ'ল কিছু?"

"একটা কি যেন গিলেছে টোপটা। মাছ কি না জানি না। দিঘড়ায় একবার একটা কাছিম আমাকে খুব জ্বালিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে যখন টেনে তুললাম দেখি মাছ নয়, প্রকাণ্ড একটা কাছিম। কাছিমের মাংসও অবশ্য উৎকৃষ্ট মাংস। নটবর রেঁধেও ছিল ভালো—"

মালী চেয়ার নিয়ে এল।

রামসদয় বসলেন।

তারপর বললেন—"আপনার চাকরই বুঝি মাছ ধরছে। আপনি দর্শকমাত্র—"

"না, আমিই এতক্ষণ ছিপটা ধরে ছিলাম। ফাৎনাটা যখন ডুবল তখন টেনে মনে হল বড় মাছ, অনেকক্ষণ খেলাতে হবে। তাই নটবরকে ডেকে বললাম তুই ছিপটা ধর, আমি ততক্ষণ সিগারে দু'টান দিয়ে নিই। নটবর সুতো ছেড়েছিস?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেক সুতো ছেড়েছি। এইবার আস্তে আস্তে গোটাতে হবে"

"দে আমাকে দে—"

ডাক্তারবাবু ছিপটি হাতে নিয়ে বসলেন আবার। হুইল দিয়ে সুতো গোটাতে লাগলেন।

রামসদয় একটু ইতস্তত ক'রে বললেন—"আপনার জন্যে সামান্য জলখাবারের আয়োজন করেছি"

"বাঃ, আমিও কিছু খাবার এনেছি সঙ্গে। আপনাকেও খেতে হবে। দাঁড়ান এ ব্যাপারটা আগে মিটে যাক, তারপর খাওয়াদাওয়া—"

রামসদয় বুঝলেন যে কথা বলবার জন্যে তিনি ডাক্তারবাবুকে মাছ ধরবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন সে কথা এখানে বলা যাবে না।

"আপনি তাহলে বসুন। আমি চট্ ক'রে ঘুরে আসছি এখুনি। বিষ্ণুকে একবার তাগাদা দিতে হবে। সে আমার মোটরটা এখনও দেয় নি"

"নিখুঁত না হলে তো ও দেবে না। ওকে তাড়া দেবেন না, তাড়া দিলে ওর মেজাজ বিগড়ে যায়, কাজ ভালো হয় না। ওকে আপনমনে করতে দিন"

"আজই ওর দেবার কথা। দেখি কতদূর কি করলে—"

রামসদয়বাবু চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরলেন তখন ডাক্তারবাবু মাছটা তুলে ফেলেছেন। প্রায় পাঁচসেরি একটা রুই মাছ।

হর্ষোৎফুল্ল লোচনে রামসদয়ের দিকে চেয়ে বললেন—"সাক্‌সেস্‌ফুল। এইবার একটা বঁটি যোগাড় করুন। আপনাকে খানিকটা দিয়ে যাই—"

"না, না আমাকে দিতে হবে না। আপনিই গোটা মাছটা নিয়ে যান"

"আমার বাড়িতে তো খাবার লোক নেই। তাছাড়া মাছ ধ'রে কখনও আমি একা খেতে পারি না। পাঁচজনকে না দিয়ে তৃপ্তি হয় না। আপনার মালীকে কিছু দিয়ে যাব। আপনিও খানিকটা নিন"

"আমি নিয়ে কি করব। আমার কি রাঁধবার লোক আছে। যে ক'দিন এখানে থাকি হোটেলে খাই—"

"বেশ, তাহলে রাত্রে আমার ওখানে খাবেন আজ—"

অনুমানের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল সে বিস্ফারিত চোখে মাছটার দিকে চেয়েছিল।

"অনুমান তুমি একটা বঁটি যোগাড় ক'রে মাছটাকে কুটিয়ে ফেল দিকি"

মালীটা দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে এসে বললে—"আমি বঁটির ব্যবস্থা করছি আসুন—"

অনুমান তার পিছু পিছু গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন—"নটবর এইবার চায়ের ব্যবস্থা কর। আর আমাদের খাবারগুলো নিয়ে এস। মালীর জন্যে জন ছয়েকের মতো খাবার রেখে দাও। আমাকে খান দুইয়ের বেশী লুচি দিও না। বেশী খেতে পারব না এখন"

রামসদয়বাবু বললেন—"আমিও কিছু খাবার আনিয়েছি আপনার জন্যে—চলুন বৈঠকখানায়"

"ও সে কথা ভুলেই গেছি। নটবর রামসদয়বাবুর জন্যও কিছু খাবার নিয়ে এস। একটু বেশী করেই এনো"

"আমার জন্যে আবার কেন"

"আমিই বা তাহলে আপনার খাবার খাব কেন। চলুন না মশাই একসঙ্গে আনন্দ করা যাক। বাগড়া দিচ্ছেন কেন। চলুন—"

উভয়ে বাগানবাড়ির বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হলেন।

চা খাওয়ার পর আসল কথাটি পাড়লেন রামসদয়।

বললেন—"আপনি প্রবীণ ডাক্তার। আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাই। আমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না, কি করি বলুন তো—"

"কি হয়েছে—"

"দুর্বলতা বোধ করি। কলকাতার কয়েকজন ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম তাঁরা এই সব ওষুধ দিয়েছেন"

একতাড়া প্রেসক্রিপশন বার করলেন তিনি।

প্রেসক্রিপশনগুলো উলটে উলটে দেখতে লাগলেন ডাক্তারবাবু।

"ওরে বাবা, সবই যে কামোদ্দীপক ওষুধ দেখছি—"

"হ্যাঁ, একটু দুর্বলতা হয়েছে আমার। কি করি বলুন তো। কোনও ওষুধেই তো কোন উপকার পাচ্ছি না"

"একটা সত্যি কথা শুনবেন?"

"কি বলুন—"

"যে যৌবন চ'লে গেছে সে আর কিছুতেই ফিরবে না। ওষুধ খাওয়ার কোনও দরকার নেই। পুষ্টিকর খাবার খান"

"তা তো খাই। সের খানেক দুধ খাই। চারটে কাঁচা ডিম খাই। কলকাতায় যখন থাকি তখন রোজ একটা ক'রে ফাউল খাই। মাছও খাই দু'বেলা—"

"তবু কিছু হচ্ছে না?"

"আজ্ঞে না"

"তাহলে আর হবে না! আচ্ছা, উঠি এবার আমি। রাত্রে যাবেন আমার ওখানে—"

"এখুনি উঠছেন কেন, আর একটু বসুন না"

"না আর বসব না, অনেক জায়গায় মাছ বিলোতে হবে। আজ চলি—"

ডাক্তারবাবু চ'লে গেলেন।

ক্ষুব্ধ হয়ে বসে রইলেন রামসদয়।

১১

রামসদয়বাবু সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর বাজারের সেই ঘরটিতে মনিহারি দোকান খুললেন একটি। বিকাশই সে দোকানের কর্মচারী নিযুক্ত হল। কিন্তু যে ব্যাপারটি বিশেষ ক'রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হচ্ছে যে রামসদয়বাবু

নিজেও সে দোকানের একধারে একটি চেয়ার পেতে রোজ বসতে লাগলেন। বিষ্ণুর কথায় রবির বাবাকেও নিযুক্ত করেছিলেন তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে। তার উপরেই তিনি এখানকার গদির কাজ-কর্ম দিয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন। বিপিন-বাবুর কর্ম-পদ্ধতি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। কাজে বাহাল হয়েই প্রথমে তিনি গুদামের সমস্ত মাল নিজের সামনে দাঁড়িয়ে ওজন করিয়ে একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন, তারপর গুদামের চাবিটি নিজের কাছে রেখে রামসদয়কে বলেছিলেন—"এটা আমার জিম্মায় থাকাই ভালো, না, আপনি রাখবেন?" রামসদয় বিপিনের কাছেই চাবিটা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তো এখানে সব সময়ে থাকব না। এ গদির ভার আপনার উপর, আপনার কাছেই সব থাকা ভালো।" দু'দিনের ভিতরই হিসাবপত্রের খাতা সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন বিপিনবাবু। সব চিঠিপত্রেরও জবাব দিয়ে দিয়েছেন। এখানকার গদি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে রামসদয় এখন নিজের 'হবি' (hobby) চর্চায় মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর 'হবি' কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার পিছু পিছু ঘোরা এবং যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ তাকে দু'চোখ ভ'রে নিরীক্ষণ করা। এর বেশী আর কিছু করবার সামর্থ্য নেই তাঁর। ডাক্তারবাবু সেদিন যে কথাটা বললেন—"যে যৌবন চলে গেছে সে আর ফিরবে না"—একথা কলকাতার অনেক ডাক্তারও বলেছে তাঁকে। কিন্তু তিনি দমেন নি। কবিরাজ এবং হকিমদের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁরা নানা রকম উত্তেজক ওষুধও দিয়েছেন তাঁকে। কিন্তু, হায়, সে সব ওষুধেও ফল হয় নি কোনও। শেষকালে তিনি বুঝছেন সত্যিই চিরতরে সামর্থ্য হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু দেখতে তো দোষ নেই? দেখেও যে একটা সুখ আছে সে সুখ থেকে কেন বঞ্চিত হবেন তিনি যতক্ষণ দেখবার শক্তি আছে। যদিও প্রায় হাজার খানেক টাকা খরচ হ'য়ে গেল মনিহারি দোকানটা করতে, বিকাশকেও যদিও মাইনে গুণতে হবে কিছুদিন, (বিকাশ যে মনিহারি দোকানটা চালাতে পারবে এ বিশ্বাস তাঁর নেই) তবু তিনি বীণার বাড়ির সামনে বসবার যে একটা সাময়িক আস্তানা করতে পেরেছেন এতেই মহা খুশী তিনি। দোকানে একটি ইজি চেয়ার পেতেছেন, সেখানে সকাল বিকেল এসে বসেন আর বীণার জানলার দিকে চেয়ে থাকেন নির্নিমেষে। বীণা কিন্তু জানলা খোলে না। বারান্দাতেও আসে না। ওই বারান্দাতে সে ছোট ছেলে-মেয়েদের একটা স্কুল করবে ভেবেছিল, কিন্তু রামসদয়বাবু বাড়ির সামনে দোকান করাতে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে আপাতত। বীণাকে বাড়ির সামনে এখন কদাচিৎ দেখা যায়। সে খিড়কি দুয়ার দিয়ে বাইরে বেরোয়। তাদের খিড়কি দুয়ার খুললেই একটা সরু গলি। সেই গলিটা অনেক এঁকেবেঁকে অনেক দূরে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। এই গলি দিয়েই আজকাল বীণা যাতায়াত করে বাইরে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে। মানতি মাসীর ওখানেই রোজ যেতে হয় তাকে। যদিও তাঁর জ্বর ছেড়েছে, কিন্তু নিজে রেঁধে খাওয়ার মতো শক্তি পাননি এখনও। বীণাই রোজ খাবার দিয়ে আসে তাঁকে টিফিন কেরিয়ারে। রামসদয় একদিন তার বাড়িতেই এসে হাজির হয়েছিলেন এ সত্ত্বেও। বীণা তখন আলুকাবলি রান্না করছিল। শশধর বাড়িতে ছিল না। বাইরের কপাটটা ভেজানো ছিল। কপাটটা ঠেলে ঢুকে পড়লেন রামসদয় একদিন দন্ত-বিকশিত ক'রে।

"কি গো ঠাকুরেণ, কেমন আছ তোমরা। তোমাদের বাড়ির কাছে এলুম, তবু একদিনও দেখা পাই না। ভালো আছ তো সব—"

বীণা মাথায় কাপড় টেনে উঠে দাঁড়াল। হাতে খুন্তি। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, "আমরা ভাল আছি। কি চাই আপনার?"

দন্ত আরও বিকশিত ক'রে রামসদয় বললেন, "কিছুই চাই না। এমনি খবর নিতে এলুম। কি রাঁধছ, খাসা গন্ধ বেরিয়েছে তো"

"আলুকাবলি চড়িয়েছি। আপনি এখন যান, ব্যস্ত আছি আমি।"

"আলুকাবলি আমাকেও একটু দিও"

"উনি যখন ফেরি করতে বেরোন তখন ওঁর কাছ থেকেই নেবেন"

"বেশ বেশ তাই নেব। রোজ আমার চাই কিন্তু। অগ্রিম দাম কিছু দিয়ে যাচ্ছি—"

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের ক'রে আর একটু হেসে বললেন—"এইটে রাখ—"

"দাম ওকেই দেবেন"

বীণা উনুন থেকে আলুকাবলির ভারী বড় কড়াইটা দুম ক'রে নাবিয়ে পাশের ঘরে চ'লে গেল। আর ফিরল না। রামসদয় কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর বেরিয়ে গেলেন।

বীণাদের পাশের বাড়িতে থাকেন চণ্ডী সরকার। বীণা তাঁদের বাড়িতেই গিয়েছিল তাঁকে ডেকে আনতে। কিন্তু গিয়ে দেখল তিনি বাড়িতে নেই। তাঁর মেয়ে টুনটুন বলল—"বাবা মাঠে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে। কি দরকার তোমার বল না।" টুনটুনের কাছে এসব কথা বলা ঠিক হবে না মনে হল বীণার। চণ্ডী-বাবুর স্ত্রী রাঁধছিলেন। তিনি বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে।

"বীণা নাকি। এ সময় হঠাৎ—"

"না এমনি। কাকাবাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। পরে আসব"

বীণা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গলিটা নির্জন। নির্জন গলি দিয়েই হাঁটতে লাগল সে। শশধর কোথায় গেছে, কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। একা বাড়িতে ফিরতে ভরসা হল না বীণার। সে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল তার বাবার কথা, মায়ের কথা, কাকার কথা তার দূর সম্পর্কের এক পিসিমার কথা, শশধরের জন্য যে জীবন সে ছেড়ে এসেছে, যে জীবনে এখন আর কোনমতে ফেরবার উপায় নেই, সেই জীবনটাই হঠাৎ যেন হুড়মুড় ক'রে এসে হাজির হল সামনে। শশধরকে গোপনে প্রশ্রয় দিয়েছিল বলে তার বাবা একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরে ছিলেন তার মাথায়। সে মরেও যেতে পারত, কিন্তু মরে নি। হাসপাতালে দিন দুই অজ্ঞান হয়ে ছিল খালি। মনে পড়ল ওই মারের জন্যই শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল তার। বিষ্ণুবাবু এস. পি-র সাহায্য নিয়ে তার বাবার মত করিয়েছিলেন। মাথার কাটা দাগটার উপর সে একবার হাত বুলিয়ে দেখল। মনে পড়ল এই দাগটার জন্য বিষ্ণুবাবু ওষুধ কিনে দিয়েছিলেন। সে ওষুধ যেমনকার তেমনি আছে। হঠাৎ বীণার মনে হল বিষ্ণুবাবু তার হিতৈষী, তাঁকে গিয়ে সব ব্যাপারটা খুলে বললে কেমন হয়। কিন্তু কি বলবে তাঁকে গিয়ে। কেমন যেন লজ্জা করতে

লাগল। অথচ এ লোকটার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় কি। একেবারে বাড়ির সামনে এসে বসেছে, আজ ঘরের ভিতর এসে ঢুকেছিল। হঠাৎ মনে হল ডাক্তার-বাবুর কাছে যাব? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না এসব কথা তাঁকে গিয়ে বলতে পারব না। কিছু দূর হাঁটবার পর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে সমাধান হয়ে গেল সমস্যাটার।

"আদাব, আদাব, বহুমায়ীজি কাঁহা যাতি হো—"

সেই কাবুলিওলা। অনেকদিন পরে দেশ থেকে ফিরেছে। চেহারাটা আরও বলিষ্ঠ হয়েছে। হাতে প্রকান্ড লাঠি। মুখে প্রশান্ত নির্ভয় হাসি। বীণার সঙ্গে আধা-হিন্দী আধ-বাংলা ভাষায় তার যে কথা হল সরল বাংলা অনুবাদ করলে তা এই দাঁড়ায়।

"আগা সাহেব, বড় বিপদে পড়ে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছি ভয়ে"

"ভয়! কিসের ভয়, কাকে ভয়? কি হয়েছে খুলেই বল না"

"আমার বাড়ির সামনে রামসদয়বাবু দোকান খুলেছে একটা। অতি পাজী লোক, সব সময় আমার জানলার দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় যেন গিলে খাবে। আমার স্বামী এখন বাড়ি নেই, সে একটু আগে আমার বাড়িতে ঢুকেছিল আমাকে দশটা টাকা দিতে গিয়েছিল, আমি পালিয়ে এসেছি—"

নাসারন্ধ্র স্ফীত হল কাবলিওলার, আগুন ছুটে বেরুল চোখের দৃষ্টি থেকে। বললে—"আমার সঙ্গে চলো। সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে কেন, জুতো মেরে তাড়িয়ে দিলেই পারতে হারামীকে।"

বাড়ির কাছাকাছি এসে বীণা বললে—"আমাদের বাড়ীর সামনে ওই দোকানটা। আমি ভিতরে যাচ্ছি"

খিড়কি দরজা দিয়ে বীণা ভিতরে চ'লে গেল।

কাবুলিওলা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দরাজ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "রামসোদয়বাবু কৌন হ্যয়—"

বিকাশ একটা টুলে বসেছিল। পাশেই বসেছিলেন রামসদয়বাবু। বিকাশ রামসদয়বাবুকে দেখিয়ে দিতেই কাবুলি গর্জন ক'রে উঠল—"আপ মেরা বেটীকা ঘরমে বিনা এত্তেলা দেকে কাহে ঘুসে থে"

"তোমার বেটীর ঘরে!—"

কাবুলি বীণার ঘরটা দেখিয়ে—"হাঁ—ই হামারা বেটীকা ঘর হ্যয়, বীণা হামারা বেটী হ্যয়, হামারা বহুমায়ী হ্যয়। আপ কাহে উঁহা গয়ে থে—"

অপ্রস্তুত মুখে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন রামসদয়।

কাবুলি মাটিতে লাঠি ঠুকে বলল—"অয়ন্দা ফির এইসে কিয়া তো ইয়ে ডান্ডা দেকে তোমহারা শর্ ফাড় দেঙ্গে। সমঝা? বহুৎ রুপিয়া হ্যয় তুমহারা, না? আপনা রুপিয়া আপনা জেবমে রাখখো। হামরা বেটীকো মৎ লালচাও। ফির কুছ কিয়া তো হাড্ডি চুরচুর কর দেঙ্গে।"

কাবুলি চোখ পাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চলে গেল। রামসদয় নীরব!

কাব‍ুলিওলা যখন দ‍ৃষ্টির আড়ালে চ'লে গেল তখন রামসদয়বাব‍ুর বাক্যস্ফ‍ূর্তি হল।

"এ তো ভয়ানক লোক দেখছি। থানায় একটা খবর দিয়ে আসি। আজকাল দারোগা কে—"

বিকাশ বললে—"ঠিক জানি না। আপনি কি বীণাদের বাড়ি গিয়েছিলেন না কি"

"হ্যাঁ। বলতে গিয়েছিলাম আমাকেও রোজ যেন আল‍ুকাবলি দেয়। তাই নিয়ে এত কাণ্ড! মজা দেখাচ্ছি ব্যাটা কাবলেকে—"

"কখন গিয়েছিলেন আপনি। আমি আসবার আগে?"

"হ্যাঁ। আমি থানায় চলল‍ুম।"

রামসদয়বাব‍ু একটা রিক্‌শা ডেকে চ'লে গেলেন।

বিকাশ খানিকক্ষণ ব'সে রইল। তারপর হঠাৎ সে শশধরকে দেখতে পেল। সে এতক্ষণে বাড়ি ঢ‍ুকছে।

"শশধর কোথায় ছিলে এতক্ষণ—"

"আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম জগন্নাথকে দেখতে। ডাক্তাররা বলছেন হাতটা না কি কেটে ফেলতে হবে। যদি সত্যিই কেটে দেয় তাহলে কি হবে বল দেখি—"

শশধরের ম‍ুখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল।

"তোমার বাড়িতে এদিকে যে হ‍ুল‍ুস্থ‍ুল কাণ্ড। এক আগাসায়েব এসে বাব‍ুকে শাসিয়ে গেল—"

"কি হয়েছে—"

"আমিও ঠিক জানি না"

শশধরের সাড়া পেয়ে কপাটটা খ‍ুলে দিলে বীণা। বিকাশও তার দোকান থেকে নেমে এল। খোলা কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—"আসতে পারি?"

"আস‍ুন না। আপনি তো বন্ধ‍ু। ও ম‍ুখপোড়ার কাছে জ‍ুটেছেন কেন"

বিকাশ ঘরের ভিতর ঢ‍ুকতেই বীণা বাইরের কপাটটা বন্ধ ক'রে দিল।

শশধর বললে—"কি হয়েছিল বল দেখি—"

"তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ"

"হাসপাতালে গিয়েছিলাম। শ‍ুনলাম জগন্নাথের হাতটা কেটে দেবে—তাই খবরটা নিতে গিয়েছিলাম। ভারী ম‍ুশকিলে পড়েছে বেচারা"

"আমিও কম ম‍ুশকিলে পড়িনি!"

"কি রকম—"

বীণা তখন সব খ‍ুলে বলল।

"আমি তো ভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কারো দেখা না পেয়ে হনহন ক'রে যাচ্ছিলাম বিষ‍্ণ‍ুবাব‍ুর কাছে—এমন সময় আগা সাহেবের দেখা পেয়ে গেলাম রাস্তায়।"

বিকাশ এতক্ষণ একটি কথা বলেনি।

সব শ‍ুনে হঠাৎ বলে উঠল—"আমি ঠিক ক'রে ফেললাম"

"কি ঠিক করলে—"

"এ দোকানে আর চাকরি করব না"

বেরিয়ে গেল তারপর। দোকানে তালা লাগিয়ে বাড়ি চ'লে গেল। বাড়িতে গিয়ে দেখা হ'ল দামোদরের সঙ্গে। তিনি খাওয়াদাওয়া ক'রে উপনিষদ পড়ছিলেন।

"এখনই বাড়ি চলে এলি যে এত সকাল সকাল"

"আমি ওখানে আর চাকরি করব না"

"কেন"

" ও লোকটা লম্পট। শশধরের বউ বীণাকে বিরক্ত করবার জন্যে ওর বাড়ির সামনে দোকান খুলেছে। আমি ওর মধ্যে থাকব না। আপনি দোকানের চাবিটা ফিরিয়ে দেবেন ওঁকে।"

তালার চাবিটা সে দামোদরের সামনে ফেলে দিয়ে ভিতরে চ'লে গেল। টেনিস র‍্যাকেট হাতে ক'রে বেরিয়ে এল একটু পরে।

"আমি ক্লাবে চললাম—"

র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে চ'লে গেল। দামোদরের মনে পড়ল এই দামী র‍্যাকেটটি তার ছোটমাসী উপহার দিয়েছিল তার জন্মদিনে। দামোদর সামনের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে ক্ষীণ আশা জেগেছিল মুদীর ধারটা এবার শোধ করতে পারবেন হয়তো। সে আশা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। আবার উপনিষদে মন বসাতে চেষ্টা করলেন। ডাক্তারবাবু উপনিষদ শুনতে চেয়েছেন তাঁর কাছে। ডাক্তারবাবুর কাছে বহুভাবে ঋণী তিনি। বরাবর তাঁর বাড়িতে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। কখনও কিছু চাননি তিনি প্রতিদানে। কাল নিজমুখে বললেন—"উপনিষদের নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু ওর ভিতর কি আছে তা জানি না। আপনারা সাহায্য না করলে তা জানাও যাবে না। কিন্তু আপনাকে বলতে সাহস পাই না—"

দামোদর বলেছিলেন—"সে কি কথা। কালই আসব আমি—" সেই জন্যেই উপনিষদ খুলে বসেছিলেন আজ। কিন্তু তাঁর বারবার মনে হ'তে লাগল, বিকাশ এ কি করলে! তাঁর মনে হ'ল যে ব্রহ্মকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কান দিয়ে শোনা যায় না, সেই ব্রহ্ম কি এই বিকাশের মধ্যেও বিকশিত?

সেদিন সন্ধ্যার সময় তিনি ডাক্তারবাবুকে উপনিষদ শোনাতে গিয়ে কিন্তু হতাশ হলেন। তিনি যখন উচ্ছ্বাস-ভরে কেনোপনিষৎ পাঠ করছিলেন তখন ডাক্তারবাবু শুয়ে ছিলেন একটা ইজি-চেয়ারে। হঠাৎ দামোদর লক্ষ্য করলেন তাঁর নাক ডাকছে। উপনিষদ পাঠ বন্ধ রেখে সবিস্ময়ে চাইলেন তিনি ডাক্তারবাবুর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন ডাক্তারবাবু।

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। না? তবে কিছু কিছু শুনেছি। 'অন্তঃকরণের সাহায্যে যাঁকে লোকে চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু যাঁর দ্বারা অন্তকরণ সমুদ্ভাসিত হয়,—চমৎকার। আজ থাক। কাল আবার আসবেন।"

দামোদর একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই উপনিষদ পাঠ বন্ধ করলেন।

ডাক্তারবাবু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "পণ্ডিতমশাই, আপনার কাছে একটা আবেদন আছে আমার। আমি আমাদের শাস্ত্রের ভালো ভালো তত্ত্বগুলো শুনতে চাই। শোনা উচিত মনে করি। কিন্তু নিরেট তো, গল্প-উপন্যাস আর

ডাক্তারি প্রবন্ধ ছাড়া অন্য কিছু মাথায় ঢোকে না। শাস্ত্রকথা শুনলে ঘুম পায়। তবু কিন্তু শুনব। রোজ আসতে হবে আপনাকে। আর এজন্যে মাসে মাসে কিছু প্রণামীও আপনাকে নিতে হবে। আপনি না বলতে পারবেন না।"

এই ব'লে ডাক্তারবাবু একটি একশ' টাকার নোট বার ক'রে দামোদরের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন।

নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন দামোদর।

দামোদরের যে অতি কষ্টে সংসার চলছে এ খবর শুনে থেকেই ডাক্তারবাবু ভাবছিলেন কি ক'রে পণ্ডিতমশাইকে সাহায্য করা যায়। এমনি টাকা দিলে তিনি নেবেন না, তাই এই কৌশল করতে হয়েছিল। এ কৌশল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল।

দামোদর বললেন—"যদিও আমি খুব অভাবগ্রস্ত লোক কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, আমি শিক্ষক, আমি বিদ্যা বিক্রয় করতে পারব না। যখন আমার টোল ছিল তখনও আমি কোনও ছাত্রের কাছ থেকে মাইনে নিতাম না। মাত্র চারটি ছাত্রের ভরণপোষণ করতে পারতাম আমার জমি থেকে। সবাই শাক ভাত খেয়েই আনন্দে থাকতাম। কিন্তু সে সব দিন আর নেই। আমার জমিও হাতছাড়া হয়ে গেছে। সবই বদলে গেছে। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। খব কষ্টে আছি। তবু আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না। তাছাড়া আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ। আমার ছেলে বিকাশটা যদি মানুষ হ'ত, কিছু রোজগার করত তাহলে নিশ্চিন্ত হতাম। বেকার হ'য়ে ব'সে আছে ছেলেটা। ওর যদি কোথাও একটা চাকরি জোটে—"

"লেখাপড়া কতদূর করেছে? বাংলা জানে তো—"

"তা জানে"

"তাহলে আমি একটা চাকরি ওকে দিতে পারি। আমার একটা ছোটখাটো লাইব্রেরী আছে। তাতে আছে অনেক পুরাতন মাসিকপত্র আর সেকালের বই। অনেক ভালো ভালো প্রবন্ধ আছে সে সব বইয়ে। আমার ইচ্ছে সেগুলো সংকলন ক'রে আবার ছাপাই। তা না হলে ওগুলো হারিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। আপনার ছেলে যদি সেগুলো একটা খাতায় টুকে দেয়—"

"হ্যাঁ তা সে দিতে পারবে—"

"তাহলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। টাকাটা আপনি রাখুন পণ্ডিতমশায়—ওটা আপনার ছেলের অগ্রিম মাইনে স্বরূপই দিলাম মনে করুন, না হয়—"

"আমার ছেলের মাইনে আমার ছেলেকেই দেবেন। সে এ কাজ করতে রাজী হবে কি না তা সেই জানে। আজকালকার ছেলেদের ঠিক চিনি না আমি। আমি ওকে বলব আপনার সঙ্গে দেখা করতে"

দামোদর উঠে পড়লেন।

"চলুন আপনাকে পৌঁছে দি। লোচন গাড়ি বার কর—"

"না, না, গাড়ি বার করবার দরকার কি, এটুকু আমি হেঁটেই চলে যাব অনায়াসে। রাতও তো বেশী হয় নি—"

"আমার দরকার আছে।"

ডাক্তারবাবু নোটটা কুড়িয়ে পকেটে পুরে ফেললেন।

দামোদরের বাড়িতে পৌঁছে ডাক্তারবাবু সটান ভিতরে ঢুকে গেলেন।

"কই মা কই—"

শীর্ণা রুগ্না দামোদরের পত্নী বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরনে ছিন্ন বস্ত্র। মুখে একটা সভয় ঔৎসুক্য।

ডাক্তারবাবু বললেন—"মা আজ আমার জন্মদিন। আমার জন্মদিনে আমার মা একটি সদব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়ে দক্ষিণা দিতেন। আমি ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি। চাকর দাই আমার রান্না করে। সদব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবার অধিকার আমি হারিয়েছি। কিন্তু এবার ঠিক করেছি দক্ষিণাটা আমি দেব। পন্ডিতমশাইকে দেবার যোগ্যতা আমার নেই কিন্তু আপনি মা আপনাকে আমি অনায়াসেই দিতে পারি। আশীর্বাদ করুন আমাকে—"

তিনি প্রণাম করে একশ টাকার নোটটি রাখলেন তাঁর পদপ্রান্তে। তারপর উঠে যখন দাঁড়ালেন তখন দেখলেন দামোদর নির্নিমেষে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে জল পড়ছে।

ডাক্তারবাবু কিছু না ব'লে বেরিয়ে এলেন।

গাড়িতে যেতে যেতে ভাবলেন—'আমার জন্মদিন কবে তা আমি জানি না। আমার মা আমার জন্মদিন করতেন এ কথাত মিথ্যে, কারণ আমি যখন চার মাসের তখনি তিনি মারা গেছেন। তবু আজ আমার জন্মদিন। আজ আমি সেই জগতে নব-জন্ম গ্রহণ করলাম যেখানে পন্ডিত দামোদরের মতো ব্রাহ্মণেরা আছেন। তাঁকে আজ সামান্য সাহায্য করতে পেরেছি এতেই আমি কৃতার্থ''

১২

রামসদয়বাবু থানায় গিয়ে দেখলেন তাঁর পরিচিত কেউ নেই। তাঁকে কেউ বসতে পর্যন্ত বলল না। তিনি খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—"দারোগাবাবু কোথা"

"ওই ঘরের ভিতর"

ঘরের ভিতরে ঢুকে যতীনবাবুর দেখা পেলেন তিনি। যতীনবাবু মুখ তুলে চাইতে খুব ঝুঁকে প্রণাম করলেন রামসদয়।

"কি চাই? কে আপনি?"

"আমার নাম রামসদয় দাঁ-দত্ত। এখানে আমার একটা গোলা আছে। কলকাতায় থাকি আমি। সম্প্রতি এখানে একটা মনিহারি দোকান খুলেছিলাম। কিন্তু এক কাবুলিওলার অত্যাচারে বিব্রত হ'য়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি—"

"কাবুলিওলা? এখানে তো একটিমাত্র কাবুলিওলা আছে, আফজল খাঁ। সে তো খারাপ লোক নয়, লোকের বিপদে-আপদে টাকাকড়ি দেয়, অনেকের টাকা ছেড়েও দেয় শুনেছি। সে খুব পপুলার লোক, সবাই তাকে ভালবাসে। সে আপনাকে বিব্রত করেছে? কেন, কি হয়েছিল—"

এখানেই রামসদয়বাবু গুলিয়ে ফেললেন। কি হয়েছিল তা সঠিক বোঝাতে পারলেন না তিনি। বোঝাতে গেলে যে সব কথা বলতে হয় তা দারোগাবাবুর কাছে বলবার সাহস হল না তাঁর। কি বুঝতে হয়তো কি বুঝবেন। তিনি আমতা আমতা ক'রে বললেন—"লোকটা আমাকে মারবে ব'লে শাসিয়েছে। তাই আমি—"

যতীনবাবু হেসে বললেন—"আগে মারুক তো, তারপর দেখা যাবে। আমি যে কাবুলিওলার কথা বলছি সে কিন্তু খারাপ লোক নয়। যাই হোক, আপনার কথা আমার মনে থাকবে, আমি নোট ক'রে নিচ্ছি—"

রামসদয়বাবু বাড়ি ফিরে এলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকরটা বলল—"এই নিন চাবি। দামোদরবাবু দিয়ে গেছেন—"

"কিসের চাবি"

"দোকানের। দামোদরবাবু বললেন বিকাশ আর দোকানে কাজ করবে না, তাই চাবিটা দিয়ে গেছে—"

রামসদয় চাবিটা নিয়ে যদিও মুখে বললেন—"ও কাজ না করে আর একজন করবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না" কিন্তু মনে মনে তিনি অনুভব করলেন এখানে এই মফঃস্বলে লোক পাওয়া খুব সহজ হবে না। এখানে সকলেই তাঁর উপর মনে মনে চটা, কেউ প্রসন্ন নয়। এখানে হঠাৎ বিশ্বাসী লোক পাওয়া শক্ত হবে তাঁর পক্ষে। ওই ছোঁড়া ভদ্রবংশের ছেলে। কবিতাই লিখুক আর যা-ই করুক চুরিচামারি করত না। পরদিন সকালে গিয়ে তিনি বিপিনবাবুকে বললেন—"বিকাশকে আমার মনিহারি দোকানে একটা চাকরি দিয়েছিলাম সে কেন জানি না চাকরিটা ছেড়ে চলে গেছে। আমাকে একটা বিশ্বাসী ছোকরা খুঁজে পেতে দিতে পারেন? মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেব। দোকানে ব'সে টুকিটাকি জিনিসপত্র বিক্রি করবে, আর তার একটা হিসেব রাখবে। আমিও গিয়ে বসব সেখানে মাঝে মাঝে, কিন্তু বুড়ো হয়েছি আমি তো বিক্রি করতে পারব না। বিশ্বাসযোগ্য একটি লোক দেখুন আপনি—"

বিপিনবাবু বললেন—"বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া শক্ত।"

"শুনেছি আপনার একটি ছেলে আছে। সে কি করে?"

"সে মোটর ড্রাইভারি করে"

"কত মাইনে পায়"

"তা আমি ঠিক জানি না"

"সে ওখানে যা পাচ্ছে তাই আমি দেব। মোটর চালাতে জানে এরকম একটা লোক আমিও খুঁজছি। আমার ড্রাইভারটা বদমায়েশি আরম্ভ করেছে। আমার ড্রাইভারটা যদি স'রে পড়ে তাহলে ওই দু'চারদিন কাজ চালিয়ে দিতে পারবে। আপনি তাকে ডেকে পাঠান"

বিপিনবাবু চুপ ক'রে রইলেন।

তারপর বললেন—"আমার ছেলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার ঝুঁকি আমি নিতে পারব না"

"তাই না কি! আপনি তার বাপ হ'য়ে একথা বলছেন?"

বিপিনবাবু চুপ ক'রে রইলেন।

রামসদয় বলে উঠলেন—"উঃ কালে কালে কি হল!"

রামসদয় নিজেই গিয়ে দোকানটা খুললেন।

দোকান খুলে চেয়ারে বসে রইলেন বীণার বন্ধ জানলার দিকে চেয়ে।

এরপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

বীণার জানলায় ছোট একটা ফুটো ছিল। বীণা সেই ফুটোয় চোখ দিয়ে দেখল রামসদয়বাবু তার জানলার দিকে চেয়ে আছেন। লোকটার গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, চোখের কোলে কালি, মাথার সামনের দিকটায় টাক, চিবুকের মাঝখানে একটা গর্ত মতন। তার বাবার চিবুকেও ওই রকম গর্ত ছিল। লোকটা ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে তার জানলার দিকে। অসহায় ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। চিবুকটার দিকে চেয়ে আবার তার বাবাকে মনে পড়ল। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে হল তার। মনে হতেই একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় ভ'রে উঠল তার অন্তর। যে আবেগে সে একদিন শশধরের মতো একটা ফেরিওলাকে বিয়ে করবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েছিল সেই আবেগেই নূতন রূপে জেগে উঠল তার মনে। ওকে জয় করবই। এই কথাগুলোও সে বলল মনে মনে। শশধর বাড়ি নেই। আজও সে তার বন্ধু জগন্নাথের খবর নিতে হাসপাতালে বেরিয়ে গেছে। বীণার আলুকাবলি রান্না হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। নিজেদের জন্য ইকমিক কুকারে সে মাংস ভাত আগেই চড়িয়ে দিয়েছে; মানতি মাসীর রান্নাটাও হ'য়ে গেছে। কিন্তু তাঁর কাছে যাবার আগেই সে ব্যাপারটা ক'রে ফেলতে চায়।

ঝুমরি মটরশুটি ছাড়াচ্ছিল। বিকেলে ঘুগনি হবে।

বীণা বললে—"ঝুমরি, ওই বড় প্লেটটা নিয়ে আয় তো। চামচেটাও আনিস"

প্লেট আর চামচ আসতেই বীণা বেশ খানিকটা আলুকাবলি বার ক'রে প্লেটে রাখল। তারপর রাখল একটা ছোট চামচ প্লেটের পাশে।

তারপর চিঠি লিখতে ব'সে গেল।

শ্রীচরণেষু,

আপনার থুতনিতে যেমন গর্ত আছে আমার বাবার থুতনিতেও তেমনি ছিল। আমার বাবা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। আপনাকেই আমি বাবা বলে ডাকব। কাল আপনার প্রতি যে অভদ্র আচরণ করেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত। আলুকাবলি এখনই তৈরি করেছি, আপনার জন্যে পাঠালাম খানিকটা। রোজ পাঠাব। আপনাকে দাম দিতে হবে না। বাবার কাছ থেকে মেয়ে কখনও দাম নেয়?

প্রণতা বীণা

ঝুমরিকে বলল—"তুই এই খাবার আর চিঠিটা দিয়ে আয় ওই বুড়োকে। তারপর এক গ্লাস জল নিয়ে যাস। আমি মানতি মাসীর কাছে যাচ্ছি। তুই বাড়িতে থাকিস আমি না ফেরা পর্যন্ত।"

মানতি মাসীর বাড়ি থেকে বীণা ফিরছিল। মাথায় কাপড় ছিল না, বেণীটা দুলছিল পিঠের উপর। বীণা পারতপক্ষে মাথায় কাপড় দেয় না, খোঁপাও বাঁধে না। কুমারী অবস্থায় যেভাবে ঘুরে বেড়াত এখনও তেমনি বেড়ায়। হনহন ক'রে

ফিরছিল সে। রামসদয়বাবুর খবরটা জানবার জন্যে খুব উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল সে। হঠাৎ ঘ্যাঁচ্ ক'রে একটা মোটর থেমে গেল তার পাশে। মোটরে বিষ্ণুবাবু। একটা মোটর ট্রায়াল দিতে তিনি বেরিয়েছিলেন। বীণাকে তিনি জিগ্যেস করলেন—"তোমার কপালের কাটা দাগটার জন্যে একটা ওষুধ পাঠিয়েছিলাম তুমি লাগাও নি ?"

বীণা ঘাড় হেঁট ক'রে রইল। তারপর বলল, "না লাগাই নি। ওটা আমার বাবার স্মৃতিচিহ্ন। ওটা থাক্—"

বিষ্ণু এ উত্তর প্রত্যাশা করেননি। হঠাৎ তার নিজের বাবা মার কথা মনে পড়ল যাঁরা না কি অনাহারে ভিখারীর মতো মারা গেছেন। তাঁদের কোনও স্মৃতিচিহ্ন কি আছে তাঁর কাছে ? নেই। হঠাৎ যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মনে হল তাঁরও কিছু একটা করা উচিত বাবা মার জন্য। কিন্তু কি করবেন ? মাথায় এল না।

বীণা ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েই ছিল।

বিষ্ণুবাবু জিগ্যেস করলেন—"ওষুধটা কোথা"

"বাড়িতেই আছে। পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে ?"

"আমিই গিয়ে নিয়ে আসব একদিন। আর সব খবর ভালো তো ?

"ভাল"

বিষ্ণুবাবু চ'লে গেলেন। তাঁর একবার মনে হয়েছিল বীণাকে একটা 'লিফট' দিয়ে দেন, কিন্তু সেটা হয়তো দৃষ্টিকটু হবে ব'লে তা আর করলেন না। বিষ্ণুবাবু কিন্তু ভাবতে লাগলেন—"বাবা মার স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়। বীণা মেয়েটা শিক্ষা দিয়ে দিলে আমাকে। ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করলে কেমন হয়, কি করলে ভালো হয়—"

বাড়ি ফিরে এসে বীণা দেখল রামসদয়বাবুর দোকান বন্ধ। ভিতরে ঢুকতেই ঝুমরি বলল—"বুড়ো বাবু তোমার জন্যে অনেকক্ষণ ব'সে ছিলেন। একটু আগেই চলে গেছেন। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।" বীণা যে চিঠি লিখেছিল তারই নীচে পেন্সিল দিয়ে লিখেছেন। কাগজের দু'পিঠ ভ'রে গেছে।

"তুমি আমাকে বাবা বলে সম্বোধন করেছ। কিন্তু তোমার বাবা হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমি অতি পাজী লোক। তুমিই বরং আমার মা হও। বকনিটকুনি দিয়ে শায়েস্তা করে ফেল আমাকে। আমার ছেলেরা বৌমারা আমেরিকায়। আমার অভিভাবক হওয়ার লোক নেই। তুমি আমার অভিভাবক হও। তোমাদের বাড়ির সামনে যে দোকানটা করেছি সেটা উঠিয়ে দেব ভাবছি। যে প্রয়োজনে করেছিলাম তা শেষ হয়ে গেল। তুমিই সেটা শেষ ক'রে দিলে। গোড়াতেই বলেছি আমি পাজী লোক। কিন্তু আমার একটা ক্ষমতা আছে, আমি ভালো লোক, খাঁটি জিনিস চিনি। তোমাকে মা ব'লে তাই এত সহজে চিনতে পারলাম। তোমার আলুকাবলি চমৎকার, দাম আমি দেব না। কিন্তু মা-কে একটা প্রণামী দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি অনুমতি কর তো বলি। আমার এই দোকানটা তোমরাই চালাও না। দোকানের জিনিসপত্র-গুলো তোমাকে এমনি দেব। বাড়ির ভাড়াও আমি নেব না। আমার ভয় হচ্ছে তুমি হয়তো রেগে উঠবে। যদি রেগে ওঠ তাহলে আমাকে থেমে যেতে হবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। কাল সকালে আসব। আমার প্রণাম নাও।" ইতি—

রামসদয়

বীণা চিঠিটা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। হঠাৎ উদ্দীপনাবশে সে যা করেছিল তার ফল যে এমন সুদূরপ্রসারী হবে তা সে কল্পনা করেনি। আনন্দে গর্বে তার বুকটা ভ'রে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল বুড়োর চোখ দুটো। সে চোখে যে দৃষ্টি সে দেখেছে সে দৃষ্টি দেখবার পর কি ও লোককে বিশ্বাস করা উচিত? কি করা উচিত ভাবছিল এমন সময় শশধর এসে ঢুকল। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল—"আজ জগন্নাথ একটু ভাল আছে। ডাক্তারবাবুরা বলছেন হাত কেটে ফেলতে হবে না। বাঁচা গেল। হ্যাঁ, এক্ষুণি বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আগামী রবিবার ভিকিরিদের খাওয়াবেন। তোমাকে বেশী ক'রে আলুকাবলি বানাতে হবে। তার সব খরচ তিনি দেবেন। কিন্তু আমি ভাবছি খরচ নেওয়াটা কি উচিত হবে?"

বীণা বললে—"আমি মানতি মাসীর বাড়ি থেকে যখন ফিরছিলাম তখন আমার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল রাস্তায়। গাড়ি থামিয়ে জিগ্যেস করলেন আমি ওষুধটা লাগাচ্ছি কি না। বললাম সত্যি কথা। উনি রাগ করলেন না, বললেন ওষুধটা নিয়ে যাবেন এসে। তখন তো ভিকিরি খাওয়াবার কথা বললেন না"

"আমাকে কিন্তু বলেছেন। আমি এখখুনি ও'র গ্যারেজ থেকেই আসছি"

"গ্যারেজে গিয়েছিলে কেন"

"বিষ্ণুবাবুকে বলতে গিয়েছিলাম জগন্নাথের দাদাটার জন্যে। তাকে যদি উনি অ্যাপ্রেন্টিস্ হিসাবে নেন আর কিছু মাইনে দেন তাহলে ওদের বড় উপকার হয়। ওর দোকানটা বেকার ব'সে আছে। জগন্নাথের বাবা মোটে পঁচাত্তর টাকা মাইনে পান। তাতে ওদের সংসার চলে না। বিষ্ণুবাবু এত ভালো লোক। শুনেই বললেন আচ্ছা, পাঠিয়ে দিও। যদি ভালো ক'রে কাজ করে আমি আপাতত রোজ এক টাকা ক'রে দেব। কাজ শিখলে আরও বাড়িয়ে দেব। তোমার হাতে কার চিঠি—"

বীণা হেসে বললে—"আমি এক কাণ্ড ক'রে ব'সে আছি। ক'রে বসলাম তো, এখন ভাবছি এর পর কি করা উচিত"

"কি হয়েছে?"

বীণা আনুপূর্বিক সব খুলে বলল—"আমার চিঠির উপরই তিনি উত্তর লিখে দিয়ে বাড়ি চলে গেছেন। এই দেখ—"

শশধর ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে চিঠিটা পড়ল। চিঠিটা প'ড়ে তার মুখে হাসি ফুটল।

"বুড়োকে ঘায়েল করে ফেলেছ দেখছি। আগা সাহেবের ধমক যা পারেনি তুমি তাই করেছ।

"কাল যখন আসবে তখন কি বলবে তাকে—"

"আমি বলব কেন যা বলবার তুমিই বোলো। বাড়ির আসল মালিক তো তুমি—"

"আহা; আমি কাল সকালেই চ'লে যাব মানতি মাসীর কাছে। আমি ওর সঙ্গে দেখা করব না"

"কেন, তোমাকে 'মা' বলেছে, তোমাকে মনিহারি দোকানটা দিয়ে দিতে চাইছে, এর পরও তুমি যদি দেখা না কর—দেখা করবে না কেন"

"ও মা-ই বলুক, আর ঠাকুমাই বলুক ওর চোখের দৃষ্টি ভালো নয়। ও কোনও

হ্নতোর আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়। আমি কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করব না। সে-ই কথাটা ব'লে দিও ওকে।"

"অমন ভদ্রভাবে চিঠি লিখেছে তার উত্তর কি অমন অভদ্রভাবে দেওয়া যায়"

"ওই দোকানটা নেবার লোভ হচ্ছে না কি তোমার"

"রাম কহো। ও দোকান নিয়ে আমি কি করব। দোকানে ঠায় ব'সে থাকা কি আমার পোষায়? আমাদের যা আছে তাতেই তো আমাদের সংসার স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়। আমি আলনুকাবলি ফেরি করি শখের জন্য। রোজ কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, রাস্তায় রাস্তায় ঘনুরে বেড়াই, বেশ লাগে। কাল নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়েছিলাম, চমৎকার একটা চাঁপা গাছ দেখলাম চৌধনুরীদের বাগানে। তার মালী বলেছে আমাকে ফুল পেড়ে দেবে একদিন। নিয়ে আসব তোমার জন্যে। ওপারে একটা পনুকুরে পদ্মও ফুটেছে খনুব দেখলাম। ওখানে একটি ছেলের সঙ্গে ভাব ক'রে এসেছি। কিশোরী তার নাম। তোমার তৈরি আলনুকাবলি খেয়ে সে তো মনুগ্ধ। আমি দাম নিতে চাইনি, সে জোর ক'রে দিয়ে দিল। বলল তাদের ক্লাবে আমাকে নিয়ে যাবে একদিন। খনুব বিক্রি হবে সেখানে—"

বীণা হাসিমনুখে সব শনুনছিল। তার এই ভবঘনুরে আড্ডাবাজ সরল স্বামীটির দৈনিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শনুনতে খনুব ভালো লাগে তার।

"তার মানে, তুমি সারাজীবনই আলনুকাবলি ফেরি ক'রে বেড়াবে" "হ্যাঁ। যতক্ষণ চলচ্ছক্তি থাকবে ততদিন আর কিছনু করব না। ফেরিওলা ছিলাম বলেই তো তোমাকে পেয়েছি—ঘরে ব'সে থাকলে কি তোমার দেখা পেতাম"

"দেখো আবার যেন কাউকে জনুটিয়ে এনো না—"

"পাগল হয়েছে!"

দনু'জনেই হো হো ক'রে হেসে উঠল।

"তুমি সত্যিই বনুড়োর সঙ্গে দেখা করবে না?"

"না। ওর চোখের দৃষ্টি ভাল নয়। তুমি বাড়িতে থেকো, আমি মানতি মাসীর বাড়িতে চলে যাব। তুমি বোলো আমি অচেনা পরপনুরনুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করি না। আর বোলো আপনার দোকানও আমরা চাই না। ও দোকান আমরা চালাতে পারব না"

"আমি ওসব বলতে পারব না। আমিও বাড়ি থেকে পালাব।"

'তুমিও পালাবে? সেটা কি পনুরনুষমানুষের মতো কাজ হবে! আমি মেয়েমানুষ আমার পালানোটা শোভা পায়। তুমি পালাবে কেন"

"আমি বনুড়ো ভদ্রলোকের মনুখের উপর কটকটিয়ে ওসব কথা বলতে পারব না"

"কটকটিয়ে বলবে কেন, ভদ্রভাবেই বলবে। তোমাকে থাকতে হবে"

শশধর বিব্রতভাবে ঘাড় চুলকুতে লাগল।

১৩

রামসদয়বাবনু হঠাৎ এমনভাবে রং বদলে ফেললেন কেন একথা যাঁরা ভাবছেন তাঁরা

রামসদয়বাবুদের চেনেন না। অনেকদিন পরে কলকাতা থেকে এসেই রামসদয়বাবু এবার প্রায় সকলের মুখেই ডাক্তারবাবুর জয়জয়কার শুনতে পেলেন। সকলেই ওঁকে ভালবাসে সকলেই ভক্তি করে। রামসদয়ের ঈর্ষা হল একটু। ওই বিষ্ণু মিস্ত্রীটা তাঁর গাড়ি সারাতে আড়াইশ' টাকা নিয়েছে, অথচ ও নাকি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক পয়সাও নেয় না। শুধু তাই নয়, ডাক্তারবাবুর গাড়ির কাজ ও সবার আগে করে। তাঁর বাগানের মালীটা ডাক্তারবাবুর কথায় গদগদ, দামোদের পণ্ডিত বলেন উনি দেবতা। সবাই ওঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত। উনি নাকি ডাক্তার খুব ভালো। কতটা ভালো তা পরীক্ষা করবার জন্যেই সেদিন ওঁকে মাছ ধরতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ওঁর বাগানবাড়িতে। তাঁর রোগের সম্বন্ধে যা বললেন তা তো রীতিমত অপমানজনক। 'এ জীবনে যৌবন আর ফিরবে না'—এ কথা কে না জানে। যৌবনকে যদি ফেরাতে পারিস তবেই না তুই বড় ডাক্তার! বাঘের চর্বি আর গণ্ডারের শিং দিয়ে ওষুধ তৈরি ক'রে দিয়েছিল একজন হাকিম, বেশ ফল হয়েছিল তাতে। অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তাছাড়া অষুধের দামও বড্ড বেশী। একশ' টাকা ক'রে তোলা। বরাবর খাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওই হাকিম এই নীতিবাগীশ ডাক্তারের চেয়ে ঢের ভালো। চারিদিকে ডাক্তারবাবুর প্রশংসা শুনে শুনে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন রামসদয়। খুব দয়ালু, খুব দাতা, গরীবদের মা-বাপ। রামসদয়কে কেউ পোঁছে না। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলে কেউ নমস্কারও করে না। তিনি একজন গন্য মান্য লোক—কলকাতায় ব্যবসা আছে, এখানেও গোলা আছে—একথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না কেউ। সামান্য একটা কাবুলীওলা তাঁকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপমান ক'রে গেল। হঠাৎ তাঁর মনে হল তিনিও কি মহৎ হ'তে পারেন না? আলবৎ পারেন। মহত্ত্ব আস্ফালন করবার জন্যে যে টাকার দরকার সে টাকা তাঁর আছে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না এবং সেই তাঁর মহত্ত্ব-কীর্তন করবে কা কা ক'রে। বিপিনকে আর বিকাশকে তিনি বাহাল করেছিলেন সম্প্রতি। এর মধ্যেও তাঁর মহত্ত্ব-আস্ফালনের ভাব ছিল একটু। দুটো বেকার গরীব লোককে বাহাল ক'রে তিনি যেন দেখাচ্ছিলেন তিনিও গরীবের উপকার করতে পারেন। যদিও এ উপকার নিঃস্বার্থ নয়, যদিও এর মধ্যেও এক ঢিলে দুটো পাখী মারবার মতলব প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু তিনি ওদের বাহাল ক'রে যে মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন এই ভ্রান্তির মোহ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল তাঁকে। তাঁর মনে এ আশাও হচ্ছিল এখানে যদি কিছুদিন থাকেন তিনি তাহলে ওই ডাক্তারবাবুকে নিষ্প্রভ ক'রে দিতে পারবেন। তারপরই ঘটল শেষের ঘটনাটা। তাস খেলতে ব'সে ভাল হাত পেলে খেলোয়াড় যেমন আনন্দিত হ'য়ে ওঠে তেমনি আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি সেদিন বীণার চিঠিটা পেয়ে। আশ্চর্য মেয়ে ওই বীণা। ফনফনে লতার মতো জীবন্ত, সর্বাঙ্গে রূপ উথলে পড়ছে, অথচ বুদ্ধি কি তীক্ষ্ম। তাঁকে বাবা ব'লে বসল। একগাদা আলু-কাবলি পাঠিয়ে দিয়ে বললে—রোজ পাঠাব, দাম দিতে হবে না। ভেবেছিল এক চালে তাঁকে মাৎ ক'রে দেবে। কিন্তু তিনিও খেলোয়াড় হিসাবে কম নন। তিনিও তাকে মা ব'লে সমস্ত দোকানটাই দান ক'রে দিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল যতই খেলোয়াড় মেয়ে হোক এ টোপ যদি গেলে তাহ'লেই তো কেল্লা ফতে।

মা যখন সেজেছে তখন ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাকে করতেই হবে। লোকত ধর্মত সেটা দৃষ্টিকটুও হবে না। আর হলেই বা কি। রামসদয় কারো তোয়াক্কা করেন না কি! আর ঘনিষ্ঠতা করতেই তো চান তিনি। এমন একটা চমৎকার মেয়ে তাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করবে এর বেশী তো কিছু কাম্য নেই তাঁর। আর ঘনিষ্ঠতা যদি হয় তাহলে কোথাকার জল যে কোথায় দাঁড়াবে, তা-ই বা কে বলতে পারে। পাতানো-মায়ের মেকী সম্বন্ধ ক'দিনই বা টিকবে। অথচ এ কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে যে রামসদয়বাবু তাঁর দোকানটা ফেরিওলা শশধরকে দান করেছেন তাদের দুঃখে বিচলিত হ'য়ে। এ শহরে ডাক্তারবাবুর এমন দান কি আছে একটাও! রামসদয় আশা করছিলেন যে পরদিন সকালে তিনি গদগদ শশধর আর বিগলিতা বীণার দেখা পাবেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন কেউ নেই। ঘরের কপাট বন্ধ। তালা ঝুলছে। ঝুমরি মেয়েটা বারান্দায় বসেছিল। সে এসে একটা চিঠি দিলে তাকে। বলল—"বাবু আপনাকে দেবার জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছেন। ও'রা কেউ বাড়িতে নেই।"

"কোথায় গেল"

"তা তো জানি না"

ঝুমরি চিঠিটা দিয়ে চ'লে গেল।

রামসদয় চিঠিটা খুলে পড়লেন।

মান্যবরেষু,

আপনি কাল বীণাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আপনার দোকান আমরা নিতে পারব না। কারণ দোকান চালাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমার বন্ধু বিকাশ আপনার দোকানে কাজ করত, সে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল কেন বুঝতে পারছি না। সে এখন ডাক্তারবাবুর কাছে চাকরি করছে শুনলাম। আপনি যদি দোকানটা দান করতে চান তাকেই দিন না। তাছাড়া আপনি দোকান ক'রে সেটা দানই বা করছেন কেন তাও আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনি কি এখনকার পাট তুলে দিতে চান? যাই হোক আমরা আপনার দোকানের ভার নিতে অপারগ। একটু কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে বলে আপনার সঙ্গে দেখা হল না। আমাদের সভক্তি নমস্কার জানবেন। ইতি

বিনীত শশধর

রামসদয় নির্নিমেষে চিঠিটার দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টির যদি দাহিকা-শক্তি থাকত চিঠিটা পুড়ে যেত। রামসদয় চিঠিটা ভাঁজ ক'রে পকেটে পুরে রাখলেন। তিনি সহসা কোন চিঠি ছেঁড়েন না। এই চিঠিটা প'ড়ে একটা জিনিস পরিষ্কার হ'য়ে গেল তাঁর কাছে। বিকাশ হঠাৎ তাঁর দোকানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল কেন সেটা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। ডাক্তারবাবু তাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছেন। আচ্ছা অভদ্র লোক তো! রাগে আপাদ-মস্তক জ্ব'লে উঠল তাঁর। মোটরে উঠে বসলেন। বললেন—"ডাক্তারবাবুর ওখানে চল—"

"কোন ডাক্তারবাবু—"

"আরে যে ডাক্তারবাবু দয়ার সাগর, মহত্ত্বের পর্বত, চেন না তাঁকে—"

"আজ্ঞে না"

"সেদিন যিনি বাগানবাড়িতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন—"

"ও বুড়ো ডাক্তারবাবু"

রামসদয় অস্ফুট কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন—"বাগি—"

ডাক্তারবাবুর বাড়ির সামনে এসে যখন তাঁর গাড়ি দাঁড়াল তখন বিকাশ বারান্দায় ব'সে একটা ছেঁড়া মাসিক-পত্র থেকে 'বৈদিক ভারত' নামে প্রবন্ধটি টুকছিল। বারান্দার আর একধারে বসে অনুমান বন্দুক সাফ করছিল। আজ ডাক্তারবাবু সদলবলে শিকারে বেরুবেন। হবিব আসবে একটু পরেই। সে-ই খবর পাঠিয়েছে বীজপুরের জলায় অনেক হাঁস এসেছে। আরও জন দুই বন্দুকধারী আসবে তার সঙ্গে। ট্যাক্সি নিয়ে রবিও আসবে। ডাক্তারবাবু ভিতরে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। রামসদয়বাবু নেমে তির্যক দৃষ্টিতে চাইলেন বিকাশের দিকে। তারপর বললেন—"ডাক্তারবাবু কোথা—"

অনুমান উত্তর দিল।

"আপনি বসুন। নটবর, বাবুকে খবর দাও। বল রামসদয়বাবু এসেছেন"।

রামসদয় বসলেন না। দাঁড়িয়েই রইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ডাক্তারবাবু।

"আরে রামসদয়বাবু যে। বসুন। নটবর এইখানেই কফি দিয়ে যা। রামসদয়-বাবুর জন্যে এক কাপ আনিস"।

রামসদয় উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন—"আমি কফি খেতে এখানে আসিনি। আমি আপনার কাছে একটা জবাবদিহি চাইতে এসেছি"

অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।

"জবাবদিহি। কিসের জবাবদিহি—!"

"আমি এই বিকাশ ছোকরাকে আমার দোকানে বাহাল করেছিলাম। আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই তাকে বাহাল করে ফেললেন এটা কি রকম ভদ্রতা মশাই? ওর এত আস্পর্ধা যে দোকানের হিসেবপত্তর আমাকে না বুঝিয়ে চাবিটা ফেরত দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছে যে আমি আপনার চাকরি করব না। এখন বুঝতে পারছি ওর এ আস্পর্ধা হ'ল কি ক'রে"

আকাশ থেকে পড়লেন ডাক্তারবাবু।

"আপনার যে দোকান আছে আর সে দোকানে বিকাশ যে চাকরি করত তা আমি কিচ্ছু জানি না তো। দামোদরবাবু একদিন কথায় কথায় বললেন ছেলেটা বেকার ব'সে আছে যদি ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা হয় তাহলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হই। আমার একজন লোকের দরকার ছিল তাই আমি ওকে বাহাল করলুম—"

তারপর বিকাশের দিকে ফিরে বললেন—"তুমি এঁর চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলে কেন?"

"যে মুহূর্তে বুঝতে পারলাম উনি শশধরের বাড়ির সামনে দোকান করেছেন বীণার উপর কুদৃষ্টি হানবার জন্যে সেই মুহূর্তেই আমি ছেড়ে চ'লে এসেছি। উনি দোকানে গিয়ে রোজ আমার পাশে ব'সে থাকতেন শশধরের বাড়ির জানালার দিকে চেয়ে। একদিন বাড়ির ভিতরেও ঢুকেছিলেন—"

"চোপ রও—"

গর্জন ক'রে উঠলেন রামসদয়। পায়ের জুতো খুলে হাতে নিলেন।

"ছি, ছি এসব কি ব্যাপার—"

শশব্যস্ত ডাক্তারবাবু বিকাশকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন।

"জুতোপেটা করব তোমাকে হারামজাদা। আমার দোকান থেকে জিনিসপত্র চুরি ক'রে এখন আমার নামে যা তা ব'লে বেড়াচ্ছে? মুখ থেঁতো ক'রে দেব তোমার জুতিয়ে"

বিকাশ জবাব দিল—"যা বলছি তা সত্যি কথা। আপনার দোকানের জিনিস যেমন ছিল তেমনি আছে। সামান্য যে ক'টা জিনিস বিক্রি হয়েছিল তার দাম আর তার হিসেবও আপনার টেবিলের ড্রয়ারেই আছে। দেখে মিলিয়ে নিন গিয়ে। বেশ চলুন, আমিই মিলিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে কেউ একজন সাক্ষী থাকলে ভালো হয়। আমি গরীব, আমি মূর্খ, কিন্তু আমি চোর নই —।"

হঠাৎ বিকাশ কেঁদে ফেললো। তার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। তারপর ডাক্তারবাবুর দিকে চোখ তুলে বললে— "আমি গরীব অসহায় ব'লে লোকটা আমার উপর অত্যাচার করবে, আর আপনি তাই দাঁড়িয়ে দেখবেন—সত্যি বলছি আমি নির্দোষ"

ডাক্তারবাবু বিচলিত হলেন।

বললেন—"রামসদয়বাবু আপনি শান্ত হোন। আপনার দোকানে কি কি জিনিস ছিল তার একটা ফর্দ আছে তো"

"আছে। দোকানেই আছে—"

"তবে চলুন চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে ফেলা যাক। বিকাশ এখানেই থাক। আমরা দু'জন যাই চলুন, মিলিয়ে দেখি আপনার কোনও জিনিস খোয়া গেছে কি না। যদি কোনও জিনিস খোয়া গিয়ে থাকে তার খেসারত আপনি নিশ্চয়ই পাবেন"

"আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? আপনার যাওয়ার দরকার কি?"

"ছেলেটার ভার যখন নিয়েছি তখন ওর বিপদে-আপদে ওর পাশে দাঁড়াতে হবে বই কি—"

"না, না, আপনার যাওয়ার দরকার নেই। যাকগে যা হবার তা হ'য়ে গেছে। ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাটি করব না। তবে শিক্ষা হয়ে গেল একটা—"

রামসদয় সুর বদলে ফেললেন হঠাৎ।

ডাক্তারবাবু বললেন—"না, আপনাকে যেতেই হবে। আমি জানতে চাই আপনার কোনও জিনিস চুরি গেছে কি না—"

"গিয়ে থাকে যাকগে—"

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠল।

"আপনি যদি না যান তাহলে আপনার নামে বিকাশ 'কেস' করবে যে আপনি তাকে এতগুলো লোকের সামনে চোর ব'লে অপমান করেছেন। ও সত্যি চোর কি না সেটা আদালতে যাচাই হবে। আমি এখনি গিয়ে আপনার দোকানে তালা দিয়ে আসব। তারপর থানায় যাব। থানার লোক এসে মিলিয়ে দেখবে সব জিনিস ঠিক আছে কি না"

কেঁচো খ‍ুঁড়তে গিয়ে যে সাপ বেরিয়ে পড়বে তা রামসদয় ভাবেন নি। যে ডাক্তারবাবুকে সহজ সরল ব'লে মনে হয়েছিল, তিনি যে হঠাৎ এমনভাবে বেঁকে দাঁড়াতে পারেন এও কল্পনাতীত ছিল তাঁর। এ নিয়ে যদি থানা পুলিস কোর্ট আদালত হয় তাহলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা যায় না, এখানে কেউ তাঁকে সুনজরে দেখে না, সবাই তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে সাক্ষী দেবে, ঢিঢিক্কার প'ড়ে যাবে চারদিকে। আরও নরম হয়ে গেলেন রামসদয়।

বললেন, "বেশ বেশ চলুন। মিলিয়েই নেওয়া যাক। আপনি যখন ছাড়বেন না, ঝোঁক ধরেছেন, চলুন"

ঠিক এই সময়ে আগা সাহেব আফজল খাঁ এসে হাজির হল।

"আদাব ডাকটার সাহেব। আপকো লিয়ে এক আচ্ছা শাল লায়া হুঁ—"

তারপর তার দৃষ্টি পড়ল রামসদয়ের দিকে। আগুন ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে। বলল—"রামসোদয়বাবু, হামারা বহুমায়ীকো খবর লেনে কা কোশিষ আর কিয়া থা?"

রামসদয় উত্তর দিলেন না ত্বরিত ক'রে বারান্দা থেকে নেমে মোটরে গিয়ে উঠলেন। হা হা ক'রে হেসে উঠল আফজল খাঁ।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"কি ব্যাপার খাঁ সাহেব—"

"কুছ্ নেহি। আপকো লিয়ে একঠো আচ্ছা শাল লায়া হুঁ—"

"আমি এখন বেরুচ্ছি। আর একদিন এসো—"

"বহুৎ খুব—"

"লোচন গাড়িটা বার কর। বেরুতে হবে। রামসদয়বাবু আপনি একটু দাঁড়ান—"

"আমার গাড়িতেই আসুন না"

ডাক্তারবাবু এ কথার জবাব দিলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন। লোচন গাড়ি বার করল। গাড়িতে গিয়ে চড়লেন তিনি। রামসদয়বাবু গাড়ি চালিয়ে আগেই চ'লে যেতে পারতেন, কিন্তু সে সাহস তিনি করলেন না।

"চলুন এবার যাওয়া যাক"—গাড়ি থেকে মুখ বার ক'রে ডাক্তারবাবু বললেন।

দুটো মোটর একসঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে ডাক্তারবাবু ফিরলেন। বিকাশ তখনও ব'সে টুকছিল।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে তার দিকে একতাড়া নোট ছুঁড়ে দিলেন। বিকাশ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল—"টাকা কিসের?"

"টাকা তোমার। খেসারত আদায় করেছি। যখন দেখা গেল দোকানের জিনিসপত্র সব ঠিক আছে তখন রামসদয়বাবুকে বললাম তাহলে আপনি ওই ব্রাহ্মণের ছেলেকে এভাবে অপমান করলেন কেন। আপনাকে খেসারত দিতে হবে। যদি না দেন তাহলে আমরা মকোর্দমা করব। অনেক হেজ্জাহেজ্জি ক'রে একশ' টাকা আদায় ক'রে এনেছি। চিঠিও লিখিয়ে এনেছি একটা। এই নাও।" পকেট থেকে একটা চিঠিও বার করে বিকাশের হাতে দিলেন। তাতে লেখা ছিল।

প্রিয় বিকাশবাবু,

ডাক্তারবাবুর সামনে আমার মনিহারির দোকানের জিনিসপত্র এবং টাকাকড়ি

মিলাইয়া দেখিলাম। সব ঠিক আছে। আপনার উপর মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি

শ্রীরামসদয় বসাক।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বিকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন।

বিকাশ হঠাৎ উঠে এসে প্রণাম করল তাঁকে।

"এ কি, এ কি, এ কি কাণ্ড! চল এবার তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। হবিব এখুনি এসে পড়বে দলবল নিয়ে"

হঠাৎ ক্ষেন্তীর মা বেরিয়ে এসে বলল—"বাবু, যে মাংস আজ আপনারা নিয়ে যাবেন সে মাংস কিন্তু নটবর রেঁধেছে। আমাকে ছুঁতে দেয়নি। আমি বললাম শেষে একটু আদা-পেঁয়াজের রস খানিকটা ঘিয়ের সঙ্গে ঢেলে দাও। তা ও দিলে না। মাংস যদি খারাপ হয় আমাকে দোষ দেবেন না"

বলেই চ'লে গেল সে ভিতরে।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে তার পিছনে পিছনে ভিতরে চ'লে গেলেন।

১৪

বিষ্ণু মিস্ত্রী ভিখারী ভোজের প্রচুর আয়োজন করেছিলেন। ঢ্যাঁটরা দিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ভিখারী-দের। আশপাশের চার পাঁচখানা গাঁয়ে খবর পেঁছিছিল যে বিষ্ণুবাবু রবিবার দিন বিকেলে ভিখারীদের খাওয়াবেন ডাক্তারবাবুর বাগানে। ডাক্তারবাবুর বাড়ির ঠিক পাশেই তাঁর শখের আমবাগান কুড়ি বিঘে জমির উপর। প্রথম যৌবনে এই বাগান নিয়ে খুব মেতেছিলেন তিনি। নানারকম আমের গাছ লাগিয়েছিলেন। তখন হেড-মিস্ট্রেস অমিতা রায়ও ছিলেন এখানে। তিনিও এ ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছিলেন খুব। তিনিই লক্ষ্ণৌ থেকে 'দশেরি' আমের দশটা কলম আনিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তার-বাবুকে। শুধু আনিয়ে দেন নি নিজের হাতে পুঁতেও ছিলেন সেগুলি বাগানের পূর্বপ্রান্তে। গাছগুলি এখনও আছে। এখন ডাক্তারবাবুর বাগান সম্বন্ধে যদিও আর তেমন উৎসাহ নাই কিন্তু ওই 'দশেরি' গাছগুলি এখনও তিনি মাঝে মাঝে দেখতে যান। মাঝে মাঝে মালীকে দিয়ে গাছগুলির তলা খোঁড়ান এবং সারও দেন। বাগানটিতে অনেক জায়গা আছে বলেই বিষ্ণু মিস্ত্রী ভিখারী-ভোজনের জন্য এই জায়গাটি নির্বাচন করেছেন। তাঁর গ্যারেজের সামনেই বড় রাস্তা, সেখানেই ভিখারীদের বসিয়ে খাওয়ালে চলত, ব্যাপারটা হয়তো সকলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করত, কিন্তু বিষ্ণুবাবুর মনঃপূত হল না এটা। ভিখারীরা ভিখারী বলেই কি রাস্তায় বসিয়ে তাদের খাওয়াতে হবে, বিশেষত এটা যখন সে তার মা-বাবার স্মৃতি-তর্পণ হিসেবেই করছে তখন এটাকে একটা ভব্য রূপ দিতে হবে। কিন্তু কোথায় করবেন প্রথমে ঠিক করতে পারছিলেন না, একবার ভেবেছিলেন যেখানে হাট বসে সেখানে করলে কেমন হয়, কিন্তু জায়গাটা বড় দূর, শহরের একেবারে বাইরে। তারপর হঠাৎ ডাক্তারবাবুর বাগানটার কথা মনে পড়ল তাঁর। ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বলতেই সোল্লাসে তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

"ভিখারীদের খাওয়াবে তুমি? খুব ভাল কথা। আমার বাগানটা নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পার—"

তারপর একটু থেমে বললেন—"কিন্তু একটি শর্তে—"

"কি বলুন—"

"আমিও খাওয়াব ওদের কিছু। তাতে তুমি বাধা দিতে পারবে না"

বিষ্ণু বললে—"আমার মা-বাবার আত্মার তৃপ্তি হবে বলেই এই ভোজের আয়োজন করেছি আমি। এর সমস্ত খরচটা আমারই করা উচিত। আপনি করবেন কেন। কি খাওয়াতে চান বলুন, আমিই তার ব্যবস্থা করব"

ডাক্তারবাবুর চোখে মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ল যেন। তিনি বিষ্ণু মিস্ত্রীর দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "দেখ বিষ্ণু, আমি তোমাদের আপন লোক মনে করি। আমার এখন মনে হচ্ছে তোমরা কিন্তু আমাকে আপন লোক মনে কর না। তোমার দাদা যদি আজ একথা বলত তুমি কি আপত্তি করতে? তুমি কি ভাবতে পারতে তোমার বাবা-মার আত্মার এতে তৃপ্তি হবে না? যাক্ এই যখন তুমি ভাবছ তখন আমার আর বলবার কিছু নেই। আমার বাগান তুমি ব্যবহার কর যতদিন খুশি ব্যবহার কর—"

কথা অসম্পূর্ণ রেখে হঠাৎ ভিতরের দিকে চ'লে গেলেন ডাক্তারবাবু। বিষ্ণু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলেন তিনি। বিষ্ণুর পিঠ চাপড়ে হেসে উঠলেন।

"বেশ বেশ, তুমি যা বলবে তাই হবে। আমি তোমার ভিখারীদের সঙ্গে ব'সে একপাত খাব, না, তাও দেবে না—"

হঠাৎ বিষ্ণু মিস্ত্রী একটা নাটকীয় কাণ্ড ক'রে বসলেন।

হেঁট হয়ে ডাক্তারবাবুর পা দুটো ধ'রে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। আপনি ভিখারীদের যা খাওয়াতে চান খাওয়াবেন আমি আর আপত্তি করব না। আমি মূর্খ তাই আপনাকে বুঝতে পারিনি—আমাকে ক্ষমা করুন"

"এ কি কাণ্ড? ওঠ, ওঠ। সত্যি তোমার আপত্তি নেই?"

"না"

"তাহলে ওদের আমি দই খাওয়াব। মহিয়ারপুরে গিয়ে দীনু গোয়ালাকে আজ ব'লে আসছি, মণ দুই—কত লোক হবে বল তো। তিন মনই ব'লে আসি তাহলে—"

"যথেষ্ট হবে"

"তাহলে ওই কথাই রইল। তোমার মেনু কি?"

"খিচুড়ি, দুটো নিরামিষ তরকারি, চারখানা ক'রে লুচি, দু'রকম সন্দেশ আর বোঁদে"

"বেশ। দইটা তাহলে বেমানান হবে না। রান্না কোথায় হবে—"

"এইখানেই হবে। আমি জন পাঁচেক রাঁধুনী ঠিক করেছি। বীণা বলেছে সে আলুকাবলি বানাবে—"

"আলুকাবলি না ক'রে শুকনো শুকনো আলুর দম করুক। বীণা কে"

"শশধরের বউ—"

"ও মনে পড়েছে। ওইটুকু মেয়ে পারবে ও?"

"শশধরও থাকবে ওর সঙ্গে। তাছাড়া ওদের মানতি মাসী পাড়ার দু'চারটি মেয়েকে নিয়েও আসবেন, তরকারি কুটবেন তাঁরা—"

"ও মানতি মাসী। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। এখন বেশ ভালো হয়ে গেছেন তো"

"হাঁ। কাল তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। বেশ বল পেয়েছেন শরীরে"

"ভিখারী ছাড়া বাইরের লোকও খাবে নিশ্চয়—"

"তা খাবে বই কি। আমার গ্যারেজে যারা কাজ করে তারা সপরিবারে খাবে। ছবিবদেরও বলেছি। আমার কাছে যারা মোটর সারায় তাদেরও বলেছি আমি। এদের জন্যে একটু আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে"

"আলাদা ব্যবস্থা, মানে? আলাদা মেনু? তা করতে যেও না। সেটা খারাপ দেখাবে। ভিখারীরা যা খাবে সবাই তাই খাবে। তা যদি না খাওয়াও ভিখারীদের অপমান করা হবে সেটা। নিমন্ত্রণ ক'রে অপমান করাটা কি ঠিক হবে? ভদ্রলোকদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে যেও না। সবাই একরকম খাবে"

"বেশ তাই হবে"

"সবাই ভিখারীদের সঙ্গে ব'সে খেলে সেটা আরও ভালো দেখাতো। কিন্তু তা হয়তো সবাই রাজী হবে না। যারা আলাদা খেতে চায় তাদের না হয় আমার বাড়ির বারান্দাতেই বসিয়ে দিও। চারিদিকে চারটা বারান্দা আছে, কুলিয়ে যাবে—"

"চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করব কি—"

"না, না। বাজে খরচ করতে যেও না, মাটিতে বসেই খাবে সবাই। তুমি বরং কিছু আসনের যোগাড় কর। এখানকার কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করেছ—?"

আমার কাছে যাঁরা মোটর সারান তাঁদের বলেছি। আর দু'চার ঘর চেনাশোনা। বেশী হবে না। এ ভোজে সবাইকে নিমন্ত্রণ করা উচিতও নয়। কাল তো রামসদয়বাবু আমাকে অপমানই করেবসলেন। বললেন, 'আমি কি ভিখিরি যে আমাকে কাঙালী ভোজনে নিমন্ত্রণ করছেন?' আমি বললাম—'ডাক্তারবাবুর বাড়ীতেই খাওয়াদাওয়া হবে। আপনাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। আমার মা-বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই ভোজ, আপনি গেলে খুব খুশী হব।' রামসদয়বাবু বললেন—'ও বাবা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। তাঁর মতো মহৎ লোকের বাড়িতে আমার মতো ক্ষুদ্র লোকের যাওয়াটা শোভা পায় না। মাপ করবেন, আমি যেতে পারব না'—কি আর করব চ'লে এলাম। লোকটা সুবিধের নয়। আমার অনুরোধে রবির বাবাকে উনি চাকরি দিয়েছিলেন একটা। শুনছি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন এখানে গোলা রাখবেন না। কিন্তু শ্রীনাথ উকিলের বখাটে ভাইটাকে বহাল করেছেন দেখলাম। প্যাঁচোয়া লোক। কাল আমি যখন গিয়েছিলাম তখন দেখলাম শ্রীনাথ উকিল ওঁর কাছে ব'সে আছে, মনে হল কি যেন একটা মন্ত্রণা করছে, আমাকে দেখে থেমে গেল—"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন—"করুকগে। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। ভোজের সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছ তো?"

"প্রায়। মাটির খুরি গেলাস অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। শালপাতাগুলো এখনও পাইনি। আজ সন্ধ্যে নাগাদ পেয়ে যাব। আপনার গাড়ি ভাল চলছে তো—"

"ফার্স্টক্লাস। কোনও 'ট্রাবল' নেই। কিছু গড়বড় হলেই তুমিই তো আগে খবর পাবে"

"আমি চলি এখন। সাগরমলের গাড়িটা খুলতে হবে—"

বিষ্ণু মিস্ত্রী চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন রামসদয়বাবু শ্রীনাথ উকিলের সঙ্গে কি মন্ত্রণা আঁটছিলেন। ডাকপিওন একটি রেজিস্টার্ড উইথ্ অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ চিঠি দিয়ে গেল তাঁকে। রসিদে সই করে চিঠি নিলেন তিনি। দেখলেন চিঠির প্রেরক হচ্ছেন উকিল শ্রীনাথ মিত্র। চিঠিতে তিনি যা লিখেছেন তার সারমর্ম এই যে তিনি তাঁর মক্কেলের হ'য়ে এ চিঠি লিখছেন। তাঁর মক্কেল শ্রীরামসদয় বসাক বাজারে একটি মনিহারি দোকান খুলে তাতে বিকাশ ভট্টাচার্য নামক একজন ছোকরাকে কর্মী হিসাবে বাহাল করেছিলেন। উক্ত ভট্টাচার্য একদিন হঠাৎ স'রে পড়ল এবং পরে দোকানের চাবিটি তার বাবা দামোদর ভট্টাচার্য মারফত ফেরত দিয়ে জানিয়ে দিল সে আর চাকরি করবে না। রামসদয়বাবু দোকান খুলে দেখলেন পাঁচ শত টাকার জিনিস অন্তর্ধান করেছে। এর পরেই তিনি খবর পেলেন যে উক্ত বিকাশ ভট্টাচার্যকে আপনি নাকি বহাল করেছেন। তিনি নিজে আপনার বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিলেন। এর পর আপনি যা করলেন তা খুবই আশ্চর্যজনক। আপনি কয়েকটি গুণ্ডা সমভিব্যাহারে তাঁর দোকানে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি এখনি লিখে দিন যে আপনার দোকান থেকে কোন জিনিস চুরি যায়নি। যদি না দেন এই গুণ্ডারা আপনার দোকান তছনছ ক'রে দেবে। আত্মরক্ষার্থে তিনি একটি কাগজে আপনার নির্দেশ অনুযায়ী লিখতে বাধ্য হলেন যে দোকান থেকে কোন জিনিস চুরি যায়নি। কিছুদিন আগে আফজল খাঁ নামে একটি কাবুলিওলাও আপনার প্ররোচনায় রামসদয়বাবুকে নাকি শাসিয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে থানায় তিনি একটি রিপোর্টও করেছেন। আপনি অবিলম্বে যদি পাঁচশত টাকা খেসারত দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেন ভালই, অন্যথায় আমরা আদালতে আপনার নামে নালিশ করব।"

চিঠিটা পড়ে ডাক্তারবাবু বিকাশ আর অনুমানকে ডাকলেন। চিঠিখানা তাদের হাতে দিয়ে বললেন—"রামসদয়বাবুর কাণ্ড দেখ। লোকটার মতিচ্ছন্ন হয়েছে—"

বিকাশ অনুমান দু'জনেই চিঠিখানা প'ড়ে দেখল। ইংরেজিতে লেখা বলে সবটা তাদের বোধগম্য হল না, কিন্তু তারা এটুকু বুঝতে পারল রামসদয় ডাক্তারবাবুর নামে একটি মিথ্যা মকদ্দমা করতে চাইছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—"অনুমান তুমি গাড়ি ক'রে নরেন উকিলের কাছে যাও। তাকে এ চিঠিটা দিয়ে এস আর বলে এস ওতে যা লেখা আছে তা সর্বৈব মিথ্যা। এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত সে যেন জানায় আমাকে। ওখানে বেশী দেরি কোরো না। আমি মহিরারপুরে যাব দীনু গোয়ালার কাছে। দইয়ের ফরমাশ দিতে হবে"

অনুমান গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আতরির মেয়েটাকে মনে আছে আপনাদের? একবার মাত্র তার নাম উল্লেখ করেছি আগে। এই আতরির জন্যেই রবি বকুনি খেয়েছিল বিষ্ণণ মিস্ত্রীর কাছে। উদগ্রযৌবনা মেয়ে। যদিও ভদ্র কায়স্থকুলে তার জন্ম কিন্তু তথাকথিত ভদ্র জীবন যাপন করবার সুযোগ পায়নি সে। কেউ ছিল না তার। মা বাবা ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন। আতরিই তাঁদের একমাত্র সন্তান ছিল। সে মানুষ হয়েছিল তার বাগদিনী দাইমার বাড়িতে। সেই ছিল তার অভিভাবক। বাগদিপাড়ায় বাগদীদের মধ্যেই মানুষ হয়েছিল সে। তার বাগদিনী দাইমাও যখন মরে গেল তখন তার আর কোন অভিভাবকই রইল না। বাগদী মায়ের দুটি বড় বড় ছেলে ছিল, তারা আতরিকে বোনের মতই দেখত, কিন্তু শাসন করতে পারত না। কারণ তারাও সচ্চরিত্র ছিল না। চুরির অপরাধে বড় ভাইটার জেল হয়ে গিয়েছিল, ছোট ভাইটা চাকরী করত একটা ফ্যাকটারিতে, আর রোজ মদ খেয়ে গড়াগড়ি দিত রাস্তায়। আতরিই লক্ষ্মণকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যেত রোজ। তাকে বকত, মারত, তার পায়ে মাথা খুঁড়ত, সেবাও করত। আবার নবোদ্ভিন্নযৌবনা আতরি যখন জোয়ান ছোঁড়াদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত তখন লক্ষ্মণ ধমকাত তাকে। অর্থাৎ কখনও আতরি লক্ষ্মণের অভিভাবক হ'ত, কখনও লক্ষ্মণ আতরির। এইভাবেই চলছিল।

কিন্তু বেশী দিন এভাবে চলল না। লক্ষ্মণ দেখল ভদ্রলোকের ছেলেরাও আতরির জন্যে উতলা হ'য়ে পড়েছে। বিপিনবাবুর ছেলে রবি আর ওই মাতাল উকিল শ্রীনাথ মিত্র দুজনেই প্রলুব্ধ করতে লাগল তাকে। শ্রীনাথ উকিল নিজে আসত না, লোক পাঠাত। শ্রীনাথ উকিল প্রস্তাব পাঠাল মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে সে আতরিকে দাই হিসেবে বাহাল করতে চায়। মাইনে ছাড়াও বকশিস পাবে মাঝে মাঝে। গয়না শাড়ি তো পাবেই। শ্রীনাথ মিত্র বিবাহিত লোক, কিন্তু তার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই। ভদ্রমহিলা বন্ধ্যা, স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়িতেই থাকেন। রবি গরীবের ছেলে, নিজেও বেকার ছিল তখন, তাই সে আতরিকে টাকার লোভ দেখাতে পারে নি, মিনতিভরা প্রণয় নিবেদনই ক'রে যাচ্ছিল কেবল। আরতি ঠিক করতে পারছিল না কি করা উচিত। তবে এটা সে অনুভব করেছিল যে সংসারসমুদ্রের কোনও ঘাটে তাকে নোঙর ফেলতেই হবে। এভাবে ভেসে ভেসে কতদিন বেড়াবে সে? যে দুটো ঘাট আপাতত দেখা যাচ্ছে তার কোনটা নির্বাচন করলে তার জীবনসমস্যার সমাধান হবে এইটে সে ঠিক করতে পারছিল না। রবিকে তার ভালো লেগেছিল, কিন্তু সে গরীব, খুবই গরীব, কিন্তু কি সুন্দর চেহারা আর কথাগুলিও কেমন মিষ্টি। শ্রীনাথ লোকটাকে পছন্দ হয়নি আতরির। কিন্তু ওর টাকা আছে। বউটাও এখানে থাকে না। চেষ্টা করলে আতরিই একদিন ও বাড়ির সর্বেসর্বা হতে পারবে—এ সম্ভাবনা-টাকেও সে তুচ্ছ করতে পারছিল না। শেষে একদিন লক্ষ্মণকেই সে সব খুলে বলল। লক্ষ্মণকে সে ছোটদা বলে ডাকত যদিও, কিন্তু আসলে সে তার বন্ধুস্থানীয় ছিল। মনের কোনও কথা সে গোপন রাখত না তার কাছে। বলল, "ছোটদা তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। তোমরা তো আমার বিয়েটিয়ে দিতে পারবে না। আমাকে নিজেই একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে। দুটো মিন্সে আমার পিছু নিয়েছে। এক ওই উকিল শ্রীনাথ, সে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে আমায় রাখতে চায়। বকশিস,

শাড়ি, গয়না এসবও দেবে বলেছে। কিন্তু লোকটার বউ আছে, বাঁজা বউ, ঝগড়া ক'রে বাপের বাড়ি চ'লে গেছে, শুনলাম সেখানে না কি একটা ইস্কুলে মাস্টারি করছে। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে, বিপিনবাবুর ছেলে রবি। রবিকে আমার খুবই পছন্দ, কিন্তু ও যে বড্ড গরীব। এখন কি করি বল তো। আমি ঠিক করতে পাচ্ছি না"

লক্ষ্মণ খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে রইল।

তারপর বলল—"বোনাই হিসেবে শ্রীনাথ উকিলই ভালো। মালদার লোক—"

আতরি বললে—"ওই রবিকেই আমার পছন্দ কিন্তু। কেমন কার্তিকের মতো চেহারা—"

"গরীব কার্তিক নিয়ে কি করবি তুই। ওদের তো দু'বেলা অন্ন জোটে না। শুনেছি—"

"কিন্তু ছেলেটি সত্যিই ভালো ছোটদা। তাছাড়া ওরা কায়স্থ। আমাদের পালটি ঘর"

"দেখ আতরি যদি গুড়ে খেয়ে থাকিস তাহা হলে আমার কিছু বলবার নেই। নিজেই পস্তাবি একদিন কিন্তু।"

"না' না তুমি ভেবে বল কি করব"

"আচ্ছা এক কাজ করি তাহলে। তোর আপত্তি নেই তো?"

"কি করবে বলই না, শুনি"

"বিষ্ণুদার কাছে চলে যাই। লোকটা খুব সাচ্চা লোক। বুদ্ধিও আছে। তার কাছে গিয়ে পরামর্শ নিই?"

"কেন তোমার মাথায় কিছু আসছে না।"

"আমি তো মুখ্যু মাতাল একটা। আমার মাথায় যা এসেছিল তা তো বললুম, কিন্তু তোর দেখছি ওই রবির দিকেই টান। এরকম অবস্থায় কি করা উচিত তা আমার মাথায় আসছে না। বিষ্ণুদাকেই জিগ্যেস করি। কি বল—"

আতরি চুপ করে রইল একটু। তারপর বলল—"বেশ, যা ভাল বোঝ কর"

লক্ষ্মণ চ'লে গেল একদিন, বিষ্ণু মিস্ত্রীর কাছে।

বিষ্ণু লক্ষ্মণকে ভালবাসতেন। তাঁর মতে লক্ষ্মণের দোষ অনেক, কিন্তু গুণও আছে। প্রধান গুণ মিছে কথা বলে না, চুরি করে না। খেটে খায়। যে বোন তার নিজের বোন নয় তাকে প্রতিপালন করে। মদ খায় অবশ্য, এটাকে বিষ্ণু মিস্ত্রী দোষের মধ্যে ধরেন না, মদ তিনিও তো খান। তাঁর মতে, দোষ হচ্ছে মদ খেয়ে মাতলামি করা। লক্ষ্মণ মদ খেয়ে মাতলামি করে না, নেশা বেশী হলে রাস্তার ধারে শুয়ে পড়ে। আতরি যখন তাকে বকতে বকতে তুলে নিয়ে যায় তখন কোনও অসভ্যতা করে না তার সঙ্গে, ভাল-মানুষের মতো টলতে টলতে তার পিছু পিছু যায়। এই সব গুণের জন্য বিষ্ণু ভালবাসতেন লক্ষ্মণকে।

সেদিন সকালে লক্ষ্মণ যখন বিষ্ণু মিস্ত্রীর ওখানে গেল তখন তিনি ব্র্যাণ্ডির বোতলটি বার ক'রে গেলাসে খানিকটা ঢেলেছেন। তিনি সাধারণতঃ কারো সামনে মদ খান না, কিন্তু যেহেতু লক্ষ্মণও ওই এক রসের রসিক তাই লক্ষ্মণের সামনে লুকো-ছাপার কোনও প্রয়োজন অনুভব করলেন না তিনি। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "লক্ষ্মণ যে। কি খবর—"

লক্ষ্মণ ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে বসল একধারে।

"এলুম, একটা দরকার আছে। আপনি পান ক'রে নিন তারপর বলব"

লক্ষ্মণ মাঝে মাঝে শুদ্ধ কথা বলে। বিষ্ণু লক্ষ্মণের প্রলুব্ধ দৃষ্টির দিকে চেয়ে আর একটি গ্লাস বার করলেন। তাতে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে এগিয়ে দিলেন সেটা লক্ষ্মণের দিকে। লক্ষ্মণ আর একবার প্রণাম করলে, তারপর সসম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে নিলে সেটা।

"বিলিতী বুঝি—"

"হ্যাঁ"

"রং আর গন্ধ থেকেই মালুম হচ্ছে সেটা। আমাকে একটু জল দিন। নির্জলা বিলিতী মাল পেটে সইবে না। খেনো খাই তো—"

বিষ্ণু কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে তাকে দিলেন। নিজেও মিশিয়ে নিলেন খানিকটা জল। একটু হেসে বললেন, "আমি আগে নির্জলাই খেতাম। কিন্তু বনু কম্পাউণ্ডার মানা ক'রে দিলে সেদিন। নির্জলা খেলে না কি লিভার খারাপ হয়"

"লক্ষ্মণ বললে—"গলাও জ্বালা করে"

এরপর তারিয়ে তারিয়ে মদ্যপান করতে লাগল লক্ষ্মণ।

বিষ্ণু আলমারি খুলে নোনতা বিস্কুট বার করলেন। কয়েকটা লক্ষ্মণকে দিয়ে বললেন—"খা। ভালই লাগবে ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে।" নিজেও নিলেন দু'খানা। মদ খাওয়া শেষ হলে বিষ্ণুবাবু বললেন, "কি দরকার তোর, বল। আমাকে বেরুতে হবে এখুনি—"

"আতরিকে চেনেন তো—"

"খুব চিনি। ও তো শুনেছি তোদের পাড়া মাতিয়ে তুলেছে—"

"আতরি কিন্তু নিষ্পাপ। অনেকে ওর পিছনে ঘুরঘুর করছে বটে কিন্তু এখনও ওর পা পেছলায় নি। ভদ্দর-লোকের ছেলেও আছে দু'জন। আমি একটু মুশকিলে পড়েছি। আতরিও পড়েছে। তাই আপনার কাছে একটু পরামর্শ করতে এসুম—"

"এতে আর পরামর্শের কি আছে। লাঠি মেরে হাঁকিয়ে দে সব ব্যাটাকে"

"তা দিতে পারি। বাগদী পাড়ায় ষণ্ডা ছোঁড়ার অভাব নেই। কিন্তু ভিতরে একটা কথা আছে। আতরিই তুলেছে কথাটা—"

"কি কথা"

"আসল কথা হচ্ছে কি জানেন, আতরি হচ্ছে কায়স্থের মেয়ে, আমাদের সমাজে ওর বিয়ে হবে না। ওকে নষ্ট করবার লোক জুটবে, কিন্তু বর জুটবে না। যে দুটি ভদ্রলোক আতরির দিকে ঝুঁকেছে, তারা দু'জনেই কায়স্থ। শ্রীনাথ উকিল, আর বিপিনবাবুর ছেলে রবি। শ্রীনাথ উকিল ব'লে পাঠিয়েছে ওকে এখন মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে বাহাল করবে। শ্রীনাথের তো স্ত্রী থেকেও নেই। তাই শেষ পর্যন্ত হয়তো আতরিকে ও বিয়েই ক'রে ফেলবে। আতরি অবশ্য যদি ওকে ভাল ক'রে খেলাতে পারে। কিন্তু আতরির ওকে তেমন পছন্দ না, ওর পছন্দ রবিকে। রবি এদিকে ছেলে নিন্দের নয়, কিন্তু ভারী গরীব যে। আতরি বলছে আমাকে নিজের হিল্লে নিজেই ক'রে নিতে হবে, তোমরা চিরকাল আমার ভার নিতে পারবে না। দুটো

ভদ্রলোক এখন আমার দিকে ঝুঁকেছে আমি কাকে বেছে নিই সেটা তোমরা ঠিক করে দাও''

বিষ্ণুবাবু বললেন—"আচ্ছা আতারিকে পাঠিয়ে দিস আমার কাছে। আমি তার সঙ্গেই কথা কইব"

"আতারি কি আসতে চাইবে।"

"না আসতে চায়, আমি তার কাছে যাব। ব্যাপারটা তার মুখ থেকেই শুনতে চাই। তাকেই আমি যা বলবার বলব"

"বেশ, বলব তাকে"

"লক্ষ্মণ প্রণাম ক'রে উঠে চলে গেল।

শ্রীনাথ মিত্র উকিলের সম্বন্ধে বিষ্ণুরও ভালো ধারণা ছিল না। প্রথম প্রথম যখন প্র্যাকটিস আরম্ভ করে তখন থার্ডহ্যান্ড ভাঙা ফোর্ড কিনেছিল একটা। বিষ্ণু খেটে-খুটে খাড়া ক'রে দিয়েছিলেন মোটরটাকে। কিন্তু শ্রীনাথের কাছ থেকে একটি পয়সা আদায় করতে পারেননি। নানা বাহানা ক'রে টাকাটা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত বলেছিল আপনি যে 'বিল' পাঠিয়েছেন তা আমি কলকাতার একজন মোটর মেকানিককে দেখিয়েছিলাম। তিনি বললেন যা হওয়া উচিত তার তিনগুণ 'বিল' করেছেন আপনি। এ টাকা আমি দেব না, আপনার ইচ্ছে হয় আপনি আমার নামে 'কেস' করতে পারেন। বিষ্ণু 'কেস' করেনি। দিনকতক পরে মোটরের আবার কি যেন বেগড়াল, অচল হয়ে পড়ল গাড়িটা। বিষ্ণুকে আবার ডেকেছিলেন শ্রীনাথ মিত্তির। বিষ্ণু আর যাননি। হবিবকেও টিপে দিয়েছিলেন, হবির যেন গাড়িতে হাত না দেয়। হবিব বিষ্ণুর ভক্ত, বিষ্ণুর কাছেই কাজ শিখেছে সে। সে শ্রীনাথ মিত্তিরকে সোজা বলে দিলে আমি পারব না। কিছুদিন পরে শ্রীনাথকে মোটরটা জলের দামে বিক্রি ক'রে দিতে হল। এখন সাইকেলে করেই ঘোরাফেরা করেন। বিষ্ণুবাবু এও জানতেন যত কুচক্রী লোকের সঙ্গে ভাব লোকটার। মিথ্যে মকদ্দমা সাজাতে ওস্তাদ। গুজব স্ত্রীর উপরও না কি অত্যাচার করত খুব। আতারিকে সে কেন বাহাল করতে চায় তা অস্পষ্ট রইল না বিষ্ণুর কাছে। বিয়ে তো করবেই না, শেষ পর্যন্ত হয়তো মাইনেও দেবে না। এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই গ্যারেজের দিকে চলেছিলেন বিষ্ণু মিস্ত্রী। গ্যারেজে গিয়ে ভাগ্য-ক্রমে রবির সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। রবি মাঝে মাঝে তাঁর গ্যারেজে আসত। রবিকে তিনি আপ্রেন্টিস ক'রে নিয়ে কাজ শেখাতে চেয়েছিলেন বিপিনবাবুর খাতিরে। রবি নিমরাজী গোছ হয়েছিল। কিন্তু বিষ্ণু দেখলেন রোজ সে আসে না, মাঝে মাঝে আসে, আর এসে কাজ না ক'রে আড্ডা দেয় খালি। বিষ্ণু একদিন ধমকে দিলেন তাকে।

"তুমি কি খালি বকবক করবার জন্যে এখানে আস না কি। কাজ শিখতে চায় তো লেগে পড়। এই গাড়ির প্লাগগুলো খুলে পরিষ্কার কর—"

রবি দাঁত বের ক'রে বলেছিল, "ভেবে দেখলুম আমি ওসব পারবনা। আমি ড্রাইভারি শিখতে চাই"

"তাহলে তাই শেখ গিয়ে। এখানে ব'সে আড্ডা মারছ কেন"

"হালিমের কাছে এসেছি। ওর শালার একটা গাড়ি আছে সেই গাড়িটা নিয়ে শিখব আমি। হালিম আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে—"

সেদিনও রবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিষ্ণুণের।

"রবি শোন। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে"

রবিকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বিষ্ণুণ কোন ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন—"আতরির মেয়েটার সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছে?"

রবি ঢোক গিলে বললে—"আতরির মেয়েটার সঙ্গে? হ্যাঁ মাঝে মাঝে দেখা হয়"

"লক্ষ্মণ এখুনি এসেছিল। তার মুখে সব শুনেছি। সে বললে তুমি নাকি খুব জমিয়েছ আতরির সঙ্গে। আতরিও তোমাকে ভালো লেগেছে। লক্ষ্মণ জিগ্যেস করতে এসেছিল এখন কি করা উচিত। তোমার কাছে একটা কথাই জানতে চাই—তুমি ওকে বিয়ে করতে রাজী আছ? আতরি বাগদীর ঘরে মানুষ হয়েছে কিন্তু ও কায়স্থের মেয়ে। বিয়ে করতে রাজী আছ?"

"বিয়ে করতে? বাবাকে জিগ্যেস করি—"

"প্রেম করবার সময় কি বাবার মত নিয়েছিলে?"

ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল রবি। অনেক প্রশ্ন করেও তার মুখ থেকে আর কোন উত্তর বার করতে পারলেন না বিষ্ণুণ মিস্ত্রী।

"ভীরু নপুংসক কোথাকার—"

বিষ্ণুণ মিস্ত্রী রেগেমেগে চ'লে গেলেন। রবিও স'রে পড়ল।

এর দুদিন পরে আতরি একদিন সকালে তাঁর বাড়িতে এল। তিনি বললেন—"আমি সব শুনেছি। তোমার কি রবিকেই বেশী পছন্দ?"

ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল আতরি।

"রবি কিন্তু তোমাকে বিয়ে করবে না। তাকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম। ওর আশা তুমি ছেড়ে দাও"

"শ্রীনাথবাবুর চাকরিটাই নেব তাহলে?"

"ও লোকটাও পাজী—"

"আমি কিন্তু এভাবে আর থাকতে পারছি না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। ছোটদা কতদিন আমার ভার বইবে? শ্রীনাথবাবুর চাকরিটাই নিচ্ছি আমি। এত মাইনে আর কেউ দেবে না—"

"মাইনে হয়ত দেবেই না। অতি পাজী লোক!"

"আমি ওকে বলব মাইনে প্রতি মাসে যদি অগ্রিম দাও তাহলেই আমি কাজ করব"

"ওরকম লোকের কাছে ইজ্জৎ বাঁচিয়ে কাজ করতে পারবে?"

"নিশ্চয়। জোর ক'রে আমার ইজ্জৎ নষ্ট করবে সে রকম মরদ এখনও জন্মায়নি। যদি বেচাল দেখি ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব"

খুশী হলেন বিষ্ণুণ মিস্ত্রী।

"বেশ তাহলে ওইখানেই কাজ নাও"

এসব অনেক আগের ঘটনা।

রামসদয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে শ্রীনাথ উকিল যখন ডাক্তারবাবুকে চিঠি দিয়েছিলেন

তখনও আতরি শ্রীনাথবাবুর বাড়িতেই চাকরি করছিল নিজের ইজ্জৎ পুরোপুরি বজায় রেখেই। তার সদম্ভ আত্মমর্যাদার কাছে নত স্বীকার করতে হয়েছিল শ্রীনাথকে। আতরির দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক মাসেই অগ্রিম মাইনে দিতে হচ্ছিল তাঁকে। একজোড়া ভালো শাড়িও কিনে দিয়েছিলেন। মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন বলেই শ্রীনাথকে এসব করতে হচ্ছিল। কিন্তু যেদিন তিনি তার ইজ্জতের আবরণ উন্মোচন করবার চেষ্টা করলেন সেইদিনই ফোঁস ক'রে উঠল আতরি। বললে—"আজ যা করেছেন করেছেন, অন্যদিন যদি এরকম বেয়াদপি করেন আমি চাকরি ছেড়ে চ'লে যাব আর ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র ক'রে দেব সব।"

"আমার কি তাহলে কোন আশা নেই"

করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন শ্রীনাথ।

আতরি বলল—"আছে, যদি আপনি পুরুত ডেকে আমাকে বিয়ে করেন। আমরাও কায়স্থ, আমার বাবার উপাধি ছিল বোষ। আপনি আমাদের পালটি ঘর—"

"কিন্তু আমার যে বউ আছে। বিয়ে করব কি ক'রে? আইনে যে বাধে—"

"তাহলে আমার ছায়া মাড়াবেন না। আমি আপনার সব কাজ করে দেব, কিন্তু যা বলছেন তা পারব না। ও কথা যদি ফের বলেন আর আপনার বাড়ি আসব না"

'না না, না আসবে না কেন? বহাল করেছি যখন থাকো তুমি। তোমার অমতে কিছু করব না আমি"

শ্রীনাথ ভাবছিলেন বোধহয় কালক্রমে আতরি হয়তো নরম হয়ে যাবে। খেলাতে হবে কিছুদিন। আতরিও ভাবছিল কিছুদিন পরেই বাবু হয়তো বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবেন, খেলাতে হবে কিছুদিন।

এইভাবেই চলছিল।

আতরিকে দেখে রামসদয়ও আসতে আরম্ভ করেছিলেন শ্রীনাথের বাড়ীতে। রবির বাবু বিপিনবাবুকে বরখাস্ত করে তাঁর গুদোমে বাহাল করেছিলেন শ্রীনাথের দূর সম্পর্কের গবেট ভাই বসন্তকে। বসন্ত শ্রীনাথের বাড়িতে চাকরের মতো থাকত ফাইফরমাশ খাটত রান্নাও করত। কিন্তু আতরিকে বাহাল করার পর শ্রীনাথ অনুভব করলেন ভাইটাকে বাড়ি থেকে সরাতে হবে। রামসদয় যখন নিয়মিতভাবে আসতে লাগলেন তাঁর বাড়িতে তখন তাঁকে একদিন বললেন, "আপনার তো অনেক ব্যবসা, আমার বেকার ভাইটাকে কোথাও লাগিয়ে দিন না।"

"আমার এখানকার গুদোমে বিপিনবাবু আছেন, লোকটা কাজের কিন্তু বড্ড বুড়ো, দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না, বিপিনবাবুকে বিদেয় ক'রে দিয়ে ওকেই বাহাল করি। বিপিনকে রাখব না"

আতরি ঠিক পাশের ঘরের মেজেতে ব'সে তরকারি কুটছিল। দুটো ঘরের মাঝখানে যে কপাট ছিল সেটা বন্ধ ছিল না। এ ঘরের কথাবার্তা ওঘরে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল "বিপিনবাবু" নামটা শুনেই সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বিপিনবাবু রবির বাবা। রবির সম্বন্ধে তার দুর্বলতা ছিল তখনও। সে খবর পেয়েছিল রবি মোটর ড্রাইভারের কাজ শিখছে। সে যদি ড্রাইভার হয় আর তারপর যদি সে বিয়ে করতে চায়……এই

ধরণের রঙিন স্বপ্ন এখনও তার মনের আকাশের প্রত্যন্তপ্রদেশকে রঞ্জিত করে রেখেছিল। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল ওরা বিপিনবাবু সম্বন্ধে কি আলোচনা করছে।

রামসদয়বাবু বললেন—"বিপিনকে আমি সরাতে চাই। আর একটা কারণে। বিপিন হচ্ছে বিষ্ণু মিস্ত্রীর লোক। বিষ্ণুর কথাতেই ওকে বাহাল করি। পরে আবিষ্কার করলুম বিষ্ণু হচ্ছে আপনাদের ওই মহামহিম ডাক্তারবাবুটির ভক্ত একজন। বিপিনকেও কথায় কথায় একদিন জিগ্যেস করলাম ডাক্তারবাবুর কথা। বিপিন সংক্ষেপে বললেন—উনি দেবতা। দেখলাম ওরে বাবা। এ রকম ভক্তিমান লোকের সঙ্গ তো বেশীদিন সহ্য করতে পারব না। তারপর আমার দোকানের কাণ্ডটা হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর স্বরূপটি সচক্ষে দেখলাম। কিন্তু কি করব, চুপ করে থাকতে হল। ইঁট খেয়ে যে পাটকেলটি মারব সে রকম সামর্থ্য তো নেই আমার—"

উকিল শ্রীনাথ বললেন—"নেই কেন। আমি তো আছি। আপনি যদি আপত্তি না করেন ওর নামে মকদ্দমা ঠুকে দিই একটা—"

"কি মকদ্দমা ঠুকে দেবেন—"

"মিথ্যে মকদ্দমা। লোকটাকে জব্দ করাই তো উদ্দেশ্য আমাদের। প্রথমে একটা চিঠি দিই যে আপনি গুণ্ডা নিয়ে আমার দোকান গিয়ে জোর ক'রে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন যে আমার দোকানের সব জিনিস ঠিক আছে। যদিও আমার পাঁচশ' টাকার জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল না তবু আমি প্রাণের ভয়ে ওকথা লিখে দিয়েছিলাম। আপনি যদি ওই পাঁচশ টাকা আমাকে না দেন তাহলে আমি আপনার নামে কেস

"তারপরে—"

"যদি আপনাকে টাকাটা দিয়ে দেয় ভালই। যদি না দেয় তাহলে কেস করব—"

"কেস করলে জিততে পারবেন?"

"মিথ্যে সাক্ষী তৈরী করতে হবে। রামু, ঘনা, কেশব, যদু এই চারটে গুণ্ডা আমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে প্রায়ই মিথ্যে সাক্ষী দেয়। ওরা কোর্টে গিয়ে বলবে যে ডাক্তারবাবু ওদের নিয়ে আপনার দোকানে গিয়েছিলেন টর্চ কিনে দেবেন বলে। দোকানে গিয়ে ডাক্তারবাবু কিন্তু আপনাকে ভয় দেখিয়ে একটা কাগজে লিখিয়ে নিলেন যে আপনার দোকান থেকে কিছু চুরি যায়নি। ওরা বলবে—আমরা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। ডাক্তারবাবু বলছিলেন আমাদের প্রত্যেককে একটা ভাল টর্চ কিনে দেবেন। উনি অনেককে অনেক জিনিস উপহার দেন, আমরা ভেবেছিলুম আমাদেরও বুঝি দেবেন। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে উনি আমাদের প্রত্যেককে দশ টাকা ক'রে দিয়ে বললেন তোমরা অন্য জায়গা থেকে টর্চ কিনে নাও—"

"এ কথা বলবে ওরা?"

"টাকা পেলে আলবাৎ বলবে। তবে ওদের কিছু দিতে হবে"

"তা দেব"

"আর কিছু না হোক লোকটাকে বিব্রত করা তো হবে। আপনার উকিল আমি আছি, আমাকে কিছু দিতে হবে না আপনার। ডাক্তারবাবুর উকিল বোধহয় নরেনবাবু, তিনি আশা করি ডাক্তারবাবুর কাছে মোটা 'ফি'ই নেবেন, সিনিয়র লোক তিনি। যাই

হোক ঠুকে তো দেয়া যাক এক নম্বর, আর কিছু না হোক লোকটা হিমশিম খেয়ে যাবে। কি বলেন, আপনার মত আছে?"

"বেশ তো"

"তাহলে লেগে পড়ি। প্রথমে এই কাগজটায় জট্ ডাউন (jot down) ক'রে নি আমাদের কি কি করতে হবে। প্রথম ডাক্তারবাবুকে হুমকি দিয়ে একটা চিঠি লেখা, দ্বিতীয় চিঠির জবাবের জন্য দশ দিন অপেক্ষা করা, তৃতীয় ওই গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে তাদের হাত করা, চতুর্থ কেস ঠুকে দেওয়া, পঞ্চম আমাদের নামজাদা ক্রিমিনাল উকিল মিস্টার লাহিড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করা, সম্ভব হলে তাঁকে আমাদের পক্ষে নিযুক্ত করা—আপাততঃ এই পাঁচটা কাজ করতে হবে—"

আর্তরি পাশের ঘরে ব'সে সব শুনছিল। মনের ভিতর আগুন জ্বলছিল তার। এখানে যে লোকটিকে সে সবচেয়ে বেশী ভক্তি করে সেই ডাক্তারবাবুকে ওরা মিথ্যে মকদ্দমায় জড়াবার চেষ্টা করছে? রবির বাবা চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে সে ডাক্তার-বাবুকে 'দেবতা' বলেছিল ব'লে! বিষুণ-বাবুকে ঠাট্টা করছে সে ডাক্তারবাবুর ভক্ত ব'লে। বারান্দায় তোলা উনুনটায় আঁচ গনগন করছিল, আঁচ গনগন করছিল আর্তরিত মনেও। কিন্তু সে একটি কথা বলেনি। অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো বসেছিল চুপ ক'রে। এমন সময় বাড়ির সামনে একটা হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড বেধে গেল। দারুণ চীৎকার চেঁচামেচি। কে যেন কাকে মারছে। রামসদয়বাবু ও শ্রীনাথবাবু তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলেন। একটা রিক্শাওয়ালাকে ধ'রে মারছে সবাই। তার অপরাধ সে নাকি একটা ছোট ছেলেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। মাথা কেটে গেছে ছেলেটার।

রামসদয় আর শ্রীনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই আর্তরি ঘরে এসে ঢুকল। দেখল শ্রীনাথ যে কাগজে মকদ্দমার পয়েণ্টগুলো জট্ ডাউন করেছিল সেই কাগজখানা শতরঞ্জির উপর প'ড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা তুলে নিল সে। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১৬

বিষুণের কাঙালীভোজন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। দীনু গোয়ালাকে ফরমাশ দিয়ে ডাক্তারবাবু যে দই আনিয়েছিলেন তা খেয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগল সবাই। বীণার আলুর দমও উতরেছিল খুব। বীণা শুধু রাঁধেই নি, গাছকোমর বেঁধে পরিবেশনও করেছিল। মালতি মাসী এসেছিলেন। বীণা ওরই মধ্যে তাঁর জন্যে আলাদা ক'রে ঝোলভাত ক'রে দিয়েছিল। মালতি মাসী কুটনো কোটায় সাহায্য তো করেই ছিলেন, পানও সেজেছিলেন। তারপর ভোজের পর মাজা বাসনগুলি গামছা দিয়ে মুছে মুছে সাজিয়ে রেখেছিলেন। অনুমান আর বিকাশও খুব খেটেছিল, বিষুণের সমস্ত ফাইফরমাশ, ডাক্তারবাবুর ফাইফরমাশ এমন কি বীণারও ফাইফরমাশ খেটেছিল তারা। শশধর ভাঁড়ার ঘরের চার্জে ছিল। ডাক্তারবাবু কাঙালীদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে ব'সে খেয়েছিলেন। হবিবের সঙ্গে রবিও এসেছিল। হবিব বিষুণের হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বললে—"রবির বাবার জন্যে এই টাকা এনেছি।"

"প্রতি মাসেই দেবে তো ?"

"সেই শর্তেই ওকে একশ' টাকা মাইনে দিয়ে বাহাল করেছি।"

"ওর লাইসেন্স হয়েছে ?"

"হয়ে গেছে"

"ট্যাক্সি কেমন চলছে ? একশ' টাকা মাইনে দিয়ে পোষাবে ?"

"সব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে রোজ প্রায় দশ টাকা আন্দাজ বাঁচে আমার"

"তাহলে তো ভালই"

হবিবকে ডাক্তারবাবুর বারান্দাতেই খেতে দেওয়া হল। ডাক্তার শৈলেনবাবু, দারোগা যতীনবাবু, উকিল নরেনবাবু, জন কয়েক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও এসেছিলেন। তাঁরাও বারান্দায় ব'সে খেলেন। ডাক্তারবাবু স্বয়ং তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন, তাদের। ডাক্তারবাবু নরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "শ্রীনাথবাবু আমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন সেটা দেখেছ তো। কি করা যায় বল তো—"

"কি আর করবেন, গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাকুন। আপনার হ'য়ে একটা জবাব দিয়ে দিয়েছি তাকে—"

"কি জবাব দিলে—"

"দিলাম যে আপনার চিঠি পেয়ে আশ্চর্য হলাম। আপনি চিঠিতে যে সব কথা লিখেছেন তা সত্য নয়। আপনি অবিলম্বে যদি চিঠিটি প্রত্যাহার ক'রে না নেন তাহলে আইনত আমি আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করব"

"আইনত আত্মরক্ষা করব মানে ? মকদ্দমা করব ? তা আমি করতে চাই না নরেন। তুমি মিটিয়ে নাও। এর জন্যে যদি কিছু টাকা লাগে তা না হয় আমি দেব। শ্রীনাথকে ডেকে মিটিয়ে নাও তুমি। কারো সঙ্গে ঝগড়া বা মনোমালিন্য রাখতে চাই না আমি।"

"কিন্তু ওরা যদি মকদ্দমা করে আপনাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। আপনার সম্মান যাতে নষ্ট না হয় তা আমাদের দেখতে হবে বইকি। আপনি আমার উপর সব ছেড়ে দিন না, আমি সব ব্যবস্থা করছি। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, আমরাও শঠ হ'তে জানি তা বুঝিয়ে দেব ভদ্রলোককে।"

"কি করবে তুমি ? কারো সঙ্গে অভদ্রতা কোরো না যেন"

"না না, অভদ্রতা করব কেন। ও আপনাকে অপমান না করলে কিছুই করতাম না। কিন্তু সে ধৃষ্টতা ওর যখন হয়েছে তখন হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব আমি, ও যে কত পাজী তা প্রমাণ ক'রে দেব আদালতে। যা বলব তা একটিও মিথ্যে নয় সব সত্যি। আরে, সেই মেয়েটা এখানেও এসেছে দেখছি—"

বিষ্ণু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"বিষ্ণু ওই মেয়েটাকে ডাক তো—"

"আতরিকে ?"

"ওর নাম আতরি নাকি ? ওই যে ডুরে শাড়ি-পরা মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে—"

"হ্যাঁ, ওই তো আতরি। আতরি এদিকে আয় নরেনবাবু তোকে ডাকছেন—"

আতরি কাছে এসেই ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করলে প্রথমে। তারপর আর সকলকেও করলে।

ডাক্তারবাবু জিগ্যেস করলেন—"মেয়েটি কে ?"

আতরিই উত্তর দিল।

"আমি ননী ঘোষের মেয়ে। তিনি হরিগঞ্জে তেল কলে চাকরি করতেন। আপনি কতবার চিকিৎসা করেছেন তাঁর—আমারও ছেলেবেলায় চিকিৎসা করেছেন আপনি"

"ননীবাবু? ও মনে পড়েছে। তিনি তো কাটোয়ায় মারা গিয়েছিলেন শুনেছি।"

"হ্যাঁ। কলেরা হয়েছিল। কাটোয়ায় তেল নিয়ে গিয়েছিলেন। সেইখানেই কলেরা হয়। আর ফেরেন নি। আমি এখানেই থেকে গেলাম।"

"কোথায় থাকো ?"

"আমার মা খুব ছেলেবেলায় মারা যান। বাগদীপাড়ার দাইমা মানুষ করেছেন আমাকে। সেইখানেই আছি—"

"ও"

নরেনবাবু এবার প্রশ্ন করলেন।

"তুমি সেদিন আমার কাছে গিয়েছিলে। মকদ্দমা ঠুকে দি তাহলে ?"

"দিন—"

"শেষকালে পিছিয়ে যাবে না তো। তুমি লিখতে পড়তে পার ?"

"বাংলা পারি—"

"তাহলে কাল যেও আমার বাড়িতে। আমি বাংলায় একটা দরখাস্ত লিখে রাখব। তার তলায় তোমাকে সই করতে হবে। সই করতে পারবে তো ?"

"পারব—"

"কাল তাহলে ন'টার সময় এসো"

"আচ্ছা"

আতরি চলে গেল। আতরিকে বিষ্ণুবাবু নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আতরি হয়তো আসত না, কিন্তু রবি এসেছে এই খবরটা পেয়ে সে এসেছিল। আতরি চলে আসবার পর বিষ্ণু মিস্ত্রী এগিয়ে এলেন।

নরেনবাবু জিগ্যেস করলেন, "আপনি চেনেন ওই মেয়েটাকে—"

"খুব চিনি—"

"ও কি এখনও শ্রীনাথ উকিলের বাড়িতে কাজ করছে ?"

"না, না। যেদিন আপনার ওখানে গিয়েছিল সেইদিনই ও কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমিই ওকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

"তাই না কি—"

"সেইদিনই ও আমাকে একটা কাগজ দিয়ে গেছে। পেন্সিল দিয়ে ইংরেজিতে লেখা। শ্রীনাথের ঘরে এটা না কি কুড়িয়ে পেয়েছিল। আমিও ভাল বুঝতে পারিনি। দেখুন তো—"

বিষ্ণু তাঁর কোটের ইনার পকেট থেকে কাগজটি বার করে নরেনবাবুকে দিলেন। সেটা প'ড়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নরেনবাবুর মুখ।

"এই তো ব্রহ্মাস্ত্র পেয়ে গেছি। আর বাছাধন যাবেন কোথা"

দারোগা যতীনবাবু আর ডাক্তারবাবু একটু দূরে স'রে গিয়ে নিম্নকণ্ঠে আলাপ করছিলেন। ডাক্তারবাবু যতীনবাবুকে বলছিলেন, "নরেন যে রকম ঝুঁকেছে তাতে মনে হচ্ছে ও মকদ্দমা করবেই। কিন্তু আমার সেটা ইচ্ছে নয়। আপনি বলে কয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিন মশায়। মদ্দমা করলেই আমাকে আদালতে যেতে হবে, উকিল জেরা করবে, ভিড় জমে যাবে—এসব আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আপনি নরেনকে বুঝিয়ে বলুন—ও নরেন এদিকে শোন যতীনবাবুর সঙ্গে কথা কও—"

নরেনবাবু এগিয়ে এলেন। বিষ্ণু চ'লে গেলেন আতরির কাছে। গিয়ে বললেন—"তুই যে কাগজটা এনে দিয়েছিস, নরেনবাবু বললেন সেটা নাকি ব্রহ্মাস্ত্র। অনায়াসে শ্রীনাথকে ঘায়েল করা যাবে। রবি এসেছে, দেখেছিস? ও ড্রাইভারির লাইসেন্স পেয়ে গেছে"

আতরি অন্যমনস্ক হবার ভান করল যেন কিছু শুনতে পায়নি। তারপর বলল—"খুব খেয়েছি। এবার বাড়ি যাই। ছোটদা দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে"

দূরে লক্ষ্মণ সত্যিই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, দু'জনে বাড়ি চলে গেল।

নরেনবাবু বললেন, "আপনি ভাবছেন কেন। যে কাগজ হাতে পেয়েছি তাতে বাছাধন নিজের ফাঁদেই ধরা পড়েছেন। ওকে জানিয়ে দেব আপনারই ছাপা 'লেটারহেড'-ওয়ালা কাগজে আপনার হাতের লেখায় আমরা অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি যে আপনি ডাক্তারবাবুর নামে একটা মিথ্যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাছাড়া আতরির কেসটাও কালকে রুজু ক'রে দেব।"

"আতরির আবার কি 'কেস'"—জিগ্যেস করলেন ডাক্তারবাবু।

"আতরি বলছে উনি ওর উপর বলাৎকার করতে গিয়েছিলেন। ও'র চাকর হিনুয়া সাক্ষী আছে"

যতীনবাবু বললেন—"ও আমার কাছে একটা দরখাস্ত করুক না। আমি লোকটাকে অ্যারেষ্ট করে ফেলি"

ডাক্তারবাবু বারবার বলতে লাগলেন—"না, না, ওসব কিছু করতে যেও না তোমরা। মিটিয়ে ফেল। দেখ, ঝগড়াঝাটি ক'রে লাভ হয় না শেষ পর্যন্ত—"

শেষ পর্যন্ত উকিল নরেনবাবু ব'লে গেলেন "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিক টিট্ ক'রে দেব ওকে"

যতীনবাবু বললেন— 'আপনি ঘাবড়াবেন না। আমরা আপনার পক্ষে আছি। ভাববেন না কিছু"

চলে গেলেন তাঁরা। একটু পরে একে একে সবাই চলে গেলেন। বিষ্ণু মিস্ত্রীও। বারান্দার একধারে ইজিচেয়ারে শুয়ে পায়ের পাতা নাচাতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। তারপর হঠাৎ উঠে পড়লেন তিনি।

"লোচন, লোচন—"

লোচন এসে হাজির হল।

"গাড়ি বার কর। বেরুব"

"বেশী দূরে যেতে হবে কি? পেট্রোল বেশী নেই—"

"বেশী দূরে যাব না। শ্রীনাথ উকিলের বাড়ি যাব। বাড়িটা চেন তুমি?"

"চিনি"

"সেইখানে চল। আমাকে নাবিয়ে দিয়ে পেট্রোল কিনে এনো—"

শ্রীনাথ আশা করেন নি যে ডাক্তারবাবু তাঁর বাসায় এসে হাজির হবেন। রামসদয়বাবুও উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

"নমস্কার নমস্কার। আপনিও আছেন এখানে ভালই হ'ল। আমি আপনার কাছেও যাব ভেবেছিলাম। এখানেই দেখা হয়ে গেল ভালই হ'ল।"

শ্রীনাথ বা রামসদয় কারো মুখ দিয়েই কোন কথা সরছিল না। শ্রীনাথ ভিজা বিড়ালের মতো আর রামসদয় গরু-চোরের মতো চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তাঁকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। ডাক্তারবাবু নিজেই একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়লেন। তারপর বললেন, "আপনাদের রেজিস্টার্ড চিঠি আমি পেয়েছি। আমার উকিল নরেন হয়তো তার জবাব দিয়েছে আপনাদের। কিন্তু আমি এসেছি আপনাদের কাছে একটা সোজা কথা জানবার জন্য। আপনারা জানেন চিঠিতে যে কথা আপনারা লিখেছিলেন তা সর্বৈব মিথ্যে। কিন্তু ওরকম ডাহা মিথ্যে কথা লিখে আমাকে বিব্রত করছেন কেন সেইটে আমি জানতে চাই। আমার অপরাধটা কি, কেন আমার উপর আপনাদের রাগ সেইটে আমাকে জানিয়ে দিন। কারো মনে দুঃখ দেবার ইচ্ছে নেই আমার, কারও রাগের কারণও হ'য়ে থাকতে চাই না। আমি সেদিন যদি ওই গরীব বিকাশকে সকলের সামনে ওরকমভাবে অপমান না করতেন তাহলে আমি ওর পক্ষ নিতাম না, আপনারা দোকানেও যেতাম না, ওকে অপমান করার জন্য খেসারত আদায়ও করতাম না। ওই গরীব বেচারীর মুখ দেখে আমার সত্যি খুব কষ্ট হয়েছিল বলেই এসব করেছি। কিন্তু আপনাদের মনেও কষ্ট দেবার ইচ্ছে নেই আমার। আপনাদের সঙ্গে মকদ্দমা করবারও ইচ্ছে নেই, আমি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই। যে পঁচিশ টাকা আপনারা অন্যায়ভাবে আমার কাছে দাবি করেছেন, সেই পাঁচশ টাকাও আমি আপনাদের দিয়ে দেব যদি তাতে আপনাদের মনের গ্লানি ধুয়ে যায়। আমি আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না, ভাব করতে চাই। এই কথাটা বলতেই এসেছি আপনাদের কাছে—"

ডাক্তারবাবু হয়তো আরও কিছু বলতেন কিন্তু তাঁকে থেমে যেতে হল। বাইরের বারান্দা থেকে একটি লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"শ্রীনাথবাবু বাড়ীতে আছেন?"

"আছি। ভিতরে আসুন—"

একটি ছোকরা এসে প্রবেশ করল।

"আমি নরেনবাবুর কাছ থেকে আসছি। তিনি আপনাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটা নিয়ে এই পিওনবুকে আপনার নামটা সই ক'রে দিন"

পিওনবুকে নাম সই ক'রে চিঠিটা নিলেন শ্রীনাথবাবু। তারপর চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"নরেন উকিলের চিঠি না কি—"

শ্রীনাথ বললেন—"হ্যাঁ—"

"নরেন মকদ্দমা করবার জন্যে ক্ষেপেছে খুব। আমার কিন্তু মকদ্দমা করবার

ইচ্ছে নেই। আমার কথা আপনাদের অকপটে সব বলেছি। আশা করি ব্যাপারটা আপনারা ভালো ক'রে ভেবে দেখবেন। আমি উঠি তাহলে—"

নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন তিনি। রামসদয় যেমন চুপ ক'রে বসেছিলেন তেমনি চুপ ক'রে ব'সেই রইলেন, একটা প্রতি-নমস্কার পর্যন্ত করলেন না। শ্রীনাথও না। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিঠিটাই পড়ছিলেন।

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি ডাক্তারবাবুর নামে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা আমার হস্তগত হয়েছে। ডাক্তারবাবুর পক্ষে আমিই লড়ব। যে সমস্ত সাক্ষী এবং মালমসলা যোগাড় করেছি তাতে আমি ও মকদ্দমা জিতব এ বিশ্বাস আমার আছে। এ চিঠি সে জন্য লিখছি না, ডাক্তারবাবুর ব্যাপার কোর্টেই নিষ্পত্তি হবে। আমি অন্য একটা ব্যাপারে এই চিঠি লিখছি। শ্রীমতী আতর ঘোষ নামে যে মেয়েটি আপনার বাড়িতে কাজ করত সে আমার কাছে একটি চিঠি লিখেছে। লিখেছে যে আপনি নাকি তার উপর বলাৎকার করতে গিয়েছিলেন। আপনার চাকর হিনুয়া নাকি দেখেছিল ব্যাপারটা। শ্রীমতী আতর আপনার বিরুদ্ধে 'কেস' করতে চায়। একজন উকিলের বিরুদ্ধে এরকম একটা কুৎসিত মকদ্দমা আদালতে ওঠে এটা আমার ইচ্ছে নয়। এটা আপোষে মিটমাট হয়ে গেলেই ভালো হয়। আপনি যদি খেসারতস্বরূপ শ্রীমতী আতরকে হাজার খানেক টাকা দিতে রাজী হন তাহলে আমি মিটিয়ে দিতে পারব। আমার মনে হয় প্রকাশ্য রাস্তার উপর নিজেদের ডার্টি লিনেন (dirty linen) বার না করাই উচিত। আপনার সম-ব্যবসায়ী হিসাবে এই সৎযুক্তি আপনাকে দেওয়া উচিত মনে হল বলেই এ চিঠি লিখলাম। আশা করি কিছু মনে করবেন না। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি। ভবদীয়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার

চিঠিটার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন শ্রীনাথ।

"কি লিখছেন নরেনবাবু"—রামসদয় জিগ্যেস করলেন।

"দেখুন"

রামসদয় চিঠিটা পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল। দুবার পড়লেন তিনি চিঠিখানা তারপর বললেন, "লোকটা তো খুব ঘাগি দেখছি—"

শ্রীনাথ কোনও উত্তর দিলেন না।

রামসদয় প্রশ্ন করলেন—"ভাবছেন কি—"

"ভাবছি হাজার টাকা খরচ ক'রে ওই মেয়েটাকে হাত করব কি না। করলে কিছু সুবিধে হবে কি না"

রামসদয় নিজের মাথায় একবার বাঁ হাতটা বুলিয়ে বললেন, "আমি উকিল নই, কিন্তু আপনার চেয়ে আমার বয়স বেশী, সেই জোরেই বলছি এখন আমাদের পিছিয়ে আসাই ভালো। অন্ততঃ, আমি এর মধ্যে আর থাকতে চাই না। ডাক্তারবাবু একটা গুড্ জেশ্চার (good gesture) ক'রে গেলেন, আসুন আমরা ওইটের সুযোগ নিই। পিছিয়ে আসাও শুনেছি অনেক সময় উঁচুদরের রণকৌশল। এখন আমরা এগিয়ে গিয়ে যদি ডাক্তারবাবুকে আলিঙ্গন করি তাহলে সেটা দেখতে শুনতেও ভাল হবে, আমরাও

হাঁপ ছাড়বার সময় পাব। তারপর আবার বাগে পেলে ক্যাঁক্ ক'রে চেপে ধরবো লোকটাকে। কি বলেন ?"

শ্রীনাথ বললেন, "বেশ। তাই করা যাক। কিন্তু আমি ভাবছি ওই মেয়েটার কথা। ওকে হাজার টাকা দিয়ে দেব ?"

"সে আপনি বুঝুন মশাই। আমি ওর ভিতরে নাক গলাতে যাব না।"

শ্রীনাথ মরিয়া হয়ে বলে ফেললেন—"নাক গলাতে হবে না আপনাকে। আপনি আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করুন। এই মেয়েটার মুখ বন্ধ করতে হলে যে টাকার দরকার তা আমার নেই। আর ও যদি কেস ঠুকে দেয় তাহলে একটা কেলেঙ্কারী হবে—"

"আমি টাকা দেব কেন। কি আশ্চর্য।"

"আপনার জন্যেই তো এত সব কাণ্ড। আপনি শশধরের বউ বীণাকে নিয়ে যে সব কাণ্ড করেছেন তা আমি শুনেছি। আপনি যদি এখন পিছিয়ে যান তাহলে আমি সব কথা প্রকাশ ক'রে দিতে বাধ্য হব।"

"কি কথা প্রকাশ করবেন আপনি ?"

"প্রকাশ হলে শুনবেন সেটা। এখন কিছুই বলব না"

উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

১৭

ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আবার একটা ভোজের আয়োজন হয়েছিল। রামসদয়বাবু এবং শ্রীনাথ উকিল যে মকদ্দমা করবেন না, তাঁরা যে দু'জনেই এসে তাঁকে প্রণাম ও আলিঙ্গন ক'রে গেছেন এই আনন্দে অধীর হ'য়ে ডাক্তারবাবু উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। শুধু খাওয়াদাওয়া নয় গানবাজনাও হবে। অনুমান, বিকাশ দু'জনেই যে গান গাইতে পারে তা সহসা আবিষ্কার করেছেন ডাক্তারবাবু। তাদের জন্য হার্মোনিয়ম যোগাড় ক'রে এনেছেন তিনি নাট্য-সমিতি থেকে। তারা দু'জনেই গান গাইবে।

রামসদয়বাবু আগেই এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, "এসব হাঙ্গামা কেন করতে গেলেন ডাক্তারবাবু। তুচ্ছ কারণে আমাদের মনোমালিন্য হয়েছিল সেটা মিটে গেছে, বাস, ওইখানেই শেষ ক'রে দেওয়া উচিত ছিল ব্যাপারটা। আপনি এত কাণ্ড করতে গেলেন কেন বুঝতে পারছি না ঠিক"

"এতে তো বোঝবার কিছু নেই। আমার স্বভাবটাই ওই রকম। আনন্দ পাওয়াই উদ্দেশ্য জীবনে। আমরা বড় বড় উৎসবের দরবারে যাওয়ার টিকিট পাই না, কাশ্মীর বা সুইজারল্যাণ্ড যাওয়ার অবসর নেই সুযোগও নেই আমাদের। আমাদের সম্বল এই সব সামান্য জিনিস। মাথার উপর আকাশ, উঠোনে দুবেবা ঘাস আর সন্ধ্যামণি ফুল আর বন্ধুবান্ধবেরা। এদের নিয়েই আনন্দ করি। আপনারা আমার বন্ধু হলেন এটা কি তুচ্ছ জিনিস ? মোটেই না। সুঠাম থাকলে আমার মনের কথা বুঝত—"

"সুঠাম কে—"

"মেডিকেল কলেজে যখন পড়তুম তখন সে আমার সহপাঠী ছিল। তারও মনটা ছিল আমার মতন। সেও আনন্দ খুঁজে বেড়াতে খালি। জানি না সে এখন কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি না। শুনেছিলাম সে বিলেত গিয়েছিল, খুব বড় ডাক্তার হয়ে এসেছিল। তারপর আর দেখা হয় নি। সুঠাম হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। সবাই হারিয়ে যায়, তাই যে যতক্ষণ কাছে আছে তাকে নিয়ে আনন্দে মেতে থাকাই উচিত। আনন্দের কোন উপলক্ষই তুচ্ছ নয়, কোন উপকরণই ছোট নয়"

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শুনছিলেম রামসদয়।

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হতেই তিনি বললেন, "এসব অতি উচ্চাঙ্গের কথা, আপনার মুখেই মানায়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করতে পারি কি, যদি আপনি অনুমতি দেন—"

"অনুমতির দরকার কি! কি আশ্চর্য্য! বলুন কি জানতে চান—"

"আপনি বিয়ে করেন নি কেন। না, করেছিলেন—?"

হেসে উঠলেন ডাক্তারবাবু।

বললেন, "না করিনি। যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি—"

হাসলেন বটে, কিন্তু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন একটু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এলেন শ্রীনাথ উকিল।

ডাক্তারবাবু বললেন—"আপনি শুনলাম শামি কাবাব ভালোবাসেন। বিষুণকে বলেছি তার ব্যবস্থা করতে। হবিব এসে গেছে—"

"আপনি শুনলেন কোথা থেকে—"

"আতীর বলে যে মেয়েটি আপনার বাড়িতে কাজ করত সেই না কি বলেছে বিষুণকে। বিষুণের কাছ থেকে আমি শুনলুম। বললুম 'ব্যবস্থা করে' ফেল তাহলে। হবিবকে খবর দাও।' হবিব এসে গেছে—"

শ্রীনাথবাবু চেয়ারটা ডাক্তারবাবুর চেয়ারের কাছে নিয়ে এসে নিম্নকণ্ঠে বললেন—"সেই ব্যাপারটার কি হল—"

"নরেনকে বলেছি আমি মিটিয়ে ফেলতে। সে বলেছে মিটিয়ে দেবে। কিন্তু একটি কাজ করতে হবে আপনাকে"

"কি—"

"মেয়েটির কাছে মাপ চাইতে হবে"

শ্রীনাথ চুপ ক'রে রইলেন।

তারপর বললেন, "প্রাইভেটলি চাইতে পারি—কিন্তু সকলের সামনে—মানে বুঝতেই পারছেন—"

"ও প্রাইভেটলি আপনার সঙ্গে দেখা করবে না। তবে কাল ওকে আমি ডেকে পাঠাতে পারি। আমার সামনেই আপনি মাপ চাইবেন। সেখানে আর কেউ থাকবে না। আমার মনে হয় রবিও যদি সেখানে থাকে ভালো হয়—"

"রবি কে—"

"হবিবের ট্যাক্সি চালায় ছোকরা। বিষ্ণুর ঘটকালিতে ওর সঙ্গে রবির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে শুনেছি। মেয়েটি যে নির্দোষ একথা রবি জানলে ভালো হয়—"

শ্রীনাথ একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর বললেন' "বেশ, তাই হবে। আপনি ব্যবস্থা করুন—"

"ভোজটা মিটে যাক। তারপর করা যাবে। নরেন তো এখুনি আসবে—"

ক্রমে ক্রমে অতিথিরা আসতে লাগলেন।

যতীন দারোগো, রবি ড্রাইভার, রবির বাবা বিপিনবাবু, বিকাশের বাবা দামোদরবাবু, শৈলেনবাবু ডাক্তার আরও অনেক লোক এসে বসতে লাগলেন চেয়ারে। অনেক চেয়ার পাতা ছিল বারান্দায় এবং মাঠে-টাঙানো সামিয়ানার নীচে। নরেনবাবু এলেন একঝুড়ি শিঙাড়া আর কয়েকটা মালা নিয়ে।

"পীতাম্বর ময়রার দোকানে যতগুলো শিঙাড়া পেলাম কিনে আনলাম। আমাদের মাননীয় অতিথিরা, মানে রামসদয়বাবু আর শ্রীনাথবাবু শিঙাড়া ভালবাসেন শুনেছি। আর এই মালাগুলো আপনারা পরস্পরের গলায় পরিয়ে দিন। আপনাদের ঝগড়া যে মিটে গেছে মাল্য বিনিময় ক'রে সেটা পাকা ক'রে নিন"

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন সবাই। ডাক্তারবাবু আগে গিয়ে রামসদয় এবং শ্রীনাথকে মালা পরিয়ে দিলেন। শ্রীনাথ এবং রামসদয়ও ডাক্তারবাবুকে পরালেন। ডাক্তারবাবুর চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

শশধর লুচি ভাজার ভার নিয়েছিলেন, বিষ্ণু মিস্ত্রী তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে রঙীন কাগজের শিকল দিয়ে সাজাচ্ছিলেন শামিয়ানাটা। বীণা আলুর দম রান্না শেষ করে পান সাজতে বসেছিল। কাবুলীওলা তাকে যে শাড়িটা দিয়েছিল সেইটে পরেই এসেছিল সে। চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে। পান সাজতে সাজতে তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বললে—"দাদু, তোমাকে না বলেই আমি আমার ছেলেকে নিমন্ত্রণ করেছি। সে একটু পরে আসবে—"

"তোমার ছেলে! সে আবার কে!"

"কাবুলীওলা আফজল খাঁ। তার আজ আমাদের বাড়িতে খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা তো এখানে চ'লে এলাম, তাই তাকেও আসতে বলেছি এখানে—"

"বেশ করেছ। ভালো ক'রে খাইয়ে দিও—"

ক্ষেন্তির মা ভার নিয়েছিল মাছের, মানতি মাসী নিরামিষ রান্নার, নটবর মাংসের আর পোলাওয়ের, হবিব বাগানের একটা ঘরে তার সহচরদের নিয়ে শামি কাবাব তৈরি করছিল। দই আর ক্ষীর নিয়ে হাজির ছিল মহিয়ারপুরের দীনু গোয়ালা। মিষ্টান্নের ভার নিয়েছিল পীতাম্বর ময়রা।

বারান্দার একধারে একটা শতরঞ্জির উপর হার্মোনিয়মটা রাখা ছিল। ডাক্তারবাবু হাঁক দিলেন—"কই বিকাশ তোমরা এস এবার—"

বিকাশ বেরিয়ে এল। অনুমানও বেরিয়ে এল তার পিছু পিছু। তার হাতে ডুগি তবলা।

বিকাশ গান ধরল—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া—"

অনুমান সঙ্গৎ করতে লাগল।

বিকাশের গলা ভাল। বেশ জ'মে উঠল। বিকাশের গান শেষ হলে অনুমান গান ধরল—"গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে"

বিকাশ তখন বাঁয়া তবলা নিয়ে বসল।

কাবুলীওলা আফজল খাঁ কখন এসে পিছনের দিকে দাঁড়িয়েছিল কেউ টের পায়নি। অনুমানের গান শেষ হতেই সে এগিয়ে এসে বলল—"আদাব—"

"এস, এস, আফজল বোসো"

ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে উঠে সংবর্ধনা করলেন তাকে।

আফজল খাঁ কিন্তু বসল না। সে বলল সেও তার দেশের নাচ-গানের কিছু নমুনা দেখাতে চায় এই জলসায়, যদি ডাক্তার সাহেব অনুমতি দেন।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—"

আফজল খাঁ উপরে উঠল না। বারান্দার নীচে যে খালি জমিটা পড়ে ছিল তারই উপর সে শুরু করে দিল তার কাবুলী নাচ আর গান। গানের ভাষা কেউ বুঝল না, কিন্তু তার বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী তার উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তার উদ্ভাসিত চোখমুখ মুগ্ধ ক'রে দিল সবাইকে। হাততালি দিয়ে উঠল সবাই। এমন কি রামসদয়বাবুও। আফজল খাঁর নাচগান শেষ হলে ডাক্তারবাবু তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। আফজল খাঁ দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল ডাক্তারবাবুকে। সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবুর বাড়িতে সত্যিই আনন্দলোক মূর্ত হ'য়ে উঠল।

১৮

এর পর দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। রামসদয়বাবু কলকাতায় ফিরে গেছেন। তিনি মনে-প্রাণে স্বীকার করে গেছেন যে ডাক্তারবাবু লোকটি সত্যিই ভালো। শ্রীনাথের সমস্যারও সমাধান হয়েছে। আতরির ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। তাঁর এবং রবির সামনে তিনি আতরির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁকে কোনও কথা বলতে দেননি ডাক্তারবাবু। নিজেই বলেছিলেন, "আতর তোমার কাছে শ্রীনাথবাবু এসেছেন মাপ চাইতে। যা হয়ে গেছে তার জন্যে উনি দুঃখিত। তুমি এ নিয়ে আর বেশী হইচই কোরো না"

আতর ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

সে বলল—"আপনি যা বলবেন তাই হবে"

এই বলেই সে প্রণাম করে বেরিয়ে গিয়েছিল। রবিও অনুগমন করেছিল তার। শ্রীনাথবাবুর মন গ্লানিহীন হয় নি। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান লোক। এটা বুঝেছিলেন ডাক্তারবাবু যতক্ষণ এদের পক্ষে আছেন ততক্ষণ এদের তিনি কিছুই করতে পারবে না সুতরাং মানে মানে সরে থাকাই ভালো। যদিও প্রসন্ন মনে নয় তবু তিনি ডাক্তারবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতাও অনুভব করছিলেন একটা। ডাক্তারবাবু না থাকলে নরেন উকিল তাঁকে মহাবিপদে ফেলে দিত। হয়তো এ শহর ছেড়ে চলেই যেতে হ'ত তাঁকে। কিন্তু ডাক্তারবাবু লোকটির সম্বন্ধে একটা কৌতূহলও জেগেছিল তাঁর। পরের জন্য লোকটা বেফয়দা এমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েন কেন? কি লাভ ওঁর এতে?

পয়সাই তো খরচ হয় খালি। উনি সেদিন বলছিলেন আনন্দলাভই ওঁর জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আনন্দলাভ তো অন্য উপায়েও হতে পারে। সবাই তো আনন্দই চায়। কিন্তু পরের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে নানারকম ঝামেলা সহ্য করার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকতে পারে তা তাঁর মাথায় ঢোকে না। সেদিন যে অত টাকা খরচ করে ভোজ দিলেন—এর কোনও মানে হয়? সেদিন তিনি জিগ্যেসও করেছিলেন ডাক্তারবাবুকে— "নানা লোকের নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে আপনার ভালো লাগে?"

ডাক্তারবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"ভালো না লাগলেও করতে হয় বিবেকের তাড়ায়। ওই বিবেকই আসল মালিক, তিনিই আনন্দের ভান্ডারী। তাঁর নির্দেশ মতো চললে তিনি ওই আনন্দ ভাণ্ডার থেকে কিছু আনন্দ বখশিস দেন। সে বখশিস যারা পেয়েছে তারাই জানে তার মূল্য কি। ওই আনন্দের লোভেই বিবেককে মেনে চলি যতটা পারি"

শ্রীনাথবাবুর লোভ হয়েছিল তর্ক করবার। কিন্তু তিনি সে লোভ সংবরণ করেছিলেন, ভেবেছিলেন কি দরকার লোকটাকে ঘাঁটিয়ে। নিজের কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে এখন স'রে পড়াই উচিত। বলেছিলেন—"ও তাই বুঝি। আচ্ছা চলি তাহলে নমস্কার"

চ'লে এসেছিলেন।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরেই ডাক্তারবাবুকে বিবেকের মুখোমুখি হ'তে হল আবার।

একটি চিঠি এসেছিল। সেটি দ্বিতীয়বার পড়ছিলেন তিনি।

শ্রীচরণেষু,

অনেকদিন পরে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমার হাতের লেখা আপনি হয়তো পড়তে পারবেন না। আমি আজকাল চোখে ভালো দেখতে পাই না। ক্রমশঃ সব ঝাপসা হ'য়ে আসছে। আমি এখন রিটায়ার করেছি। এলাহাবাদে এক বন্ধুর বাড়িতে আছি। আমার তো আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। এইখানেই কোথাও একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকব আর কোনও হোটেলে খাব। যা পেনসন পাই—মাসে দেড়শ' টাকা —তাতে কোনক্রমে কুলিয়ে যাবে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আমি যদি অন্ধ হয়ে যাই তাহলে কি হবে। আমি দিল্লীর একজন বড় ডাক্তারকে চোখ দেখিয়েছিলাম। তিনি ওই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন। বয়স তো পঞ্চান্ন পেরিয়ে গেছে এখন চোখ ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাবে। অন্ধই হয়ে যাব শেষকালে। আপনাকে এসব কথা লিখছি তার কারণ সেই বহুকাল আগে যখন আমি আপনাদের শহরে হেডমিস্ট্রেসগিরি করতাম তখন আপনাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সেখান থেকে যখন চলে আসি তখন আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করব। আপনাকে ভালো লেগেছিল বলেই সে প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করেছি। মাঝে মাঝে চিঠি লিখেছি, আপনার উত্তরও পেয়েছি। ইদানীং অনেকদিন চিঠি লিখিনি আপনাকে। আজ মনে হল চোখটা যে রকম খারাপ হ'য়ে আসছে তাতে আপনাকে ভবিষ্যতে আর হয়তো চিঠি লিখতে পারব না। আপনাদের শহরে যখন ছিলাম তখনকার দিনগুলো স্বপ্নের মতো মনে হয়। কিন্তু সে সব স্বপ্নের তো সমাধি

হয়ে গেছে। জীবনের ঘনিয়ে আসছে অন্ধকারে, যে অন্ধকারে কেউ আলো জ্বালতে পারবে না। আপনাকে একটা অনুরোধ শুধু করছি। টাকা পাঠিয়ে আমাকে বিব্রত করবেন না। বহুদিন আগে আপনি একবার আবার জন্মদিনে একশ' টাকা পাঠিয়েছিলেন একটা শাড়ি কিনে নেবার জন্য। তখন আপনাকে যা বলেছিলাম আজও আবার সেই কথাই বলেছি, টাকা পাঠাবেন না। আমাদের মধ্যে যে পবিত্র সম্পর্কটা আছে টাকার স্পর্শে তা কলঙ্কিত হয়ে যাবে, আমি সেটা চাই না। অল্প কয়েক দিনের জন্য আপনার সঙ্গে আমার যে মধুর সম্পর্ক হয়েছিল তা অমলিনই থাকুক। সেই পবিত্র স্মৃতি নিয়েই আমি যেন মরতে পারি। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমার ঠিকানাটা ওপিঠে লিখে দিলাম। ইতি

প্রণতা

অমিতা রায়

বহুকাল পূর্বে যে মিস অমিতা রায় এখানে হেডমিস্ট্রেস ছিলেন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর মুখখানা ডাক্তারবাবুর মানসপটে ভেসে উঠল। তাঁর গাড়িটাও তখন নূতন ছিল। নিজেই ড্রাইভ করতেন তিনি। পাশে বসে থাকতেন মিস রায়। যেদিন তিনি চ'লে গেলেন সেদিনের কথাও মনে পড়ল। স্টেশনে তাঁকে তুলে দিতে গিয়েছিলেন ট্রেনে। ট্রেন যখন ছাড়ছে তখন দেখতে পেলেন অমিতার চোখে জল টলমল করছে। সেই শেষ দেখা। তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি তাঁর। চিঠিপত্র পেয়েছেন মাঝে মাঝে। অমিতা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে? ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইলেন তিনি। তারপর পায়ের পাতা নাচাতে লাগলেন ইজিচেয়ারে শুয়ে। তারপর উঠে পড়লেন। বারান্দায় পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। আবার শুলেন ইজিচেয়ারে। আবার পায়চারি করলেন। আবার পড়লেন চিঠিখানা। তারপর ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর চোখ খুলে হাঁক দিলেন—"লোচন—"

ড্রাইভার লোচন এসে দাঁড়াতেই বললেন—"তুমি একবার গাড়ি নিয়ে বিষুণের কাছে যাও। তাকে ডেকে নিয়ে এস একবার"

লোচন চ'লে গেল। আবার চোখ বুজে শুয়ে রইলেন ডাক্তারবাবু।

একটু পরে অনুমান গোটা দুই ছিপ নিয়ে হাজির হল।

"আজ গোপালগঞ্জে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা আছে, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। চার ফেলে এসেছি সেই পুকুরে। খেয়েদেয়ে বেরুবেন কি?"

"আজ আর বেরুব না"

অনুমান একটু অবাক হল। ডাক্তারবাবুর এরকম ভাবান্তর সে আগে লক্ষ্য করেনি। একটু ক্ষুন্নমনে চ'লে গেল সে।

"বিকাশ, বিকাশ—"

বিকাশ পাশের ঘরে ব'সে টুকছিল।

সে বেরিয়ে আসতেই ডাক্তারবাবু বললেন, "ডাকঘরে যেতে হবে তোমাকে। কিছু টাকা বার করতে হবে, আর একখানা চিঠি রেজেস্টি ক'রে পাঠাতে হবে, আমার টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেখ উইথড্রয়াল ফর্ম আছে কি না। যদি না থাকে নিয়ে এস ডাকঘর থেকে"

বিকাশ ঘরের ভিতর ঢুকে গিয়ে একটু পরে বলল—"উইথ্‌ড্রয়াল ফর্ম' আছে। এখুনি যাব কি"

"একটু পরে। বিষ্ণু আসুক—"

একটু পরেই বিষ্ণু এসে পড়লেন।

"বিষ্ণু এসেছে? একটা জরুরী কাজে আমাকে এলাহাবাদ যেতে হবে। আমার গাড়ি ক'রেই যাব। তোমাকেও থাকতে হবে আমার সঙ্গে। রাস্তায় যদি বেগড়ায়—"

"আমি একটা নতুন গাড়ি যোগাড় ক'রে দিতে পারি আপনাকে, এলাহাবাদ তো অনেক দূর—"

"না আমি নতুন গাড়িতে যাব না। আমার বুড়ো গাড়ি নিয়েই যাব। তুমি যদি সঙ্গে থাক তাহলে আর ভাবনা কি। হবিবকে ব'লে তার একটা 'লরি'ও নেব। তাতে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে নিও। তোমার কারখানার কি হবে তাই ভাবছি—"

"কদিন বাইরে থাকবেন?"

"তাতো ঠিক বলতে পারছি না। যেতে আসতেই তো অনেক সময় লেগে যাবে—"

"দিন সাতেক লাগবে। ওখানে ক'দিন থাকবেন?"

"যদি যাই তাহলে দিন দুই থাকব।"

"কবে যাবেন"

"যদি যাই সপ্তাহখানেক পরে যাব।"

"যদি বলছেন কেন—"

"যাওয়া নাও হতে পারে। যদি একটা টেলিগ্রাম আসে তাহলে যাব না—"

"ও"

বিষ্ণু কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন—"বেশ, ঠিক আছে। যাব আপনার সঙ্গে। আমি ব্যবস্থা করে ফেলছি। তবে হবিবের 'লরি'টা নিতে চাইছেন কেন। "আমার যন্ত্রপাতির জন্যে একটা 'লরি' তো দরকার নেই"

"আমার সঙ্গে আরও লোক থাকবে যে। হবিব, দামোদর, পণ্ডিত, শশধর, তার বউ বীণা, নরেন উকিল যদি যেতে চায় সেও যাবে, যতীন দারোগাকেও বলব—"

বিষ্ণু অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন।

"এত লোক নিয়ে যাবেন!"

বিষ্ণুর বিস্মিত দৃষ্টি দেখে ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন।

"ধ'রে নাও না এলাহাবাদে যমুনার তীরে পিক্‌নিক্‌ করতে যাচ্ছি আমরা"

"তাই না কি"

ডাক্তারবাবু অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"যে ক'দিন তুমি থাকবে না তোমার ব্যবসার ক্ষতি হবে তো। আমি সে ক্ষতিপূরণ করব। তুমি 'না' বলতে পারবে না। হবিবকেও ব'লে দিও 'লরি'র ভাড়া নিতে হবে—"

বিষ্ণু মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন। কোন জবাব দিলেন না।

বিষ্ণু চ'লে গেলে ডাক্তারবাবু শ্রীমতী অমিতা রায়কে একটা চিঠি লিখে ফেললেন।

"বিকাশ, এই চিঠিটা রেজেষ্ট্রি ক'রে দাও। আর সেভিংস ব্যাংক থেকে হাজার তিনেক টাকা তুলতে হবে। আমি উইথড্রয়াল ফর্মে সই ক'রে দিচ্ছি। আর পোষ্ট-মাষ্টারের একটা চিঠিও লিখে দিচ্ছি। টাকাটা এখুনি চাই না। দিন সাতেক পরে পেলেও চলবে। সাতদিন পরে আমি এলাহাবাদ যাব। তুমি আর অনুমান এখানে থাকবে। তোমাদের উপরই বাড়ির ভার থাকবে। আর এলাহাবাদ থেকে আমি চিঠি লিখব তোমাদের"

"আচ্ছা—"

বিকাশ পোস্টাফিসে চ'লে গেল।

১৯

শ্রীমতী অমিতা রায় ডাক্তারবাবুর চিঠিখানা পড়ছিলেন।

কল্যাণীয়াসু,

অমিতা, তোমার চিঠি পেয়েছি। আমারও শেষ জীবনে একা একা আর ভালো লাগছে না। আমিও একজন সঙ্গিনী চাই। যে প্রস্তাবটা অনেকদিন আগে করব ভেবেছিলাম কিন্তু যা চক্ষুলজ্জাবশতঃ করতে পারিনি সেই প্রস্তাবটা আজ করছি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তোমার জন্য নয় আমার নিজেরই প্রয়োজনে এ প্রস্তাব করছি। আমার মনে হয় এতে তোমারও সমস্যার সমাধান হবে, আমিও শেষ জীবনটা সুখে থাকতে পারব। তোমার যদি এতে আপত্তি থাকে আমাকে টেলিগ্রামে জানিও সেটা। তোমার টেলিগ্রাম না পেলে আমি গিয়ে হাজির হব। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করব তোমার টেলিগ্রামের। টেলিগ্রাম না এলে বুধবার (২১শে এপ্রিল) আমি রওনা হব এখান থেকে। আশীর্বাদ জেনো।

ইতি হিরন্ময়

দিন দশেক পরে সবাই দেখল ডাক্তারবাবুর বাড়ি ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। গেটের উপর তৈরী হয়েছে নহবতখানা। সেখানে নহবত বাজছে সকাল থেকে। বিকাশ আর অনুমান ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত। একটু পরে ডাক্তারবাবুর গাড়িটা এসে গেটে ঢুকল। গাড়িটাও ফুলে ফুলে সাজানো। পদ্ম আর গোলাপই বেশী।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে গাড়ি থেকে নামলেন। তারপর হাত ধরে নামালেন শ্রীমতী অমিতা রায়কে। তিনি একটি লাল বেনারসী শাড়ি পরে আছেন, কিন্তু মাথার চুলগুলি সব শাদা। সেই শাদার উপর সিঁদুর অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। ডাক্তারবাবু হাত ধ'রে ধ'রে তাকে নিয়ে এলেন বারান্দায়। সত্যি তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন।

বীণা শাঁখ বাজাতে লাগল।

প্রথম গরল

উৎসর্গ

আমার ছোট বউমা
শ্রীমতী চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়াসু

মানুষের স্মৃতি বেশি দিন থাকে না। এক জন্মেই তাহা ক্রমশ ঝাপসা হইয়া যায়। জন্মান্তরে তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। আমি কিন্তু ভুলি নাই। ইকা-জোলমা-শিলাঙ্গী-নিনানিকে লইয়া যে ব্যক্তি মাতিয়া উঠিয়াছিল সেই ব্যক্তিই যে আবার নবজন্মে নূতন মোহে নূতন নারীর জন্য তপস্যা করিতেছে এবং তাহারই অন্তরলোকে বসিয়া আমি যে সাংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষের মত নির্বিকারভাবে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছি ইহা আশ্চর্যজনক হইলেও সত্য। আমি জন্ম-জন্মান্তরে নানাভাবে আবর্তিত হইয়াছি কিন্তু বিস্মৃতির কবলে পড়ি নাই। যাহা দেখিয়াছি সমস্ত আমার মনে আছে, তাহার কিছুটা আজ তোমাদের শুনাইব। যাহার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া আমি দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, অনুভব করিয়াছি সে ব্যক্তি আমি নহি, সে শরীরী। মৃত্যুর করাল কবলে বারংবার সে শরীর অবলুপ্ত হইয়াছে। পুরাতন গৃহের মত তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেই সব গৃহের মধ্যে আমি বায়ুর মত বাস করিয়াছি। গৃহ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমি লুপ্ত হই নাই। বহু গৃহের বহু লীলা আমার স্মৃতির স্তরে স্তরে অক্ষয় হইয়া আছে। আমার নিজের জবানীতে তাহার কিছুটা আজ তোমাদের শুনাইব।

নদীর ক্রোড়েই মানব সভ্যতা লালিত হইয়াছে। কখনও সে নদীর নাম নীল কখনও ইউফ্রেটিস, কখনও তাইগ্রিস, কখনও আমাজন, কখনও ভল্‌গা, কখনও গঙ্গা। বহু নামহীন নদীও মানব-সভ্যতাকে লালন পালন করিয়াছে। এক জন্মে—যখন আমার নাম জংলা ছিল—আমরা কন্যানদীর তীরে তৃণ বপন করিয়া জীবন-ধারণ করিতাম। ধবল আমাদের দলপতি ছিল। ধবলের পত্নী নিনানি ছিল আমার প্রণয়িণী। তাহারই কৃপায় ও কৌশলে প্রবল পরাক্রান্ত উদ্ভনের প্রবল অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। এখন নিনানিও নাই, উদ্ভনও নাই। এখন আমার নূতন নাম টালা। এখন আমাদের সে দুর্দশাও আর নাই। আমরা চাষ-বাসের প্রভূত উন্নতি করিয়াছি, গৃহস্থ হইয়াছি। মানুষের বাঁচিবার তাগিদই মানুষকে নিত্যনব উদ্ভাবনে নিযুক্ত করিয়াছে। লৌহ তাম্র প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করিয়া মানব সমাজ এখন প্রকৃতির নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। আমরা চাষের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছি, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি, নৌকাযোগে বিদেশের হাটে-বাজারে যাতায়াত করিতেছি। এসব করিতে বহু যুগ লাগিয়াছে, নিরন্তর চেষ্টাই মানুষকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এখন আমাদের শস্যক্ষেত্র দিগন্তবিস্তৃত। ছোট ছোট গ্রামে আমাদের পরিবারবর্গ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। সকলেই—বিশেষ করিয়া মেয়েরা, এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত—চাষবাসের কর্মে নিযুক্ত। আমাদের অনেক গরু, অনেক মহিষ, অনেক ছাগল, অনেক ভেড়া। কুকুর আমাদের পরিজনের মতো হইয়া গিয়াছে। জন্তু জানোয়ার এবং পক্ষী শিকারে আমরা দক্ষ হইয়াছি। বল্লম বর্শা তীর-ধনুক ছোরা কুঠার এবং খড়্গ এখন আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমাদের গরু-মহিষ-ছাগল-ভেড়া বিরানি নামক বিরাট জঙ্গলে থাকে। দোহা এবং তাহার স্যাঙাৎরা তাহাদের দেখাশোনা করে। অনেক দুধ হয়।

কত হয় ঠিক জানি না। শুধু জানি, ছয়মাস পর্যন্ত কোনও গাভীর দুধ আমরা খাই না। ছয়মাস পর্যন্ত বাছুরেরাই মায়ের দুধ খাইবার সুযোগ পায়। শুধু বাছুরদের নয়, বাছুরের মায়েদেরও দোহা দুধ খাওয়ায়। এ সত্ত্বেও অনেক দুধ উদ্বৃত্ত হয়। কিছু দুধ দোহা আমাদের খাওয়ার জন্য পাঠাইয়া দেয়। বড় বড় মাটির কলসীতে করিয়া সে দুধ দোহার ভৃত্যগণ আমাদের কাছে প্রত্যহ বহন করিয়া আনে। আমাদের খাইবার পরও যাহা বাঁচে তাহা লইয়া দোহা ব্যবসায় করে। দুধের বদলে চাষের জন্য লাঙল, লোহার ফাল, তামার বাসন, মাটির জালা, বল্লম, তীর প্রভৃতি সংগ্রহ করে সে। দুধ লইয়া বৎসরে একটা করিয়া উৎসবও হয় একদিন। তাহাকে শুদ্ধ ভাষায় দুধ-ভূমি বলা যাইতে পারে। চলিত ভাষায় আমরা তাহাকে দুধভুঁইয়া বলি। সেদিন আমাদের জমিতে আমাদের বৃক্ষগুলির নীচে কলসী কলসী দুধ ঢালা হয়। সেদিন আমরা বা বাছুরেরা—কেহই—দুধ খাই না। সমস্ত দুধ জমিতেই ঢালা হয়। দোহা সেদিন মহানন্দে নৃত্য করে। আমরাও সকলে নৃত্য করি। বাহুর উৎক্ষেপে, সর্বাঙ্গের দোলনে, আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখ-মণ্ডলে, উচ্ছ্বসিত অঙ্গভঙ্গীতে সে নৃত্যের যে প্রকাশ তাহা উচ্চাঙ্গের কলাসম্মত নৃত্যবিধির মানদণ্ডে মাপা যাইবে কি না জানি না কিন্তু তাহা যে আমাদের অন্তরের স্বতোৎসারিত আনন্দের প্রকাশ তাহাতে সন্দেহ নাই। আনন্দকে মাপিবার অথবা মাপিয়া আনন্দ করিবার কোন উপায় তখনও আমাদের জানা ছিল না। দোহার প্রাণ-প্রাচুর্যের হিল্লোলে আমরা সকলে ভাসিয়া যাইতাম, আমরা সকলে হাবুডুবু খাইতাম, আমরা সকলে আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। দোহা আমাদের মধ্যে একটি অদ্ভুত লোক। সে মাছ-মাংস খাইত না। দুধ, শাক সবজি আর ফল তাহার আহার ছিল। বিশাল চেহারা ছিল তাহার। দৈত্যের মতো সে বিরানির বিরাট অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। অদ্ভুত শক্তিধরও ছিল সে। বাঘ, সিংহ, ভালুক, নেকড়ে বাঘকে সে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিত। শৃগাল প্রভৃতি ছোট জানোয়ারকে সে সামান্য ঢিলের মত শূন্যে ছুঁড়িয়া দিত। বেজি, খরগোসদের সে গ্রাহ্যই করিত না। তাহারা পারতপক্ষে তাহার সম্মুখে আসিত না। একবার সে একটা বন্য বরাহের পিঠে চড়িয়া তাহার সূচ্যগ্র মুখটা ধরিয়া তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিয়াছিল। বিরাট বিরানি অরণ্যের যোগ্য অধিপতি ছিল দোহা।

আমরা তখন যেন একটা রূপকথালোকে বাস করিতাম। আমাদের চারিদিকের প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস, জন্তু-জানোয়ার, পাখী, মেঘ ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ, আমাদের মাঠের ফসল, আমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই যেন একটা অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতাম। বিশ্বাস করিতাম আমরা যেন কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত। সেই শক্তিই আমাদের নিয়ামক, তাহার বিধান অব্যর্থ, তাহার আইন ন্যায়সঙ্গত। তাহার আইন ন্যায়সঙ্গত এই বিশ্বাস থাকাতে আমরা সর্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতাম, পাছে সে আইন লঙ্ঘন করিয়া ফেলি। মাঝে মাঝে ফেলিতামও, কারণ সব সময় সম্পূর্ণভাবে ন্যায়পথে চলা কি সম্ভব মানুষের পক্ষে? এমন কি যাহা জীবনধারণের পক্ষে অনিবার্য তাহা তো করিতেই হইত। সম্পূর্ণ ন্যায়পথে চলা যে অসম্ভব। বন্যপশুকে যখন শিকার করি তখন কি অন্যায় করা হয় না? ফসল কাটিয়া যখন

আহার করি তখন কি সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়? অন্তরের অন্তস্থলে আমরা অনুভব করিতাম অন্যায় করিতেছি, কিন্তু না করিয়াও বা বাঁচিব কি প্রকারে। তাই মনের মধ্যে একটা অপরাধ-বোধ জাগ্রত হইয়া থাকিত। মনে মনে একটা ভয়ও হইত। ভাবিতাম যাহাকে আমরা হনন করিতেছি তাহার আত্মা কোনও না কোন ভাবে ইহার প্রতিশোধ লইবে। আমরা বিশ্বাস করিতাম মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব লোপ পায় না, আত্মা বাঁচিয়া থাকে, সে আত্মা দুর্বল নয়, শক্তিশালী, ভয় হইত হয়তো সে প্রতিশোধ লইবে। তাহার ক্রোধ প্রশমনের জন্য আমরা তাই তাহাকে নানাভাবে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতাম।

একটা ঘটনার বর্ণনা দিতেছি। ইহা হইতেই আমাদের মনোবৃত্তির কিছু পরিচয় হয়তো পাইবে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

সেদিন সকালে দোহা প্রকাণ্ড একটা ভালুক স্কন্ধে লইয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড কালো ভালুক। প্রায় একটা মহিষের মতো আকৃতি। দোহা সেটাকে আছড়াইয়া মারিয়াছিল। দোহা নিরামিষাশী, কিন্তু সে জানে ভালুকের মাংস আমাদের খুব ভালো লাগে। আমরা সকলেই মাংসাশী, তাই কিছু শিকার করিলেই আমাদের জন্য সে জানোয়ারটি বহিয়া আনে। দোহা আসিয়া প্রথমেই একটি বিকট চীৎকার করিল। সে চীৎকার অনেকটা রোদনের মতো। সে চীৎকার যেন অনেকটা ভালুকেরই আর্তনাদের অনুরূপ। দোহা নিকটে আসিলে আমরা দেখিলাম দোহা কাঁদিতেছে। তাহার বিরাট শ্মশ্রু-গুম্ফ অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া যাইতেছে। দোহা আমাদের কাছাকাছি আসিয়া ধপাস করিয়া ভালুকটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। তাহার পর আমাদের জমির মাঝখানে দুইটা মোটা খুটি পুঁতিয়া ভালুকটাকে তাহার পিছনের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিল। ভালুকের ঘাড়টাকেও একটা কাঠ দিয়া সোজা করিয়া দিল সে। ঘাড়টা একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। ঘাড়টা সোজা করার পর দেখা গেল জিভটা বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। নাকের ছিদ্র দিয়া ও চোখের কোণ হইতে রক্ত পড়িতেছে। মৃত চোখ দুইটা যেন বিস্মিত-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে আমাদের দিকে। দোহাও খানিকক্ষণ নির্নিমেষে সেদিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল তাহাকে। অনেকক্ষণ প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিল, জোড়হস্তে অনেকক্ষণ বসিয়াই রহিল তাহার পর। আমরাও সকলে জোড়হস্তে নীরবে বসিয়া রহিলাম। একটু পরে সে যাহা বলিল তাহার অনুবাদ তোমাদের ভাষায় দিলাম। কিন্তু এ অনুবাদে দোহার স্বতঃস্ফূর্ত বাচনভঙ্গীর, তাহার শ্রদ্ধাপ্লুত মুখমণ্ডলের, তাহার ভক্তি-স্নিগ্ধ দৃষ্টির পরিচয় নাই।

দোহা বলিল—হে বীরবর তোমাকে আমি সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বধ করিয়াছি এ অহংকার আমি করি না। আমি জানি স্বেচ্ছায় তুমি আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছ। আমাদের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করিবার জন্য বার বার তুমি আত্মদান করিয়াছ। আমাদের অহঙ্কারকে স্ফীততর করিবার জন্য মহাবলী হইয়াও তুমি বার বার আমাদের মতো দুর্বল হস্তে পরাজয় বরণ করিয়াছ। তোমার দেহকে আমরা পাতিত করিয়াছি, কিন্তু তোমার অমর আত্মা বিয়ানির অরণ্যে এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করিতেছে। তোমার সেই আত্মাকে আমরা প্রণাম করি। তাহার নিকট আমরা আশীর্বাদ ও অভয় ভিক্ষা করি। তোমার শৌর্য, বীর্য, মহিমা আমাদের যেন নানা বিপদ হইতে

রক্ষা করে। আমাদের ক্ষুধাকে শান্ত করিবার জন্য, আমাদের লোভকে তৃপ্ত করিবার জন্য, আমাদের জীবনধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য, হে বীরেন্দ্র, বার বার তুমি আমাদের নিকট আসিও, এই প্রার্থনা। আমরা বার বার তোমাকে পূজা করিয়া ধন্য হইব।...

এই ধরনের প্রার্থনা দোহা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিল। তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোমাদের মধ্যে যাহারা পবিত্র আছে, যাহারা সম্প্রতি মৈথুন হইতে বিরত থাকিতে পারিয়াছ, তাহারা আসিয়া ইহার সৎকার কর। যাহারা অপবিত্র, অসংযমী, তাহারা এখন উহাকে স্পর্শ করিও না। করিলে আমাদের ঘোর অমঙ্গল হইবে।

দোহার কথা শুনিয়া দুইজন পুরুষ, রম্ভা ও জিকটু আগাইয়া গেল। মেয়েদের মধ্যে গেল কিংকা ও রুলকি। আমি যাইতে পারিলাম না, কারণ যদিও আমি কৃষি-বিভাগের অধিকর্তা, এ ব্যাপারে আমারই অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি সংযমী ছিলাম না। কিছুক্ষণ পূর্বেই আমি কণ্টকার আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। কণ্টকা শয়তানী, কিন্তু সে এত লোভনীয়া, তাহার সান্নিধ্য এমন উম্মাদনাকর যে সে যখন তাহার ছলা-কলা লইয়া, সর্বাঙ্গে হিল্লোল তুলিয়া, আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন আমার পক্ষে আত্মসংযম করা কঠিন হইয়া উঠে। দোহা যখন সকলকে আহ্বান করিতেছিল তখন অনাবৃত-স্তনী পীবরবক্ষা কণ্টকা ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। কণ্টটা সত্যই মোহিনী, কিন্তু সে দুষ্টা, সে প্রগলভা।

রম্ভা জিকটু কিংকা ও রুলকি ছাড়া যখন কেহ গেল না, তখন দোহা বলিল, গাছের তলায় ইহার জন্য একটি ঘর নির্মাণ কর।

আমাদের বসতির মধ্যস্থলে সেই বিরাট গাছটি ছিল। সে গাছের আমরা নাম জানি না। চেনা-শোনা কোনও গাছের সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। শুধু জানি তাহা অতি বৃহৎ, তাহা আকাশচুম্বী। তাহার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, বিপুল পত্রসম্ভার। পাতাগুলি বেশ বড় বড়, অতিশয় চিক্কণ এবং ঘনসবুজ। পাতাগুলি যখন কিশলয়রূপে থাকে তখনও তাহা ঘন-সবুজ। তখন মনে হয় অসংখ্য ঘন-সবুজ গুটিকা যেন গাছের সর্বাঙ্গে উম্মুখ হইয়া রহিয়াছে। ক্রমশঃ তাহারা নিজেদের বিস্তার করিয়া ঘন-সবুজ পাতায় পরিণত হয়। যখন পাতায় পরিণত হয় তখনও পাতাগুলি যেন উম্মুখ হইয়া থাকে। সমস্ত গাছটারই কেমন যেন একটা উম্মুখ ওৎ-পাতা ভাব। আমরা সকলেই গাছটাকে ভয় করি, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে যখন সে গাছে ফুল ফুটিয়া ওঠে। মনে হয় সমস্ত গাছটায় যেন আগুন জ্বলিতেছে। অগ্নিশিখার মতো এ রকম ফুল আমরা আর কোন গাছে দেখি নাই। প্রায় এক পক্ষকাল ওই ফুলগুলি সমানে ফুটিয়া থাকে। সে সময় আমরা সকলে আতঙ্কিত হইয়া থাকি। ভয় হয় কখন কি অনিষ্ট ঘটিবে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন অনিষ্ট হয় নাই। বরং দেখা যায় ওই গাছে যখন ফুল ফোটে তখন আমাদের বংশবৃদ্ধি হয়।

দোহার জন্ম ওই ফুল ফুটিবার সময় হইয়াছিল। ওই গাছের তলাতেই দোহার মা দোহাকে প্রসব করিয়াছিলেন। প্রসব করিবার সময় চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন

এই গাছই মানুষরূপে আমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমার ছেলে মেয়ে যাহাই হউক এই গাছের আত্মাই তাহার মধ্যে আছে। আমি যেদিন বুঝিতে পারিলাম আমার স্বামী নপুংসক সেদিন আমি এই মহাবৃক্ষকেই স্বামী রূপে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম।

এসব অনেকদিন আগেকার গল্প। তখন আমার জন্মও হয় নাই। আমার বাবা তখন দলপতি ছিলেন। তাঁহার মুখেই এ গল্প শুনিয়াছি। দোহা বিরাটকায় শিশু হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সে আরও বৃহৎ হইয়া উঠিল। শুধু আকারে নয়, চরিত্রেও। তাহার ধৈর্য, তাহার বীর্য, তাহার মহাশক্তি দেখিয়া সত্যই আমাদের বিশ্বাস হইয়াছিল সে ওই মহাবৃক্ষের সন্তান। কিন্তু পলিতকেশা ঝাঝার ধারণা অন্যরূপ ছিল। সে বলিত দোহার মা বিষকুণ্ডা যখন যুবতী তখন এক অশ্বারোহী ডাকাত নাকি তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অনেকদিন পরে বিষকুণ্ডা হাঁটিতে হাঁটিতে ফিরিয়া আসে। আসিয়া বলিয়াছিল, আমি ঘোড়ার মাংস খাইয়াছি, ভেড়ার লোম ও তুলার আঁশ দিয়া তৈরি ঘরে বাস করিয়াছি। যাহারা আমাকে হরণ করিয়াছিল তাহারা ডাকাত, চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়ানোই তাহাদের পেশা। আমাকে যে লোকটা লইয়া গিয়াছিল আমি তাহার দাসী হইয়া ছিলাম। হয়তো চিরকাল দাসী হইয়াই থাকিতে হইত, কিন্তু সহসা তাহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হইল। আমাকে যে লোকটা লইয়া গিয়াছিল তাহার বক্ষে তাহার দাদা একটা বল্লম বিদ্ধ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হইল তাহার। জ্ঞাতিদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমি সেই সুযোগে এখানে পলাইয়া আসিয়াছি। আমাকে তোমরা কেহ ছুঁইও না, আমি একধারে এক পাশে থাকিয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিব। এই গাছের তলায় থাকিব, ইহাই আমার আশ্রয়। এই গাছই এখন আমার স্বামী, আমার প্রভু। এই গাছের তলায় তিন বৎসর বাস করিবার পর দোহার জন্ম হয়। ঝাঝা বলিত ছেলেটা তিন বৎসর পেটের মধ্যে ছিল বলিয়া অত বড় হইয়াছে। ঝাঝা আমার প্রপিতামহী ছিলেন। তিনি আরও অনেক গল্প বলিতেন।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহু পূর্বে নাকি জিগাসা নদীর তীরে বসবাস করিতেন। সে নদীতে যখন বান আসিত তখন নাকি কুল কিনারা দেখা যাইত না। আমাদের ফসল, ঘর-বাড়ি ডুবিয়া যাইত, গরু-বাছুর ভাসিয়া যাইত, অনেক লোকের প্রাণ-হানিও হইত। তখন সকলে মিলিয়া বানের পূর্বে নদীর তীরে বিরাট বাঁধ দিবে বলিয়া সংকল্প করেন। বাঁধের মাটি কাটিবার সময় আমাদের পূর্বপুরুষ ডংকার সহিত উহাদের বিবাদ বাধে। বিবাদের কারণ একটি গাছ। একটি বিরাট গাছকে উৎখাত করিয়া সকলে যখন নদীতে বাঁধ দিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন তখন ডঙ্কা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—এই গাছ সামান্য গাছ নহে। উহা বৃক্ষরূপী দেবতা, আমি ওই দেবতার মহিমা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি, উহার নিকট প্রার্থনা করিলে মনের বেদনা দূর হয়। ওই গাছকে উৎখাত করিলে আমাদের অনিষ্ট হইবে। ডংকার কথা কিন্তু কেহ গ্রাহ্য করিল না, গাছটি কাটিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া তাহার উপর মাটি দিয়া বাঁধ বাঁধিল তাহারা।

ডঙ্কা বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়াছিলেন। আকাশের দিকে দুই বাহু উৎক্ষিপ্ত

করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি আর এখানে থাকিব না। দেবতার মহারোষে এদেশ ছারখার হইয়া যাইবে।

ডংকা নিজের পরিবারবর্গ ও কয়েকটি গরু-ভেড়া লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন। কিছু দূর আসিয়া কিন্তু একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিল। তিনি বন্যপথেই হাঁটিতেছিলেন। কিছুদূর হাঁটিবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন বনের খানিকটা অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তাহার মাঝখানে একটি শিশু-বৃক্ষ রহিয়াছে। ডংকার মনে হইল শিশু-বৃক্ষটি যেন তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। কাছে গিয়া ডংকা আশ্চর্য হইয়া গেল। যে বৃক্ষটি উহারা উৎখাত করিয়াছিল এই শিশু-বৃক্ষটি তাহারই চারা। শুধু তাহা নহে পাশেই একটি কোদাল এবং ঝুড়িও রহিয়াছে। কি করিয়া এই বনের মধ্যে ওই শিশু-বৃক্ষটির পাশে কোদাল ও ঝুড়ি আসিল তাহা লইয়া ডংকা মাথা ঘামাইলেন না। তিনি দেবতার নিগূঢ় ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিলেন। অনেকখানি মাটির সহিত সেই গাছের চারাটি তুলিয়া তিনি ঝুড়িতে রাখিলেন এবং ঝুড়িটি মাথায় করিয়া বহিয়া আনিলেন। অনেকদিন হাঁটিয়া অবশেষে তিনি বিরানি জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হন। বিরানির পাশ দিয়া যে নদী বহিতেছিল সেটির নাম জমানি। ডংকা যখন প্রথম আসেন তখন বিরানি জঙ্গলের বা নদীটির কোন নাম ছিল না। দুইটি নামকরণই ডংকা করিয়াছিলেন। এ প্রদেশে তখন মানব-বসতি ছিল না। জন্তু-জানোয়ারগণই রাজত্ব করিত এ অঞ্চলে। বহুবৎসর পূর্বে ডংকা মহাসমারোহে এই গাছটি স্বহস্তে এই স্থানে পুঁতিয়া গিয়াছেন। তখন হইতেই ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া সেই গাছ এখন মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। শুনিয়াছি বহুকাল পূর্বে এই গাছের তলায় পশুবলি হইত। বহু বন্যপশুর শোণিতে এই বৃক্ষের মূলদেশ সিঞ্চিত হইয়াছে। এই গাছ সত্যই এখন বিশাল। একশত জন হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইলেও ইহার কাণ্ডের পরিধি সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত করিতে পারে না। ইহার চূড়া গগনচুম্বী। নানারকম পাখী ইহার ডালে বাসা বাঁধে। নীলকণ্ঠ, ফিঙে প্রভৃতি সাধারণ পাখীরা গাছের নিম্নাংশে নীড় নির্মাণ করে। একটু উঁচু দিকে থাকে হলদে পাখীরা। মাঝে মাঝে হরিয়ালের ঝাঁক আসিয়া বসে। আর আসে একজোড়া ধনেশ পাখী। প্রতিবছর আসিয়া তাহারা এই গাছের মগডালে বসে। দুই একদিন থাকে, তাহার পর উড়িয়া যায়। তাহাদের আমরা অতিথির মত অভ্যর্থনা করি। তাহাদের উদ্দেশে ফল ফুল শস্যের অর্ঘ্য নিবেদন করি, নৃত্যগীত দিয়া তাহাদের সংবর্ধনা করি। তাহাদের কৃষ্ণাভ ছাইয়ের মত রং, বিশেষ করিয়া তাহাদের বিরাট অদ্ভুত ঠোঁট আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে। মনে হয় তাহারা কোনও সুদূর দেশের দূত, সেখানকার বার্তা বহন করিয়া যেন গাছের কানে কানে বলিয়া যায়। সে বার্তা শুনিয়া গাছের পাতাগুলি আরও ঘনসবুজ আরও রহস্যময় হইয়া ওঠে। আর একটা আশ্চর্যের বিষয়, কাক, চিল বা শকুনি এই গাছে কখনও বসে না। ও গাছে তাহারা বাসাও বাঁধে না। কিন্তু এক-জোড়া পেচক-দম্পতী এই গাছের কোনও কোটরে বাস করে। বেশ বড় পেঁচা। গায়ের রং কালো ও বাদামী মেশানো। মাথা দুইটি পালকের শিং আছে। তাহারা গভীর রাত্রে বাহির হইয়া ডাক দেয়—বু বুওও। মনে হয় কোন প্রহরী যেন পাহারা দিতেছে। যেদিন তাহাদের ডাক

শুনিতে পাই না, সেদিন আমাদের মনে ভয় হয়। মনে হয় বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে। আরও দুই প্রকারপাখী জমানির তীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটির নাম মুণ্ডক। সারস জাতীয় পাখী, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বড় মুরগীর মত। দেখিতে অতি সুন্দর। সর্বাঙ্গ সাদা, ডানার কাছে বাদামী, মাথা ও মুখটি কালো। ঠোঁটটি বেশ লম্বা। কেন জানি না এই পাখীটি দেখিলেই মনে একটা পবিত্র ভাবের উদয় হয়। সকলেই আমরা শ্রদ্ধা করি মুণ্ডককে। মুণ্ডক প্রতি বছর আমাদের গাছের পূর্বদিকের অংশটাতে বাসা বাঁধে। শাবকগুলি বড় হইলে কিন্তু বেশী দিন মা-বাবার কাছে থাকে না, উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। জানি না কোন দেশে যায় তাহারা। জানি না সে দেশেও এমন মহাবৃক্ষ আছে কি না। দ্বিতীয় পাখীটি আরও বড়। এটিও দেখিতে চমৎকার। তীক্ষ্নকণ্ঠে উক্ উক্ উক্ উক্ করিয়া ডাকে বলিয়া ইহার নাম উকনা বা হুকনা। আকারে শকুনি অপেক্ষা বড়। পা দুইটি বেশ বলিষ্ঠ এবং পীতবর্ণের। বুকটা সাদা, পিঠে কালো বাদামী রং। ডানার কাছে কালো রঙের ফুল কাটা। জমানি নদীর যেখানটা নির্জন এবং বালুকাময় সেইখানেই ইহারা থাকে। মাঝে মাঝে আমাদের গাছে আসিয়া বসে। যেদিন বসে সেদিন আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। উকনা কিন্তু গাছে বাসা বাঁধে না। নদীর চরে ঝোপের মধ্যে ডিম পাড়ে। তাহার ডিম আমরা খাইয়া দেখিয়াছি, খুব সুস্বাদু।

এসব কথা এত বিস্তারিত বলিলাম, কারণ ইহাদের লইয়াই তখন আমাদের জীবন ছন্দিত হইত। ওই বিরাট গাছটাই ছিল আমাদের সমস্ত জীবনের কেন্দ্র এবং প্রেরণা। তাহাকে আমরা ভয় করিতাম, ভক্তিও করিতাম। আমাদের পূর্বপুরুষ ডংকার তিনটি স্মৃতি আমাদের মধ্যে এখনও বর্তমান। একটি স্মৃতি বিরানি জঙ্গল যেমানে দোহা থাকে, যেখানে আমাদের গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। এই বিরানি অরণ্যের নামকরণ ডংকা নিজের মায়ের নামে করিয়া গিয়াছে। ডংকা যখন জিগাসা নদীর তীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছিল তখন পথে তাহার মা বিরানি এবং জ্যেষ্ঠা পত্নী জমানি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি এবং করকাপাতের ভিতর পড়িয়া অনেক গরু-বাছুর এবং আত্মীয়-স্বজন মারা যায়। এই সময় বিরানি ও জমানিরও মৃত্যু হয়। কিন্তু ডংকা তাহাদের অমর করিয়া গিয়াছে। বিরানি অরণ্য এবং জমানি নদীর মধ্যে তাহারা বাঁচিয়া আছে। আমরা চাষ-বাসের উপর নির্ভর করি। আমাদের নিকট নদী অরণ্য এবং ভূমি এই তিনটিই অপরিহার্য জীবন-ভিত্তি। আর আমাদের ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে ওই বিরাট বনস্পতি। ডংকা ইহাকে মাথায় বহিয়া আনিয়া রোপন করিয়াছিল বটে কিন্তু কোনও নামকরণ করিয়া যায় নাই। হয়তো ইহার কোন নামকরণ করিতে পারে নাই। তাহার হয়তো মনে হইয়াছিল এই অনন্ত-সম্ভাবনাময় বহুরূপী বৃক্ষকে একটা কোন নামের সীমাবদ্ধতায় বাঁধা যাইবে না। আমরা উহার নাম দিয়াছি 'টুকচুম্বা'। আমাদের ভাষায় ইহার অর্থ দেবতা।

এইখানে আমাদের আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। কারণ, তোমাদের যে গল্পটি বলিব বলিয়া ঠিক করিয়াছি সে গল্পটির মূল তাহার মধ্যে নিহিত আছে। জমানি নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে আমাদের বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। ক্ষেতের মাঝে

মাঝে ছোট ছোট পল্লী। সে সব পল্লীর কোনটা আমাদের কামারশালা, কোনটাতে আমাদের কুম্ভকারেরা থাকে। শুধু কুম্ভ নয়, নানাবিধ সুদৃশ্য তৈজসপত্রাদি নির্মাণ করে তাহারা। সে সব আমরা নৌকায় করিয়া বিদেশের হাটে পাঠাই এবং সে সবের বদলে অনেক বিদেশী জিনিস লইয়া আসি। কিন্তু আমাদের নদীর পশ্চিম তীর খুব নিরাপদ নয়। যেখানে আমাদের শস্যক্ষেত্র শেষ হইয়াছে সেখানে শুরু হইয়াছে আমাদের সমাধিক্ষেত্র। জায়গাটা পাহাড়ে গোছের। চারিদিকে বড় বড় পাথরের স্তূপ। সে স্তূপ হইতে আরও পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। বর্ষাকালে সে পর্বত-শ্রেণীর বর্ণ নীল, গ্রীষ্মকালে ধূসর। এই পর্বতশ্রেণীর ওপারে আছে মরুভূমি। ঝাঝার মুখে শুনিয়াছি ডঙ্কার প্রপিতামহের প্রপিতামহরা ওই পর্বতশ্রেণীর ওপারে মরুভূমিতে বাস করিতেন। তাঁহারাই নাকি বহুপূর্বে পাহাড় ডিঙাইয়া একদা সপরিবারে জিগাসা নদীর তৃণশ্যামল সৈকতে চলিয়া যান। জিগাসা নদী ওই পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে। পর্বতমালা হইতে আর একটি নদী বাহির হইয়াছে, তাহার নাম কলকলা। জমানি নদী কলকলা নদীর শাখা। কিন্তু জমানি জিগাসা নদী হইতে অনেক দূরে। তাহা পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া পূর্ববাহিনী হইয়াছে এবং উপর্যুপরি কয়েকটা অরণ্য পার হইয়া বিরাট একটা জলাশয় সৃষ্টি করিয়াছে। সে জলাশয় বহুদূরে। তাহা আমরা দেখি নাই। মরুভূমি হইতে জিগাসা নদীর তীরে আমাদের যে পূর্বপুরুষ দুইজন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের একজনের নাম ছিল থানথিরা, আর একজনের নাম ছিল বানমুখ। ঝাঝা বলে—দুইজনের চরিত্র নাকি দুইরকম ছিল। থানথিরা ধীর স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। মরুভূমির অনিশ্চয়তা এবং রুক্ষতার মধ্যে বাস করিয়া থানথিরা সুখ পান নাই। তাঁহার মনে সুখশান্তির যে স্বপ্ন জাগিত তাহাই পাইয়াছিলেন জিগাসা নদীর তীরে। তিনি একদা মরুবাসী বেদুঈন ছিলেন, কিন্তু সেই ভয়াবহ অনিশ্চিত দস্যুর জীবন তাঁহার ভালো লাগিত না। জিগাসা নদীর তীরেই তিনি নূতন ধরনের গৃহস্থালী স্থাপন করিলেন। মরুভূমিতে আর ফিরিয়া গেলেন না। ওই অঞ্চলে যে সব নিতান্ত বর্বর অরণ্যবাসীরা আসিত তাহাদের মধ্য হইতে তিনি গো-বংশীয়া মনমনকে ছাগ-বংশীয়া বুলাকে এবং অশ্ববংশীয়া অংঘোকে বিবাহ করিলেন। ইহাদের মধ্যে অংঘোই নাকি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিল। সে যখন হাসিত তখন অংঘো, অংঘো শব্দ হইত। মনে হইত তাহার গলার ভিতর কোন বাজনা বাজিতেছে। তাহার পা দুইটিও অদ্ভুত ধরনের ছিল, অনেকটা অশ্বক্ষুরের মতো। সে ঘোড়ার মতো ছুটিতেও পারিত। ঘোড়ার পিঠের উপর তাহার দক্ষতাও অসাধারণ ছিল। ঘোড়ার পিঠের উপর দাঁড়াইয়াও সে ঘোড়া হাঁকাইতে পারিত। ঘোড়ারাও অতি সহজে বশীভূত হইত তাহার। বস্তুত থানথিরা এবং বানমুখ যতগুলি ঘোড়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন অংঘোই তাহাদের তত্ত্বাবধান করিত। অংঘো ডাক দিলেই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিত তাহার কাছে।

বানমুখ অস্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। সর্বদাই বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইতেন। গৃহস্থালীর শান্ত পরিবেশ তাঁহার ভালো লাগিত না। দুর্গম গিরিসঙ্কটের আহ্বান, মরুভূমির নিষ্করুণ স্পর্ধা তাঁহাকে বেশী আকর্ষণ করিত।

দুর্দমনীয়কে দমন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে সর্বদা কোন না কোন বিপজ্জনক অভিযানে টানিয়া লইয়া যাইত। একবার বিরাট একটা হস্তীযূথের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রাণসংশয় হইয়াছিল। আর একবার মরুভূমির একটা ক্ষুধার্ত সিংহের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া তিনি প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মুখের খানিকটা ওই সিংহ খাবলাইয়া লইয়াছিল। বাম দিকের গালে মাংস ছিল না। শূন্য গহ্বর দিয়া মুখের দাঁতগুলি এবং জিভের খানিকটা দেখা যাইত। সে অতি বীভৎস চেহারা। কোনও ছেলে বা মেয়ে পারতপক্ষে তাঁহার নিকট যাইত না।

থানথিরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। বানমুখকেও তিনি বন্য-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু বানমুখ তাঁহার সে উপদেশ কর্ণপাত করিতেন না। শুধু তাহাই নয়, যে শান্তি তিনি পাইতেছিলেন না, যে শান্তি পাইবার যোগ্যতাই তাঁহার ছিল না, সে শান্তি থানথিরা পাইয়াছিলেন বলিয়া থানথিরার প্রতি তাঁহার কেমন যেন একটা আক্রোশ ছিল। হঠাৎ একদিন তিনি বিনা কারণেই থানথিরার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। থানথিরা যদিও ধীর-স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গায়ে শক্তি কম ছিল না। পিশাচ-প্রকৃতির বলশালী বানমুখকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া দুইহাতে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া বলিয়াছিলেন—তোমাকে এখনই আমি মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু ভ্রাতৃহত্যায় আমরা প্রবৃত্তি নাই। এখানে যখন তোমার ভাল লাগিতেছে না, যে সামাজিক জীবন আমরা এখানে যাপন করিতেছি তাহা যখন তোমার পছন্দ নয়, তখন তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি? তুমি যেখানে সুখে থাকিবে মনে কর সেইখানে চলিয়া যাও। কাল প্রভাতে তোমার মুখ যেন আর না দেখি।

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল সমস্ত ঘোড়াগুলি লইয়া বানমুখ অন্তর্ধান করিয়াছে। অংঘোও নাই। সে-ও সম্ভবত তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

সেইদিন হইতে থানথিরা আর ঘোড়া পোষেন নাই। তাঁহার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল ঘোড়া জানোয়ারটার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ যেন যুক্ত হইয়া আছে। তাঁহার বেদুইন-জীবনে যখন তিনি মরু-দস্যু ছিলেন তখন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াই তিনি লুটপাট করিয়া বেড়াইতেন। ওসবে তাঁহার আর প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে ঝঞ্ঝা আমাদের শস্যকে ছিন্নভিন্ন করে, আমাদের ঘরের চাল উড়াইয়া লইয়া যায়, শান্ত নদীকে উন্মাদ করিয়া তোলে, সেই ঝঞ্ঝা যে বায়ুর রুদ্ররূপ সেই বায়ুটিরই আর এক রূপ ঘোড়া। বানমুখ এবং অংঘোও অশ্ব-প্রেত অশ্ব-প্রেতনী। মানুষের রূপ ধরিয়া তাহারা আমাদের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছিল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি অশ্ব বর্জন করিয়াছিলেন। অশ্ব যদিও খুব উপকারী জন্তু, অশ্বের মাংস যদিও খুব সুস্বাদু, তবু আতঙ্ক-বশত থানথিরা অশ্বের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। থানথিরা ডঙ্কার পূর্বপুরুষ। তাই ডঙ্কাও অশ্ব পোষেন নাই। তাই থানথিরার বংশধরেরা কেহ অশ্বপালন করে না। অশ্বের সম্বন্ধে তাহাদের একটা ঘৃণা-মিশ্রিত ভয় ছিল। দোহার মা বিষ-কুণ্ডাকে একজন অশ্বারোহী ডাকাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইহাতে অশ্ব সম্বন্ধে আমাদের আতঙ্ক

আরও বাড়িয়াছিল। বিষ-কুণ্ডা যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল সে ঘোড়ার মাংস খাইয়াছে, যাহারা অশ্বপালন করে তাহাদের চলন্ত তাঁবুতে তাহাদের সহিত বাস করিয়াছে, তখন সে নিজেই নিজেকে অস্পৃশ্যা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল, তাই সে আমাদের সঙ্গে মেশে নাই। ওই বৃক্ষতলেই সে নিরামিষ খাইয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছে। হয়তো সেই জন্যই দোহা মাছ-মাংস খায় না।

দোহার বয়স যখন দশ বৎসর তখন বিষ-কুণ্ডা মারা যায়। তখনই দোহার চেহারা বলিষ্ঠ যুবকের মত। একাই সে মায়ের মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া কবর দিয়া আসিয়াছিল। আর কাহাকেও যাইতে দেয় নাই। বলিয়াছিল—আমার মা চিরকাল তোমাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া একা বাস করিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর পর আমি একাই যেন তাঁহার শবদেহ বহন করিয়া তুঙ্গালি পর্বতে তাঁহাকে কোন গুহার ভিতর সমাহিত করি। সে গুহা আমি নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছি। মায়ের নির্দেশ মত আমি সেখানে একাই গিয়া তাঁহার সমাধি রচনা করিব। তোমরা কেহ আমার সঙ্গে আসিও না। আসিলে মায়ের আত্মা হয়তো শান্তি পাইবে না।

তখন আমাদের দলপতি ছিলেন আমার বাবা। তাঁহার নাম ছিল মহোরি। আমাদের ভাষায় মহোরী মানে সিংহ। তিনি দোহাকে খুব ভালবাসিতেন। তাই দোহার অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। দোহা একাই গিয়া তাহার মাকে তুঙ্গালি পর্বতের কোন গুহায় কবরস্থ করিয়া আসিয়াছিল। দোহাকে বাবা খুব ভালবাসিতেন। দোহার মা বিষ-কুণ্ডা ছিল বাবার ভগ্নী। একমাত্র ভগ্নী। দোহার সামর্থ্য ও চরিত্র দেখিয়া বাবা এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঠিক করিয়াছিলেন দোহাকে আমাদের দলপতি করিয়া যাইবেন। কিন্তু দোহার জন্মের সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা ছিল বলিয়া বৃদ্ধা ঝাঝা তাঁহাকে এ কাজ করিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল, তোমার পুত্রদের মধ্যেই কাহাকেও দলপতি নির্বাচন কর। মহোরীর বহু পুত্র-কন্যা। আমার চল্লিশ জন ভাই ছিল। মহোরির যখন বার্ধক্য উপস্থিত হইল, একদিন যখন তিনি উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন, সেইদিনই স্থির করিলেন নূতন দলপতি এইবার নির্বাচন করিতে হইবে, আমি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। পরদিনই তিনি সমবয়স্ক কুড়িজন পুত্রদের মধ্যে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ঘোষণা করিলেন যে সকলকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইবে তাহাকেই তিনি দলপতি নির্বাচন করিবেন। দোহা অবশ্য এ প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল না। মহোরি তাহাকে বিরানি বনের একাধিপত্য দিয়া বলিলেন, তুমি বিরানি বনকে রক্ষা কর। তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেহ পারিবে না। তুমি ওই বনে সর্বেসর্বা হইয়া থাক। আমাদের জমি, ফসল ও সমাজের শাসনভার রহিল দলপতির উপর। প্রতিযোগিতার দ্বারাই সে দলপতি নির্বাচিত হইবে।

আমিই মল্লযুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া দলপতি নির্বাচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু দলপতি হইয়াও আমি সর্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকিতাম। সর্বদাই মনে হইত আমার জীবন নিরাপদ নয়। বিশেষ করিয়া ভয় করিতাম আমার সৎভাই ভিংড়াকে। ভিংড়ার মা ছিলেন ক্রীতদাসী। কোন এক দূরের হাট হইতে বাবা তাঁহাকে অনেক শস্যের বিনিময়ে কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত একটা বন্য সৌন্দর্য ছিল। স্বভাবও ছিল

বন্য। সাপের মাংস প্রিয় খাদ্য ছিল তাঁহার। সাপের মুন্ডটা কাটিয়া ফেলিয়া তাহার চামড়া ছাড়াইয়া ফেলিতেন। তাহার পর সেটাকে পোড়াইয়া খাইতেন। তাহার ভাষাও আমরা বুঝিতাম না। বাবা কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মেয়েটি অনেক রকম তুকতাক তন্ত্রমন্ত্র জানিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ভিংড়াকেও তিনি এসব শিখাইয়াছিলেন। ভিংড়া আমাদের সহিত মিশিতও না। তাহাকে মল্লযুদ্ধে হারাইয়া দিয়া আমি দলপতি হইয়াছিলাম ইহাতে সে খুশী হয় নাই। আমার কেমন যেন ভয় করিত। যদিও আমাকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সশস্ত্র দাস আমার চারিদিকে পাহারা দিত তবু আমার ভয় ঘুচিত না। পায়ে সামান্য একটা কাঁটা ফুটিলেও মনে হইত ভিংড়া হয়তো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া পথের কাঁটাকে আমার পায়ের পাতায় দংশন করিতে প্ররোচিত করিয়াছে। সেই কাঁটার কানে কানে হয়তো কোনও সাংঘাতিক মন্ত্রও বলিয়া দিয়াছে। ভিংড়া আমার সহিত গায়ের জোরে পারিবে না, কিন্তু মায়ের পথ অনুসরণ করিয়া যে শক্তিতে সে শক্তিমান হইতে চাহিয়াছিল তাহা ভয়ংকর। সে শক্তির নিকট আমার শক্তি তুচ্ছ। সকলে বলিত সে দৈবীশক্তিতে বলীয়ান। সে-ও প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইত ঝঞ্ঝা, বজ্র, সূর্য, চন্দ্র তাহার আজ্ঞা পালন করে, বর্ষার মেঘমালা তাহার নির্দেশেই সঞ্চরণ করে। আমাদের ফসলের প্রাণ-শক্তিও নাকি তাহার নিয়ন্ত্রণে বাড়ে কমে। সমস্ত প্রকৃতিই নাকি তাহার আদেশ মান্য করিয়া চলে।

ভিংড়া যে জীবন যাপন করে তাহাও আমাদের মতো স্বাভাবিক গৃহস্থ জীবন নয়। আমরা আদিম অসভ্য যুগ পার হইয়া আসিয়াছি, আমরা কৃষিসভ্যতার পত্তন করিয়াছি, শুধু প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্র নহে, ধাতুর অস্ত্র-শস্ত্রও আমরা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি, পদব্রজে এবং নৌকা করিয়া আমরা আমাদের এলাকার বাহিরে যাতায়াত করি, শস্যসম্ভার লইয়া আমাদের কর্মীরা বিদেশের হাটে যায়, শস্যের বদলে লোহা, তামা, কাঠ ও আরও নানারকম পণ্য কিনিয়া আনে। আমরা এখন গুহায় থাকি না। মাটির ঘরে বাস করি, নলখাগড়া এবং লম্বা লম্বা ঘাস দিয়া আমাদের ঘরের চাল যে ভাবে প্রস্তুত হয় তাহাতে শিল্প-নৈপুণ্য আছে। আমরা তাঁত বসাইয়াছি। আমাদের মেয়েরা চরকায় সুতা কাটে। আমাদের চম্পা নামে মেয়েটি চিরকুমারী, কোনও পুরুষের সংস্রবে আসে না। সে চমৎকার ছিট বানাইতে পারে। সে শিল্পী। নানা রঙের সুতা দিয়া কাপড়ের উপর ফুল-লতা-পাতার সুন্দর নক্সা আঁকে। তাহার জন্য বিদেশী হাট হইতে বিশেষ ধরনের ছুঁচ দোহা আনাইয়া দেয়। শুধু ফুল-লতা-পাতা নয়, পাখীর ডানার বর্ণ-বৈচিত্র্য, এমন কি সাপের গায়ের বর্ণ-লীলাও আকর্ষণ করে তাহাকে। দোহা তাহার জন্য চিমটা দিয়া সাপ ধরিয়া আনে মাঝে মাঝে, এবং সাপটাকে দুইটা কাঠির কৌশলে এমনভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে যে সাপটা আর নড়িতে পারে না। চম্পা সাপের গায়ে বার বার হাত বুলাইয়া সেই হাত নিজের চোখের উপর বুলায়। এই আশ্চর্য উপায়ে সে সাপের গায়ের রঙ নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লয়। তাহার পর কাপড়ের উপর সেটা তুলিবার চেষ্টা করে। সাপটাকে সে মারে না। কয়েকবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

আমাদের এই পরিবেশে ভিংড়া বড় বেমানান। সে আমাদের পল্লীতে মাটির ঘরে

থাকে না। থাকে পাহাড়ের পাথর ঘেরা একটা গুহায়। তাহার বেশবাসও অদ্ভুত। মাথার চুল, মুখের দাড়িতে সে নানারকম জন্তুর হাড়, নখ, নানাজাতের পাখীর পালক, ঠোঁট ঝুলাইয়া রাখে। একটা শকুনির ঠোঁট তাহার মাথার জটার মাঝখানে উদ্যত উদগ্র হইয়া আছে। সকলের মনে একটা রহস্যময় বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া সে নিজেকে অসাধারণ করিয়া তুলিতে চায়। পর্বত গুহায় বসিয়া সে যাহা করে তাহাও ভীতিকর। প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড করিয়া সে সেখানে নানারকম জিনিস পোড়ায়। নানা রঙের নানা আকারের পাথর, বুনো লতা পাতা, নানারকম জন্তু-জানোয়ার, দুই একটা লোহা বা তামার টুকরা, আরও কতরকম জিনিস সে ওই অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেয়। অগ্নিকুণ্ডের আগুন সে কখনও নিবিতে দেয় না। নিজেও যে সব জন্তু-জানোয়ার বা গাছপালা খায় ওই আগুনেই ঝলসাইয়া লয়। তাহার খাওয়া-দাওয়াও আমাদের মতো নহে। আমরা সাধারণত রুটি, যবচূর্ণ, বার্লির মণ্ড, নানারকম ফল খাই। ভেড়া গরু ছাগও আমাদের খাদ্য। বন্যবরাহ বা ভালুকের মাংস পাইলে, কিংবা বনাহরিণ শিকার করিতে পারিলে আমাদের মধ্যে একটা উৎসব পড়িয়া যায়। মাংস আমাদের প্রতিদিন জোটে না। মাছও খাই আমরা। মাছও রোজ পাওয়া শক্ত। ছিপ বা জালের তখনও চলন হয় নাই। মেয়েরা কাপড় দিয়া মাছ ধরে মাঝে মাঝে। কেহ কেহ বড় বড় মাছ সাঁতার দিয়াও ধরে। মাছ-পোড়া আমাদের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু ভিংড়া এসব খায় না। সে খায় বাদুড় চামচিকা কাছিম ঝিনুক ইঁদুর—এই সব। শুনিয়াছি মাঝে মাঝে শকুনি না বাজের মাংসও খায়। তাহার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। জন্তু-জানোয়ার ঝলসাইবার সময় যে চর্বি নির্গত হয় সেগুলি সে ফেলে না, একটি পাত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। কাঠ খড় এবং সুতা দিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট মশালও সে তৈয়ারী করিয়াছে। মশালের সহিত সে বিশেষ বিশেষ লতা এবং পাতাও বাঁধিয়া দেয়। কোনও কোনও মশালে পাখীর পালক এবং নাড়িভুঁড়িও বাঁধা থাকে। এই মশালগুলি জ্বালাইয়া সে মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে এবং আকাশের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া কি সব বলে। কি বলে বোঝা যায় না কিন্তু চীৎকারটা আদেশের মতো শোনায়, মনে হয় অন্তরীক্ষবাসী কাহাকেও সে যেন ধমক দিয়া হুকুম জারি করিতেছে।

সকলে ভয় করে ভিংড়াকে। সকলে মনে করে ভিংড়া রুষ্ট হইলে যে কোনও লোকের অনিষ্ট করিতে পারে। আকাশের দেবতা-অপদেবতার সঙ্গে তাহার নাকি যোগাযোগ আছে। একদিন গোন্দা নাম্নী মেয়েটি মাঠে ফসল কাটিতে কাটিতে হটাৎ অজ্ঞান হইয়া হাত-পা ছুড়িতে লাগিল। তাহার কাপড় খুলিয়া গেল। সে দুইটা প্রস্তরখণ্ড লইয়া নিজের স্তন দুইটিকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তাহার পর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। মুখ দিয়া ফেনা উঠিতে লাগিল। ফেনার সহিত রক্তও পড়িল অনেক, পড়িয়া গিয়া ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছিল। একটু পরে মারা গেল সে। সকলেই মনে করিল ভিংড়ার ক্রোধই এই মৃত্যুর কারণ। এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা গোন্দাকে ভিংড়া তাহার পর্বত-গুহায় যাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু সে যায় নাই। না যাইবার কারণ ভয়। ভিংড়া নাকি নারীদের নির্যাতন করিয়া আনন্দ পায়। উলঙ্গ করিয়া তাহাদের চাবুক মারে, তাহার পর তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে

নৃত্য করিতে বাধ্য করে। যখন তাহারা নাচে তখনও সে নির্মমভাবে চাবুক চালায়। সে বলে উলঙ্গিনী যুবতি নারীদের আর্ত হাহাকারে তাহার দেবতা নাকি তুষ্ট হয়। তাহাদের আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ভিংড়াও আকাশের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতে থাকে। ভিংড়ার এই অমানুষিক আচরণের জন্য সকলে তাহাকে ভয় করে। আমিও করি।

আমার মনে হয় আমাকে এবং দোহাকে সে তাহার দৈবীশক্তির সাহায্যে মারিয়া ফেলিতে চায়। তাহার পর আমাদের সমস্ত দলটার উপর আধিপত্য করিতে চায় সে। এই জন্যই দৈববলে সে নিজেকে বলীয়ান করিতেছে। তাহার শক্তি যে মিথ্যা প্রতারণা একথা বিশ্বাস করিবার সাহস আমাদের নাই। এ বিষয়ে একটা অন্ধ ভয় আমাদের সর্বদা ভীত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি আমরা তখন একটা রূপকথালোকে বাস করিতাম। রূপকথায় যেমন যে-কোনও অপ্রত্যাশিত আশ্চর্যজনক ঘটনা যে-কোনও সময়ে ঘটিতে পারে আমরাও তেমনি যে-কোনও অত্যাশ্চর্য ঘটনার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইয়া থাকি। কোনও কিছুকেই আমরা অসম্ভব মনে করি না। আমাদের স্বপ্নের সহিত ভয়, আশার সহিত আশংকা, জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া, সম্পদের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা সর্বদা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করে। তাই আমারা কোনও কিছুকেই উপেক্ষা করিতে পারি না। পাথরের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করি, কর্কশ কণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে কর্করা পক্ষীর দল যখন অর্ধবৃত্তাকারে আকাশে উড়িয়া যায় তখন তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হই, আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনে অথবা আত্মরক্ষার জন্য যখন পশুকে হত্যা করিতে বাধ্য হই তখন সেই মৃত পশুর কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সেদিন দোহা যে ভালুকটি মারিয়া আনিয়াছিল তাহার কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। সেটা আগে শেষ করি। সেদিন আমরা মহাসমারোহে ভালুকটিকে নব-নির্মিত কুটিরটিতে লইয়া গেলাম। সংযমী রম্ভা, জিকটু, কিংকা ও রুলকি ভালুকটিকে বহন করিয়া লইয়া গেল। আমরা তাহাদের পিছু পিছু নৃত্যগীত করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। গানের মর্ম—ওগো ভালুক, তুমি আর আমাদের পর নও, তুমি আমাদের আত্মীয়, তুমি আর বনের নও তুমি ঘরের। ঘরের ভিতরে গিয়া ভালুকের ছাল ছাড়াইয়া তাহার মাংস রম্ভা ও জিকটু কাটিয়া কাটিয়া বাহির করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসটি কিংকা ও রুলকি গাছের তলায় পুঁতিয়া দিল। তাহার মুণ্ডটা কিন্তু অক্ষত রহিল। তাহার পর খড়ের একটা ভালুক বানাইয়া তাহার উপর মুণ্ডটি স্থাপন করিয়া কিংকা ও রুলকির সাহায্যে দোহা সেটিকে মাঠের মধ্যে আনিয়া কয়েকটা বাঁশের উপর টানাইয়া দিল। মুণ্ডের উপর সিঁদুর দেওয়া হইল, তাহার গলায় ফুলের মালা দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া আবার আমাদের নৃত্যগীত শুরু হইল। গানের সেই একই মর্ম—ওগো ভালুক, ওগো ভালুক, তুমি আর আমাদের পর নও। তাহার পর কিংকা, রুলকি, রম্ভা, জিকটু অগ্নিকুণ্ড বানাইয়া ভালুকের টুকরা-করা মাংসগুলি শেঁকিতে লাগিল। মাংস শেঁকা হইয়া গেলে সেগুলি কলাপাতার উপর সাজাইয়া ভালুকের সম্মুখে রাখিয়া আমরা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—ভালুক তুমি আমাদের অনুমতি দাও আমরা তোমার মাংস ভক্ষণ করি। মৃত ভালুক অনুমতি দিতে পারে না, অনুমতি কিন্তু

আসে। হয়তো গাছে কাকেরা একসঙ্গে কা কা করিয়া উঠিল, হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘের গর্জন শোনা গেল, কিংবা হয়তো অকস্মাৎ শোঁ শোঁ করিয়া হাওয়া উঠিল—আমরা বুঝিলাম ভালুকের আত্মা আমাদের অনুমতি দিয়াছে। সেদিন কিন্তু কিছুই হইল না। চারিদিক নীরব নিথর। গান গাহিয়া গাহিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, ক্ষুধার উদ্রেক হইল, মাংসের লোভনীয় গন্ধ আমাদের আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল, কিন্তু তবু কোথাও এমন কোনো নির্দেশ মিলিল না যাহাকে আমরা অনুমতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

একটু পরে দেখা গেল ভিংড়া আসিতেছে। ভিংড়া সাধারণত আমাদের মধ্যে আসে না, দূরে দূরে থাকে। তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনকে আমরা অনুমতি হিসাবে গণ্য করিব কি? সকলে আমরা দোহার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম দোহা চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। দোহা হাত না তুলিলে আমরা মাংস স্পর্শ করিতে পারিব না। কণ্টকা লোলুপ দৃষ্টিতে মাংসখণ্ডগুলির দিকে চাহিয়াছিল। সে হঠাৎ চোখ তুলিয়া ভিংড়াকে দেখিতে পাইল এবং দোহাকে বলিল—আমাদের জাদুকরই হয়তো আজ অনুমতি-রূপে আমাদের আছে আসিয়াছে। ভিংড়া নিকটে আসিয়া দোহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—তুমি একটি বড় ভালুক মারিয়াছ শুনিলাম। ভালুকটি আমার বন্ধু ছিল। আমি প্রায়ই তাহাকে খাম-আলু, শাঁক-আলু খাওয়াইতাম। কন্দ উহার প্রিয় খাদ্য ছিল। উহার জন্য কিছু কন্দ আনিয়াছি। সেগুলি উহার সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে বল—তোমার জন্য কন্দ আনিয়াছি, খাও। তাহার পিছনে পিছনে এক সহচরী কন্দের বোঝাটা বহিয়া আনিতেছিল। বোঝা খুলিয়া দোহা ভালুকের সম্মুখে সেগুলি সাজাইয়া দিল। আমরা সকলে মনে মনে ভালুককে অনুরোধ করিতে লাগিলাম, তোমার কন্দ আসিয়াছে, তুমি খাও। প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম কন্দ দেখিয়া ভালুকের আত্মা প্রসন্ন হইবে, আমাদের অনুমতিও শীঘ্র আসিয়া পড়িবে। কিন্তু কোনও নির্দেশ আসিল না।

কণ্টকা ভিংড়ার দিকে চাহিয়া বলিল—কই অনুমতি তো আসিতেছে না। তোমার বন্ধুকে অনুমতি দিতে অনুরোধ কর। আমরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিব?

ভিংড়া কণ্টকার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। কণ্টকার চোখে-মুখে একটা আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল। সে সরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল এবং মাটিতে দুই হাত রাখিয়া মনে মনে ধরিত্রী মাতার আশ্রয়-ভিক্ষা করিতে লাগিল। বিপদে পড়িলে আমাদের সমাজে সকলেই ইহা করে।

ভিংড়া বলিল, অনুমতি এখনই আসিবে। কিন্তু সে অনুমতি দিবে ভালুকের কোন শত্রু। মেঘ, জল, আকাশ, অরণ্য ভালুকের বন্ধু। ইহারা অনুমতি দিবে না। দেখিতেছ না চারিদিক কেমন থমথম করিতেছে। আমিও কাহাকেও অনুমতি দিতে অনুরোধ করিব না।

এই সময়ে হঠাৎ একটা বড় বাদামী রঙের পাখী আসিয়া আমাদের সেই মহাবৃক্ষের ডালে বসিল। দেখিলাম তাহার নখরে একটা সবুজ সাপ কিলবিল করিতেছে। টুকচুন্বার ডালে বসিয়া সে সেই সাপটাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া খাইতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইবামাত্র তীক্ষ্ণস্বরে সে চীৎকার করিয়া উঠিল—কেক্, কেক্, কেক্ কাঁইঁই।

দোহা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিল। ভিংড়াও সঙ্গে সঙ্গে পাখীটাকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল একটা। তাহার সঙ্গে ধনুর্বাণ ছিল। কিন্তু তাহার বাণ পাখীর গায়ে লাগিল না। পাখীটা লাফাইয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল যেন—কেক্ কেক্ কেক্ কেক্ কীঁঈঈ। ভিংড়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাহার দিকে। তাহার পর বলিল, লক্ষণ শুভ নয়। আমাদের বিপদ আসন্ন। ও পাখী এদেশের নয়, আমাদের রাজারা যেখানে থাকে সেই দেশের। বাজপাখী। সাপ ধরিয়া খায়। এ অঞ্চলে কদাচিৎ আসে, যখন আসে তখন অমঙ্গল হয়। উহাকে মারিয়া উহার দেহটাকে যদি আমার অগ্নিকুণ্ডে ঝলসাইয়া লইতে পারিতাম, উহার চর্বি দিয়া যদি আকাশের দিকে মশাল জ্বালিয়া দিতে পারিতাম, উহার ঠোঁটি ও নখর যদি আমার অঙ্গে ধারণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অমঙ্গলটা আমাদের এলাকায় আসিতে পারিত না। কিন্তু আমার বাণ লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। তাই মনে হইতেছে অমঙ্গলটা আসিবেই। এই কথাগুলি বলিয়া ভিংড়া আর একবার কণ্টকার দিকে চাহিল। কণ্টকা মাটিতে দুই হাত রাখিয়া এবং মাটির দিকেই দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া আমার পাশেই বসিয়াছিল। ভিংড়া আর কিছু বলিল না। চলিয়া গেল।

আমাদের সে সমাজে যদিও সতীত্ব বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু বলাৎকার মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পুংশ্চলী কামুকী রমণীদেরও আমরা প্রশ্রয় দিতাম না। এরূপ ঘটনা ঘটিলে আমাদের সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সমবেত হইয়া দোষীদের বিচার করিতেন। ধর্ষণকারীদের তাঁহারা দূর করিয়া দিতেন সমাজ হইতে। আমাদের প্রহরীরা তাহাদের কলকলা নদী পার করিয়া আমাদের এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিত। সে লুকাইয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হইত। তাহাকে আমাদের কবরস্থানে লইয়া গিয়া জীবন্ত কবর দেওয়া হইত। তবে এরূপ ঘটনা বেশী ঘটিত না। আমি একবার মাত্র দেখিয়াছি। যে রমণী তিনবারের বেশী ধর্ষিতা হইয়াছে তাহাকেও সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইত। তাই তিনবারের বেশী ধর্ষিতা হইলে কোনও রমণী সে কথা সমাজপতিদের কানে তুলিতেন না। স্বেচ্ছায় কেহ যদি একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসিত তাহা তেমন দোষণীয় বলিয়া গণ্য হইত না। কেবল সে এবং তাহার সন্তানসন্ততি স্বামীর ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত—এই নিয়ম ছিল। সেকালে সমাজের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঘর এবং তাহার চারিপাশের চাষের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। সে জমিতে সে নিজেই চাষ করিত, সে ঘরটি সে নিজেই মেরামত করিত, নিজের রুচি অনুসারে সাজাইত, গুছাইত। আমরা প্রত্যেকেই অনেকখানি জমির মালিক ছিলাম। সে জমিতে অনেক কুটির প্রস্তুত করিতাম কারণ অনেকেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। স্ত্রীরা ভালও হইত, মন্দও হইত। তোমাদের সমাজে এখন যেমন সতী অসতী দুইই আছে, আমাদের সমাজে তেমনি ছিল।

সেদিন ভিংড়ার কথা শুনিয়া আমি একটু ভয় পাইয়া গেলাম। তাহার ভবিষ্য-বাণী মাঝে মাঝে সত্যই ফলিয়া যায়। একবার মনে আছে নীল নির্মল আকাশের দিকে চাহিয়া সে বলিয়াছিল, তোমরা যে সব ফসল রোদে শুকাইতে দিয়াছ তাহা তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেল, একটু পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামিবে। আকাশে বৃষ্টির কোনও

লক্ষণ ছিল না। কিন্তু সত্যই কিছুক্ষণ পরে আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দেখা দিল, চতুর্দিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এত বৃষ্টি হইল যে আমাদের অনেকের ঘর ভাঙিয়া পড়িল। জমানি নদীতে জল বাড়িয়া গেল। ভিংড়ার এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। বিরানি জঙ্গলের উপর কয়েকটি শকুনিকে চক্রাকারে উপর্যুপরি কয়েকদিন উড়িতে দেখিয়া ভিংড়া একবার বলিয়াছিল এবার গো-মড়ক হইবে। সত্যই সেবার অনেক গরু মারা গিয়াছিল। আমাদের অবশ্য ক্ষতি তেমন হয় নাই। আমাদের দাস-দাসীরা গরুর চামড়া ছাড়াইয়া নৌকা করিয়া সেগুলি বিদেশের হাটে বেচিয়া আসিয়াছিল। গরুর হাড় দিয়াও অনেক রকম অস্ত্র-শস্ত্র বানাইয়াছিলাম আমরা। কিছু হাড় বিদেশে পাঠাইয়া তাহার পরিবর্তে গরুও কিনিয়াছিলাম। ভিংড়ার ভবিষ্যদ্বাণীকে তাই আমরা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। একবার আমাদের দেশে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সমস্ত ফসল যখন বৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি একদিন ভিংড়াকে গিয়া বলিলাম, তুমি তো শক্তিধর পুরুষ। মেঘ, বজ্র, সূর্য, আকাশ সবাই তোমার আদেশ মান্য করিয়া চলে একথা তুমি অনেকবার বলিয়াছ। অনাবৃষ্টিতে আমাদের ফসল শুকাইয়া যাইতেছে। নদীতে বান আসে নাই। তুমি ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পার? ভিংড়া বলিল, পারি। কিন্তু ইহার জন্য অন্তত চৌদ্দজন কুমারী মেয়ে দরকার। তাহারা প্রত্যেকেই সুকেশিনী হইবে। তাহাদের মধ্যে চারজন সাজিবে জল-মুরগী, তিনজন বুড়ি-পাখী, তিনজন বাবাজী এবং চারজন জল-পিপি। ইহাদের সকলকে চুল এলো করিয়া জমানি নদীতে ডুবিয়া স্নান করিতে হইবে। তাহার পর নদীতীরে বসিয়া ওই জলচর পাখীদের ডাকের নকল করিয়া ডাকিতে হইবে। ডাকটা যেন প্রার্থনার মতো হয়। জলমুরগী, বুড়িপাখি, বাবাজী, জলপিপি সকলেই জলচর পাখী। জলের অভাবে তাহারা যেন বিধাতার কাছে আর্তকণ্ঠে অভিযোগ করিতেছে, জল দাও জল দাও, আমরা মারা গেলাম। পাখিদের প্রার্থনা দেবতা পূর্ণ করেন। উহাদের আলুলায়িত কুন্তল হইবে মেঘের প্রতীক। ভিজা চুলগুলি রোদে শুকাইয়া গেলে তাহারা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে নদীর জলে লাফাইয়া পড়িয়া আবার চুলগুলি ভিজাইয়া লইবে এবং মুখে জল পুরিয়া ফোয়ারার আকারে তাহা আকাশের দিকে ফুৎকার দিয়া ছুঁড়িয়া দিবে। কিছু জোঁক শামুক কচ্ছপ এবং মাছও প্রতিদিন চাই। তাহাদের জীবন্ত অবস্থায় আগুনে শেঁকিতে হইবে। ওই সব জলচর প্রাণীদের নির্বাক যন্ত্রণা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সহিত আকাশে উঠিয়া মেঘদের মনে করুণা-সঞ্চার করিবে।

আমরা সব ব্যবস্থাই করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সমাজের কুমারী মেয়েরা জলচর পাখীর ভূমিকায় অভিনয় করিতে রাজী হইল না। ক্রীতদাসীরা সে অভিনয় করিয়াছিল। তাহারা কিন্তু সকলে কুমারী ছিল না। জোঁক শামুক এবং কচ্ছপ অনেক পোড়ানো হইয়াছিল, মাছ বেশী পাওয়া যায় নাই। ভিংড়া বলিল ব্যবস্থায় খুঁত আছে, বৃষ্টি হইবে না। হইলও না। আকাশে কালো মেঘ না আসিয়া একটা রক্তবর্ণ মেঘ রণরণ করিয়া বেড়াইল। কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টি হইল না। ভিংড়া বলিল, আমাদের সমাজের মেয়েরা ইহাতে যোগ দেয় নাই বলিয়াই এরূপ হইল। ক্রীতদাসীরা নানা দেশ হইতে আসিয়াছে, বৃষ্টি হইয়া থাকিলে তাহাদের দেশেই হইয়াছে।

ভিংড়া পর্বতশৃঙ্গে চড়িয়া রক্তবর্ণ মেঘের উদ্দেশে চীৎকার করিয়া নানারূপ দুর্বোধ্য অভিশাপ উচ্চারণ করিল, সারি সারি মশাল জ্বালিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল। মেঘটা সরিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার বদলে কালো মেঘ আসিল না। একফোঁটা বৃষ্টি হইল না।

দোহা সেই সময়ে একটা নূতন ধরনের কাজ করিয়াছিল। সে বলিল আমাদের জমানি নদী, একটি শাখানদী। যে বৃহত্তর কলকলা নদী উত্তরবাহিনী হইয়া অবশেষে সাগরে গিয়া মিশিয়াছে, জমানি নদী তাহারই শাখা। কলকলা নদীও নাকি আর একটি প্রকাণ্ড বড় নদীর শাখা। সে নদীর নাম গাং-গাং। তাহার পার দেখা যায় না। তাহার দুই কূল বার বার ভাঙিয়া যায় বলিয়া তাহার তীরে কেহ বাস করিতে পারে না। এই গাং-গাং নাকি মরুভূমি বেষ্টন করিয়া অবশেষে সাগরে গিয়া মিশিয়াছে। গাং-গাং নদীর কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু সে নদী কখনও দেখি নাই। দোহা বলিল, আমরা সকলে মিলিয়া যদি চেষ্টা করি, একটা খাল কাটিয়া আমরা কলকলা নদীর কিছু জলকে আমাদের অঞ্চলে আনিতে পারি। আনিতে পারিলে আমাদের জলকষ্ট দূর হইবে। দোহা নিজেই সর্বপ্রথমে একটা কোদাল লইয়া অগ্রসর হইল। দেখা গেল চম্বাও তাহার অনুবর্তিনী হইয়াছে। তাহার কাঁধেও একটা কোদাল। চম্বা দোহাকে ভালবাসিত। মনে মনে তাহাকে পূজা করিত। দোহাও হয়তো ভালবাসিত তাহাকে। কিন্তু এ ভালবাসার কোনও বহিঃ-প্রকাশ ছিল না। আরও অনেকে গেল তাহাদের সঙ্গে। ক্ষেতখামারে যে সব ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা ছিল, তাহারা গেল। আর গেল দোহার বিরানি জঙ্গলে যাহারা কাজ করিত তাহারা। তাহারাও অনেকেই ক্রীতদাস। দোহা বিরানি জঙ্গলে স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিত না। ক্রীতদাস-দাসীদের কথা আগেও দুই-একবার উল্লেখ করিয়াছি। তখন শস্যের বিনিময়ে অনেক দাস-দাসী আমরা কিনিতাম। তখন বিভিন্ন অঞ্চলের হাটে বা মেলায় গরু-বাছুরের মতো ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীও ক্রীত বিক্রীত হইত। এইভাবে বহু বিভিন্ন দেশের স্ত্রী-পুরুষ আমাদের সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। অনেক সময় তাহাদের ভাষা আমরা বুঝিতাম না। ইঙ্গিতের ভাষা দিয়া তাহাদের সহিত প্রথম প্রথম আলাপ চলিত। ক্রমশ আমাদের ভাষা তাহারা শিখিয়া ফেলিত। তাহাদের চেহারাও নানা-রকম ছিল। কেহ পীতবর্ণ, কেহ রক্তবর্ণ, কেহ বা গৌরবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণও ছিল অনেকে। আমরা নিজেরাই ছিলাম কৃষ্ণকায়। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের মধ্যে রূপসী এবং রূপবানও থাকিত অনেকে। তাহাদের কিনিয়া আনিতাম বটে কিন্তু কিছুকাল পরে সকলের সহিতই অন্তরের যোগ স্থাপিত হইত। কিছু কিছু অবশ্য পলাইয়া যাইত। কিন্তু অধিকাংশই পলাইত না। কালক্রমে আমাদের সুখ-দুঃখের সহিতই তাহারা নিজেদের জড়াইয়া ফেলিত। সুন্দরী ক্রীতদাসীদের আমরা মাঝে মাঝে বিবাহও করিয়াছি। আমার কনিষ্ঠা পত্নী সুলমা কোন দেশের মেয়ে তাহা ঠিক জানি না। সে তম্বী, তাহার চোখের তারা মিশকালো, গোছা-গোছা বাদামী রঙের কোঁকড়ানো চুলে তাহার মাথা ভর্তি। মুখখানি লম্বা গোছের। দাঁতগুলি দুগ্ধধবল এবং ছোট ছোট। গাল দুটি লাল, ঠোঁটও লাল। কিন্তু যাহা সর্বাপেক্ষা আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা তাহার বুদ্ধি-দীপ্ত চোখের দৃষ্টি। সুলমা স্বল্পভাষিণী। আমাদের কথা হয়তো

ভালো বোঝেও না। কিন্তু মনে হয় চোখের দৃষ্টি দিয়া সে সব বুঝিয়া লইতেছে। আমাদের ভাষা তাহাকে কিছু কিছু শিখাইয়াছি। তাহাকে একথাও বলিয়াছি সে যদি নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতে চায় আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। সে যদি স্বেচ্ছায় আমার কাছে না থাকে তাহাকে বন্দিনী করিয়া রাখিতে চাই না। সে কিন্তু যাইতে রাজী নয়। তাহার বাবা তাহাকে নাকি হাটে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। বাবার কাছে সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। মাঝে মাঝে সে আমার ছোরা লইয়া তাহার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করে এবং আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসে। তাহার এই রহস্যময় আচরণে আমি মনে মনে একটু ভয় পাইয়া যাই। কণ্টকা সে ভয়টা আরও বাড়াইয়া দেয়। সে বলে সুলমা একদিন আমাকে হত্যা করিয়া সরিয়া পড়িবে। সুলমাকে খোলাখুলি আমি একদিন এ-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল (কিছুটা আমাদের ভাষায় এবং কিছুটা আকার-ইঙ্গিতের সহায়তায়) সে এদেশের কাহাকেও কখনো হত্যা করিবে না। যদি সে নিজের দেশে সসম্মানে ফিরিবার কোনও সুযোগ পায়, সে হত্যা করিবে তাহার বাবাকে এবং তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামীকে যাহারা শস্যের হাটে নিলামে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল। বলিতে বলিতে তাহার চোখের দৃষ্টিও ছুরিকার মতো চক চক করিয়া উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে আমি আর তাহার সহিত আলাপ করি নাই। কণ্টকা আমাকে প্রায়ই সাবধান করিত, আমি যেন উহার সহিত বেশী না মিশি। কিন্তু তাহার এ সাবধান-বাণী সত্ত্বেও আমি মিশিতাম, আত্মসংবরণ করিতে পারিতাম না। তাহার রূপই যে শুধু আমাকে আকর্ষণ করিত তাহা নয়, যৌন-আকর্ষণই যে সুলমার একমাত্র আকর্ষণ ছিল এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাহার মধ্যে যে রহস্যময়ী ছিল তাহাকে আমি উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। মনে হইত সে যেন আমাকে ভালও বাসে এবং সে ভালবাসা ঠিক যৌন-ভালবাসা নয়। সে যুগে যৌন-লালসা তৃপ্ত করিবার উপকরণ আমাদের সমাজে প্রচুর ছিল। তাহার জন্য কাঙালের মতো কাহারও পিছনে পিছনে ঘুরিবার প্রয়োজন হইত না। যদি কাহারও মধ্যে এমন কোনও গুণ দেখিতাম যাহা পশুত্ব ছাড়া আরও কিছু, তাহাই আমাকে আকৃষ্ট করিত। যাহা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বিশ্লেষণ করা যায় না, যাহা আকুল করে কিন্তু কেন আকুল করে বোঝা যায় না—তাহাই সুলমার মধ্যে ছিল। তাহার জন্যই তাহাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। আমার শতাধিক পত্নী। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কণ্টকা এবং সুলমাই আমার হৃদয়-হরণ করিয়াছে। বাকি সকলের আমি খবরও রাখি না। তাহারা আমার অনুগত দাসীমাত্র। কাহারও পুত্র-কন্যা হইয়াছে কাহারও হয় নাই। সকলেই আমার জমিতে কাজ করে। কণ্টাকাকেও আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। সে উগ্র, কিন্তু তাহার উগ্রতাতেও একপ্রকার মাদকতা আছে। সে যেন সর্পিনী, কিংবা ব্যাঘ্রিনী, কিন্তু ভয়ঙ্করী নহে, মোহিনী। তাহার প্রেমের তীব্রতা এবং প্রচণ্ডতা আমাকে যেমন অভিভূত করে তেমনি করে সুলমার সংবৃত, শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত রহস্যময় আমন্ত্রণ। কণ্টকা একদিন ব্যাঘ্রিনীর মতো সুলমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কণ্টকা শক্তিশালিনী গাঢ়-যৌবনা, বন্যপ্রাথর্যে প্রখরা সে। আশঙ্কা হইয়াছিল সে হয়তো সুলমাকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য হইয়া গেলাম, তন্বী সুলমার শক্তিও কম নয়। দেখিলাম একটু পরেই সুলমা কণ্টকাকে চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছে।

আমিই উঠিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া আসি। সেইদিনই উভয়ে ওই মহাবৃক্ষকে সাক্ষী করিয়া আমার নিকট শপথ করে যে ভবিষ্যতে কেহ কাহারও অঙ্গস্পর্শ করিবে না।

কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। দোহা কলকলা নদী হইতে যে খাল কাটিয়া আনিয়াছিল তাহা দুঃসাধ্য কার্য তো বটেই, তাহাতে দোহার বাস্তব-বুদ্ধির পরিচয়ও আমরা পাইয়াছিলাম। সে যুগে এরূপ একটা দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা কেহই ভাবিতে পারিত না। কাজটি কিন্তু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই। ভিংড়া ইহাতে মত দেয় নাই। বলিয়াছিল, কলকলা নদীকে জোর করিয়া একটা খালের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিলে ফল ভালো হইবে না। নদীর অভিশাপই আমাদের উপর পড়িবে। ভিংড়া পর্বতের শিখরে চড়িয়া কর্কশকণ্ঠে অবিরাম চিৎকার করিত। কি যে বলিত তাহাও অনেক সময় বোঝা যাইত না। হঠাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। নদীর খাল যখন খানিকটা কাটা হইয়াছে, দোহা যখন নদীর মধ্যে নামিয়া খালটাকে গভীরতর করিতেছিল এমন সময় একটা বিরাট কুমীর তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার পায়ে কামড়াইয়া কুমীরটা তাহাকে জলের তলায় টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। অন্য কেহ হইলে সেই বিরাট কুমীরের কবলমুক্ত হইতে পারিত না। কিন্তু দোহাও বিরাট শক্তিশালী পুরুষ। সে সেই কুমীরকেই ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিল, তাহার পর কোদাল দিয়া কোপাইয়া তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলল। দোহার পায়ে কয়েকটা ক্ষত হইয়াছিল, রক্তও পড়িতেছিল খুব। দোহা নিজের চিকিৎসা নিজেই করিয়াছিল। সে নানারকম গাছ-গাছড়া পাতা-শিকড় বাটিয়া একটা মলম প্রস্তুত করিল, মলমের সহিত ওই কুমীরটার পিত্ত এবং চর্বি মিশাইল এবং চম্বার স্বহস্তে প্রস্তুত একটি ছিটের উপর তাহা মাখাইয়া ক্ষতগুলির উপর বাঁধিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাজও করিতে লাগিল। প্রায় সহস্র নর-নারী কাজে লাগিয়াছিল। কাজ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলকলার জল কল কল বেগে সেই খালের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিল। মধ্যে একটা ঢালু উপত্যকার মতো ছিল, সেখানে খাল কাটিতে হইল না। কলকলা সে উপত্যকা প্লাবিত করিয়া বিরাট একটা জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। উপত্যকাটির আকার অনেকটা প্রকাণ্ড গামলার মতো। যে দিক দিয়া কলকলা প্রবেশ করিয়াছিল সে দিকটাই কেবল নীচু ছিল। অন্য তিন দিক উঁচু সেই উঁচু অংশটা অতিক্রম না করিলে আমাদের অঞ্চলে জমানি নদীতে কলকলাকে আনা যাইবে না, এই ভাবিয়া দোহা পাহাড়ের মতো একটা উঁচু টিলাকে কাটিয়া খুব বড় একটা খাল বানাইবার আয়োজন করিতে লাগল। টিলাটার উপর অনেক বড় বড় গাছ ছিল। প্রত্যেক গাছের গায়ে সিঁদুর লেপিয়া দোহা প্রথমে প্রত্যেক গাছকে পূজা করিল। মেয়েরা প্রত্যেক গাছকে ঘিরিয়া নৃত্যসহকারে যে গীত গাহিল তাহার মর্ম এই ঃ ওগো গাছ তোমরা আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে চল। তোমাদের সাহায্য আমরা চাই। আমাদের বিরানি জঙ্গলে তোমাদের নবজন্ম লাভ হোক, তোমরা আমাদের সহায় হও, আমাদের উপর বিরূপ হইও না। একটা বিরাট গাছ যখন ভাঙিয়া পড়িল তখন দেখা গেল গাছটা একক নয়, জোড়া গাছ। দুইটি ভিন্ন জাতীয় গাছ পরস্পর জড়াইয়া মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। একটি গাছে অসংখ্য ফুল

ফুটিয়াছিল। ছোট ছোট ফুল, কিন্তু অপরূপ। চম্বা বলিল, আমি ওই গাছে চড়িব, ওই ফুলগুলিকে ভালো করিয়া দেখিব তাহাদের উপর হাত বুলাইয়া সেই হাত আমার চোখের উপর বার বার বুলাইব। খানিকক্ষণ এইরূপ করিলে ওই ফুলগুলির ছবি আমার মনে আঁকা হইয়া যাইবে। নূতন ধরনের একটা ছিট প্রস্তুত করিব আমি। চম্বা তর-তর করিয়া গাছটার উপর উঠিয়া গেল এবং ফুলগুলির উপর চোখ রাখিয়া বার বার তাহাদের যেন চুম্বন করিতে লাগিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নূতন কোন প্রকাশ দেখিলে চম্বা যেন আত্মহারা হইয়া যাইত। এজন্য অনেকে তাহাকে পাগলি বলিত, অনেকে সন্দেহ করিত সে ডাইনি। কিন্তু কেহ তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিত না, সকলেই ভয় করিত তাহাকে। ভিংড়া একদা তাহাকে নিজের সহচরী করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। চম্বা উত্তর দিয়াছিল, তুমি যে দেবতার উপাসনা কর সে দেবতা ভীষণ। আমার দেবতা সুন্দর। তোমার সহচরী হইতে পারিব না। ভিংড়া এ কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া ছিল, তাহার পর উত্তর দিল—ভীষণের মধ্যেও সুন্দর আছে একথা জান না? চম্বা কোনও উত্তর দেয় নাই। ভিংড়ার চোখের একটা তির্যক দৃষ্টি চম্বার মুখের উপর অনেকক্ষণ নিবদ্ধ হইয়াছিল। চম্বা কিন্তু তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই। তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। ভিংড়া চম্বাকে আর কিছু বলে নাই।

সেদিন চম্বা যখন গাছের উপর উঠিয়া ফুলের রাশির মধ্যে তন্ময় হইয়াছিল তখন কিন্তু একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। চম্বা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। যে গাছে ফুল ফুটিয়াছিল তাহার সহিত অন্য যে গাছটি জড়িত ছিল তাহারা পাতাগুলি ছোট ছোট এবং ঘন সবুজ রঙের। প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহার ডালপালাগুলির বিন্যাসও জটিল। তাহার ডালপালার মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপ আত্মগোপন করিয়া ছিল তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। চম্বাও পারে নাই। সাপটা হঠাৎ যখন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল তখন সে চেঁচাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে ছুটিয়া গেল সেদিকে। দোহা উঠিয়া গেল গাছটার উপর। আরও অনেকে গেল। দোহার হাতে একটা বড় ছোরা ছিল। সেই ছোরা দিয়া সে ময়াল সাপটাকে কাটিতে লাগিল। কিন্তু তবু যে পাকে সাপটা চম্বাকে জড়াইয়াছিল সেই পাকটা শিথিল হইল না। পাছে চম্বার গায়ে আঘাত লাগে এই ভয়ে সে পাকটার উপর ছুরি চালাইতে সাহস করে নাই। কিন্তু চম্বার আর্তস্বরে বিচলিত হইয়া দোহা শেষে সেই পাকটার উপরই ছোরা চালাইতে লাগিল এবং সাপটাকে টুকরা টুকরা করিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। দেখা গেল চম্বার নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। তাহার গায়ে স্তনের নীচে ছোরার আঁচড়ও লাগিয়াছে। রক্ত পড়িতেছে। দোহা চম্বাকে ছোট শিশুর মতো বুকে তুলিয়া লইল এবং ঘাস-পাতার একটি মোটা বিছানা করাইয়া তাহার উপর তাহাকে শোওয়াইয়া দিল। তাহার পর গাছ-গাছড়া পিষিয়া মলম প্রস্তুত করিল ওই ময়াল সাপের চর্বি দিয়া। সে মলম সে স্বহস্তে তাহার ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিল। তাহার পর চম্বারই প্রস্তুত (একটি গোক্ষুর সর্পের অনুকরণে প্রস্তুত) ছিট দিয়া সেটি বাঁধিয়া দিল। তাহার পর দোহা বলিল—ওই সাপটারই চামড়া খানিকটা ছাড়াইয়া আনিয়া এটির উপর বাঁধিয়া দিতেছি। আমার বিশ্বাস তাহা হইলে তুমি তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিবে। সাপের টুকরাগুলি

কুড়াইয়া দোহা সেগুলিকে সমাধিস্থ করিল এবং সমাধির পাশে অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিল।

প্রায় মাসখানেক শয্যাগত ছিল চম্বা। দোহাই তাহার সেবা করিত। অনেকের ধারণা হইল ভিংড়ার চক্রান্তেই এই সব দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। দোহা এ সম্বন্ধে কিছু বলিত না। সে রোজ খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিত।

কলকলা নদীর নদীর জল যখন আমাদের জমানিতে প্রবেশ করিয়া আমাদের শস্যক্ষেত্রগুলির উপর প্রবাহিত হইল তখন আমাদের কিছু ফসল বাঁচিল বটে, কিন্তু অনেক ফসল ডুবিয়াও গেল। আমাদের অনেকের ঘর-বাড়িও জলমগ্ন হইল। বস্তুত কলকলা নদীর প্রবল বন্যায় আমরা হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। তখন আমাদের মনে হইতে লাগিল ভিংড়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল কলকলার অভিশাপে আমাদের অনিষ্ট হইবে। হঠাৎ এই সময় প্রচুর বৃষ্টিপাতও হইয়া গেল। ভিংড়া বৃষ্টিপাতের জন্য কিছুদিন আগে যে সব প্রক্রিয়া করিয়াছিল, আমাদের মনে হইল, তাহাই হয়তো এতদিন পরে সফল হইল। এ কথাও মনে হইল যে কলকলাকে এ অঞ্চলে এমন জবরদস্তি করিয়া না আনিলেই বোধহয় ভালো হইত। মেঘ তো আসিলই, আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল। বৃষ্টিতেই আমাদের ফসল রক্ষা পাইত। দোহা কিন্তু অক্লান্তকর্মী লোক। সে দমিল না। উপত্যকার যে মুখটা কাটিয়া সে কলকলাকে আমাদের জমির উপর বহাইয়াছিল সে মুখটা সে আবার মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। ইহার জন্য আরও কিছুমাটি কাটিতে হইল। কাছের একটা পাহাড় হইতে কিছু পাথরও আনাইল সে। খালের মুখটা বন্ধ হইয়া গেল। উপত্যকাটা প্রকাণ্ড একটা জলাশয়ে পরিণত হইল। দেখা গেল জলাশয়ে মাছও আছে। আমাদের মেয়েরা গিয়া সেখানে মাছ ধরিত। ইহার পর হইতেই কিন্তু ভিংড়ার প্রভাব আমাদের মধ্যে খুব প্রবল হইল। ভিংড়া যে একজন অসাধারণ শক্তিধর একথা আমাদের মধ্যে অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিল। আমার মনেও ক্রমশ এই ধারণাটা বদ্ধমূল হইল যে ভিংড়া অসাধারণ লোক, যে কোন উপায়েই হোক সে এমন একটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে যে শক্তি প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, যে শক্তির ইঙ্গিতে হিংস্র কুম্ভীর কলকলার জলে দোহাকে আক্রমণ করে, যে শক্তির প্ররোচনায় ময়াল সাপ আসিয়া চম্বাকে নিষ্পেষিত করিতে চায়, যে শক্তির আদেশে আকাশে মেঘ আসিয়া আমাদের প্লাবিত করে। এ শক্তিকে উপেক্ষা করা শক্ত। এ শক্তিকে দমন করিব এমন শক্তি আমার নাই। লোকে বিপদে পড়িলে আমার কাছে আসিত না, ভিংড়ার কাছে যাইত। একদিন নামুনাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। নামুনা বন্ধ্যা ছিল। বহু পুরুষের সংস্রবে আসিয়াও তাহার সন্তান হয় নাই। আমাদের সমাজেও বন্ধ্যা নারীকে সকলেই কৃপার চক্ষে দেখিত। অনেকে তাহাদের ডাইনি মনে করিত। অনেক বন্ধ্যা নারী আত্মহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। কেহ বিষ খাইত, কেহ পাহাড়ের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িত, কেহ জমানির জলে ডুবিয়া মরিত। সকলে ভাবিয়াছিল নামুনার এইরূপই কিছু একটা পরিণতি ঘটিবে। হঠাৎ দেখিলাম নামুনার গায়ে মুখে পিঠে সর্বাঙ্গে কালো কালো দাগ। কে যেন তাহাকে চাবুক মারিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কি, তোমাকে এমন করিয়া মারিয়াছে কে? নামুনা উত্তর দিল—ভিংড়া। আমি সন্তান-কামনায় অনেকের

নিকট গিয়াছি, কিন্তু কেহই আমাকে সন্তান দিতে পারে নাই। ভিংড়া বলিল তোমার শরীরে একটা পিশাচী বাস করে। সে-ই তোমার সন্তানকে খাইয়া ফেলে। তাহাকে চাবকাইয়া না তাড়াইলে সে যাইবে না। তুমি যদি মার খাইতে প্রস্তুত থাকো, আমার নিকট আসিও। আমি কাল ভিংড়ার নিকট গিয়াছিলাম। আমি অবাক হইয়া গেলাম। দেখিলাম ভিংড়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে আরও অবাক হইতে হইল। সকলে দেখিল নামুনার গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়াছে। দশমাস পরে নামুনা সত্যই একটি সুস্থ পুত্র প্রসব করিল। ভিংড়ার শক্তি সম্বন্ধে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। এই দৈবীশক্তির নিকট নতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই এই কথাই সকলের মনে হইতে লাগিল। আমি একদিন দোহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাকে বলিলাম, আমার আর দলপতি থাকিবার ইচ্ছা নাই। যদিও একদা আমি পিতার আদেশে ভিংড়াকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলাম, যদিও পিতাই আমাকে দলপতি নির্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তবু এখন আমার মনে হইতেছে ভিংড়াই আমার অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। দৈবীশক্তি তাহার সহায়। এ অবস্থায় আমাদের সমাজের দলপতিত্ব ভিংড়াকে দেওয়াই উচিত। দোহাকে বলিলাম, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, চল আমরা দুইজনে একদিন তাহার কাছে যাই এবং তাহাকেই দলপতি পদে বরণ করি।

দোহা তখন দুগ্ধ-দোহন করিতেছিল। চারিদিকে গাভীর পাল, একপাশে কয়েকটি জালা। দোহা একটি কলসীতে দুধ দুহিতেছিল। যাহারা দুগ্ধ বহন করে তাহারা দূরে দাঁড়াইয়াছিল। দোহা আমার কথার কোন উত্তর দিল না। দুধের কলসীটা যখন ভরিয়া গেল তখন সেটা একটা বড় জালায় ঢালিয়া দিয়া সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, আজ 'ফানুডি'তে যাইব। সেখানকার জন্তুগুলিকে দুধ খাওয়াইব। 'ফানুডি'তে কয়েকটি হায়না ধরা পড়িয়াছে। চল, সেখানেই সব কথাবার্তা হইবে।

ফানুডি দোহার একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। এখানে সে অবসর বিনোদন করে। ফাঁদে যে সব জন্তু-জানোয়ার ধরা পড়ে, জীবন্ত থাকিলে দোহা তাহাদের এই 'ফানুডি'তে রাখিয়া দেয়। একটা বিস্তীর্ণ জায়গাকে বড় বড় গাছ ও লম্বা লম্বা খুঁটি দিয়া সে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ভিতরও খুঁটি-দিয়া-ঘেরা ছোট বড় অনেক কক্ষ আছে। কক্ষগুলির মধ্যেও ছোট ছোট গাছপালা এবং প্রচুর ঘাস। এই সব কক্ষের মধ্যে দোহা নানারকম জন্তুদের কিছুদিন বন্দী করিয়া রাখে। তাহার পর নানাভাবে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করে। এ বিষয়ে তাহার কৌতূহল অসীম। সে তাহাদের জন্য নানা রকম খাবার সংগ্রহ করে, তাহাদের সহিত কথা বলে। তাহার পর যখন তাহার কৌতূহল মিটিয়া যায় তখন তাহাদের ছাড়িয়া দেয়। অনেকগুলি কুকুর পুষিয়াছে। খরগোশও অনেকগুলি। সম্প্রতি সে আবিষ্কার করিয়াছে যে, সমস্ত জানোয়ারই দুধ খায়। যাহারা স্তন্যপায়ী জীব নয়, যেমন সাপ, পাখী, তাহাদেরও দুধে অরুচি নাই। অবশ্য সব পাখীদের কথা সে জানে না।

দোহা একটি জালা মাথায় তুলিয়া লইল। তাহার দুই বিশ্বস্ত সহচর নাগা ও বাঘার মাথাতেও একটি করিয়া জালা চড়িল। তাহাদের পিছনে ছোট বড় জালা বহিয়া অনেক অনুচর চলিতে লাগিল। বিরানি অরণ্যে দোহা কোনও স্ত্রীলোক দাসী নিযুক্ত করে না। তাহার অনুচরেরা সবাই পুরুষ। দোহা নীরবেই পথ চলিতে

লাগিল। আমিও তাহার পাশে পাশে যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ দোহা বলিল, তোমার বাবা তোমাকে দলপতি করিয়া গিয়াছেন। সে পদ ত্যাগ করিবার তোমার অধিকার নাই। ভিংড়োর দৈবীশক্তি যে কি ধরনের শক্তি তাহা আমার ধারণাতীত। সে যখন মেঘকে আহ্বান করে মেঘ তখন আসে না, আসে ছয় মাস পরে। আহ্বান না করিলেও হয়তো সে মেঘ আসিত। একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া নানারকম জন্তু-জানোয়ার পোড়াইয়া এবং কয়েকটা মেয়েকে নির্যাতন করিয়া সে যে কি শক্তি কেমন করিয়া অর্জন করে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মার খাইয়া বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী কেমন করিয়া হয় তাহা জানি না। শুধু জানি অনেক মেয়ের কিছুদিন ছেলে হয় না, তাহার পরে আপনিই হয়। ভিংড়া চমকপ্রদ একটা কিছু করিয়া তোমাদের ঘাবড়াইয়া দিতে চায়, তোমরা অতি সহজে তাহার ভাঁওতায় ভোল। একটা কথা নিশ্চয় জানিও সর্বশক্তিময়ী প্রকৃতি কিন্তু তাহার ভাঁওতায় ভোলেন না, তাহার চীৎকারে সাড়া দেন না, তাহার উৎকট চেহারা দেখিয়া ভয় পান না। প্রকৃতি সর্বশক্তিময়ী। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার কাছে আমরা প্রার্থনা করিতে পারি, নতজানু হইতে পারি, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে পারি, নানা উপচার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারি, ইহাতে আমাদের তৃপ্তি হয়, কিন্তু প্রকৃতি প্রসন্ন হইবেন কি না তাহা জানি না। আমরা কেবল আশা করিতে পারি তিনি দয়া করিবেন। এ আশা করিয়া সুখ আছে, মাঝে মাঝে সান্ত্বনাও পাওয়া যায়। কিন্তু ভিংড়া যাহা করে তাহা বীভৎস, তাহা নিষ্ঠুর, তাহাতে শক্তি বা সৌন্দর্যের পরিচয় নাই। ভিংড়া গায়ে নানা রকম রং মাখে, আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া মাথা নাড়ে, বহুরূপী গিরগিটিও রং বদলায়, সে-ও আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া মাথা নাড়ে। তাহা দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হয়, কেহ ভয় পায়। শুনিয়াছি পাহাড়ের ওপারে একটা সম্প্রদায় আছে তাহারা নাকি গিরগিটিকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। আর একটা সম্প্রদায় আছে তাহারা আবার বহুরূপী গিরগিটিকে শয়তান বলিয়া মনে করে। দেখিতে পাইলেই মারিয়া ফেলে। ভিংড়াও অনেকটা বহুরূপী গিরগিটির মত। তাহার ভড়ং দেখিয়া তুমি ভয় পাইও না। উহাকে লইয়া মাথা ঘামাইও না। তোমার বাবা তোমাকে যে ভার দিয়া গিয়াছেন সুপুত্রের মত তাহা বহন কর। ভিংড়া যদি সমাজের কোন অনিষ্ট করে তখন তাহাকে লইয়া মাথা ঘামাইও, এখন কিছু করিবার দরকার নাই।

এই দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া দোহা নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল এবং বাকী পথটাও নীরবেই অতিক্রম করিল। আমিও ভাবিয়া দেখিলাম দোহা যাহা বলিতেছে তাহাই সমীচীন।

'ফানুডি'র কাছাকাছি আসিবামাত্র ব্যাঘ্রের চীৎকার ও হায়েনাদের হা-হা-রব শুনিতে পাইলাম। দোহার একজন অনুচর বলিল—বাঘটা দুধ খায় নাই। ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে, আর বার বার লাফাইয়া বেড়াটা পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। হায়নাগুলা পরস্পর মারামারি করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। সব কটাই পুরুষ হায়না। উহাদের বোধহয় রাখা যাইবে না। উহারাও দুধ খায় নাই।

দ্বিতীয় অনুচর বলিল—বাদামী রঙের যে বড় বাজপাখীটা ধরা পড়িয়াছে সে-ও দুধ খাইতেছে না। ঠোঁট এবং নখ দিয়া দুধের বাটি বার বার উল্টাইয়া দিতেছে।

উহার জন্য কি কয়েকটা ইঁদুর ধরিয়া দিব? দোহা জালাটা নামাইয়া বলিল— মহিষটাকে আন এবং শঙ্কর মাছের চাবুকটা আমাকে দাও।

মহিষ মানে মহিষের চামড়া। মৃত মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া সেটাকে শুকাইয়া বোরখার আকারে এক অদ্ভুত পোশাক প্রস্তুত করিয়াছে দোহা। শিং সুদ্ধ মহিষের মুণ্ডটাও পোশাকে সংলগ্ন হইয়া আছে। মুণ্ডের ভিতর আছে খড়। সেটা যখন দোহা পরিধান করে মনে হয় একটা মহিষ যেন পিছনের দুই পায়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দোহা হাত দুইটিও মহিষের চামড়ায় ঢাকিয়া রাখে। দক্ষিণ হস্তে থাকে শঙ্কর মাছের শুষ্ক ল্যাজটি।

এই পোশাক পরিয়া দোহা যখন দুর্দান্ত বাঘটির কক্ষে প্রবেশ করিল তখন বাঘটি প্রথমে ভয়ে সংকুচিত হইয়া সরিয়া গেল। দোহা আগাইয়া গিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। প্রথমে বাঘটা কিছু বলিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল যে ওই ভীষণদর্শন জিনিষটা সত্যই তত ভীষণ নয় তখন সে স-গর্জনে ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহার উপর। প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল দোহা। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া দুইহাতে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দুই হাতে তাহার মুখ ফাড়িয়া তাহার মুখের মধ্যে খানিকটা দুধ ঢালিয়া দিল। দোহা একটা দৈত্য। তাহার পর সে হায়েনার ঘরে ঢুকিল। হায়েনারা তাহার চেহারা দেখিয়া ভয় পাইল না। দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে আক্রমণ করিল। কিন্তু মহিষের শুষ্ক চর্মে তাহাদের নখ-দন্ত বসিল না। দোহা নির্মমভাবে চাবুক চালাইয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। বলিল, তিনদিন উহাদের খাইতে দিও না। তাহার পর কেবল দুধ দিও। তখনও যদি না খায় আরও তিন চার দিন কিছু খাইতে দিও না। তাহার পর আবার দুধ দিও। সাতদিন পরেও যদি না খায় উহাদের ছাড়িয়া দিও।

দোহা বাহিরে আসিয়া মহিষটা দূরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর যাহা করিল তাহা অপ্রত্যাশিত। একটা গাছের নীচে বসিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিরানির ক্রীতদাসরা ইহাতে বিস্মিত হইল না। তাহারা প্রতি কক্ষে কক্ষে দুধ দিয়া আসিতে লাগিল। দোহার এসব ভাবান্তরে তাহারা অভ্যস্ত। দোহা কখনও কাঁদে, কখনও অট্টহাস্য করে, কখনও বড় বড় বাছুরকে কাঁধে তুলিয়া নৃত্য করে। এসব আমিও জানিতাম। কিন্তু তাহার বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া আমি আবার বিচলিত হইলাম। বলিলাম, তুমি কাঁদিতেছ কেন? যদি কাঁদিবেই তবে এসব কাণ্ড কর কেন? দোহার যুক্তি কিন্তু অদ্ভুত। সে বলিল, কাঁদি, কারণ না কাঁদিয়া পারি না। আর এসব করি, কারণ এসব কর্তব্য। বিরানি অরণ্যে আধিপত্য করিতে হইলে হিংস্র পশুদের শাসন করিতে হইবে। তাহাদের আমি মারিয়া ফেলিতে চাহি না, কারণ তাহারা এ অরণ্যের শোভা। তাহাদের আমি ভালবাসা দিয়া খাবার দিয়া দুধ খাওয়াইয়া বশ করিতে চাই। যখন বশ মানিতে চায় না তখনই শাসন করি। এটা আমার কর্তব্য, কিন্তু বড় দুঃখজনক কর্তব্য, তাই মাঝে মাঝে কাঁদিয়া ফেলি।

আমরা তখন সভ্যতার যে স্তরে ছিলাম সে স্তরে আমাদের সমাজ বেশ সমৃদ্ধ ছিল। অনেক উন্নতি হইয়াছিল। আমাদের খাদ্যের অভাব ছিল না, আমরা খাদ্য সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছিলাম, আমরা বাহির হইতে খাদ্য আমদানীও করিতে পারিতাম।

মোটামুটি আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও ছিল আমাদের। যদিও আমরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলাম না, তবু বাহিরের শত্রু হানা দিলে আমরা বর্শা, বল্লম, কুঠার, খড়্গ, তরবারি, ঢাল দিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম বহুদূরে একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজা নাকি আমাদের অধিপতি। তাঁহাকে আমরা কখনও দেখি নাই। ইহাও শুনিয়াছিলাম তিনি নাকি পোড়ামাটির ইঁট দিয়া বিরাট একটি শহর নির্মাণ করিয়াছেন। শহরের মধ্যস্থলে তাঁহাদের দেবতার প্রকাণ্ড মন্দির আছে। সে মন্দিরে ধুমধাম করিয়া সে দেবতার পুজা হয়। আমরা সে দেবতা বা মন্দির কখনও দেখি নাই। মর্দন নামে আমাদের ভৃত্যটি প্রতি বছর কিছু শস্য খাজনা স্বরূপ তাহার তহশিলদারকে দিয়া আসে। তহশিলদারের সহিতও আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। ধর্ম সম্বন্ধেও আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, রাজার ধর্ম আমাদের পালন করিতে হইত না। তখন প্রত্যেক জনপদের আলাদা আলাদা দেবতা ছিল। একটা নয়, অনেক। গাছে গাছে, নদীতে তড়াগে, পর্বতে ঝরণায়, এমন কি জন্তুতেও অনেকে দেবতার প্রকাশ অনুভব করিত এবং পুজা করিত। আমাদের দেবতা ছিল টুকচুম্বা, যদিও অনেকে জীবজন্তুকেও পুজা করিত। এই পরিবেশে দোহা ছিল একটি অনন্য পুরুষ। ভিংড়ার অনন্যতাও অনেকে স্বীকার করিত। কিন্তু দুইজনের মধ্যে তফাত ছিল অনেক। ভিংড়া মনে করিত শাসন করিয়া সে প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিবে। তাহার এই শক্তিকে সকলের সম্মুখে আস্ফালন করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে ভণ্ডামিরও আশ্রয় লইত। এমন একটা ভাব করিত যে যদিও তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সব সময়ে সফল হইতেছে না, কিন্তু এই না হওয়ার মধ্যেও এমন একটা নিগূঢ় কিছু আছে যাহা আমাদের মতো সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে। আমরা যেন অন্ধভাবে তাহার কথায় বিশ্বাস করি। অনেকে করিত। দোহা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার দেহের শক্তি প্রচণ্ড, মনের শক্তিও প্রচণ্ড। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রচণ্ডতা তাহাকে নিষ্ঠুর করে নাই, উগ্র করে নাই, দোহা শক্তিধর, কিন্তু কোমল। প্রকৃতিকে স্ববলে আনিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার স্পর্ধা তাহার নাই। সে জানে প্রকৃতির শক্তি অমিত, তাহার নানারূপ, নানা প্রকাশ। তাহা অগ্নিতে জ্বলন্ত, প্রস্তরে কঠিন, আলোকে জ্যোতির্ময়, বন্যায় ভূমিকম্পে মেঘগর্জনে অশনিপাতে ভয়ঙ্কর। তাহার বহু রূপ, অসংখ্য প্রকাশ। এ সবের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার সাধ্য মানুষের নাই। সে সাধ্য যদি কখনও হয়ও, তবু প্রকৃতির শক্তি অদম্য থাকিবে, সে নিগূঢ় শক্তি বিস্তার করিয়া নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেই। মানুষ এ শক্তির নিকট নতজানু হইয়া কেবল প্রার্থনা করিতে পারে এবং এই প্রার্থনা তাহাকে এমন একটা অবর্ণনীয় শক্তি দেয় যাহা লাভ করিলে মানুষের আর ভয় থাকে না। দোহা প্রার্থনা করিত। সকলকে প্রার্থনা করিতে বলিত। এই বিরাট শক্তির নিকট প্রার্থনা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই ইহাই তাহার মত ছিল। প্রতি মাসে শুক্লা দ্বিতীয়ার দিন টুকচুম্বার তলায় প্রার্থনাসভা বসিত। সে সভায় কোনও বক্তৃতা হইত না। সকলেই চোখ বুজিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত। দোহা উঠিয়া পড়িলেই সভা ভাঙিয়া যাইত। তাহার পর শুরু হইত নৃত্য-গীত। নাচ-গান শেষ হইয়া গেলে আমরা প্রত্যেকে এক কলসী করিয়া জল টুকচুম্বার তলায় ঢালিয়া দিতাম।

সেদিন দোহা সেই বাজপাখিটার ঘরে যখন গেল তখন আমরা দুজনেই চমকাইয়া

উঠিলাম। দোহা বলিল, এ পাখি তো এ প্রদেশের নয়। যেদিন ভালুকটাকে মারিয়াছিলাম সেইদিন এই পাখিটাই আসিয়া আমাদের গাছে বসিয়াছিল না? আমিও বলিলাম—হ্যাঁ এইটাই তো টুকচুম্বার ডালে বসিয়া আমাদের মাংস খাইবার অনুমতি দিয়াছিল। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তীর ছুঁড়িয়াছিল ভিংড়া। এ পাখি কি করিয়া ধরা পড়িল? দোহার একটা অনুচর বলিল, পাখিটা একটা প্রকাণ্ড সাপ ধরিয়াছিল। সেই সাপটার সহিত ঝটাপটি করিতে করিতে পাখিটা একটা মস্ত কাঁটাঝোপে পড়িয়া যায়। সেই ঝোপে উহার ডানা আটকাইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতেই আমরা উহাকে ধরিয়াছি। সাপটাকে ধরিতে পারে নাই, সেটা পলাইয়া গিয়াছিল। পাখিটাও দুধ খায় না। ঠোঁট দিয়া রোজ দুধের বাটি উল্টাইয়া দেয়। উহার ঘরে একটা ইঁদুর ঢুকিয়াছিল। সেটাকে ধরিয়া খাইয়াছে। আমাদের ফাঁদে অনেক ইঁদুর ধরা পড়িয়াছে। উহাকে ইঁদুর দিব কি? দোহা একটু ভাবিল। তাহার পর বলিল, না, উহাকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার আগে উহার গায়ে গাঢ় সবুজ রং মাখাইয়া দাও। এবার বিদেশের বাজার হইতে যে রং আসিয়াছে সেটা খুব পাকা রং। ও পাখি যদি আবার দেখা দেয় তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব একই পাখি বার বার ফিরিয়া আসিতেছে কি না। পাখিটাকে ধরিয়া রঙের চৌবাচ্ছার কাছে লইয়া গেল অনুচরটি। গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়াকে চিহ্নিত করিবার জন্য বিরানিতে নানা রঙের চৌবাচ্ছা থাকিত। সবুজ রঙের চৌবাচ্ছায় পাখিটাকে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। পাখিটার গায়ের রং বাদামী। মাঝে মাঝে সাদা রং ছিল কিছু কিছু। পেটের কাছে গোল গোল কয়েকটি সাদা বৃত্তের মত ছিল। ল্যাজেরও খানিকটা সাদা। সাদা অংশগুলি সবুজ হইয়া গেল। বাদামীর উপরও সবুজের ছোপ লাগিয়া একটা অদ্ভুত রং হইল। মোট কথা, পাখিটা যেন রূপান্তরিত হইয়া গেল। ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র সে সোঁ করিয়া অনেক উপরে উঠিয়া গিয়া একটা ঘুরপাক খাইল। তাহার পর তীক্ষ্ণকণ্ঠে সেই চীৎকারটা করিল—কেক্ কেক্ কেক্ কেক্—কঁঈঈ। মনে হইল যেন ব্যঙ্গ করিয়া গেল। তাহার পরই অন্তর্হিত হইয়া গেল মহাশূন্যে। তাহাকে আর দেখা গেল না। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দোহা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল পাখিটাকে বশ করিতে না পারিয়া সে যেন ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহার মুখে-চোখে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল—কে জানে ইহা কোনও অমঙ্গলের সঙ্কেত কি না। মনে পড়িল ভিংড়াও এ কথা বলিয়াছিল। বলিলাম—চল কাল টুকচুম্বার পূজা করি। দোহা বলিল, বেশ। পরদিনই সেই মহাবৃক্ষের তলায় পূজার আয়োজন হইল। সমস্ত জনপদ নৃত্য-গীতে মাতিয়া উঠিল। হঠাৎ একজন বলিল—টুকচুম্বার কুঁড়ি হইয়াছে। দেখিলাম অগ্নি-গোলকের ন্যায় একটি কুঁড়ি একটি শাখার প্রান্তে দেখা দিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরেই অগ্নিশিখার মত অজস্র ফুল ফুটিল। মনে হইল সমস্ত গাছটাই যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। গাছটায় ফুল ফুটিলেই আমার কেমন যেন আতঙ্ক হইত। এবারও হইল। এবারও আমাদের সমাজে অনেক জননী সন্তান প্রসব করিল। প্রতিবারেই ফুল ফুটিলে আমাদের বংশবৃদ্ধি হয়, এবারও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

এবারে কিন্তু বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিল একটি। শুধু তাই নয়, বিস্ময় ক্রমশ আতঙ্কে রূপান্তরিত হইল।

প্রথমে একটা গুজব শোনা গেল, আমাদের অঞ্চলে কেহ কেহ নাকি ঘোড়া দেখিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি ঘোড়া জানোয়ারটার সহিত আমাদের পূর্বপুরুষ বাগমুখ ও অংঘোর অপ্রীতিকর স্মৃতি বিজড়িত ছিল। তাহাদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের জন্য থানথিরার বংশধরেরা ঘোড়ার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল। আমাদের অঞ্চলে বহুকাল ঘোড়া দেখা যায় নাই। ঘোড়ার আবির্ভাবে আমরা সকলেই বেশ বিচলিত হইয়া পড়িলাম। আমি নিজেই একদিন স্বচক্ষে দেখিলাম আমাদের ক্ষেতের মাঝখানে বেশ একটা বড় ঘোড়া চরিয়া বেড়াইতেছে। যাহারা আমাদের ক্ষেত পাহারা দেয় তাহারা ঘোড়াটাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারা বলিল ঘোড়াটাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহার কাছাকাছি যাইতেই ঘোড়াটা কান দুইটি পিছন দিকে বাঁকাইয়া তাহাদের কামড়াইতে গিয়াছিল। আমরা অনেকে বাহির হইয়া ক্ষেতের চারিদিকে সমবেত হইলাম। দেখা গেল অনেক দূরে আরও দুইটি ঘোড়া চরিতেছে। এই অবস্থায় কি করা উচিত আমরা চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময় আমার কনিষ্ঠা পত্নী সুলমা আমার পাশে দাঁড়াইল এবং মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা সোৎসুক দীপ্তি দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম, কি ব্যাপার, হাসিতেছ কেন? সে বলিল একটা লম্বা দড়ি দিয়া উহাকে যদি ধরিয়া দাও আমি উহার পিঠে চড়িতে পারি। আমার বাবার ঘোড়া ছিল। সুলমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, একটু বিব্রতও হইলাম। যাহার বাবার ঘোড়া আছে এবং যে ঘোড়ায় চড়িতে পারে তাহাকে আমি—থানথিরার বংশধর—বিবাহ করিয়াছি এ কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেলে লোকে কি ভাবিবে! এ আশঙ্কাও মনে জাগিল সুলমা অংঘোর বংশের কেহ নয় তো? কাহাকেও কিছু বলিলাম না। শেষে ঠিক করিলাম দোহার নিকট গিয়া সব বলিব। সে হয়তো এখনও ঘোড়ার খবর শোনে নাই, শুনিলে আসিত।

সব শুনিয়া দোহা বলিল—ঘোড়া তিনটিকে ধরিতে হইবে। সুলমার জন্য চিন্তিত হইও না। সে অংঘোর আত্মীয় কি না এ চিন্তা অনর্থক। সে ঘোড়ায় চড়িতে পারে এটা তাহার বিশেষ গুণ, দোষ নহে। তবে কথাটা কাহাকেও বলিও না। কারণ অনেকেই অল্পবুদ্ধি, কথাটা শুনিলে অমূলক জল্পনা-কল্পনা করিবে। এখন কথাটা গোপন রাখ। ঘোড়া তিনটিকে আগে ধরা যাক।

দোহা পশু-পক্ষী বিষয়ে খুব উৎসাহী, সে আমাদের ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের সমবেত করিয়াছিল। তাহার পর নির্দেশ দিল বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঘোড়া তিনটিকে ঘিরিয়া ফেলিতে। বৃত্তটি প্রথমে বৃহদাকার হইবে, পরে সেটি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিবে। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র দেওয়া হইল। কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে লগুড় কাহারও হাতে তরবারি, কাহারও হাতে ছোরা। অনেকের হাতেই দড়িও রহিল। সুলমা একটা লম্বা দড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। সকলকে বলিয়া দেওয়া হইল ঘোড়া যদি আক্রমণ করিতে আসে তাহারা তাহাকে যেন আঘাত করিতে ইতস্তত না করে। সুলমাও ওই বৃত্তের মধ্যে রহিল। দোহাও নিজের শঙ্কর মাছের চাবুকটা লইয়া সকলের সহিত যোগ দিল।

তিনটি ঘোড়াকে লইয়া তিনটি বৃত্ত হইয়াছিল। আমিও একটা বৃত্তের মধ্যে ছিলাম। বৃত্তগুলি ক্রমশ ছোট হইয়া ঘোড়াগুলির নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ঘোড়াগুলি বুঝিতে পারিল যে তাহাদের ঘিরিয়া ফেলা হইতেছে। তাহারা সচকিত হইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। সুলমা যে বৃত্তের মধ্যে ছিল সেই বৃত্তের ঘোড়াটা সবেগে সুলমার দিকে ছুটিয়া আসিয়া বৃত্ত ভেদ করিতে চেষ্টা করিল। সুলমা কিন্তু বিচলিত হইল না। সে দড়িতে একটা ফাঁস বানাইয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিল। ঘোড়াটা কাছে আসিবামাত্র সে দড়িটা ছুঁড়িয়া দিয়া তাহার গলায় ফাঁসটা পরাইয়া দিল। ঘোড়াটা কিন্তু থামিল না। সুলমাকে টানিয়া অনেক দূরে লইয়া গেল। কতদূরে লইয়া যাইত কে জানে, কিন্তু দোহা ছুটিয়া গিয়া ঘোড়াটার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মুখের উপর শপাশপ চাবুক মারিতে লাগিল। তাহার পর আরও আগাইয়া গিয়া তাহার সামনের ঝুঁটিটা ধরিয়া এক ঝটকায় মাটিতে ফেলিয়া দিল। ঘোড়াটা মাটিতে পড়িতেই সে যাহা করিল তাহা সাধারণ মানুষে পারে না। সে ঘোড়ার চার পা ধরিয়া তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও লোকজন ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়াটাকে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ঘোড়াটা সত্যই যখন বন্দী হইল তখন সুলমা বলিল, আমি ঘোড়াটার পিঠে চড়িব। আমি ঘোড়ায় চড়িতে জানি। সুলমা একটা শক্ত দড়ি পাকাইয়া লাগামের মতো করিল এবং তাহার এক অংশ ঘোড়ার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া বাঁধিয়া দিল। ঘোড়টা কামড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম সুলমা জানে কি করিয়া ঘোড়াকে জব্দ করা যায়। লাগামটা যখন ঠিক মতো বাঁধা হইয়া গেল তখন সুলমা একলাফে ঘোড়াটার পিঠে চড়িয়া বসিল। বলিল, ঘোড়ার মুখের লাগাম সাধারণত চামড়ার হয়। মুখের ভেতরের অংশটায় লোহার শিকল থাকে। এ লাগাম বেশীক্ষণ টিকিবে না। তখন আমি উহার ঘাড়ের চুল মুঠো করিয়া ধরিব, উহার গলা জড়াইয়া ধরিব। ঘোড়াটা লাফাইয়া আমাকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। তোমরা একটা শক্ত দড়ি দিয়া ঘোড়াটার পেটের সঙ্গে আমার কোমর ও উরু শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দাও। দোহা আপত্তি করিল না, যদিও আমি মনে মনে বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। দোহা নিজের চাবুকটাও সুলমাকে দিল। সুলমা বলিল, এবার ঘোড়াটাকে খুলিয়া দাও। খুলিয়া দিবার সঙ্গে ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সুলমা ও ঘোড়াটা দিগন্তরেখায় অন্তর্ধান করিল। আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কণ্টকা আমার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলল, পাপ বিদায় হইল, ও আর ফিরিবে না।

বাকি ঘোড়া দুইটাও কিছুক্ষণ পরে ধরা পড়িল। দোহা সে দুটিকে তাহার 'ফানুডি'তে লইয়া গেল।

পরদিন দোহা আমাকে বলিল, দুইজন বিশ্বস্ত লোককে বিদেশের বাজারে পাঠাও। ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম কিনিয়া আনুক। আমাদেরও ঘোড়ায় চড়া শিখিতে হইবে। আমরাও সুলমার অনুসরণ করিয়া দেখিব ঘোড়ারা কোথা হইতে আসিয়াছে। তাহাদের খুশিমতো চলিতে দিলে তাহাদের নিজেদের দেশেই ফিরিয়া যাইবে। দোহার মতলব শুনিয়া আমার ভয় হইল।

বলিলাম, আমাদের পূর্বপুরুষ থানীধরা ঘোড়া বর্জন করিয়াছিলেন। তুমি ঘোড়ার সহিত কোন সাহসে ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহিতেছ? দোহা বলিল, আমরা

ঘোড়াকে ডাকিয়া আনি নাই। ঘোড়া নিজে আসিয়াছে। আজকাল অন্যান্য দেশে শুনিয়াছি ঘোড়াকে মানুষ নানা কাজে লাগাইতেছে। বাহন হিসাবে ঘোড়া যে বেশী দ্রুতগামী তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। দেখিলে না সুলমা কেমন সবেগে চলিয়া গেল? হয়তো থানথিরার আত্মাই আমাদের উপকারের জন্য ঘোড়া তিনটিকে আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। হয়তো ইঙ্গিতে আমাদের বলিয়া দিলেন— এইবার তোমরা ঘোড়া ব্যবহার করিতে পার। ঘোড়া ব্যবহার না করিলে বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবে না। আত্মরক্ষাও হয়তো অসম্ভব হইয়া উঠিবে। শত্রু যদি ঘোড়ায় চড়িয়া আসে তখন ঘোড়ায় চড়িয়াই তাহাদের প্রতিরোধ করিতে হইবে। তিনটি ঘোড়াকে আমাদের রাজ্যে পাঠাইয়া থানথিরা হয়তো এই ইঙ্গিতই করিতেছেন। আর একটা কথা, সকলেই যখন ঘোড়া ব্যবহার করিতেছে তখন আমরা পিছাইয়া থাকিব কেন? ঘোড়ার সমস্ত খবর আমাদের জানিতে হইবে। দেখিলাম ঘোড়ার ব্যাপারে দোহা এত উৎসাহিত হইয়াছে যে তাহাকে বাধা দেওয়া শক্ত। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের তাহা হইলে কি করিতে বল তুমি?

দোহা বলিল, যাহারা ঘোড়ার জিন লাগাম কিনিতে বিদেশের হাটে যাইবে তাহাদের বলিয়া দিব দুইজন ভালো অশ্বারোহীও তাহারা যেন সন্ধান করিয়া আনে। তাহাদের আমরা বেতন দিয়া এখানে রাখিব। আমাদের সকলকেই ঘোড়া-চড়া শিখিতে হইবে। ঘোড়া-চড়া শিখিয়া আর একটা কাজ করিতে হইবে আমাদের। আমার ইচ্ছা যে ঘোড়া দুইটা আমরা ধরিয়াছি, তাহাদের পিঠে চড়িয়া তুমি এবং আর একজন বাহির হইয়া পড়। ঘোড়াকে নিজের মতে চলিতে দিলে তাহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছে সেই দেশে ফিরিয়া যাইবে। সে দেশের হালচাল কিরূপ, আমাদের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব কি না, এ-সব খবর জানা দরকার। তুমি আমাদের দলপতি, তুমিই তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিবে, তাই তোমাকেই যাইতে বলিতেছি।

প্রশ্ন করিলাম, আমার সহিত আর কাহাকে যাইতে বলিতেছ?

সেটা তুমিই ঠিক কর।

তুমিই চল না।

না, আমি যাইব না। প্রথমতঃ, এই ঘোড়া আমার ভার বহন করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা দুইজনেই চলিয়া গেলে ভিংড়া যে কি করিবে তাহা অনিশ্চিত। সে হয়তো রটাইয়া দিবে ঘোড়া দুইটি আমাদের হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা আর ফিরিব না। সে-ই তখন দলপতি হইয়া আরও পশু-পক্ষী পুড়াইতে থাকিবে। আমাদের এই জনপদ নষ্ট হইয়া যাইবে। তৃতীয়ত, আমি চলিয়া গেলে বিরানিতে বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা। তাই আমি যাইব না। আমাকে এখানে থাকিতে হইবে। সেই দিনই আমাদের দুইজন লোক নমুরি নামক বিখ্যাত মেলায় ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম কিনিতে চলিয়া গেল। অনেক জিনিষপত্র, শস্যসম্ভার, ফল, চামড়া লইয়া সাতটি নৌকাও তাহাদের সঙ্গে গেল। সেকালে আমাদের মুদ্রা ছিল না, দ্রব্যের বিনিময়েই আমরা জিনিসপত্র কেনা-বেচা করিতাম।

ঘোড়ায় চড়া শিখাইবার জন্য যে দুইজন শিক্ষক আসিয়াছিলেন তাহাদের একজনের নাম আবিদ, আর একজনের নাম শরীফ। দুইজনেই বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ। তাঁহারা আরব অঞ্চলের লোক। বেদুইনদের রক্ত নাকি তাহাদের ধমনীতে প্রবাহিত। আরব

দেশের জনৈক অশ্ব-ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস অহারা। খুব প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার চালচলন বেশ আভিজাত্যপূর্ণ। কটিবন্ধে সর্বদা ছোরা ও অসি। তাহাদের ঘোড়া দুইটিও চমৎকার। আমাদের ঘোড়ায় চড়া শিখাইবার জন্য তাহাদের প্রচুর গম, অনেক চামড়া, কিছু হরিণের শিং এবং দুইটি বাঘের চামড়া অগ্রিম দিতে হইয়াছিল। তাহাদের মালিক গিয়াসুদ্দিনকে তাহা তাহারা দিয়া আসিয়াছিল। আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আরও কিছু তাহাদের দিব। এ প্রতিশ্রুতিও আমরা দিয়াছিলাম।

দেখা গেল আবিদ এবং শরীফ দুইজনেই ভাল শিক্ষক। তাহারা দুইটি বেশ বড় বড় ঘোড়া আনিয়াছিল। আমাদের দুইটা ঘোড়া আগে হইতেই ছিল। দেখা গেল আমাদের ঘোড়াগুলি বুনো ঘোড়া নয়। বোঝা গেল তাহারা ইতিপূর্বে মানুষের সংস্পর্শে ছিল। আবিদ ও শরীফ তাহাদের মুখে লাগাম এবং পিঠে জিন দিয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর আমাদের শিক্ষা শুরু হইল। আমরা অনেকেই তাহাদের নিকট ঘোড়ায় চড়া শিখিলাম। দোহাও তাহাদের বড় উঁচু ঘোড়াটায় চড়িল একদিন। কয়েক দিনের মধ্যেই ভালো ঘোড়-সোয়ার হইয়া উঠিল সে। আবিদ এবং শরীফ দুইজনেই তাহার নৈপুণ্যের প্রশংসা করিল। কিন্তু এ-কথাও বলিল, দোহা ছোট ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে না। তাহার জন্য বড় বলিষ্ঠ ঘোড়া চাই। বলিল, তাহারা বড় ঘোড়া আনিয়া দিবে কিন্তু তাহার পরিবর্তে দুইটি বাঘের চামড়া এবং ভালুকের চামড়া দিতে হইবে। দোহার ভাণ্ডারে চামড়ার অভাব ছিল না। কিন্তু দোহা এখনই বড় ঘোড়া কিনিতে রাজি হইল না। বলিল, এখন আমি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইব না। যখন প্রয়োজন হইবে, তখন গিয়াসুদ্দিনের নিকট লোক পাঠাইব।

আমরা অনেকেই ঘোড়ায় চড়া শিখিলাম। শুধু পুরুষেরা নয়, মেয়েরাও। আমাদের একঘেয়ে জীবনযাত্রায় ঘোড়া যেন একটা নূতন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। দলে দলে ছেলেমেয়েরা আবিদ ও শরীফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িল। কণ্টকা অল্প দিনেই ভালো অশ্বারোহিনী হইল একজন। সে ধনুর্বাণেও খুব দক্ষ ছিল। উড়ন্ত পাখীকে সে তীরবিদ্ধ করিয়া মাটিতে নামাইয়া আনিতে পারিত।

মাস তিনেকের মধ্যে আমাদের শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হইল। দম নামক যুবকটিও ঘোড়ায় চড়া ভালো করিয়া শিখিয়াছিল। দোহা আর একদিন যখন আমাকে তাগাদা দিল, এইবার তুমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়, দেখ ঘোড়া তোমায় কোথায় লইয়া যায়, তখন ঠিক করিলাম দমকে সঙ্গে লইয়াই বাহিরে যাইব। কণ্টকা কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, আমার সঙ্গ সে-ই যাইবে। আর কাহারও যাইবার প্রয়োজন নাই। দোহা আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া পথ চলা নিরাপদ নহে। কণ্টকা কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হইল না। বলিল, তুমি চলিয়া গেলেই ভিংড়া আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তখন আমাকে রক্ষা করিবে কে? দোহা যদি আমাকে তাহার বিরানি জঙ্গলে লুকাইয়া রাখে তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে থাকিতে পারি। এই বলিয়া দোহার পানে চাহিয়া সে মুচকি হাসিতে

লাগিল। দোহা এ প্রস্তাবে রাজি হইল না। সুতরাং তাহাকে সঙ্গেই লইতে হইল। দম আমাদের পিছু পিছু হাঁটিয়া চলিল। প্রায় শতখানেক ক্রীতদাসও দমের সহিত রহিল। আমি আর কণ্টকা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া বসিলাম। কণ্টকার পিঠে তীর-ধনুক বাঁধা, কোমরে ছোরা, মাথায় বাজপাখীর পালক দিয়া প্রস্তুত একটা শিরস্ত্রাণ। সে পুরুষের বেশই ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু পীবর স্তন দুইটিকে লুকাইতে পারে নাই।

আমরা ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ঘোড়া দুইটি নিজের খুশিমতো চলিতেছিল। দেখিলাম তাহারা পশ্চিম দিকেই চলিতেছে। দূরে আকাশের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা গেল। শুনিয়াছি পর্বতের ওপারে মরুভূমি আছে। একটু পরে ঘোড়া দুটি পাহাড়ের দিকেই মুখ ফিরাইল। দেখিলাম তাহারা পাহাড়ের ক্রমোচ্চ ঢালু পথ বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। খুব সাবধানে পদক্ষেপ করিয়া তাহারা ক্রমশ উপরে উঠিতে লাগিল। আমরা তাহাদের বাধা দিলাম না। খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা উপত্যকার মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড়, মাঝখানটা সমতল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, ঠিক করিলাম রাত্রে আর পাহাড়ে উঠিব না। ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। কাছেই ঘাস ছিল, ঘোড়া দুটি চরিতে লাগিল। কণ্টকা আমার পাশে বসিয়াছিল। হঠাৎ সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার পর আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়া একটি নাতি-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিলাম শৃঙ্গের ঠিক নীচেই একটি পুষ্টকায় রোমশ ছাগল দাঁড়াইয়া আছে। কণ্টকা আমার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া মাটিতে শুইয়া সরীসৃপের মতো ছাগলটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম তাহার শিকারের স্পৃহা জাগিয়াছে। খুশীই হইলাম। যদি ছাগলটাকে মারিতে পারে কিছু ভালো টাটকা মাংস পাওয়া যাইবে। দমের সহিত ক্রীতদাসরা আমাদের জন্য যে খাদ্য আনিতেছে তাহাতে মাংস নাই। কণ্টকা একটু পরে একটি উঁচু টিলার অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গেল। আমি একা বসিয়া রহিলাম। একটু পরে দলবল লইয়া দম আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে বলিলাম, কণ্টকা ছাগল শিকার করিতে গিয়াছে। তুমি এইখানেই আমাদের তাঁবুটা ফেল আর আগুন জ্বালাও। রাতটা এখানেই কাটানো যাক। দম বলিল, আমাদের তাঁবুর গাড়িটা পিছাইয়া পড়িয়াছে। আসিয়া পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইবে। আমি ততক্ষণ কাঠ যোগাড় করিয়া, আগুন জ্বালাই। নিকটেই একটি শুষ্ক গাছ ছিল, সে তাহারই ডালপালা কাটিতে লাগিল। আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ছাগলটা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে নাই। কণ্টকাকেও দেখা যাইতেছে না। ঘনায়মান অন্ধকারে উপত্যকার চতুর্দিক হইতে নানারকম অদ্ভুত শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সম্ভবত পাহাড়ী কীটপতঙ্গ ও নিশাচর পাখীদের শব্দ। মনে হইল যেন একটা ভিন্ন জগতে আসিয়াছি। কয়েকটা পাখীর তীব্র চীৎকার শুনিলাম। এ ডাক আগে কখনও শুনি নাই। মনে হইল পাখীগুলি বোধহয় এ অঞ্চলেরই বিশেষ অধিবাসী। একটা তীব্র গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। গন্ধটা সম্ভবত ফুলেরই গন্ধ, কিন্তু অচেনা। কিন্তু কণ্টকা কোথা গেল? টিলার ওপারে সহসা একটা আর্ত চীৎকার শুনিতে পাইলাম। আমাদের তাঁবুর গাড়ি তখনও আসে নাই। সে গাড়িতে কিছু মশাল ছিল, অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। আমি কিন্তু গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে

পারিলাম না। যেদিক হইতে চীৎকারটা আসিয়াছিল, সেই দিকে ছুটিয়া গেলাম। দমকে বলিলাম একটা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া আমার অনুসরণ করিতে। টিলার ওপারে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম বাণবিদ্ধ মৃত ছাগলটা পড়িয়া আছে এবং তাহার পাশে দুই জন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেছে। জ্বলন্ত মশালের আলোকে দেখিলাম কণ্টকা একটি দাড়ি-গোঁফওলা লোকের বুকে চড়িয়া বসিয়া আছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত।

একি কাণ্ড কণ্টকা?

আমি ইহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিয়াছি।

সে কি? লোকটা কে?

আমি জানি না। আমি যখন ছাগলটাকে মারিয়াছি তখন লোকটা হঠাৎ ওই পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া বলিল, এ আমাদের ছাগল, তুমি মারিয়াছ কেন? তোমাকে এবং এই ছাগলটিকে লইয়া আমি আমাদের দলপতির কাছে যাইব। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের দলপতি কোথায় থাকেন? সে বলিল, পাহাড়ের ওপারে যে মরুভূমি আছে সেই মরুভূমির তিনি মালিক। সেইখানে তোমাকে যাইতে হইবে। এই বলিয়া, সে আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। বুঝিলাম তাহার মতলব ভালো নয়। এক ধাক্কায় তাহাকে সরাইয়া দিলাম। তাহার পরই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঠিক যুদ্ধ নয়, আমি ছুটিয়া পলাইতেছিলাম সে আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ একবার সে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি তাহার হাতে কামড়াইয়া দিতেই সে আবার আমার হাত ছাড়িয়া দিল। তখন আমি ছুটিয়া গিয়া একটা বড় পাথর তুলিয়া তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিলাম। পাথরটা মাথায় লাগিতেই লোকটা পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার বুকে চড়িয়া বসিয়া ছোরা বসাইয়া দিয়াছি। ভাল করি নাই? এ ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল? আমি বলিলাম, এখন উঠিয়া এস। দম ছাগলটাকে টানিয়া লইয়া চলুক এবং ওটাকে আগুনে ঝলসাইয়া ফেলুক। লোকটা ওখানেই পড়িয়া থাক।

তাঁবুর গাড়িটা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁবুটা আমরা বিদেশের হাট হইতে আমদানী করিয়াছিলাম। পশুর লোম ও মোটা সুতা দিয়া প্রস্তুত। অন্ধকার হইলে তাঁবুটা খাটাইয়া রাত্রিবাস করিব বলিয়াই তাঁবুটা আনিয়াছিলাম। কিন্তু কণ্টকা যে কাণ্ডটা করিয়া বসিয়াছে তাহার পর এখানে তাঁবু খাটাইয়া থাকা নিরাপদ মনে হইল না। গাড়িতে মশাল ছিল তাহাই বাহির করিয়া জ্বালানো হইল। দম একটু দূরে একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া গোটা ছাগলটাকেই ঝলসাইতে লাগিল। লোমপোড়ার বিশ্রী গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কেহ না আসিয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে ঘন অন্ধকারে একটা শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

দম বলিল, দূরে বোধহয় একটা ঝরনা আছে। তাহারই শব্দ।

কণ্টকা সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, রক্তে আমার সর্বাঙ্গ মাখা। আমি ঝরনায় স্নান করিয়া আসি। দম তুমি আমার সঙ্গে চল। কণ্টকাকে মানা করা বৃথা। সে মানা শুনিবে না। সে খামখেয়ালী। তাহার সাহসেরও অভাব নাই। তাহার চরিত্রে সামান্য

দূরদর্শিতা থাকিলে সে এই অজানা জায়গায় অন্ধকার রাত্রে ঝরনায় গিয়া স্নান করিতে চাহিত না। বিশেষত, যখন একটু আগে একটা খুন হইয়া গিয়াছে এবং যে ছাগলটার পোড়া-গন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে সেটা আমাদের সম্পত্তি নহে, তখন আমাদের একটু সতর্ক থাকা উচিত। কিন্তু অসমসাহসিকা কণ্টকা বিপদের মধ্যেই ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। সম্ভবত মনে করে তাহার যৌবন তাহাকে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। যৌবন যে বিপদকে ডাকিয়াও আনিতে পারে এ জ্ঞান যে তাহার নাই তাহা নহে, কিন্তু সে বোধহয় মনে করে যৌবনের ছলা-কলার সাহায্যে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার ক্ষমতাও তাহার আছে।

কণ্টকা চলিয়া যাইবার পর আমি খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আমাদের ক্রীতদাসরাও আগুনের চারপাশে বসিয়া রহিল। আমাদের ঘোড়া দুইটি নিকটেই চরিতেছিল। আমার হঠাৎ মনে হইল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? বরং একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া জায়গাটা কি রকম দেখা যাক। আমরা পর্বতের একটা উপত্যকার মধ্যে ছিলাম। কাছে দূরে পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। শুনিয়াছিলাম পর্বতের ওপারে মরুভূমি আছে। আমি একটা ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দুইজন ক্রীতদাসকে বলিলাম আমার অনুসরণ করিতে। উপত্যকার প্রান্তে আসিয়া দেখিলাম সেই মৃত লোকটি নাই। ঘোড়াটা একটা পাহাড়ের পথ ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ...কিছু দূর উপরে উঠিয়া মনে হইল দূর হইতে একটা সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে। পুরুষ-কণ্ঠের সঙ্গীত। সঙ্গীতের ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। দূর হইতে সঙ্গীতের সব কথাও শোনা যাইতেছিল না। কিন্তু সে সঙ্গীতের আবেগ এমনই প্রবল এবং সে আবেগের আবেদন এত মর্মস্পর্শী যে, তাহা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমার ঘোড়াটাও আমাকে সেই দিকে লইয়া চলিল, মনে হইল সঙ্গীত তাহাকেও যেন আকর্ষণ করিতেছে।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া দেখিলাম চাঁদ উঠিতেছে। আর পাহাড়ের চূড়ার ঠিক নীচেই রহিয়াছে একটি তাঁবু। তাঁবুর চারিদিক খোলা, তাঁবুর ছাদ গম্বুজাকৃতি হইয়া আকাশকে যেন খোঁচা মারিতেছে। চারদিকে চারটি মোটা কাঠের থাম, তাঁবুর মাঝখানেও একটি মোটা কাঠের থাম। পাঁচটি থামের উপরই মনে হইল তাঁবুটি বিস্তৃত রহিয়াছে। দেখিলাম তাঁবুর মধ্যে যে থামটি রহিয়াছে তাহাতে ঠেস দিয়া বসিয়া একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি গান গাহিতেছে। তাহার হাতে একটি একতারা। একতারার নিম্নভাগটা একটু অদ্ভুত ধরনের। সহসা মনে হয় মানুষের খুলি দিয়া প্রস্তুত। আমরা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গান থামিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—সম্ভবত জানিতে চাহিল—আমরা কে। কিন্তু তাহার ভাষা আমরা বুঝিলাম না। কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু আমাদের রীতি অনুসারে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলাম। সে-ও ঝুঁকিয়া অভিবাদন করিল আমাকে। তাহার পর মুখে তর্জনী ঠেকাইয়া এবং তর্জনীটি দূরে লইয়া গিয়া সে ইঙ্গিতে যাহা জানাইল তাহা হইতে অনুমান করিলাম সে আমাকে কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছে। কথা বলিলাম এবং পরমুহূর্তেই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সে আমাদের ভাষাতেই উত্তর দিল। দেখিলাম

সে আমাদের ভাষা জানে এবং আরও কয়েক রকম ভাষা তাহার আয়ত্ত। তাহাকে বলিলাম, আপনার গান শুনিয়াই আমরা এখানে আসিয়াছি। গানের ভাষা বুঝি নাই, গানের সুরই আমাদের টানিয়া আনিয়াছে। আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। আপনার পরিচয় জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

তখন সে বলিল—আমার নাম তিরথন। সর্দার মালেকের আমি ভৃত্য।

সর্দার মালেক কে ?

তিনি এই মরুভূমির অধিপতি।

কোন মরুভূমি ?

যতদূর দৃষ্টি চলে চাহিয়া দেখুন। এ সমস্তই সর্দার মালেকের। দৃষ্টির ওপারেও খানিকটা জমি তিনি সম্প্রতি দখল করিয়াছেন। সেখানে এখনও লড়াই চলিতেছে। তেমুজিন খাঁ বন্দী হইয়াছে কিন্তু তাহার স্ত্রী শিকারা এখনও লড়িতেছে। তাহার সাহায্যে নাকি খেথুন সম্প্রদায়ের লোকেরা আসিয়াছে।

আপনি এখানে কি করিতেছেন ?

আমি সীমান্তরক্ষী। সীমান্তে শত্রু হানা দিলে আমি তূর্যধ্বনি করি। মরুভূমির মধ্যে বালিয়াড়ির আড়ালে কিছু সৈন্য আত্মগোপন করিয়া থাকে। তূর্যধ্বনি শুনিলেই তাহারা ছুটিয়া আসে। এই দেখুন আমার তূর্য।

পাশেই প্রকাণ্ড বাঁশীর মত একটা জিনিস রাখা ছিল। সেইটা তুলিয়া দেখাইল।

আপনি এতক্ষণ যে গান গাহিতেছিলেন তাহার সুর অতি চমৎকার। কিন্তু সে গানের ভাষা আমি বুঝিতে পারি নাই। বিষয়টা কি, যুদ্ধ নাকি ? কিন্তু অনুমান করিতেছি যুদ্ধের উদ্দীপনা উহাতে নাই। আছে কোমল মধুর ভাব একটা।

তিরথন কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া যাহা বলিল তাহাতে বুঝিলাম সে সাধারণ মানুষ নহে, সে কবি।

বলিল, আমার গানের বিষয় আমার অন্তরের হাহাকার। একদিন যাহা ছিল এখন যাহা নাই, তাহার জন্য হাহাকার। অতি বাল্যকালে মঙ্গোলিয়ায় দিগন্তবিস্তৃত পীতাভ উঁচু-নীচু বালিয়াড়ি আর লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে, মরুভূমির ঘূর্ণিঝড়ের তপ্ত আবহাওয়ায় মরীচিকাময় স্বাধীনতার মধ্যে আমি দিন কাটাইয়াছি। ওই আবহাওয়াতেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এক হুন পরিবারের ক্রোড়ে। হুনরা যুদ্ধপ্রিয়। পরস্পরের মধ্যে মারামারি করাই তাহাদের স্বভাব। অপরের ধনসম্পত্তি লুটপাট করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে তাহারা। একদল হুন আর একদলকে আক্রমণ করিতেছে ইহা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই রকম একটা মারামারির সময় আমি শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ি। তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলে নাই। অনেক ক্ষুধার্ত হুন মানুষের মাংসও খায়। তাহারা ইচ্ছা করিলে আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু মারে নাই। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর। আমাকে যাহারা হরণ করিয়া আনিয়াছিল তাহারা আর একটি যুদ্ধে আর একটি পরিবার হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিল রিরিকে। দশ বছরের মেয়ে রিরি। চোখ দুটি ছিল হরিণীর চোখের মত। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। গায়ের রং অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল বাদামী। সে রকম উজ্জ্বল বাদামী রং দেখা যায় না। আমি তো আর দেখি নাই। ফরসা নয়, কালো নয়, সে ছিল উজ্জ্বল বাদামী। মাথায় কালো

ভ্রমরকৃষ্ণ চুল। মাথার চুল মুখের খানিকটা ঢাকিয়া গুচ্ছে গুচ্ছে নামিয়া আসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে। অদ্ভুত সুন্দরী ছিল রিরি। কিন্তু ওই সুন্দর সুকোমল রিরির উপর যে অকথ্য অত্যাচার হইত তাহা যেমন অশ্লীল, তেমনি নিষ্ঠুর। রিরি একদিন গভীর রাত্রে আমাকে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, চল পালাই। সেদিন খুব শীত ছিল। একটা তীব্র হাওয়াও বহিতেছিল। অন্ধকারে মরুভূমির উপর দিয়া আমরা ছুটিতে লাগিলাম। না ছুটিলে সেই শীতে জমিয়া আমাদের মৃত্যু হইত। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু ছুটিতেছিলাম। অবশেষে একটা জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। জঙ্গলের ভিতর কিছুদূর গিয়া দেখিলাম রিরি নাই। আস্তে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কোন সাড়া পাইলাম না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে আসিল না। একটু পরেই কিন্তু ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাইলাম। বুঝিলাম হুনের দল ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের ধরিবে বলিয়া। একটু পরেই রিরির আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। তাহার পর আর্তনাদটা হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহারা উহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, কি মারিয়া ফেলিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে ধরিবার জন্যও তাহারা বনটা তোলপাড় করিয়া বেড়াইল খানিকক্ষণ। কিন্তু আমাকে ধরিতে পারিল না। সেই ঘাসের জঙ্গলে আমি এমনভাবে আত্মগোপন করিয়াছিলাম যে তাহারা আমাকে ধরিতে পারে নাই। আমার নাগাল পাইলে ধরিত, কিন্তু নাগালই পায় নাই। আমি বালির মধ্যে নিজের দেহটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহার উপর ঘাসের জঙ্গল ঘন হইয়াছিল। তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই। তাহারা যখন চলিয়া গেল তখনও আমি অনেকক্ষণ সেই বালু-স্তূপের নীচে পড়িয়া রহিলাম। মনে হইতেছিল শীতে বুঝি জমিয়া যাইব। কিন্তু যাই নাই, বালুর আবরণ আমাকে রক্ষা করিয়াছিল। চতুর্দিক যখন নিস্তব্ধ হইয়া গেল তখন আমি সন্তর্পণে বালুর স্তর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। তখনও বেশ অন্ধকার। মাথার উপর দিয়া একঝাঁক পাখী ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। বুঝিলাম প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। ভাবিলাম অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই এই হুনদের এলাকা পার হইয়া অন্য এলাকায় যাইতে হইবে। কালবিলম্ব না করিয়া আবার ছুটিতে শুরু করিলাম। কিছুদিন পরে আবার একদলের হাতে ধরা পড়িলাম। হুনেরা নানা দল মরুভূমিকে নানাভাগে ভাগ করিয়া বাস করে। এক এলাকা পার হইলে অন্য এলাকার লোকেদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। সেখানে ক্রীতদাসের মত থাকিতে হয়। থাকিতে পারিলে আহার আশ্রয় দুই পাওয়া যায়। কিন্তু এক জায়গায় বেশী দিন থাকা যায় না। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় বার বার পলাইতে হইয়াছে। কারণ কোথাও স্নেহের সাগ্রহ বাহু আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে নাই। একমাত্র রিরিই আমাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তাহা শেষ হইয়া গেল। সারা জীবনটাই কষ্টে কাটিয়াছে। জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক হাহাকার জমিয়া আছে। সেই সবই মাঝে মাঝে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গান রূপে মূর্ত হয়। আজ রিরির কথা মনে পড়িতেছিল। আর মনে পড়িতেছিল আমার বাল্যজীবনের কথা। মনে পড়িতেছিল সেই গোবি মরুভূমিকে যাহার ক্রোড়ে একদা জন্মলাভ করিয়াছিলাম। বড় বড় হ্রদের পাশে নলখাগড়ার বন, সেখানে নানারকম পাখীদের আনা-গোনা, মনে পড়িতেছিল সেই বৈকাল হ্রদের তীরে কি বড় বড় পাখীই না দেখিয়াছিলাম, মনে

পড়িতেছিল সেই দিগন্তবিস্তৃত বিস্তারকে, বালিয়াড়ির উঁচু-নীচু অদ্ভুত সৌন্দর্যকে, মেঘহীন আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীকে। আমার গানের সুরে ইহাদের কথাই ধ্বনিত হইতেছিল। তাহা ভীষণ অথচ সুন্দর, মৃদু অথচ কঠিন। ভাষায় তাহা অবর্ণনীয়, সুরেই তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। আর মনে পড়িতেছিল আমার মাকে। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। আমার মুখ তিনি কখনও দেখেন নাই। সর্বদাই আমার মুখে হাত বুলাইয়া দেখিতেন, সর্বদাই আমাকে বুকে আঁকড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহার বুক হইতেই একবার এক দস্যু আমাকে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। আমার বাবাকে আমি দেখি নাই। আমার জন্মের পূর্বেই এক খণ্ডযুদ্ধে তিনি মারা যান।

তিরখন চুপ করিল।

আমি তখন বলিলাম, আমি আপনার নিকট একটি পরামর্শ চাই।

তিরখন উত্তর দিল—তৎপূর্বে আপনার পরিচয় দিতে হইবে।

'আমার নাম টালা। এই পাহাড়ের নীচে পূর্বদিকে নদীতীরে যে সমস্ত জমি আছে সেখানে আমাদের দল বহুদিন হইতে বাস করিতেছে। আমি তাহাদের দলপতি। আমরা জমিতে ফসল ফলাই। আমাদের নৌকা সে ফসল দূরদেশে লইয়া যায়। কয়েকদিন আগে কয়েকটি ঘোড়া আমাদের অঞ্চলে আসিয়াছিল। আমরা তাহাদের ধরিয়াছি, তাহাদের পিঠে চড়িয়াই এখানে আসিয়াছি। তাহাদের লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিলাম তাহারাই আমাদের এখানে লইয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ আগে আমরা এই পাহাড়ে উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমার স্ত্রী কণ্টকা শিকার-প্রিয়। এই উপত্যকায় সে একটি ছাগল দেখিয়া সেটিকে তীরবিদ্ধ করে। তাহার পরই পাহাড়ের অন্তরাল হইতে একজন আসিয়া বলে, আমার ছাগল তুমি মারিলে কেন? এই লইয়া উভয়ের কলহ হয়। লোকটি নাকি কণ্টকাকে আক্রমণ করিয়াছিল। বলিয়াছিল তাহাকে বন্দী করিয়া দলপতির কাছে লইয়া যাইবে। কণ্টকা আত্মসমর্পণ করিবার পাত্রী নয়। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কণ্টকা ছুরিকাঘাতে লোকটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। সব শুনিয়া সেখানে গেলাম, দেখিলাম মৃতদেহটি নাই। হয় সে মরে নাই, কিংবা তাহার মৃতদেহ কেহ তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

তিরখন প্রশ্ন করিল, মৃত ছাগলটা কোথা?

সেটাকে আমরা ঝলসাইতেছি। আপনি যদি অনুমতি করেন কিছু মাংস আপনাকেও আনিয়া দিব। ছাগলটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। আপনি এখন পরামর্শ দিন এ অবস্থায় আমাদের এখন কি করা উচিত।

তিরখন নিজের দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কোনও উত্তর দিল না। আমি সোৎসুকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। অবশেষে সে যাহা বলিল তাহা দুশ্চিন্তা বাড়াইয়া দিল, কমাইল না।

বলিল, আপনারা যাহা করিয়াছেন তাহা যদি সর্দারের কর্ণগোচর হইয়া থাকে তাহা হইলে ভয়ানক কাণ্ড হইবে। আপনাদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত তাঁহার রাগ কমিবে না। তিনি অত্যন্ত রাগী লোক। আমি আপনাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছি একথা তিনি যদি শোনেন তাহা হইলে আমারও সমূহ বিপদ।

হয়তো আমার মুণ্ডচ্ছেদেরই আদেশ দিবেন।

প্রশ্ন করিলাম, এ ছাগলটা কি সর্দারের?

'সম্ভবত তাঁহারই। তাঁহার একটি সদ্য-বিবাহিতা বেগমের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে আজ একটি উৎসব হইতেছে। সে জন্য কিছু ছাগল বাহির হইতে আনানো হইয়াছে। সর্দার এখন যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু কথা আছে রাত্রে যুদ্ধ শেষ করিয়া সর্দার আসিয়া সদলবলে উৎসবে যোগ দিবেন। বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছে। অনেক মাংস চাই। দুইটি উটও মারা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, দল হইতে একটা ছাগল ছিটকাইয়া বোধহয় পলাইয়া আসিয়াছিল। আপনার পত্নী সেইটাই মারিয়াছেন। ছাগলের রক্ষকটি মরে নাই, গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। একটু আগে এই পথেই তাহাকে তাঁবুতে লইয়া গিয়াছে। সম্ভবত তাহার মুখেই সর্দার সব খবর পাইবেন।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি লোক আসিয়া হাজির হইল। বলিল, ছাগলের রক্ষকটি মারা গিয়াছে।

তিরখন তাহাকে প্রশ্ন করিল, সর্দার কখন আসিবেন?

খবর আসিয়াছে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইয়াছেন। শীঘ্রই আসিয়া পড়িবেন।

আচ্ছা তুমি যাও, সর্দার আসিলে আমাকে খবর দিও। লোকটি সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইল। তাহার পর চলিয়া গেল।

তিরখন তখন আমাকে বলিল, আপনাকে দেখিয়া আমার ভাল লাগিয়াছে। আপনার কথাবার্তাও ভালো। সুতরাং আপনার প্রাণরক্ষার চেষ্টা আমি করিব। আমাদের সর্দার অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক। বন্দীদের প্রতি তিনি কিছুমাত্র দয়া করেন না। সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া ফেলেন। আমার আশঙ্কা, আপনারও সেই দশা হইবে। কারণ, আমি যখন আমার নাগালের মধ্যে আসিয়াছেন তখন আপনি আর পলাইতে পারিবেন না। পলাইতে চেষ্টা করিলে আমি তুর্যধ্বনি করিব। সঙ্গে সঙ্গে সেনারা আসিয়া আপনাকে বন্দী করিয়া ফেলিবে। আপনাকে আমি ছাড়িয়াও দিতে পারি না, কারণ মালিকের কাজে ফাঁকি দেওয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু আপনি যদি কয়েকটি মিথ্যা কথা বলিতে প্রস্তুত থাকেন এবং আপনার পত্নীও যদি তাহা সমর্থন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে বাঁচাইবার একটা উপায় বাহির করিব। সম্ভবত, বাহির করিতে পারিব। যে ছাগলটা মারিয়াছেন সেটা কোথায়?

সেটা ঝলসানো হইতেছে।

'সেটাকে গোটাই লইয়া আসুন। আপনার পত্নীকেও আনুন। তাহার পর ওই ঝলসানো ছাগলটা লইয়া আমরা সর্দারের দরবারে যাইব। আমি বলিব, আপনার এই উৎসবে ইনি একটি ঝলসানো ছাগল উপহার আনিয়াছেন। ইনি পাহাড়ের ওপাশের জনপদের মালিক। ইনি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করেন। পাহাড়ের ওপাশে বিস্তৃত সমতল আছে সেখানে ইঁহারা চাষ করেন। ইনি দলপতি। আমাদের দলের একটি লোক ইঁহার পত্নীর সহিত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছে। সে নাকি ইঁহাকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহার হাতে শানিত অস্ত্র ছিল। আত্মরক্ষার জন্য তিনি লোকটির বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়াছেন। লোকটি মারা গিয়াছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু তবু ইঁহারা আশা করিতেছেন যে সমস্ত শুনিয়া আপনি ইহাদের ক্ষমা করিবেন। আমি এই সব কথা যখন বলিব তখন আপনি ও আপনার পত্নী মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া থাকিবেন।

এ সব কথা আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমার আত্মসম্মান যেন ক্ষুন্ন হইতেছিল। কিন্তু দেখিলাম এ অবস্থায় এই দুর্ধর্ষ সর্দারের বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বিরুদ্ধাচরণ করাটাও সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। আমাদের লোকবল কম। তাছাড়া আমরা যুদ্ধেও পারদর্শী নই। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমাদের সমগ্র জনপদকে বিপন্ন করা উচিত নয়।

তিরথন বলিল, আপনি ফিরিয়া যান। ছাগলটাকে আর আপনার পত্নীকে লইয়া আসুন। বেশী বিলম্ব করিবেন না। আমি আপনার ওপর বিশ্বাস করিয়াই আপনাকে যাইতে দিতেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে যদি আপনি ফিরিয়া না আসেন সৈন্য ডাকিয়া আপনাকে ধরিয়া আনিব।

আমি আবার অশ্বারোহণে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া দেখি কণ্টকা দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া সর্বাঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিতেছে। ঝরনায় স্নান করিয়া খুব আনন্দ হইয়াছে তাহার।

কি সুন্দর ঝরনাটা। সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া গিয়াছে। এস এবার খাওয়াদাওয়া করা যাক।

খাইব কি, মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ছাগলটা স্পর্শ করিও না। মহা বিপদে পড়িয়াছি। সর্দারের ছাগল মারিয়াছ। এখন খাওয়াদাওয়া থাক, চল সকলে সর্দারের কাছে যাই। তিনি যদি ক্ষমা করেন তবেই আমরা রক্ষা পাইব। চল দেরি করিও না—

তিরথন যাহা বলিয়াছিল কণ্টকাকে সব বলিলাম। কণ্টকা বলিল, আমি যাইব না।

না গেলে বিপদ আছে। সমূহ বিপদ। সর্দার যদি সসৈন্যে আমাদের তাড়া করেন আমরা ধরা পড়িয়া যাইব। ধরা পড়িলে শাস্তি মৃত্যু। সর্দার নাকি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য দণ্ড দেন না। চল না, দেখিয়াই আসি ব্যাপারটা কি।

চল, কিন্তু আমি যাহা করিব তাহাতে বাধা দিও না।

কি করিবে?

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিব।

বিরাট মরুভূমির মধ্যে সর্দারের সভা বসিয়াছিল একটা প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে। সর্দার প্রশস্ত একটা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশে বসিয়াছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরা। অগ্নিশিখার মতো চেহারা। ধবধবে ফরসা রং, গায়ে লাল রঙের ওড়না। সর্বাঙ্গে লাল পাথরের গহনা চকমক করিতেছে। দেখিলাম সর্দারের সম্মুখে কিছু দূরে নরমুণ্ড স্তূপীকৃত রহিয়াছে। যুদ্ধে কিছু পূর্বে যাহাদের বন্দী করা হইয়াছিল তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে। মুণ্ড-নিঃসৃত রক্তের ধারায় খানিকটা জায়গা ভিজিয়া গিয়াছে। সর্দার গম্ভীর মুখে বসিয়া ছিলেন। মুখে সামান্য একটু ভ্রূকুটি। চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত। কোমরে প্রকাণ্ড একটা বাঁকা তলোয়ার। অঙ্গে বহুমূল্য পোশাক। তাঁহার ঘনকৃষ্ণ চাপ-দাড়ি এবং গুম্ফ সত্যই ভীতিপ্রদ। মনে হইতেছিল একটা মনুষ্য-রূপী সিংহ যেন বসিয়া আছে। সর্দারের দুই পাশে এবং পিছনে বহু সশস্ত্র সৈনিক।

তিরখন কুর্নিশ করিতে করিতে তাঁহার নিকট গেল এবং আমাদের কথা তাঁহার কাছে নিবেদন করিল। আমার কয়েকজন ক্রীতদাস ঝলসানো ছাগলটা লইয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। ছাগলটি রাখিবার জন্য তিরখন প্রকাণ্ড একটি কারুকার্যমণ্ডিত থালা দিয়াছিল। তিরখন ইঙ্গিত করিতেই তাহারা সেটি আনিয়া সর্দারের পদপ্রান্তে স্থাপন করিয়া আমাদের প্রথামতো প্রণাম করিল। দেখিলাম সর্দারের মুখভাব কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়াছে। তিনি ঝলসানো ছাগলটি দেখিলেন এবং হাত নাড়িয়া সেটি অন্যত্র লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারাই কয়েকজন ভৃত্য ছাগলটি স্থানান্তরে লইয়া গেল। তখন তিরখন আমাদের দুইজনকে ডাকিল। আমরা কুর্নিশ করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। তাহার পর সর্দারের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া রহিলাম। সর্দারের দৃষ্টি দেখিলাম কণ্টকার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। তিরখন যে ভাষায় সর্দারকে আমাদের কথা বলিতেছিল সে ভাষা আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য। সর্দার মাঝে মাঝে কেবল বলিতেছিলেন—'খো।' পরে জানিয়াছি 'খো' মানে 'ঠিক'। সব শুনিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া সর্দার যাহা বলিলেন তিরখন তাহার অর্থ আমাদের বুঝাইয়া দিল।

তিরখন বলিল, সর্দার বলিতেছেন যে এই আগন্তুকদের সদ্ব্যবহারে আমি প্রীত হইয়াছি। যে পাষণ্ড লোকটা এই বিদেশিনীর উপর বলাৎকার করিতে গিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়া তিনি শুধু যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নয়, সুরুচিরও পরিচয় দিয়াছেন। যে রমণী পশুর নিকট আত্মসমর্পণ করে সে-ও পশু। আপনাদের উপহার পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের সম্প্রদায়ের বন্ধুত্বলাভ করিলেও আমি খুশী হইব। কিন্তু একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাই। সমানে সমানে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব। আপনারা ভূমি চাষ করিয়া যে সম্পত্তি আহরণ করেন আমাদের কাজ তাহা লুণ্ঠন করা। সুতরাং আমাদের উভয়ের ধর্ম বিপরীত। যে তেমুজিনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হইতেছে তাহারাও কৃষক-সম্প্রদায়, জমি চাষ করিয়া প্রভূত সম্পত্তি উৎপাদন করে। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা প্রচুর সৈন্য এবং প্রচুর যুদ্ধোপকারণও রাখিয়াছে। তাহাদের অশ্ববাহিনী বিপুল, তাহাদের রণকৌশলও প্রশংসাযোগ্য। তেমুজিনের পত্নী শিকারা নিজেই একজন যোদ্ধা। তিনি নিজেই এখন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের দেশ হইতেই আমি আমার কনিষ্ঠা-পত্নী ভুলেরাকে সংগ্রহ করিয়াছি। আশা করিতেছি এইবার আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হইবে। আমি আত্মীয়দের সহিত যুদ্ধ করি না। ভুলেরা শিকারার নিকট একটা শান্তি-প্রস্তাব পাঠাইয়াছে, দেখা যাক কি হয়। আমি জানিতে চাই আপনারা যদি আমাদের বন্ধুত্ব কামনা করেন, কি শর্তে সেটা হইবে?

আমি বলিলাম, বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই কামনা করি। আমি আমাদের সম্প্রদায়ের দলপতি। তবু শর্তের কথা আমার দলের অন্যান্য লোকদের সহিত পরামর্শ না করিয়া বলিতে পারি না।

সর্দার বলিলেন, শর্ত দুই প্রকার হইতে পারে। এক, সম্পত্তি বিনিময় করিয়া, না হয় বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া—কণ্টকার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, আপনাদের সম্প্রদায়ের কয়েকজন রূপসীকে আমার পরিবার-ভুক্ত করিতে পারিলে আমি খুশি হইব। আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু রমণীকে আপনারাও বিবাহ করুন, তাহাতে

আমার আপত্তি নাই। সহসা কণ্টকার দিকে ফিরিয়া তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, এ বিষয়ে আপনার কি মত?

কণ্টকা ইহা শুনিয়া যাহা করিল তাহা বিস্ময়জনক। সে কিছু বলিল না। সে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সর্দারের দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া আগাইয়া গেল। সর্দার হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে আরও নিকটে রাখিলেন। তখন সে বলিল, আমি যাহা করিতে চাই তাহাতে কেহ বাধা দিবে না তো?

তিরখন তাহার বক্তব্য অনুবাদ করিয়া সর্দারকে শুনাইল। সর্দার মাথা নাড়িয়া জানাইলেন না, কেহ বাধা দিবে না। তখন কণ্টকা সর্দারের কনিষ্ঠা পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, আপনিও অনুমতি দিন। তিনি কোনও উত্তর দিলেন না, মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা দেখা গেল, তাঁহার দুই চোখে জল টলমল করিতেছে। সর্দার বলিলেন, আমার হুকুমের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। আমার সহস্র পত্নী। প্রত্যেকের মতামত শুনিয়া যদি আমাকে চলিতে হয়, আমি এক পা-ও চলিতে পারিব না। আপনি যাহা করিতে চান তাহা নির্ভয়ে করুন। কেহ আপনাকে বাধা দিবে না। ইহার পর কণ্টকা যাহা করিল তাহা আরও বিস্ময়কর। সে সোজা গিয়া সর্দারের কোলের উপর বসিয়া পড়িল এবং দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

সর্দার বলিলেন—খো।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। সর্দার সোচ্ছ্বাসে কি যেন বলিতে লাগিলেন। তিরখন তাহার অনুবাদ করিল। বলিল, সর্দার বলিতেছেন আপনার পত্নী আচরণ দ্বারা যাহা ব্যক্ত করিলেন তাহার অর্থ অতিশয় স্পষ্ট। আমি ইহাতে খুব আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু ইনি আপনার পত্নী। আপনার এ বিষয়ে অভিমত কি? আপনি যদি বলেন আমি এখনই ইহাকে আমার কোল হইতে নামাইয়া দিব। আমি বলিলাম, আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের পতি নিজেরাই নির্বাচন করিতে পারে। কণ্টকা যদি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করে আমার কোন আপত্তি নাই।

কণ্টকার চোখে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল। তাহার পরই সহসা চতুর্দিকে একটা গোলমাল শুরু হইয়া গেল। সকলেই আমরা সামিয়ানার তলা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সেদিন পূর্ণিমা ছিল। দেখিলাম চাঁদের খানিকটা কালো হইয়া গিয়াছে। গ্রহণ লাগিয়াছে। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হইলে আমরা সকলে টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিতাম। তাহার পর আগুনের প্রজ্বলিত মশাল আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিতাম। উদ্দেশ্য, আমাদের দেওয়া আগুন হইতে সূর্য বা চন্দ্র তাহার জ্যোতি সংগ্রহ করুক। কিন্তু ইহাদের আচরণ দেখিলাম অন্যরূপ। ইহারা দেখিলাম তীরে কাপড় জড়াইয়া এবং সেগুলি চর্বিতে ভিজাইয়া ছোট ছোট মশাল জ্বালিতেছে, এবং সেই মশালগুলি ধনুকে লাগাইয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। আকাশে অসংখ্য জ্বলন্ত মশাল উড়িতে লাগিল। তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, ইহাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি ইহাই করিতেন। ইহাদের বিশ্বাস জ্বলন্ত মশালগুলি হইতে চন্দ্র পুনরায় তাহার

জ্যোতি সংগ্রহ করিতে পারিবে। ভাবিয়া দেখিলাম আমরা যাহা করি তাহা ইহারই রকমফের। উদ্দেশ্য একই।

যাই হোক, সেই জনারণ্যে কণ্টকা হারাইয়া গেল। সর্দার এবং তাহার কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরাকেও আর কোথাও দেখিলাম না।

তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এখন আমরা কি করিব? তিরখন বলিল—কিছুক্ষণ এইখানেই থাকা যাক। আপনার পত্নীকে না লইয়া কোথায় যাইবেন?

বলিলাম, আমার পত্নীর যে ব্যবহার দেখিলাম তাহাতে মনে হয় না যে সে আমার সহিত ফিরিয়া যাইবে। তিরখন হাসিয়া উঠিল।

বলিল, নারীদের চরিত্র অতি জটিল। আপনি অত সহজে উহাদের বিচার করিবেন না। আপনার পত্নীর কি উদ্দেশ্য তাহা এখনই বোঝা যাইবে না। কিছুদিন সবুর করিতে হইবে।

আমরা দুইজনেই সেই জনারণ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। চারিদিকেই চীৎকার আর কোলাহল। চন্দ্রগ্রহণ সকলকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ছোট অসংখ্য মশাল ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কিছু দূরে আসিয়া দেখিলাম একদল লোক উবু হইয়া বসিয়া কি একটা কাজে যেন ব্যস্ত রহিয়াছে। আকাশের দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কে? এরা আকাশের দিকে মশালের তীর ছুঁড়িতেছে না কেন? তিরখন বলিল—উহারা ক্রীতদাস। অত্যন্ত বীভৎস এবং হিংস্র। লক্ষ্য করিয়া দেখুন উহাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রত্যেকের পায়ে শিকল বাঁধা আছে। হিংস্র প্রকৃতির জন্য সর্দার ইহাদের কিনিয়া আনিয়াছেন। উদ্দেশ্য, ইহাদের হিংস্র সৈন্য-বাহিনীতে পরিণত করা। ইহারা নরমাংস খায়। আজ যে সব যুদ্ধবন্দীর মাথা কাটা গিয়াছে—যে সব মাথা আপনি সর্দারের দরবারে স্তূপীকৃত দেখিলেন—সেই সব মাথার কবন্ধগুলি এই নরমাংসভক্ষকের দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক যুদ্ধের শেষেই দেওয়া হয়। উহারা কবন্ধগুলি টুকরা টুকরা করিতেছে। পরে আগুনে ঝলসাইয়া খাইবে। অনেকে কাঁচাও খায়।

আমি নির্বাক বিস্ময়ে রহিলাম। ইহাদের কাহারও আকাশের দিকে দৃষ্টি নাই, চন্দ্রে কি হইতেছে না হইতেছে সে বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহাদের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ কতকগুলি ছিন্নভিন্ন কবন্ধের উপর। শুনিতে পাইলাম ইহারা একটা হিস্ হিস্ শব্দও করিতেছে। সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না।

চলুন অন্য কোথাও যাই।

কিছু দূরে একটা টিলা আছে। চলুন সেইখানেই যাওয়া যাক। আপনাকে গান শুনাইব।

চলুন।

টিলাটি সত্যই নির্জন স্থানে অবস্থিত। চারিদিকে মরুভূমি যেন সাগরের মতো দিগন্ত-বিস্তৃত। মাঝখানে নাতি-উচ্চ টিলাটি।

সেই টিলার উপর বসিয়া তিরখন গান ধরিল।

সে গানের ভাষা আমার নিকট দুর্বোধ্য, তবু তাহার সুর আমার মনে একটা বেদনা

জাগাইয়া তুলিল। আমি মুগ্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। গান শেষ হইলে তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গানের অর্থ কি ?

তিরখন বলিতে লাগিল, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করে। অত্যাচারের তরবারি মানুষকে মারিয়া ফেলে। কিন্তু মানুষের দেহটাই মরে, আর কিছু মরে না। সে অন্য দেহে অন্য রূপে জন্মগ্রহণ করে। বৈকাল হ্রদের তীরে বড় বড় নলখাগড়ার অন্তরালে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত বর্ণের পাখীরা নামে। বৈকাল হ্রদের জলে বড় বড় শ্বেত-হংস ভাসিয়া বেড়ায়। মনে হয় তাহারা রূপান্তরিত মানুষ। অত্যাচারিত নিহত মানুষরাই বোধহয় পক্ষীর রূপ ধরিয়াছে। বৈকাল হ্রদের তীরে একবার বাদামী রঙের একটি চমৎকার পাখী দেখিয়াছিলাম। তাহার মুখটা সাদা, পুচ্ছটি নীল। সেই পাখীটার ছবি মনে জাগিল। সে পাখী কি এখনও বৈকাল হ্রদে আসে ? আমার রিরি কি সেই পাখীর রূপ ধরিয়া বৈকাল হ্রদের উদার পরিবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ? সে কি গান গায় ? তাহার গানে আমার কথা থাকে ? আমার স্মৃতি কি তাহার মন এখনও আচ্ছন্ন করিয়া আছে ? আমার গানে এই সব কথাই সুর করিয়া বলিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি হূন ?

হ্যাঁ, এক হূন পরিবারেই আমার জন্ম। চিরকাল আমি হূনদের সঙ্গেই আছি। সর্দার মালেক একটি হূন সম্প্রদায়েরই দলপতি।

হূনদের বিশেষত্ব কি ?

তিরখন কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, আমাদের প্রধান বিশেষত্ব, আমরা যাযাবর। আমরা কোথাও ঘর বাঁধি না। পথই আমাদের ঘর। সে পথ চিরপরিবর্তনশীল। আমাদের খাদ্যদ্রব্য, আমাদের তাঁবু, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, আমাদের পরিবারবর্গ, আমাদের সৈন্যদল, আমাদের ক্রীতদাসেরা, আমাদের ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল হরিণের দল—সবই চলন্ত। সকলকে লইয়া আমরা পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়াই। অপরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করাই আমাদের জীবন-ধারণের উপায়। সে জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। প্রকৃতির সহিতও আমরা যুদ্ধ করি। রোদে পুড়ি, জলে ভিজি, বরফে কাঁপি, কখনও জমিয়া যাই, কখনও মরিয়া যাই। তবু আমরা দমি না, থামি না। বন্য জন্তু শিকার করি আর লুণ্ঠন করি সেই সব মূর্খদের যাহারা ঘর-বাড়ি বানাইয়া ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া একস্থানে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে।

বলিলাম, আমরা তো সেই দলের—

তোমরাও একদিন হূনেদের পাল্লায় পড়িবে। কিন্তু আমাদের সহিত তোমরা যদি বন্ধুত্ব কর, সর্দার তোমাদের রক্ষা করিবেন। হূনদের বন্ধুপ্রীতি অসাধারণ। আমার ঠাকুমার মুখে গল্প শুনিয়াছি। তিনি এ গল্প শুনিয়াছিলেন তাঁহার ঠাকুমার মুখে। চীন সাম্রাজ্যের সহিত হূনদের চিরশত্রুতা। অহি-নকুল সম্পর্ক। চীন সম্রাটরা অধিকাংশই অত্যন্ত বিলাসী। বিলাস মানুষের মনুষ্যত্বে ঘুণ ধরাইয়া দেয়। ক্রমশ তাহারা অপদার্থ কামুক ননীর পুতুল হইয়া পড়ে। তাহাদের এই অপদার্থতার সুযোগ লইয়া হূনরা তাহাদের আক্রমণ করে। চীন সম্রাটরা নিজেদের মধ্যেও মারামারি করে। এক বংশ আর এক বংশকে উচ্ছেদ করিয়া সিংহাসন জবর দখল করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে কিছুদিন। আবার তাহাদের মধ্যেও পচ ধরে। একবার

এক রাজ্যচ্যুত চীনা রাজকুমার চীন-উই হূনদের আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদের নিকট গিয়া বলিয়াছিল—আমি কোমল জীবন যাপন করিতে চাই না, তোমাদের মতো কঠোর জীবন যাপন করিতে চাই। তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও। হূনরা যদিও চীনদের শত্রু তবু ওই রাজকুমারকে তাহারা মারিয়া ফেলে নাই। সাদরে আহ্বান করিয়া নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিল—

ঠিক এই সময় গোলমালটা তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিলাম আমাদের সম্মুখ দিয়া কয়েকটি ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে। অশ্বারোহী নাই। তাহার পরে দেখিলাম কয়েকটি অশ্বারোহীও ছুটিয়া চলিয়াছে। তিরখন বলিল—এ তো আমাদেরই সৈন্য। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি, তোমরা পলাইতেছ কেন?

শিকারার কাছে আমরা হারিয়া গিয়াছি। অগণিত খেখুন সৈন্য আমাদের পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে। না পলাইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। তুমিও পালাও আর দেরি করিও না।

তিরখন ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

দুটি অশ্বারোহীহীন ঘোড়া আমাদের সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, তিরখন দুইটাকেই ধরিয়া ফেলিল। সে যে এত ক্ষিপ্র তাহা অনুমান করিতে পারি নাই।

তিরখন বলিল, চল পালাই। একটাতে আমি চড়িতেছি আর একটাতে তুমি চড়।

পলাইয়া কোথা যাইব?

আপাতত চল তোমাদের দেশে যাই।

আমাদের এলাকায় যখন পৌঁছিলাম তখন ভোর হইতেছে। দূর হইতে টুকচুম্বার শিখর দেখিতে পাইলাম। রক্তবর্ণ পুষ্পের সমারোহে সে শিখর যেন বিরাট একটা অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতেছে। একটু ভয় হইল। একজন অপরিচিত হূনকে সঙ্গে আনিয়া অন্যায় করিলাম না তো? কিন্তু তখনই মনে হইল এই সর্বপ্রচারী হূনের গতিরোধ করিবার শক্তি আমার নাই। ইহার সহিত বন্ধুত্ব করিলেই বরং লাভ আছে। আমার ক্রীতদাসরাও একটু পরে তাঁবু লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল তাহারা। তাহারা ভাবিয়াছিল আমি যখন ময়ূপতি সর্দারের কবলে পড়িয়াছি তখন আমার রক্ষা নাই। আমার নিধনবার্তাই তাহারা বহন করিয়া আনিতেছিল। আমাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত এবং পুলকিত হইল তাহারা। কণ্টকার সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করিল না। আমি যদিও জানিতাম কণ্টকা হূন-সর্দারের অংক-শায়িনী হইয়াছে তবু তাহার জন্য আমার মনে মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আমি বাহিরে সে কষ্ট প্রকাশ করিলাম না।

আমাদের প্রথা অনুসারে আমার দামামায় ঘা দিলাম। সকলে সমবেত হইলে বলিলাম—আমার সঙ্গে একজন অতিথি আসিয়াছেন ইঁহার সংবর্ধনা কর। সকলে তিরখনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তার পর গান গাহিতে গাহিতে তাহাকে নদীতীরে লইয়া গেল। সেখানে তাহাকে স্নান করাইল। স্নানের পর গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল। তাহার পর নানাবিধ খাদ্যসম্ভার আনিয়া সাজাইয়া দিল তাহার সম্মুখে

আমি দোহার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম। একটু পরেই দোহা প্রচুর দুগ্ধ, নানারকম ফল এবং একটি মৃত হরিণ লইয়া উপস্থিত হইল। হরিণটি সে কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিয়াছিল। সেটি আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া সে আদেশ করিল ইহার সৎকার কর।

মৃত ভালুকের সৎকারের কথা আগেই বলিয়াছি। সেই ভাবেই এই হরিণটিকেও বন্দনা করিয়া আমরা তাহার মাংস টুকরা টুকরা করিয়া আগুনে ঝলসাইতে লাগিলাম। তিরখন নীরবে সব দেখিতেছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, হরিণকে মারিয়া তাহার পর হাতজোড় করিয়া তাহার গুনগান করা আমার নিকট হাস্যকর বোধ হইতেছে। ইহার মধ্যে তোমাদের যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইতেছে তাহা অসঙ্গত। হয়তো ইহার মধ্যেই তোমাদের বিনাশের বীজ নিহিত হইয়া আছে। যাহা আমরা নিজেদের শক্তিবলে জয় করি, তাহার জন্য কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন কি। বাঘ বা ভালুক বা হরিণ যখনই সুযোগ পায় তখনই আমাদের মারিবার চেষ্টা করে। এজন্য তাহারা কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। আমরাই বা হইব কেন?

দোহা বলিল—কারণ আমরা বাঘ, ভালুক বা হরিণ নই, আমরা মানুষ। তাই বাধ্য হইয়া যখন আমরা অন্যায় করি তখন আমাদের দুঃখ হয়।

তিরখন বলিল—যে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আমাদের মধ্যে শক্তি ও সাহস দিয়াছেন যাহাতে আমরা লুণ্ঠন করিতে পারি। অপরকে না মারিয়া আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। অপরকে লুণ্ঠন করিবার প্রবৃত্তি ভগবানই আমাদের মধ্যে দিয়াছেন। সেই প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। ইহার জন্য কুণ্ঠার কোনো প্রয়োজন নাই। যে সবল শক্তিমান সে-ই বাঁচিয়া থাকিবে, অশক্ত দুর্বলের বাঁচিবার অধিকার নাই, বলিয়া তিরখন একটি সুমিষ্ট হাসি হাসিল। তাহার পর বলিল—আমার জীবনে বহুবার আমি বহুভাবে বঞ্চিত হইয়াছি। কিন্তু কখনও কাহারও বিরুদ্ধে আমি নালিশ করি নাই। কারণ অপরাধটা যে আমার। আমি দুর্বল। এখন যে সর্দারের ক্রীতদাস আমি, তাঁহার অনুগ্রহের উপরই জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিবার শক্তি আমার নাই, তাই তাঁহার অবিচার অত্যাচার সব মানিয়া লইয়াছি। কাহারও বিরুদ্ধে কোনও নালিশ আমার নাই। কারণ অপরাধ আমার, আমি দুর্বল। এই যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে তাহা জানি না। মরুভূমির ওপারে বিরাট পিরালা রাজ্য আছে। তেমুজিন সে রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইঁহারাও আপনাদের মত কৃষিকর্ম করেন, বাণিজ্য-ব্যবসায় করেন। আত্মরক্ষার জন্য ইঁহারা বিশাল সৈন্যবাহিনীও গঠন করিয়াছেন। হিংস্র এবং দুর্ধর্ষ খেথুন সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের মিত্রতা আছে। আমাদের সর্দার মালেক ইঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। অপরের রাজ্য আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়াই ইঁহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। পিরালা রাজ্যের রাজা তেমুজিন যুদ্ধে মারা গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী শিকারা দোর্দণ্ড-প্রতাপশালিনী। তিনি খেথুনদের সাহায্য লইয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছেন। আমাদের সৈন্যরা পলাইয়া যাইতেছে দেখিলাম। জানি না যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে। আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহাও অনিশ্চিত।

দোহা বলিল, আপনি আমাদের অতিথি হইয়া আসিয়াছেন, আমাদের দলপতি আপনাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, আপনি যতদিন খুশী আমাদের এখানে থাকুন।

আপনি সবল ও দুর্বলের যে সংজ্ঞা ও পরিণতির কথা বলিলেন আমরা তাহার সহিত একমত নই। আমরা মনে করি আজ যে দুর্বল, জন্মান্তরে সে-ই হয়তো সবল হইবে। দুর্বলের প্রতি অযথা অত্যাচার করা তাই আমরা নিরাপদ মনে করি না। যখন বাধ্য হইয়া জীবনধারণের জন্য তাহা করিতে হয়, তখন আমরা তাই অত্যাচারিতের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি। করিয়া তৃপ্তি পাই। আপনি নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন, আপনার কোনও অসুবিধা আমরা হইতে দিব না। একজন ক্রীতদাস এবং একজন ক্রীতদাসী সর্বদাই আপনার সঙ্গে থাকিবে। আপনার ইচ্ছামত যে-কোনও কাজ আপনি করিতে পারেন। আমাদের এখানে নানা রকম কাজ হয়।

তিরখন অভিবাদন করার ভঙ্গীতে দোহাকে নমস্কার করিয়া কহিল—আপনাদের ভদ্রতায় আমি খুব মুগ্ধ। কিন্তু আপনাদের এই ভদ্রতা আমাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আমার ধারণা, ভদ্রতা একপ্রকার দুর্বলতা। ভদ্রলোকেরা জীবনযুদ্ধে টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। নির্মম দস্যুদের হস্তে তাহারা বিনষ্ট হইবে। আপনারা সৈন্যবাহিনী গঠন করুন। শক্তিশালী রাজাদের সহিত বন্ধুত্ব করুন। বিষয়-সম্পত্তি করিলেই দস্যু আসিবে, দস্যুদের ঠেকাইতে হইলে সৈন্য চাই। আমরা হুনরা তাই কখনও বিষয়-সম্পত্তি করি না, আমরা যাযাবর, আমাদের সম্পত্তিও যাযাবর। কিন্তু আপনারা যখন যাযাবর হইতে পারিবেন না, তখন আপনাদের সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি আপনাদের হিতৈষী হিসাবেই এ পরামর্শ দিতেছি।

দোহা বলিল, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। কোনও শক্তিশালী রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আপত্তি নাই। আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত রাখা যে উচিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। কিন্তু কিভাবে তাহা সম্ভবপর হইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। সামরিক শিক্ষা দিবার মত লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? আমরা তো এ বিষয়ে অজ্ঞ।

হুনদের ভিতর হইতেই লোক পাওয়া যাইবে। আপনারা যদি যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেন তাহা হইলে আমি লোক যোগাড় করিয়া দিতে পারি। তবে একথাও আপনাদের বলিয়া দিতেছি—হুনরা খুব লোভী, খুব অসভ্য, বর্বরতাই তাহাদের স্বভাব। তবে প্রচুর পারিশ্রমিক দিলে তাহারা আপনাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাহাদের বর্বর আচরণ আপনাদের সহ্য করিতে হইবে। তাহারা অত্যন্ত কামুক। হয়তো আপনাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের লইয়া টানাটানি করিবে। এ সব সহ্য করিতে পারিবেন কি? যদি পারেন তাহা হইলে আমি ঘুরঘুট্ খাঁকে খবর দিই। সে সর্দার মালেকের বিরাগভাজন হইয়া সদলবলে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আমার সহিত সে যোগাযোগ রাখিয়াছে। আমি খবর দিলে সে আপনাদের এখানে আসিবে এবং আপনাদের সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।

ঘুরঘুট খাঁ এখন কোথায় আছেন?

তিনি এক পার্বত্য প্রদেশের জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া আছেন। এখান হইতে দুইদিনের পথ। আপনাদের সম্মতি থাকিলে আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে পারি।

দোহা জিজ্ঞাসা করিল—সর্দার মালেকের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল কেন?

'আসল কারণ ভুলেরা। ভুলেরা আসলে ঘুরঘুটেরই পত্নী। সে তাহাকে যখন বিবাহ করিয়া আনিতেছিল তখন সর্দার মালেক তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

বলিলেন—ইহাকে আমিই বিবাহ করিব। তুমি অন্য মেয়ে দেখ। জোর করিয়া ভুলেরাকে বিবাহ করিয়া তিনি ভুলেরাকে বলিলেন—তুমি যদিও আমার কনিষ্ঠা পত্নী হইলে কিন্তু তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠার অধিকার দিলাম। তোমার সম্মানার্থে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করিব। যদিও যুদ্ধ চলিতেছিল তবু সর্দার ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই ভোজেই আপনাদের দলপতি টালা উপস্থিত ছিলেন। ইহার কয়েকদিন পূর্বেই ঘুরঘুট দলত্যাগ করিয়াছিল। যাইবার পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়াছিল কোথায় সে থাকিবে। আপনারা যদি বলেন আমি তাহার নিকট চলিয়া যাই, তাহাকে লইয়া আসি—

সহসা ভিংড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম সে সর্বাঙ্গে লাল ও কালো রং মাখিয়াছে। তাহার হাতে একটি জীবন্ত বাজপাখী। মাথার সামনে শকুনের মুণ্ডটা বীভৎস দেখাইতেছে।

ভিংড়া বলিল—শুনিতেছি তোমরা বিদেশীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছ। এই বাজপাখী আসিয়া আমাকে খবরটি দিল। বাজপাখী বজ্রের দূত। বজ্রের সহিত আমি বন্ধুত্ব করিয়াছি। বাজপাখীর মুখে বজ্রই আমাকে খবরটি পাঠাইয়াছে। আরও বলিয়াছে তোমরা যদি বিদেশীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা কর, বজ্র তোমাদের দলপতিকে নিধন করিবে। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে তাহার।

এই বলিয়া সে বাজপাখীর কানের কাছে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর বাজপাখীটিকে সে ছাড়িয়া দিল। সোঁ করিয়া উড়িয়া গেল পাখীটা।

তিরখন ভিংড়ার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়াছিল। ভিংড়ার শেষ কথাগুলি শুনিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, বজ্রের সহিত যদি সত্যই আপনার বন্ধুত্ব হইয়া থাকে তবে তো আপনি পৃথিবীর সম্রাট হইতে পারেন। তাহা না হইয়া আপনি এ রকম অদ্ভুত বেশে প্রায়-উলঙ্গ হইয়া সর্বাঙ্গে পাখীর নখ পালক ও ঠোঁট ঝুলাইয়া উন্মাদের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন কেন বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কে?—

দোহা বলিল—উনি আমাদের আত্মীয়। সম্পর্কে আমাদের দলপতির বৈমাত্র ভাই। কিন্তু উনি আমাদের জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের স্বতন্ত্র একটি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জগতের সহিত আমাদের জগতের কোনও মিল নাই। উনি মনে করেন নিজের শক্তিবলে উনি প্রকৃতির শক্তিকে বশীভূত করিতে পারিবেন। সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, ঝঞ্ঝা, বর্ষা, বন্যা সকলেই উঁহার আজ্ঞা অনুসারে চলিবে। আমরা তাহা সম্ভব মনে করি না। তাই উনি আমাদের সঙ্গে থাকেন না। দূরে একটা পাহাড়ে একাই থাকেন। পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

তিরখন বলিল, শুনিয়াছি আমাদের পূর্বপুরুষরা যে দেশে বাস করিতেন সে দেশকে সকলে দানব-দৈত্য ভূত-প্রেতের দেশ বলিত। সে দেশের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। সে দেশের বিরাট তৃণ-প্রান্তর, সে দেশের প্রকাণ্ড মরুভূমি, সে দেশের প্রচণ্ড শীত-গ্রীষ্ম, সে দেশের প্রবল ঝঞ্ঝা, বস্তুত সে দেশের তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা এমনই ভয়ংকর ছিল যে, সে দেশে কোনও মানুষ বাস করিতে পারে, ইহা কেহ কল্পনাই করিতে পারিত না। সভ্যদেশ হইতে কোনও

মানুষ সে দেশে গেলে আর ফিরিয়া আসিত না। সকলে মনে করিত দৈত্য-দানবেরা তাহাদের খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে দেশে কাহারা ছিল জানেন? হুনেরা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা। দৈত্য-দানব ভূত-প্রেত নয়। এই হুনদের কোনও অলৌকিক শক্তি ছিল না। তাহাদের সম্বল ছিল তাহাদের ঘোড়া, তাহাদের শানিত অসি, তাহাদের দুর্জয় সাহস, তাহাদের কষ্ট সহ্য করিবার অসীম ক্ষমতা। প্রতিকুল প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই তাহারা বাঁচিয়া থাকিত, কিন্তু সে যুদ্ধ তাহারা করিত তাহাদের অদম্য চরিত্রবলে, কোনও মন্ত্রের সাহায্যে নয়।

ভিংড়ার মুখে একটা ভ্রূকুটি-কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, অদম্য চরিত্রবলেই প্রকৃতিকে বশ করা যায়। কিন্তু সে অদম্য চরিত্র কেবল ঘোড়া বা তলোয়ার থাকিলেই হয় না। তাহা লাভ করিবার আরও নানা উপায় আছে। আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি তাহা সাধারণ লোকের নাগালের বাহিরে। আমি চলিলাম। কিন্তু আমি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া গেলাম তাহা যেন ভুলিও না।

ভিংড়া চলিয়া গেল। আমি একটু ভয় পাইয়া গেলাম। ভিংড়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় ফলিয়াছে। আমি কি সত্যই বিদেশীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছি? আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, আমরা যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারি, তাহার ব্যবস্থাই তো করিতেছি আমি। ইহার জন্য বজ্র আমাকে মারিয়া ফেলিবে?

সহসা চমকিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম আকাশে ধুলো উড়াইয়া অনেক অশ্ব আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহীদের চীৎকারে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা আসিয়া পড়িল। দেখিলাম সকলেরই হাতে তীক্ষ্ণ বর্শা, প্রত্যেকেরই কটি-বন্ধ হইতে তরবারি ঝুলিতেছে। প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ সৈন্য। সৈন্যদের পুরোভাগে যে দুইজন ছিল তাহারা ঘোড়া হইতে নামিয়া আমাদের দিকে আগাইয়া আসিল। কাছে আসিতেই কণ্টকাকে চিনিতে পারিলাম। চিনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সৈন্যের বেশ পরিয়া এ কাহাদের সঙ্গে কণ্টকা আসিয়াছে? কণ্টকা বলিল, তোমার জন্য একটি উপহার আনিয়াছি। ঘোড়ার জিনের পিছন দিকে একটি পুঁটুলি বাঁধা ছিল। কণ্টকা সেটি আনিয়া আমার হাতে দিল। বলিল, খুলিয়া দেখ।

খুলিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। এ কি, এ যে সর্দার মালেকের মুণ্ড।

কণ্টকা হাসিয়া বলিল, আমি স্বহস্তে উহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছি। পাষাণ্ডটা যখন আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল তখন কৌশলে আমি উহারই কোমর হইতে ছোরা খুলিয়া উহার গলায় বসাইয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর বাহির হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম—সর্দার মালেকের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে সকলে ভীত হইয়া পড়িল। মালেকের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্তত ছুটিতে লাগিল। তখন শিকারা সুযোগ পাইলেন। সৈন্য লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন সর্দারের সৈন্যদের উপর। শিকারার সহিত আলাপ কর, তিনি আমাদের সহিত আলাপ করিতেই আসিয়াছেন।

কণ্টকার সহিত অপর যে সৈনিকটি ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়াছিল তিনি অভিবাদন করিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন। শিকারাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। মুখটা ঠিক যেন ব্যাঘ্রিনীর মুখ। দেহটাও বেশ লম্বা-চওড়া। স্ত্রীলোক বলিয়া মনেই হয় না। শিকারা আমাকে বলিল সে আমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য

আসিয়াছে। কন্টকার সহিত সে 'সেহলা' পাতাইয়াছে। 'সেহলা'র স্বামী তাহার বন্ধু। কন্টকা সর্দার মালেককে বধ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার পক্ষে নাকি যুদ্ধজয় সম্ভব হইয়াছে। এ জন্য কন্টকার কাছে সে কৃতজ্ঞ। দোহা নিকটেই নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল। শিকারা দোহার বিশাল দেহের দিকে নির্নিমেষে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর প্রশ্ন করিল, উনি কে?—

উনি আমাদেরই লোক। উনি আমাদের বিরানি অরণ্যের অধিপতি।

শিকারা দোহাকেও অভিবাদন করিল।

সহসা আবিষ্কার করিলাম তিরখন অন্তর্ধান করিয়াছে। তখন কিভাবে সে অন্তর্ধান করিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। সম্ভবত তাহার ভয় হইয়াছিল শিকারা যদি বুঝিতে পারে সে সর্দার মালেকের ভৃত্য, তাহা হইলে তাহাকে বন্দী করিবে। আমার সন্দেহ হইল তিরখন হয়তো ঘুরঘুটের সন্ধানে সেই পার্বত্য প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে।

শিকারাকে প্রশ্ন করিলাম, সর্দার মালেকের কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরাকে আপনারা কি বন্দী করিয়াছেন?

তাহাকে আপনি চিনিলেন কিরূপে?

তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই। দূর হইতে সর্দার মালেকের সভায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। কন্টকা সর্দার মালেকের একটি ছাগল মারিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া আমাদের সে সভায় যাইতে হইয়াছিল। সেই সভাতেই কন্টকার প্রতি সর্দারের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। তাহার পরিণাম যে কি হইয়াছে তাহা আপনার অবিদিত নাই। সেই সভাতেই দেখিয়াছিলাম ভুলেরাকে। পরে শুনিয়াছি তাহাকে সর্দার নাকি তাহার স্বামী ঘুরঘুট খাঁ-র নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিলেন। ঘুরঘুট খাঁ সর্দারের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন। ইহাও শুনিয়াছি এই অপমানের পর ঘুরঘুট খাঁ সদলবলে সর্দারকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাকি ইচ্ছা ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ অপমানের প্রতিশোধ দিবেন। তাই কৌতূহল হইতেছে ভুলেরার কি হইল? তাহাকে কি আপনারা বন্দী করিয়াছেন?

শিকারা বলিল, আপনি যে সব খবর দিলেন তাহা সবই সত্য। আমার গুপ্তচরেরা-ও এই খবর আনিয়াছে। সর্দার মালেকের অনেক পত্নী ছিল, তাহাদের প্রত্যেককে আমি বধ করিয়াছি, কিন্তু ভুলেরাকে করি নাই। আমি ঘুরঘুট খাঁ-র কাছে খবর পাঠাইয়াছি সে যদি আসিয়া আমার দলে যোগ দেয় এবং আমার বাধ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ভুলেরাকে সে ফিরিয়া পাইবে। ভুলেরা এখন বাঁদী হইয়া আমার কাছে আছে।

বলিলাম—'ভুলেরা বাঁচিয়া আছে জানিয়া সুখী হইলাম। শিকারার ব্যাঘ্রবদনে একটা কৌতুকের হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল। বলিল, ভুলেরা অপূর্ব সুন্দরী। মনে হইতেছে তাহাকে আপনার পছন্দ হইয়াছে। আমার 'সেহলা' যদি আপত্তি না করে তাহা হইলে ওই রূপসীকে আপনার হাতে সমর্পণ করিতে আমার আপত্তি নাই। আপনাদের বন্ধুত্ব আমি কামনা করি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম—কণ্টকা আপত্তি না করিলেও আমার আপত্তি আছে। কোনও স্ত্রীলোককে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি ভোগ করিতে চাই না। তাহাতে কোনও আনন্দ হয় না।

কণ্টকা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

দোহা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিকারার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আপনারা অতিথি। আপনাদের জন্য কোনও আয়োজনই করা হয় নাই এখনও। আমি চলিলাম। আপনাদের সঙ্গে কত লোক আছে ?

দুই শত। বেশী ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। আমাদের সঙ্গে খাবারও আছে।

তবু আমাদের খুদ-কুঁড়া যাহা আছে তাহা সসম্ভ্রমে আপনাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত না করিলে আমাদের কর্তব্যচ্যুতি হইবে। টালা তুমি নাচ-গানের ব্যবস্থা কর। আমি বিরানি হইতে এখনই কিছু দুধ, আটা এবং চাল পাঠাইতেছি।

দোহা চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে শিকারা চাহিয়া রহিল। সে যখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল তখন বলিল, ইনি প্রচণ্ড স্বাস্থ্যবান। এমন সুন্দর স্বাস্থ্য বড় একটা দেখা যায় না। উনি বিবাহ করিয়াছেন ?

না। দোহা নারীসংগ বর্জন করিয়া চলে। বিবাহ করে নাই।

আশ্চর্য !

আমি একজন ক্রীতদাসকে আদেশ করিলাম নাচ-গানের ব্যবস্থা করিতে।

শিকারা আদেশ করিল তাহার সেনাদের অধ্যক্ষকে।

আপনারা ঘোড়া হইতে নামিয়া এখানেই বিশ্রাম করুন। গায়ের পোশাক খুলিবার দরকার নাই। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সর্দার মালেকের আস্তানা জুনাজিরায় যাইব।

আমাদের গায়ক-গায়িকাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর একটু পরেই দূরে শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই নানা সাজে সাজিয়া নানা বয়সের ছেলেমেয়েরা নৃত্য-গীতে মাতিয়া উঠিল। শিকারাও তাহাদের সহিত যোগ দিল। কণ্টকাও চুপ করিয়া রহিল না। সে নানারকম নাচ জানিত, তাহাই একে একে দেখাইতে লাগিল। শিকারার সৈন্যদল টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইয়া করতালি দিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিল কণ্টকাকে। মনে হইতেছিল তাহারা সকলেই কণ্টকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।...একটু পরেই দোহার অনুচরবৃন্দ প্রচুর খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। একটু দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনুন কাটাইয়া দোহা বড় বড় ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া দিল। রম্ভা, জিকটু, কিংকা, রুলোকি এবং তাহাদের সঙ্গিনীরা লাগিয়া গেল রুটি প্রস্তুত করিতে। হাত দিয়ে চাপড়াইয়া মোটা মোটা রুটি করিতে লাগিল তাহারা।

শিকারা বলিল—আমাদের সংগে শুকনো মাংস আছে। শুকনো ফলও আছে। সুতরাং আর কিছু করিবার দরকার নাই।

দোহা কিন্তু ইহাতে সম্মত হইল না।

বলিল, আপনাদের প্রত্যেককে একবাটি করিয়া দুধ খাইতে হইবে। তাছাড়া বিরানি জংগলে একপ্রকার কন্দ আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। সেই কন্দ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কাঁচালংকা মাখিয়া দিলে উত্তম ব্যঞ্জন হয়। তাহাও আপনাদের খাইতে হইবে।

শিকারা মুগ্ধদৃষ্টিতে দোহার দিকে চাহিয়া ছিল। সে বলিল—আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। যাহা বলিলেন তাহাই করিব—

আহারাদির পর শিকারা বলিল—আমরা এখনই জুনাজিরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

জুনাজিরা কোথা ? সেখানে কেন যাইতেছেন—একটু বিশ্রাম করুন না।

আমার কথায় শিকারা হাসিয়া উঠিল।

বিশ্রাম? বিশ্রাম করিবার সময় কই। এখন বিশ্রাম করিতে গেলে জুনাজিরা হাতছাড়া হইয়া যাইবে। ঘুরঘুট খাঁ জুনাজিরার খবর জানে। জানিনা সে এতক্ষণ সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে কি না।

জুনাজিরা কোথায়?

এখান হইতে সোজা উত্তরে মরুভূমির ওপারে যে পর্বতশ্রেণী আছে তাহারই নাম জুনাজিরা। গুপ্তচর খবর আনিয়াছে ওই জুনাজিরা পর্বতের গুহায় গুহায় সর্দার মালেকের লুণ্ঠিত প্রচুর ধনরত্ন নাকী স্তূপীকৃত হইয়া আছে। গুপ্তচর আমাদের সেখানে লইয়া যাইবে। সর্দার মালেককে যখন পরাজিত করিয়াছি তখন তাহার ধনরত্ন আমি অধিকার করিব। সে ধনরত্ন যদি পাই তাহা হইলে এই অঞ্চলের সমস্ত, যতদূর দৃষ্টি চলে সমস্ত, আমি বিরাট এক রাজ্যে পরিণত করিব। তোমরা সে রাজ্যের অংশীদার হইবে, বন্ধু হইবে। এখন আমাদের যাইতে দাও। শিকারা সদলবলে চলিয়া গেল। অশ্বক্ষুরের শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দোহা আর আমি সবিস্ময়ে তাহাদের প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

দোহা বলিল—আমাদের জীবনে একটা পরিবর্তন আসন্ন। আরও ঘোড়া সংগ্রহ কর। আমাদেরও একটা সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। তিরখন সাহায্য করিবে বলিয়াছিল। সে কোথায় গেল?

সে অন্তর্ধান করিয়াছে। সম্ভবত শিকারার ভয়েই করিয়াছে। তবু মনে হয় সে কোনও সময়ে ফিরিয়া আসিবে। লোকটি ভালো। শিকারা মেয়েটিকে তোমার কেমন মনে হয়?

প্রথম দৃষ্টিতে ভালো মনে হয় নাই। পরে কি রকম লাগিবে জানি না। প্রথম পরিচয়ে সবটা বোঝা যায় না।

কয়েকদিন বেশ অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়া গেল। সশস্ত্র অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া শিকারার আগমন অনেকের মনেই একটা ত্রাসের সঞ্চার করিল। দুঃসাহসী কণ্টকাও একদিন আমাকে বলিল—শিকারার সহিত বন্ধুত্ব করিলে হয়তো আমরা নিরাপদে থাকিব, কারণ তাহার অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যবল প্রচুর। কিন্তু আমার সন্দেহ শিকারার সহিত তোমরা বন্ধুত্ব রাখিতে পারিবে কি না—

তোমার এ সন্দেহ কেন?

কণ্টকা মুচকি হাসিয়া বলিল—তাহার রোজ একটি করিয়া নূতন পুরুষ চাই। তাহার স্বামী তৈমুজিন পাহাড়ের মতো জোয়ান ছিল একজন। তবু শিকারার গোপন অনেক প্রণয়ী ছিল শুনিলাম। তোমরা কি তাহার চাহিদা মিটাইতে পারিবে?

কোনও পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় তাহার নিকট যায় আমরা আপত্তিই বা করিব কেন?

শিকারা যদি এখানে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে সে যাহা চাহিবে তাহাই করিতে হইবে। স্বেচ্ছার বা অনিচ্ছার কোনও প্রশ্নই থাকিবে না তখন। কামোন্মাদিনী শিকারা ব্যাঘ্রিনীর মতো ভয়ঙ্করী। তাহার সে মূর্তি আমি দেখিয়াছি তাই সাবধান করিয়া দিতেছি—

তুমি এত কথা জানিলে কিরূপে?

আমি যে কয়েকদিন উহার সঙ্গে ছিলাম। আমাকে সে নিষ্কৃতি দেয় নাই। হঠাৎ

একদিন রাত্রে একটা জোয়ানকে আমার তাঁবুতে ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, এ লোকটা তোমাকে দেখিয়া ক্ষেপিয়াছে, ইহার মনোরঞ্জন কর। লোকটা আমাদের সেনাপতি—

সব কথা খুঁটাইয়া নাই বা শুনিলে।

কণ্টকা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

তাহার পর বলিল—বোরিলার সহিত তোমার দেখা হইয়াছে?

না।

বোরিলা জাল পাতিয়া অনেক হাঁস ধরিয়াছিল। নানারকমের হাঁস। সে হাঁসগুলিকে লইয়া আসিতেছিল, পথে ভিংড়ার সহিত তাহার দেখা হয়। ভিংড়া তাহার নিকট হইতে হাঁসগুলি কাড়িয়া লইয়াছে। বোরিলার জালটাও কাড়িয়া লইয়াছে সে। অনেকদিন ধরিয়া বেচারি জালটি বুনিয়াছিল।

শুনিয়া বড় রাগ হইল। বোরিলার নৈপুণ্যের জন্যই আমরা মাঝে মাঝে বুনো হাঁসের মাংস খাইতে পারিতাম।

বোরিলা কোন দেশের মেয়ে তাহা জানি না। কিন্তু জাল পাতিয়া হাঁস ধরিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহার। সে জালে আঠা লাগাইয়া মাঠে বিছাইয়া দেয়। আঠা-লাগানো জালের উপর ঘাস-পাতা-খড়-কুটা দিয়া তৈরি একটা মেকি হাঁস স্থাপন করে এবং পাশের ঝোপ হইতে হাঁসের ডাক ডাকে। আকাশচারী হাঁসেরা মনে করে তাহাদের কোন সঙ্গী বুঝি মাঠে নামিয়াছে। তাহারাও দলে দলে নামিয়া পড়ে এবং জালের আঠায় আটকাইয়া পড়ে। তখন বোরিলা তাড়াতাড়ি জালটা গুটাইয়া জালের ভিতরই তাহাদের বন্দী করিয়া ফেলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—বোরিলা কোথায়?

সে ভিংড়ার ভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ কাল আমার সহিত দেখা হয়। সে আমাকে দেখিয়াও একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকিতেই কিন্তু সে বাহির হইয়া আসিল এবং ভয়ে ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল ভিংড়া তাহাকেও জোর করিয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে হাত ছিনাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহার ভয় ভিংড়া তাহাকে একদিন ধরিবেই এবং ধরিয়া নির্মমভাবে চাবকাইবে। তোমরা উহাকে যদি রক্ষা না কর, ও একদিন হয়তো এ দেশ ছাড়িয়াই চলিয়া যাইবে। এখানে ও ছাড়া আর তো কেহ হাঁস ধরিতে পারে না। ও চলিয়া গেলে হাঁসের সুন্দর মাংস আর আমাদের ভাগ্যে জুটিবে না। বড় ভাল লাগে হাঁসের মাংস।

উহার নিকট হইতে হাঁস ধরিবার কৌশলটা শিখিয়া লও।

মম্মন্ জাল প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু যে আঠাটা বোরিলা জালে লাগায় সে আঠা যে যে জিনিস দিয়া প্রস্তুত করে, তাহা কাহাকেও শিখায় না বোরিলা। বলে ও আঠা মন্ত্রঃপূত। যবদ্বীপের এক ডাইনির নিকট সে উহা শিখিয়াছিল। সেই ডাইনির অনুমতি না পাইলে সে উহা কাহাকেও শিখাইতে পারিবে না। শিখাইলে ডাইনির অভিশাপে উহাকে বোবা হইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আমি মম্মনুকে বলিয়াছি সে গোপনে গোপনে লক্ষ্য রাখুক কি ভাবে আঠাটা প্রস্তুত করে বোরিলা। সে লক্ষ্য রাখিতেছে। কিন্তু তবু দলপতি হিসাবে তোমার বোরিলাকে রক্ষা করা কর্তব্য।

ভিংড়া তাহার নিকট হইতে হাঁস কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, ইহার একটা প্রতিবাদ না করিলে অন্যায় হইবে। তুমি দোহার সহিত পরামর্শ করিয়া কিছু একটা কর।

কণ্টকার কথাটা সঙ্গত মনে হইল। কিন্তু একথাটাও মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিলাম না যে আমিও ভিংড়াকে মনে মনে ভয় করি। তাহার দৈবীশক্তিকে অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিব এতটা মনের জোর তখন আমাদের ছিল না। নানাবিধ অলৌকিক এবং অযৌক্তিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়াই তখন আমাদের মন আবর্তিত হইত। অনেক অযৌক্তিক অলীক ব্যাপারকেই তখন আমরা ধর্ম বলিয়া মনে করিতাম। সুতরাং ভিংড়াকে বেশী ঘাঁটানোটাও সুযুক্তি মনে হইল না।

কণ্টকা দেখিলাম আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বলিলাম, তোমাকে যদি ভিংড়ার নিকট দূত করিয়া পাঠাই, তুমি যাইতে রাজি আছ?

দলপতি হিসাবে যদি আদেশ কর নিশ্চয়ই যাইব। কিন্তু স্বামী হিসাবে যদি বল, তাহা হইলে বলিব ওই পিশাচের কাছে আমার যাইবার ইচ্ছা নাই। ওই সাপটার কাছে গেলেই সে আমাকে জাপটাইয়া ধরিবে। ছোবল দিবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে রক্ষক রূপে যাও, আমি নিশ্চয়ই যাইব। কিন্তু আমার পরামর্শ, অবিলম্বে দোহার সহিত দেখা কর। সে যাহা বলিবে তাহা করাই সমীচীন।

দোহার নিকটেই অবশেষে গেলাম।

গিয়া দেখিলাম বিরানির সংলগ্ন যে বিরাট প্রান্তরটি ছিল দোহা সেখানে বহু লোকজন লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। অনেক বড় বড় গাছের ডাল কাটিয়া একস্থানে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে। বড় বড় গাছের গুঁড়িও কয়েকটা রহিয়াছে দেখিলাম।

দোহা আমাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এ-সব কি করিতেছ?

এই মাঠটাকে উঁচু বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিব। এখানে আমাদের ঘোড়ারা থাকিবে। বিদেশের বাজারে লোক পাঠাও। তাহারা ঘোড়া কিনিয়া আনুক। ঘোড়া আমাদের পুষিতেই হইবে। কাল রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি।

কি রকম?

দেখিলাম যেন আমার মা বিষ-কুণ্ডা একটা বিরাট কালো ঘোড়ার উপর চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক অশ্বারোহী। মা যেন তাহাদের এই স্থানটা দেখাইয়া বলিতেছেন তোমরা সবাই এখানে থাকিবে। আমার ছেলে দোহা তোমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। এ কথা শুনিয়া ঘোড়ারা সমস্বরে হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। আমার যখন ঘুম ভাঙিল তখনও মনে হইল যেন বহু অশ্বের হ্রেষাধ্বনি অন্ধকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল আমার মা বিষ-কুণ্ডা যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে একটা নীরব অনুরোধ যেন আমার অন্তরে আসিয়া পৌঁছিল। সে অনুরোধ—তুমি ঘোড়াকে অবহেলা করিও না। অশ্বপালন করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। কিছুক্ষণ পরেই মায়ের মূর্তি মিলাইয়া গেল। সকালে উঠিয়াই তাই এ স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিব ঠিক করিলাম। তুমি

আবিদ ও শরীফকেও খবর দাও। তাহারা ঘোড়ার বিষয়ে অনেক কিছু জানে। তাহাদের উপদেশ অনুসারে আমরা চলিব।

বেশ, তাহাই হইবে। আমি কিন্তু ভিংড়ার ব্যাপারে তোমার পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। ভিংড়ার আচরণ ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম।

সব শুনিয়া দোহা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, ভিংড়ার আচরণ যদি মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে শাসন করিতে হইবে। তুমি কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক পাঠাইয়া তাহার নিকট হইতে হাঁসগুলি কাড়িয়া আন। বোরিলা যে হাঁস ধরিয়াছে তাহা কাড়িয়া লইবার কোন অধিকার ভিংড়ার নাই। বোরিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যদি তাহার উপর বলাৎকার করে তাহা হইলে আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়া তাহার প্রতিবাদ করিব এ কথা তাহাকে বলিয়া পাঠাও।

বলিলাম, সে যদি তাহার দৈবীশক্তি দিয়া আমাদের শক্তিকে প্রতিহত করে কিংবা যদি আমাদের উপর প্রতিশোধ লয় তখন আমরা কি করিব সেটাও ভাবিয়া দেখ—

ভিংড়া যে দৈবীশক্তি লইয়া আস্ফালন করে, যে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করিয়া সে সকলকে ভয় দেখায়, তাহার মর্ম আমরা বুঝি না, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের নাই। আমরা দেবতাকে বিশ্বাস করি। সেই সর্বশক্তিমান যে সর্বত্র আছেন একথাও আমরা মানি কিন্তু তিনি যে আমার, তোমার, বা ভিংড়ার আদেশে চলিবেন—একথা বিশ্বাস করি না। ভিংড়া করে। করুক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের সে যদি অনিষ্ট করিতে চায়, আমাদের সামাজিক নিয়ম যদি সে লঙ্ঘন করে, আমরা তাহা সহ্য করিব না। আমরা যে শক্তিতে বিশ্বাস করি সেই শক্তি দিয়াই আমরা তাহাকে বাধা দিব, প্রয়োজন হইলে তাহাকে উৎখাত করিব। একথা তাহাকে জানাইয়া দাও। জন কয়েক বলিষ্ঠ লোক লইয়া তুমি নিজে গেলেই ভাল হয়। সে যদি তোমার কথা না শুনিতে চায়, কিংবা মারমুখী হইয়া তোমাকে তাড়া করিয়া আসে, তুমি সদলবলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া আমাদের এলাকা হইতে তাড়াইয়া দাও। আমাদের এলাকার বাহিরে গিয়া সে যাহা ইচ্ছা করুক, আমাদের এলাকায় তাহাকে থাকিতে দিব না।

দোহার চোখ-মুখে একটা ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠিল। বলিলাম, তুমিও ভাই আমার সঙ্গে চল না—

তুমি আমাদের দলপতি, ভিংড়া তোমার ভাই, তোমারই প্রথমে যাওয়া উচিত। তুমি যদি কিছু না করিতে পার তখন আমি তো আছিই। তুমি সশস্ত্রে স-সৈন্যে ভিংড়ার বিরুদ্ধে যাও, তাহার পর দেখা যাক কি হয়।

আমার কিন্তু ভয় করিতেছিল। কিন্তু সে কথা দোহাকে বলিতে পারিলাম না। দৈহিক বলপ্রয়োগ করিয়া অবশ্যই আমি ভিংড়াকে কাবু করিতে পারিব। কিন্তু তাহার দৈবীশক্তি? কখন যে সাপ হইয়া কামড়াইবে, বজ্র হইয়া মাথায় পড়িবে, বিষ হইয়া কণ্টকের মুখে মৃত্যুকে লেলাইয়া দিবে, তাহার তো স্থিরতা নাই।

...তবু গেলাম।

আমার সশস্ত্র সহচরদের লইয়া ভিংড়া যে পাহাড়ের গুহায় থাকিত সেই পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। পাহাড়ে ওঠার একাধিক রাস্তা ছিল। যে গুহায় ভিংড়া থাকিত

একটা রাস্তা সেই গুহার পিছনে গিয়া শেষ হইয়াছে। আমি সেই রাস্তা দিয়া উঠিতে লাগিলাম। আমার হাতে বড় একটা ছোরা ছিল। সহচরদের বলিলাম, তোমরা ভিন্নপথে পাহাড়ে ওঠ। সকলেই গুহার নিকটে গিয়া সমবেত হও। আমি ভিংড়ার সহিত প্রথমে আলাপ করিব, সে যদি রূঢ় আচরণ করে, তাহা হইলে তোমাদের ডাকিব।

আমি গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা ভয়ংকর।

ভিংড়া গুহার সামনে হাঁসগুলির পায়ে ও ডানায় দড়ি জড়াইয়া তাহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে। দেখিলাম সে একটা হাঁসের গলা কাটিয়া তাহার রক্ত আর একটা হাঁসকে জোর করিয়া পান করাইতেছে। পায়ে চাপিয়া ধরিয়া বাঁ-হাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সহায়তায় সে জোর করিয়া একটা জীবন্ত হাঁসের ঠোঁট দুইটা ফাঁক করিয়া ছিন্নমুণ্ড হাঁসের রক্তাক্ত কবন্ধটা তাহার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া চীৎকার করিতেছে—পি পি পি পি। তাহার গলার শির ফুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ।

আমি ধমক দিয়া উঠিলাম—তুমি এ কি করিতেছ! ভিংড়া তড়াক করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বসিল। রক্তাক্ত হাঁসটা ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু উড়িয়া পলাইতে পারিল না, কারণ তাহার পা ও ডানা দুই-ই বাঁধা ছিল।

ভিংড়া আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার পর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

আমি কি করিতেছি—তাহা বুঝিবার বুদ্ধি তোমার নাই। তুমি লাঙল চষিয়া গম ফলাইতে পার, তাহাই কর গিয়া। এখানে আসিয়াছ কেন?

তোমার পাগলামির প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছি। তুমি বোরিলার হাঁস কাড়িয়া আনিয়াছ কেন? তাহার জালটা কাড়িয়া আনিয়াছ। সেটা কোথায়—

ভিংড়া তর্জনী তুলিয়া দেখাইয়া দিল—ওই দেখ। দেখিলাম নিকটস্থ পর্বতশৃঙ্গ দুইটিতে যে বড় বড় গাছ ছিল তাহাতে জালটা টান করিয়া টাঙানো আছে। জালের ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে। আমি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া ভিংড়া আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

বলিল, তোমার মাথায় ঢুকিবে না কেন ওই জাল টাঙাইয়াছি—

বলিয়াই দেখ না, বুঝিতে পারি কি না।

ভিংড়া হাসিয়া বলিল—বেশ, তবে শোন। তোমাদের বোরিলা মন্ত্রঃপূত আঠা জালে মাখাইয়া হাঁস ধরিয়াছে ইহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। আমি ওই জালে আরও কিছু মন্ত্র পড়িয়া আকাশে টাঙাইয়া দিয়াছি, আর একরকম হাঁস ধরিব বলিয়া।

কি রকম হাঁস?

তাহাদের তোমরা দেবতা বলিয়া পূজা কর। কিন্তু আমি জানি উহারা দেবতা নয়, হাঁস। হাঁসের মত উহারাও আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। খানিকটা হাঁস বটে, কিন্তু খুব শক্তিমান হাঁস। ধরিতে পারিলে তাহাদের শক্তি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিব। তাহার পর আবার তাহারা শক্তি সংগ্রহ করিয়া যখন আসিবে, তখন আবার তাহাদের ধরিব। ধরা পড়িলেই মুক্তির মূল্য স্বরূপ তাহাদের খানিকটা শক্তি তাহারা আমাকে দিবে। না দিলে ছাড়িবই না।

আবার ভিংড়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কি রকম হাঁস তাহা তো বলিলে না—

তোমরা যাহাকে চন্দ্র সূর্য বল আসলে তাহারা হাঁস। নক্ষত্ররাও হাঁস, কিন্তু তাহারা অনেক দূরে ওড়ে। এ জালে হয়তো ধরা পড়িবে না। চন্দ্র সূর্য কিন্তু ধরা পড়িবে। কাল সূর্যকে ধরিয়াছিলাম, খানিকটা শক্তি সে আমাকে দিয়াছে। চাঁদ এখন ছোট, নিজেই দুর্বল। যে দিন সূর্যের মত বড় হইবে, সেদিন তাহাকেও ধরিব—

ভিংড়া উঠিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। মনে হইল সে যেন স্পর্ধা করিয়া আমাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিতেছে।

বলিলাম, বোরিলার হাঁস এবং জাল তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। তুমি যদি জাল ফেলিয়া আকাশের সূর্য চন্দ্র ধরিতে চাও তাহা হইলে সে জাল নিজেই প্রস্তুত কর। আর এই হাঁসগুলিকে লইয়া কি করিতেছ?—

একটা হাঁসের রক্ত আর একটা হাঁসকে খাওয়াইতেছি। তাহার পর সে হাঁসের রক্ত আর একটা হাঁসকে খাওয়াইব। এইভাবে রক্ত খাওয়াইতে খাওয়াইতে যে শেষ হাঁসটি থাকিবে, সে হাঁসটি আমি খাইব। সমস্ত হাঁসের শক্তি তখন আমার মধ্যে আসিবে। তখন আমিও আকাশে উড়তে পারিব।

ভিংড়া দুই হাত আকাশে তুলিয়া এমন একটা ভঙ্গী করিল যে সে এখনই আকাশে উড়িয়া যাইবে। বলিলাম—নিজ হাঁস ধরিয়া তুমি সে শক্তি সংগ্রহ কর। বোরিলার হাঁস বোরিলাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

দিব না। আমার বেশী জোর আছে আমি তাহার হাঁস কাড়িয়া আনিয়াছি। দিব কেন?

বলিলাম, কিন্তু ইহা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে তোমার চেয়ে আমার গায়ে জোর বেশী। আমি তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব।

কাড়িয়া লইবে?

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ভিংড়া উন্মত্তের মতো আমার উপর লাফাইয়া পড়িল। আমার হাতের ছোরাটা দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। ভিংড়ার মুখে যত প্রকোপ গায়ে তত শক্তি নাই। তাহাকে সহজেই চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলাম আমি। তাহার পর আমার অনুচরদের ডাকিলাম। ভিংড়াকে তাহারা বন্দী করিয়া ফেলিল। হাঁসগুলিকে লইয়া দুইটি লোক বোরিলার নিকট চলিয়া গেল। বোরিলার জালটাও গাছ হইতে খুলিয়া লইয়া গেল তাহারা।

বন্দী ভিংড়াকে টানিতে টানিতে আমরা দোহার নিকট উপস্থিত হইলাম। ভিংড়ার হাত-পা বাঁধিয়া সমস্ত রাস্তাটা তাহাকে ছ্যাঁচড়াইয়া ছ্যাঁচড়াইয়া আনিতে হইয়াছিল। তাই তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। দোহার 'ফানু-ডি'তে পাথরের বড় বড় চাঙড় দিয়া প্রস্তুত একটি বড় ঘর ছিল। দোহা সেই ঘরে ভিংড়াকে বন্দী করিয়া রাখিল।

তাহার পরদিনই তিরখন ঘুরঘুট খাঁকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহারা যে ঘোড়া দুইটির পিঠে চড়িয়া আসিয়াছিল তাহাদের দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঘুরঘুট খাঁ-র চেহারাটাও দেখিবার মতো। কপালের উপর প্রকাণ্ড একটা

ক্ষতচিহ্ন। ঘনকৃষ্ণ গুচ্ছ গুচ্ছ শ্মশ্রু-গুম্ফে সমস্ত মুখ সমাচ্ছন্ন। চক্ষু দুইটি আকর্ণবিস্তৃত, দৃষ্টি নির্ভীক। বলিষ্ঠ স্কন্ধ, বলিষ্ঠ বাহু, বিস্তৃত বক্ষ, চওড়া পিঠ। বৃকোদর, ক্ষীণকটি। পা দুইটি লোহস্তম্ভের মতো। কথায় কথায় অট্টহাস্য করে। তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াও বিস্মিত হইয়া গেলাম আমরা। চামড়ার পোশাক। কিন্তু সে পোশাকে মখমল এবং উজ্জ্বল ধাতুর সমাবেশে এমন একটা শোভার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখি নাই। ঘুরঘুট খাঁকে দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়া গেলাম। ঘুরঘুট খাঁ যেদিন আসিল সেদিন আমরা ভিংড়ার সম্বন্ধে কি করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য টুকচুম্বার নীচে সমবেত হইয়াছিলাম। দোহা বলিয়াছিল সকলে একসঙ্গে বসিয়া এ বিষয়ে মীমাংসা করা উচিত এবং সকলের অভিমত শুনিয়া আমরা স্থির করিব ভিংড়ার এই অত্যাচার আমরা সহ্য করিব, না, তাহাকে আমাদের এলাকা হইতে দূর করিয়া দিব। কণ্টকা বলিয়াছিল উহাকে মারিয়া ফেলা হোক, আপদের শেষ হইয়া যাক। দোহা কিন্তু তাহাকে হত্যা করিতে চায় না। অনেকের মত, তাহাকে নির্বাসিত করিলে দূর হইতেও সে আমাদের অনিষ্ট করিবে। উহার জাদু, উহার মন্ত্রতন্ত্র বড় ভয়ংকর। উহাকে বিনাশ করিয়া ফেলাই উচিত। দোহা কিন্তু বলিতেছে উহাকে মারিয়া ফেলিলে ও আরও ভয়ংকর হইয়া পড়িবে।

কারণ আমার মতে মৃত্যুই মানুষের শেষ নয়। মৃত্যুর পরও মানুষ শুধু যে বাঁচিয়া থাকে তাহা নয়, বেশী শক্তিশালী হয়। এই জন্যই আমরা পূর্বপুরুষদের আত্মাকে প্রীত রাখিবার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা করি। যে সব জানোয়ারকে আমরা হত্যা করিতে বাধ্য হই তাহাদেরও আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করি আমরা। পৃথিবীতে কেহই মরে না। সুতরাং ভিংড়াকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা হাস্যকর হইবে। এই সব আলোচনা হইতেছিল এমন সময় তিরখন ও ঘুরঘুট খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

এ কিসের জমায়েত ?

আমাদের ভাষাতেই প্রশ্ন করিলেন ঘুরঘুট খাঁ। প্রশ্ন করিয়া তিনি ও তিরখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। আমাদের দুইজন ক্রীতদাস অশ্ব দুইটির লাগাম ধরিতে যাইতেছিল। ঘুরঘুট খাঁ বলিলেন—কিছু করিতে হইবে না। ধরিবার দরকার নাই। উহারা এমনই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কোথাও পলাইয়া যাইবে না।

ঘোড়া দুইটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তিরখন পরিচয় করাইয়া দিল—ইনিই ঘুরঘুট খাঁ। আপনাদের নিমন্ত্রণে এখানে আসিয়াছেন। আপনারা যদি ইঁহার শিক্ষায় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিতে চান, ইনি আপনাদের সাহায্য করিবেন। কি শর্তে করিবেন তাহা আপনারা আলোচনা করুন। আমাকে এখানে কোথাও যদি একটু স্থান দেন, আমি বাঁশী বাজাইব, গান গাহিব, প্রয়োজন হইলে তূর্যধ্বনিও করিব। একটা ফাঁকা জায়গা, আর কিছু খাবার পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিব আমি। কোনও পাহাড়ের উপর আমার যদি স্থান করিয়া দেন, আরও খুশী হইব। প্রকৃতির বিরাট বিস্তার চোখের সম্মুখে না থাকিলে আমি স্বস্তি পাই না। আপনারা যদি আমাকে না রাখিতে চান, আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব। এখানে এত জনতা কেন ?

দোহা এবং আমি অগ্রসর হইয়া ঘুরঘুট খাঁকে অভিবাদন করিলাম।

দোহা বলিল—আমাদের সম্প্রদায়ের একটি লোক উন্মাদ হইয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে। তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে। এখন তাহাকে লইয়া কি করিব সেই আলোচনা সকলে মিলিয়া করিতেছি—

ঘুরঘুট খাঁ হাসিয়া বলিলেন—সকলে মিলিয়া? সকলে মিলিয়া কলহ হয়, নানা লোক নানা মত প্রকাশ করে, কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছানো যায় না। আপনাদের যিনি দলপতি তিনিই স্থির করুন কি করিবেন। তাঁহার হুকুমই সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। আমার সমর-কৌশলের ইহাই মেরুদন্ড, নির্বিচারে সেনাপতির আদেশ পালন করিতে হয়। আপনাদের এই লোকটি কি ধরনের উন্মাদ?

দোহা ভিংড়ার অদ্ভুত চরিত্রের কথা বিশদ করিয়া বর্ণনা করিল। শেষে বলিল—মুশকিল হইয়াছে ভিংড়া আমাদের জনপদবাসী অনেকের উপর অত্যাচার করিতেছে। মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। বোরিলা নামে একটি মেয়ে হাঁস ধরিত, সেদিন সে তাহার সব হাঁসগুলি কাড়িয়া লইয়াছে। হাঁস ধরিবার জালটাও লইয়া গিয়াছে। বলিতেছে ওই জাল দিয়া আকাশের সূর্য চন্দ্র ধরিবে।

ঘুরঘুট খাঁ বলিলেন—উহার কি সত্যই কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে?

যদি থাকে উহাকে সেই ক্ষমতার অনুপাতে সম্মান করা উচিত।

দোহা বলিল—ভিংড়া বলে সে বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, অগ্নি, বন্যা, পশু, পক্ষী সকলকে বশ করিতে পারে। আমি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করি না। এসব বলিয়া ও শুধু লোকের মনে ভয় সঞ্চার করে।

ঘুরঘুট খাঁ কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। বলিলেন—খুব ছেলেবেলায় আমার বাবার মায়ের মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি আবার সেটা শুনিয়াছিলেন তাঁহার দিদিমার মুখে। আমরা হুন। আমাদের কোথাও ঘর-বাড়ি নাই। ঘোড়ার পিঠেই আমাদের বাড়ি। চলন্ত জানোয়াররাই আমাদের সম্পত্তি। আমাদের সমস্ত পরিবারও থাকে চলন্ত তাঁবুর ভিতরে। সে তাঁবুর নাম আমাদের ভাষায় 'ইয়ুর্ত'। বিরাট চুনকাম করা ছবি আঁকা তাঁবু, বিরাট বাঁশের গাড়ির উপর অবস্থিত। দশ-বারোটি গরু সেই 'ইয়ুর্ত' একসঙ্গে চলে, চাকার ধুরির সঙ্গে বাঁশ বাঁধিয়া 'ইয়ুর্ত' গুলি সংযুক্ত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ইয়ুর্তেই জন্মলাভ করিয়াছেন, ইয়ুর্তেই মানুষ হইয়াছেন। পুরুষদের কাজ ছিল ঘোড়ায় চড়িয়া লুণ্ঠন করা। মঙ্গোলিয়ার ভয়ংকর মরুভূমিতে তাঁহারা দানবের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সুবিধা পাইলেই তাঁহারা চীন সাম্রাজ্যের জনপদ লুণ্ঠন করিতেন। বস্তুত সেই প্রাচীন যুগে চীনাদের সহিত আমাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। তাহা নিদারুণ সংঘর্ষ। শান্তিপ্রিয় চীন সম্রাটরা আমাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন। আমরা তাঁহাদের সাম্রাজ্য যথেচ্ছ লুটপাট করিয়া সরিয়া পড়িতাম। সম্রাটের সৈন্যেরা আমাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। কারণ তাহারা ছিল বিলাসী। একবার কিন্তু আমাদের বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। এই গল্পটাই আমার বাবার মায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। তখন চীন দেশের রাজা ছিলেন হোয়া-টি। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর। আকৃতিও ছিল ভয়ানক। মুখ ছিল পাথরের মতো, আমাদের মতো গোঁফ-দাড়ি ছিল না তাঁহাদের। তাঁহারা গোঁফ-দাড়ি গজাইতে দিতেন না। বাল্যকাল হইতে অস্ত্র

দিয়া তাঁহারা মুখের চামড়া ছুলিয়া ফেলিতেন। কোন চুল গজাইত না। ক্ষিপ্র অশ্বারোহী ছিলেন তাঁহারা। সর্বদা ঘোড়ার পিঠেই থাকিতেন। ঘোড়ার জিনের তলায় তাঁহাদের উরুর নিম্নে থাকিত কাঁচা মাংস। তাহাই আহার ছিল তাঁহাদের। আর যখন সুবিধা পাইতেন—'কুমিস' খাইতেন। চামড়ার থলিতে তাঁহারা দুধ রাখিতেন, সেই দুধ পচিয়া গাঁজিয়া কুমিসে পরিণত হইত। তাহাই তাঁহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তাঁহারা একবার হোয়াং-টির রাজ্য আক্রমণ করিলেন। হোয়াং-টির মাহিনা-করা মোটা মোটা সৈন্যরা দলে দলে আসিল, কিন্তু আমাদের মারের চোটে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। বিরাট হূনবাহিনী চীন রাজ্যের অনেকটা দখল করিয়া যখন রাজধানীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে তখন হোয়াং-টি বুঝিতে পারিলেন যে সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র বা সেনাসামন্ত দিয়া দুর্ধর্ষ হূনদের গতিরোধ করা যাইবে না। তাঁহার একটি ছোট লাল রঙের ঘোড়ার গাড়ি ছিল। সেই গাড়ি চড়িয়া তিনি বনের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রকাণ্ড একটি অরণ্য ছিল সেকালে। ছোট লাল রঙের গাড়ি চড়িয়া তিনি সেই অরণ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি যখন তাঁহার ছোট লাল গাড়ি চড়িয়া অরণ্য হইতে বাহির হইলেন তখন দেখা গেল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিংহ, বাঘ, চিতা, হাতী, নেকড়ে, হায়না, শৃগাল, চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, বড় বড় বিষাক্ত সাপও ফণা তুলিয়া আসিতেছে তাঁহার সঙ্গে। আকাশ জুড়িয়া অনেক বাজ, চিল, শকুনি, এমন কি ঈগল পাখীও উড়িয়া আসিতেছে দলে দলে। এই অদ্ভুত বন্য বাহিনীর সম্মুখে হূনরা দাঁড়াইতে পারিল না। অনেকে মারা গেল, পলাইয়া গেল অনেকে। হোয়াং-টি অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি শুধু যে বন্য জন্তুদের অনায়াসে বশ করিতে পারিতেন তাহাই নয়, তাহাদের দ্বারা অনেক দুঃসাধ্য কাজও করাইয়া লইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এ ক্ষমতা ছিল, হিংস্র বন্যপশুরাই খেলার সঙ্গী ছিল তাঁহার। তিনি যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন হূনরা তাঁহার রাজত্ব আক্রমণ করিতে পারে নাই। আপনাদের ভিংড়ার সত্যই যদি কোন ক্ষমতা থাকে, সে ক্ষমতার সুযোগ আপনাদের গ্রহণ করা উচিত।

দোহা বলিল—ভিংড়া কিন্তু আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চাহে না। সে শত্রুভাবাপন্ন—

ঘুরঘুট খাঁ সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—তাহা হইলে উহাকে মারিয়া ফেলুন।

দোহা আপত্তি করিল।

বলিল, মারিয়া ফেলিলেই শত্রুর বিনাশ হয় না। আমার বিশ্বাস, দেহহীন শত্রু আরও বেশী শক্তিশালী আরো বেশী প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়। আমার মতে ভিংড়া যে অঞ্চলটায় থাকে সে অঞ্চলটা তাহাকে দান করিয়া দেওয়া উচিত। যাহারা উহার সহিত গিয়া ওই অঞ্চলে বাস করিতে চাহিবে তাহাদের আমরা বাধা দিব না। কিন্তু ভিংড়ার সহিত একটি শর্ত থাকিবে, সে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করিবে না, আমাদের কাহারও উপর সে অত্যাচারও করিবে না। এই শর্তে সে যদি রাজি থাকে—

ঘুরঘুট খাঁ বলিলেন—যাহারা অত্যন্ত ধূর্ত, অত্যন্ত শঠ, তাহারা মুখে শর্ত করে, কাজে তাহা মানে না। যাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী তাহারাও ইহা করে। সৈনিক

জীবনের ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। সুতরাং শত্রুকে যদি বিনাশ করিতে চান, তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিন। মৃত্যুর পর তাহার প্রেতাত্মা কি করিবে তাহা লইয়া যদি মাথা ঘামান তাহা হইলে ইহলোকের সমস্যা মিটিবে না। বৈষয়িক ব্যাপারে অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। ভিংড়ার প্রেতাত্মা যদি আপনাদের পীড়ন করে তখন তাহাকে ঠেকাইবার জন্য ভালো ওঝা ডাকিবেন। যাই হোক, আমাকে যে জন্য ডাকিয়েছেন সে কথাটার আলোচনা এইবার শুরু করুন। আপনাদের সামরিক প্রথায় শিক্ষা দিয়া আপনাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কয়েকটি শর্ত আছে—

কি শর্ত বলুন—

যে সামরিক বাহিনী আমি প্রস্তুত করিব সেই বাহিনীর আমি সর্বেসর্বা হইব। আমার আদেশ ছাড়া অন্য কাহারও আদেশ সেখানে চলিবে না।

দোহা বলিল—কিন্তু সে আদেশ দিবার আগে আপনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন তো?

আপনাদের, মানে কাহাদের? এই বিরাট জনতার?

না। আমাদের দলপতি টালার। তাহার সম্মতি ব্যতীত আমরা কিছুই করি না।

কিন্তু আপনাদের দলপতি কি যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বোঝেন?

যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বোঝেন না, কিন্তু কিসে আমাদের হিত বা অহিত হইবে তাহা বোঝেন। তাছাড়া, আপনি যখন এখানে থাকিবেন তখন যুদ্ধ সম্বন্ধেও সে আপনার নিকট জ্ঞানলাভ করিয়া ফেলিবে। আমাদের দলপতি বুদ্ধিমান ও বলবান লোক।

ঘুরঘুট খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

তাহার পর বলিলেন—আপনাদের দলপতির সহিত যদি আমার মতের মিল না হয় তখন কি হইবে?

দোহাও কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর উত্তর দিল—আমাদের দলপতির আদেশই সর্বদা আমাদের নিকট গ্রাহ্য হইবে। তবে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিবার পূর্বে আমাদের দলপতি নিশ্চয়ই তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আপনি আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করুন, আপনি যাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে এবং সসম্মানে থাকিতে পারেন সে ব্যবস্থা আমরা করিব।

ঘুরঘুট খাঁ হা হা শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন—আমি যদি ভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনাদের জনপদ অধিকার করিয়া বসি, আপনারা কি বাধা দিতে পারিবেন? তখন তো আমিই সর্বেসর্বা হইব। আপনাদের অধীনে আপনাদের দলপতির মুখাপেক্ষী হইয়া আমি থাকিব কেন?

তখন আমি কথা বলিলাম। এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম। বলিলাম—থাকা না থাকা আপনার ইচ্ছা। আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে পারি, আপনাকে শিক্ষকরূপে পাইলে আমরা আনন্দিত হইব। আরও বলিতে পারি মানীকে কি করিয়া সম্মান

করিতে হয় তাহাও আমরা জানি। আপনি এখনই বলিলেন অন্যত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনি আমাদের সর্বেসর্বা হইবার শক্তি রাখেন। খুব সম্ভব রাখেন, কিন্তু একটি কথা আপনাকে বলিতে চাই। বিজয়িনী তেমুজিনের পত্নী শিকারা আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের বন্ধুত্ব কামনা করিয়াছেন, আমার স্ত্রী কামুক সর্দার মালেককে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া অত সহজে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিয়াছেন এই কথা তিনি বার বার বলিলেন। আমার স্ত্রীর সহিত তিনি 'সেহলা' পাতাইয়াছেন। সুতরাং কোন বহিঃশত্রু যদি আমাদের এখন আক্রমণ করে, শিকারা এবং খেখুন সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সাহায্য করিবে এ বিশ্বাস আমার আছে। শিকারা বন্ধুত্বের জন্য কোন শর্ত আরোপ করে নাই, তাহার নিকটই আমরা যদি বলি আমরা একটি সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে চাই আপনি সাহায্য করুন—আমার বিশ্বাস তিনি করিবেন। আপনার সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত কিছু আলোচনা হইয়াছিল। আপনার যে পত্নীকে সর্দার মালেক ছিনাইয়া লইয়াছিলেন বলিয়া আপনি তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করেন, আপনার সেই পত্নী শিকারার নিকট বন্দিনী হইয়া আছে। শিকারা সর্দার মালেকের সমস্ত পত্নীদের হত্যা করিয়াছেন, করেন নাই কেবল ভুলেরাকে। তাঁহার বাসনা, আপনি যদি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সৈন্যবিভাগে সেনাপতি-রূপে যোগদান করেন, তাহা হইলে ভুলেরাকে তিনি আপনার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। আপনি যদি ইহাতে সম্মত হন, আমার বিশ্বাস, তাঁহার পিরালা রাজ্যে আপনি সেনাবিভাগে একটা সম্মানের আসন পাইবেন। আমার মনে হয় শিকারার অনুরোধ রক্ষা করিলে সব দিকই রক্ষা হয়। আপনাকেও আমরা হয়তো শেষ পর্যন্ত পাইতে পারি। সবই অবশ্য আপনার সম্মতির উপর নির্ভর করিতেছে।

মনে হইল ভুলেরার খবর পাইয়া ঘুরঘুট খাঁ যেন একটু উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বলিলেন, শিকারা আমার প্রভুর শত্রু। আমার প্রভু আমার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম। ইহাতে বিশ্বাসঘাতকতার নাম-গন্ধও নাই। কিন্তু আমি যদি এখন সেই শত্রুর অধীনে গিয়া চাকরি করি তাহা হইলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে গিয়া পড়িবে। সর্দার মালেক কামুক ছিলেন বলিয়া আমার স্ত্রী ভুলেরাকে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, শিকারাও কামুকী, সে হয়তো আমাকেই দখল করিতে চাহিবে। সর্দার মালেক কামুক ছিলেন, কিন্তু অনেক গুণ ছিল তাঁহার। তিনি আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্য-দলে আমাকে উচ্চপদ দিয়াছিলেন, আমার অধীনে যে সৈন্যদল থাকিত সেখানে আমার আদেশই সর্বদা বলবৎ থাকিত। সেইজন্যই আমি স-সৈন্যে অবিলম্বে তাঁহার দল ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছি। আমি যদিও তাঁহার অধীনে ছিলাম, কিন্তু তিনি কখনও আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। শিকারা আমাকে সে সুযোগ দিবে কি না সন্দেহ। ভুলেরাকে পাইলে অবশ্য আমি খুব খুশি হইব, কিন্তু আমার স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়।

আমি বলিলাম—ভুলেরাকে আপনি পাইবেন—

কি উপায়ে—

শিকারা বলিয়াছিল—ভুলেরাকে আমি যদি চাই ভুলেরা আমার হইবে। তখন

আমি তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। মনে হয় শিকারা তাহার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিবে না।

ঘুরঘুট খাঁ-র ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

আপনি যদি ভুলেরাকে আমার কাছে ফিরাইয়া দিতে চাহেন কোনও শর্ত কি আরোপ করিবেন?

না, বিনা শর্তেই ভুলেরাকে আপনি পাইবেন। আপনার এ উপকার যদি করিতে পারি আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। আপনি আমাদের সেনাবিভাগ গঠন করুন আর না-ই করুন আপনার বন্ধুত্ব আমাদের সর্বদাই কাম্য।

ঘুরঘুট খাঁর চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি আগাইয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, বিনা শর্তেই আপনাদের সৈন্যগঠন আমি করিব। কিন্তু শিকারার সহিত যদি আপনারা বন্ধুত্ব করেন, দেখিবেন আমাকে যেন তাহার কবলে ফেলিয়া দিবেন না। আমার পরামর্শ, যতদিন আমরা নিজেদের সৈন্যদল গঠন না করিতে পারি, ততদিন আপনারা শিকারার সহিত একটা মৌখিক বন্ধুত্ব করুন। তারপর আমরা শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করিলে শিকারার অনুগ্রহের আমরা তোয়াক্কা রাখিব না।

বলিলাম—মৌখিক বন্ধুত্ব তো ভণ্ডামি। তাহার কবল হইতে আপনাকে আমরা মুক্ত রাখিবার চেষ্টা অবশ্যই করিব। আপনাকে আমাদের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলই আমরা দিব। সেখানে আপনি আমাদের সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষা দিতে পারিবেন। কিন্তু শিকারার সহিত ভণ্ডামি করিতে পারিব না, যদি বন্ধুত্ব করি আন্তরিক বন্ধুত্বই করিব।

ঘুরঘুট খাঁ কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—সে বন্ধুত্ব কিন্তু বেশী দিন টিকিবে না। শিকারা মানবী হইলে হয়তো টিকিত, কিন্তু সে মানবী নয়, দানবী। তেমুজিনকে সে ভেড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। তেমুজিন তাহার হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার বীরত্ব, তাহার পৌরুষ, কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। সে নিজের স্ত্রীর ভোগের জন্য সমর্থ পুরুষ সংগ্রহ করিয়া দিত। সে রাজা ছিল নামে, আসলে সে ছিল শিকারার ক্রীতদাস। খেখুন সম্প্রদায়ের রাজাকেও বশীভূত করিয়াছে নিজের যৌবন দিয়া। শিকারা অমিত শক্তিশালিনী, কিন্তু সে মানবী নয়, দানবী। সেই জন্য আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি। শিকারা এখন কোথায় গিয়াছে জানেন?

তিনি জুনজিরা পাহাড়ে গিয়াছেন, সেখানে নাকি সর্দার মালেকের গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে। সেই গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়াছেন তিনি।

ঘুরঘুট খাঁ-র চোখে-মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন—'আমিও ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু শিকারাকে হতাশ হইতে হইবে। সর্দার মালেকের বিপুল ধনসম্ভার জুনজুনিরায় আর নাই।

কি হইল?

ডাকাতে লুণ্ঠন করিয়াছে।

ঘুরঘুট খাঁ-র মুখের হাসি আরও ব্যঞ্জনাময় হইল। ঠিক এই সময়ে দূরে বহু

অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শোনা গেল। আমরা চক্রবালরেখার দিকে চাহিয়া দেখিলাম চক্রাকারে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী আমাদের দিকে দ্রুতবেগে আগাইয়া আসিতেছে।

তিরথন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এইবার সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বলিল, সম্ভবত শিকারা আসিতেছে। আমাদের আর এখানে থাকা ঠিক নয়।

আমরা এখন চলিলাম। পরে আবার কোনদিন আসিব।

ঘুরঘুট বলিলেন—ঠিক কথা। আমাদের এখন এখানে থাকা উচিত নয়।

তাঁহারা দুইজনেই অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহারা গেলেন শিকারা যে দিক হইতে আসিতেছিল সেই দিকেই। আমাদের জনপদে তাঁহারা যদি আত্মগোপন করিতে চাহিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের বিরানি জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহারা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। শিকারা যে বিরাট প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আসিতেছিল, স্থলপথে সেই প্রান্তরই আমাদের জনপদ হইতে নির্গমনের পথ। সুতরাং সেই দিকেই তাহারা ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। আমরা সকলে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

দোহা বলিল, শিকারাকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন কর। উহাদের আহারের ব্যবস্থা এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভিংড়ার সম্বন্ধে কি করিব তাহা তো এখনও ঠিক হইল না। তোমাদের সকলের মত কি তাহা তোমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া ঠিক কর। তোমরা সব নদীর ধারে চলিয়া যাও। এখানে এখনই সদলবলে শিকারা আসিয়া পড়িবে। তাহার সম্মুখে আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার আলোচনা না করাই ভাল।

সকলে নদীর তীরে চলিয়া গেলে দোহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি ইচ্ছা, ভিংড়াকে আমরা মারিয়া ফেলি—?

বলিলাম, না, আমার ভাই সে। তাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে অনেক আগেই তাহা করিতাম। কিন্তু সে ইচ্ছা আমার আগেও ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু তাহাকে আমি ভয় করি। তাহার অলৌকিক শক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দিবার মত মনোবল আমার নাই। কিন্তু এটাও মনে হয়, উহার উপস্থিতি আমাদের জনপদের পক্ষে নিরাপদ নয়। কি করা উচিত তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমরা সকলে মিলিয়া যাহা আমাকে বলিবে তাহাই আমি করিব—

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। দম ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, ভিংড়া বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিয়াছে। দম বলিল, আমার মৃত পিতা মহোরির প্রেতাত্মা আসিয়া নাকি বন্দীশালার অর্গল খুলিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধা বাবলা সেখানে ছিল। সে আমার বাবার প্রেতাত্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বাবলা বাবার আমলের লোক। অনেকে বলে সে নাকি বাবার প্রণয়িনী ছিল। বাবলা যদিও এখন জরগ্রস্তা তবু সে বাঁচিয়া আছে এখনও। লাঠি ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, আপনমনে বিড় বিড় করিয়া সর্বদা কি বলে। দম আরও বলিল, ভিংড়ার সহিত নামনা মেয়েটিও পলাইয়াছে। নামনার কথা হয়তো তোমাদের মনে আছে। নামনা মেয়েটি নিঃসন্তান ছিল। ভিংড়ার নিকট নির্যাতিত হইয়া সে একটি পুত্রসন্তান লাভ করিয়া ছিল। সে-ও নাকি তাহার সহিত পলাইয়াছে। কোথা পলাইল? জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাকে। কোথায় তাহা কেহ জানে না। আমাদের

অশ্বশালা হইতে দুইটি অশ্বও লইয়া গিয়াছে তাহারা। আমরা যখন এখানে সকলে জমায়েত হইয়া ঘুরঘুট খাঁকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম সেই সময়ই তাহারা পলাইয়াছে। আমি এখন হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম তাহারা বন্দীশালার কপাটটা খোলা। তাই ছুটিয়া আপনাকে খবর দিতে আসিয়াছি। আমরা কি তাহার সন্ধানে বাহির হইব?

দোহা কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল—যে সমস্যার আমরা সমাধান করিতে পারিতেছিলাম না, অদ্ভুত উপায়ে তাহার সমাধান হইয়া গেল। এখন আর কিছু করিবার দরকার নাই। শিকারা আসিতেছে, তাহারই অভ্যর্থনার আয়োজন করা যাক।

শিকারা আসিয়া আমাদের মধ্যে রহিয়া গেল কিছুদিন। আমাদের এলাকার অনেক বিস্তীর্ণ জমি খালি পড়িয়াছিল। শিকারা সেখানে নিজের অনেক তাঁবু খাটাইয়া সসৈন্যে বসবাস করিতে লাগিল। আমরা প্রথম প্রথম কয়েকদিন তাহাদের খাদ্য-সরবরাহ করিয়াছিলাম, সেবা-শুশ্রূষারও আয়োজন করিয়াছিলাম, কিন্তু শিকারা বলিল তাহারা এখানে যখন কিছুদিন বসবাস করিবে স্থির করিয়াছে তখন সে আমাদের ভার স্বরূপ থাকিতে চায় না, আমাদের প্রতিবেশীরূপে থাকিতে চায়। তাহারা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমরাই মাঝে মাঝে সেখানে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলাম। নূতন দেশের ক্রীতদাস-দাসীদের নূতন রকম নৃত্য-গীত নূতন রকম শূল্যপক্ব মাংস, নূতন রকম পিষ্টক আমাদের মুগ্ধ করিতে লাগিল। আমরা উহাদের ভদ্রতায় মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু উহাদের সৈন্যসামন্ত দেখিয়া আমাদের ভয় হইল। দোহাকে একদিন বিরলে ডাকিয়া বলিলাম—আমাদের জনপদের এতখানি জায়গা দখল করিয়া শিকারার ওই অবস্থান আমার ভালো লাগিতেছে না। উহারা যদি স্বেচ্ছায় চলিয়া না যায় তাহা হইলে আমাদের কি কর্তব্য তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? উহাদের সৈন্যসামন্ত আছে, আমাদের কিছুই নাই, এ অবস্থায় উহাদের সহিত কলহ করাও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। কিন্তু কি করিব আমরা? ঘুরঘুট খাঁ আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া দিবে এই আশ্বাস দিয়াছিল, কিন্তু সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে আর তাহার কোন খবর পাইতেছি না। তিরখনও আর আসে না। আমার মনে হয় শিকারা এখানে আছে বলিয়াই সম্ভবত তাহারা গা-ঢাকা দিয়া আছে। কিন্তু উহারা কতদিন এখানে থাকিবে তাহার তো স্থিরতা নাই। এখন কি করা যায় বল তো?

দোহা নীরবে সব শুনিল। লক্ষ্য করিলাম তাহার মনে কি একটা বক্তব্য ফুটিয়াছে যাহা সে বলিতে পারিতেছে না। তাহার মুখে কেমন যেন একটা দ্বিধা ও লজ্জার ভাব।

প্রশ্ন করিলাম—ব্যাপার কি? কিছু বলিতেছ না কেন?

দোহা বলিল—ব্যাপার গুরুতর।

বলিয়াই আবার চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মাথা চুলকাইয়া বলিল—তোমাকে এখন কথাটা বলিব না ভাবিয়াছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত বলিতেই হইত, কারণ তুমি আমাদের দলপতি। এখনই শোন। শিকারা যেদিন এখানে আসে সেইদিন রাত্রেই সে বিরানি জঙ্গলে গিয়াছিল। কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে ঢুকিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল এ জঙ্গলে কোনও স্ত্রীলোক প্রবেশ করিবে না ইহাই নিয়ম। পরদিন রাত্রে শিকারা মুখে গোঁফ-দাড়ি পরিয়া পুরুষের বেশে গিয়া হাজির হইল। প্রহরীকে বলিল—আমি এই

বনের অধিপতি তোহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। জরুরি দরকার। শীঘ্র খবর দাও ? কিংবা আমাকে তাহার কাছে লইয়া চল। প্রহরী তাহার গোঁফ-দাঁড়ি দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে লোকটি ছদ্মবেশে আসিয়াছে। বলিল, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আমাদের মালিককে খবর দিতেছি। আমি তখন ঘুমাইতেছিলাম। কিন্তু প্রহরীর ডাকাডাকিতে আমাকে উঠিতে হইল। খবর শুনিয়া শিকারার নিকট আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই শিকারা গোঁফ-দাড়ি খুলিয়া ফেলিল এবং একমুখ হাসিয়া বলিল—কাল স্ত্রীলোকের বেশে আসিয়াছিলাম বলিয়া আপনার প্রহরীরা আমাকে আপনার কাছে যাইতে দেয় নাই। আজ তাই পুরুষ-বেশে আসিয়াছিলাম, আজও যাইতে দিল না। আমি অবশ্য জোর করিয়া প্রবেশ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি আপনাদের বন্ধু এবং অতিথি, তাই আপনাদের মনে দুঃখ হয় এমন কিছু করিতে চাই না। আপনাদের —বিশেষ করিয়া আপনার—প্রেমই আমি কামনা করি। চলুন, আপনার আস্তানাটা একবার দেখিয়া আসি।

আমি রাজি হইলাম না। বলিলাম—রাত্রে অন্ধকারে ওই জঙ্গলের ভিতর আপনি যাইতে পারিবেন না। আমার এই জঙ্গল যদি দেখিতে চান, দিনের বেলা আসিবেন, আমি আপনাকে সব দেখাইয়া দিব। এক দিনে অবশ্য সব দেখা সম্ভব নয়, অন্তত দশ দিন লাগিবে। আপনার যদি কৌতূহল থাকে, কাল সকালেই আসুন। আপনি এত রাত্রে আসিয়াছেন কেন ? শিকারা বলিল, জরুরি দরকার আছে। বলিলাম, কি দরকার বলুন ? শিকারা কিন্তু কিছু বলিল না, মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর অপাঙ্গ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, গভীর রাত্রে কোন একাকিনী নারী কোন্ জরুরি প্রয়োজনে একজন পুরুষের কাছে যায় তাহা কি আপনি জানেন না ? বলিলাম, আমি একটু হাঁদা গোছের লোক, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি সরল করিয়া বলুন। তখন সে বলিল, আমার মনের বেদনা যদি বুঝিতে চান আমার পূর্ব-ইতিহাস শুনিতে হইবে। আপনার কি সময় আছে ? যদি থাকে তাহা হইলে চলুন ওই গাছটার নীচে আমরা বসি। সেখানে বসিয়া আপনাকে আমার জীবন-কাহিনী শুনাইব। আমার জীবন-কাহিনী শুনিলে আপনার হয়তো আমার উপর অনুকম্পা হইবে। আমি একটু বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু শিকারার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। কাছেই প্রকাণ্ড একটি বট-বৃক্ষ ছিল, তাহারই তলায় গিয়া দুইজনে উপবেশন করিলাম। বেশ অন্ধকার জায়গাটা। শিকারা আমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। আমি কিন্তু সরিয়া বসিলাম। শিকারা তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

বলিল—আমি পিরালার রাণী, পিরালার রাজা তেমুজিন আমাকে বিবাহ করিয়াছিল। আমরা এখন যদিও আপনাদের মতো চাষ-বাস করি, কিন্তু পূর্বে আমরাও দস্যুবৃত্তি করিতাম। আমি হুন-কন্যা, আমার পিতা গোমন্দ খাঁ গোবি মরুভূমিতে প্রবল-প্রতাপ হুন-সর্দার ছিলেন। হুনরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করিত। একদল আর একদলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিত। শুনিয়াছি আমার মা নাজনীকে আমার বাবা এক হুন শিবির হইতে লুঠ করিয়া আনিয়াছিলেন। গোমন্দ খাঁ-র হারেমে অনেক বেগম ছিল, কিন্তু আমার মা ছিলেন গোমন্দ খাঁ-র প্রিয়তমা। হুনেদের জীবনে আর পশুর জীবনে

বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। ঘোড়া, গরু, ভেড়া আর খচ্চরই আমাদের সঙ্গী। তাহারাই আমাদের সম্পত্তি। আমরা তাহাদের মাংস খাই, তাহাদের দুধ দুহিয়া তাহাদেরই চর্ম হইতে প্রস্তুত থলিতে জমাইয়া রাখি, সে দুধ পচিয়া যখন কুমিস হয় তখন তাহা পান করি। তাহাদের চামড়া দিয়া আমাদের গাত্রাবরণও প্রস্তুত হয়। যুদ্ধের ঢাল, তরবারির খাপ সবই পশুচর্মের। আমিও বাল্যকাল হইতে শিকার করিতে ভালোবাসিতাম। তাই আমার বাবা আমার নামকরণ করিয়াছিলেন শিকারা। আমার আদরের ছোট্ট নাম ছিল—খুশ। এ নাম কিন্তু আমার বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারাইয়া গিয়াছে। বোহন খাঁ আর একটি হুন সম্প্রদায়ের সর্দার ছিল। তাহার দলে ছিল তিন হাজার ঘোড়সোয়ার। সে আমার বাবাকে খবর দিল যে আমার বাবা যদি তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার দলে যোগ না দেন তাহা হইলে সে আমাদের আক্রমণ করিবে। বাবা রাজি হইলেন না। একদিন গভীর রাত্রে বোহন অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করিল। অনেকে মরিল, অনেকে পলাইয়া গেল। আমার বাবা-মা পলাইতে পারেন নাই। বোহন তাঁহাদের বন্দী করিয়া হত্যা করিয়াছিল। আমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া আমাদেরই একজন সৈনিক মরুভূমির মধ্যে অন্ধকারে পলাইয়া গিয়াছিল। সে যে কে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। অন্ধকারে তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া সে টপ করিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছিল—আমরা হারিয়া গিয়াছি চল পালাই। ঘোড়ার পিঠে তাহার কোমর জড়াইয়া আমি বসিয়াছিলাম। অন্ধকারের ভিতর অনেকক্ষণ আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছিলাম। হঠাৎ আমার রক্ষক ঘোড়া হইতে নীচে পড়িয়া গেল। ঘোড়াটাও দাঁড়াইয়া পড়িল। আমিও ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি উঠিতেছেন না কেন? আপনার কি খুব বেশী ব্যথা লাগিয়াছে? কোনও উত্তর পাইলাম না। তিনি নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলেন। যখন প্রভাত হইল তখনই বুঝিতে পারিলাম তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার উরুদেশ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখিলাম খড়্গাঘাতে তাঁহার চর্মের বর্ম ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পোশাক দেখিয়া বুঝিলাম লোকটি আমাদের দলের সৈনিক। এত বড় আঘাত সত্ত্বেও সে যে আমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া এতদূর আসিতে পারিয়াছে ইহাতে আমি অবাক হইয়া গেলাম। মৃতদেহের পাশেই বসিয়া রহিলাম অনেকক্ষণ। তাহার পর রোদ উঠিল, চারিদিকের হাওয়া তপ্ত হইয়া উঠিল, ক্ষুধারও উদ্রেক হইল। দেখিলাম ঘোড়াটা অনেক দূরে চরিতেছে। বুঝিলাম ওখানে তাহা হইলে ঘাস আছে। ঘাস থাকিলে জলও আছে। দূরে একটি পাহাড়ও দেখিলাম। পাহাড় হইতে অনেক সময় ঝর্ণার ধারা নামিয়া আসিয়া মরুভূমির মধ্যেও মরূদ্যান সৃষ্টি করে। অনেক সময় সেখানে লোকজনও থাকে। আমি মৃত সৈনিকটির দেহ হইতে অস্ত্রগুলি খুলিয়া লইলাম। একটা তরবারি, বেশ বড় একটা ইস্পাহানি ছোরা, কোমরে বাঁধিয়া লওয়াই সঙ্গত মনে হইল। ভাবিলাম সঙ্গে অস্ত্র থাকিলে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। ঘোড়াটা যেখানে চরিতেছিল সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কাছে গিয়া দেখিলাম তাহারও বাম উরুতে একটি প্রকাণ্ড ক্ষত, রক্ত পড়িতেছে না, রক্ত শুকাইয়া ক্ষতের মুখটি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তবু তাহাতে আরোহণ করিলাম এবং নদীর ধার দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে একটি পাহাড়তলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নদীটি সেখানে বেশ চওড়া হইয়াছে, তাহার স্রোতও প্রবল।

তাহার তীরে কয়েকটি পাথরের তৈরি বাড়িও দেখিতে পাইলাম। দূরে একটি মন্দিরের চূড়াও দেখা গেল। আমি যাইবামাত্র কয়েকজন বাহির হইয়া আসিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই চেহারা একরকম। সকলেরই মাথা কামানো এবং পরিধানে গলা হইতে পা পর্যন্ত হলুদ রঙের আলখাল্লা। তাহাদের ভাষা শুনিয়া মনে হইল তাহারা চীনা। চেহারাও অনেকটা সেই রকম। আমার বাবা মাঝে মাঝে চীন দেশের সীমান্তে লুটপাট করিতে যাইতেন। তখন দুই একটা চীনাকে দেখিয়াছিলাম। অশ্বপৃষ্ঠে আমার সশস্ত্র আবির্ভাব দেখিয়া তাহারা ভয় পাইয়াছে মনে হইল। আমি অনুভব করিলাম এখানে আতিথ্যগ্রহণ করিতে হইলে ইহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে। আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া আমার তরবারি এবং ছোরা খুলিয়া তাহাদের পায়ের কাছে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলাম। তাহার পর মুখে এবং পেটে হাত দিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। তখন তাহার মধ্যে একজন—পরে শুনিয়াছি তাহার নাম লামা লিং—আমাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। যদিও ঘরের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল তিনি অত্যন্ত গরীব তবু একটি মূল্যবান চীনার বাসনে তিনি আমাকে খাইতে দিলেন। যাহা খাইতে দিলেন তাহা অবশ্য নগণ্য—কিছু বাসী ভাত এবং কি একটা কন্দ-সিদ্ধ। তাহার সঙ্গে একটি লঙ্কার টুকরা। বাসনটি কিন্তু মহামূল্য। আমার খাওয়া শেষ হইলে তিনি সযত্নে বাসনটি ধুইয়া মুছিয়া ন্যাকড়া জড়াইয়া একটি কাচের বাক্সে সযত্নে রাখিয়া দিলেন। দরিদ্রের গৃহে এরূপ মহামূল্য বাসন কি করিয়া আসিল তাহা ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। একবার সন্দেহ হইল ইহারা চোর না তো! দেখিলাম আমার তরবারি ও ছোরাটিকেও ইহারা সযত্নে তুলিয়া রাখিল। আমার খাওয়া শেষ হইলে লামা লিং ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল এবং দুইটি লোক লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পর আমাকে ইঙ্গিতে জানাইল যে উঁহাদের সঙ্গে আমাকে যাইতে হইবে। আমার ঘোড়াটি দাঁড়াইয়া ছিল। আমি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। আমার সঙ্গী দুইজনের মধ্যে একজন আমার পিছনে চড়িল এবং আর একজন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটিকে পর্বতশ্রেণীর দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। পর্বতশ্রেণী যত কাছে মনে হইতেছিল দেখা গেল তাহা তত কাছে নয়। মরুভূমিতে ধুলার ঝড় বহিতেছিল, কিছুদূর গিয়া আমরা আর যাইতে পারিলাম না। দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া সেই তপ্ত বালুর উপরই শুইয়া পড়িলাম। আমি হূন-কন্যা, মরুভূমির তপ্ত হাওয়ার সহিত আমার বাল্যকাল হইতেই পরিচয়, তবু মনে হইতে লাগিল আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমার ঘোড়াটি আগে হইতেই অসুস্থ হইয়াছিল, সে-ও এবার শুইয়া পড়িল এবং খানিকক্ষণ পরে মারা গেল। সমস্ত দিন বালুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আমরা শুইয়া রহিলাম। আমাদের উপর বালুর কয়েকটা আস্তরণ পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর ঝড়টা কমিলে আমরা পদব্রজে আবার যাত্রা করিলাম। যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন অনেক রাত্রি। ক্ষুধায় পিপাসায় ক্লান্তিতে আমি প্রায় মর-মর। পর্বতের তলদেশে দেখিলাম অনেক লোকের বাস। পর্বতের পাশ দিয়া একটি নদীও বহিতেছে। আমার সঙ্গীরা ভিতরে ঢুকিয়া গেল। একটু পরেই আমার জন্য খাবার এবং চমৎকার একটি পানপাত্রে কিছু ঠাণ্ডা জল লইয়া একটি অপরিচিত লোক প্রবেশ করিল। সে আমাদের ভাষায় কথা বলিল—এখন যাইয়া বিশ্রাম কর। কাল

সকালে তোমার সব বিবরণ শুনিব। বুঝিলাম এ লোকটি আমাদের ভাষা জানে বলিয়াই ইহার কাছে আমাকে আনা হইয়াছে। পরদিন সকালে অকপটে সব তাঁহাকে বলিলাম। তিনি খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—এ পাহাড়ের গুহায় গুহায় বুদ্ধমূর্তি এবং বুদ্ধের ছবি আছে। সহস্র বুদ্ধের মন্দির নামে ইহা খ্যাত। এখানে তোমাকে থাকিতে দেওয়া নিরাপদ নয়। তোমার সন্ধানে হুনরা হয়তো এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। এখান হইতে কিছু দূরে একটি পথ আছে। সেই পথ দিয়া চীনদেশ হইতে বহু পণ্যদ্রব্য পশ্চিম দেশে যায় উটের পিঠে। সেখানেই লইয়া গিয়া কোনও উটের পিঠে তোমাকে চড়াইয়া দিব আমরা। তাহারা তোমাকে লইয়া গিয়া কোনও বাজারে বিক্রয় করিয়া দিবে। যে তোমাকে কিনিবে সে-ই তোমার আশ্রয়দাতা হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কাল সকালে আমাদের একজন লোক তোমাকে সেই পথের ধারে উটের আড্ডায় লইয়া যাইবে। উটের আড্ডাটিও বেশ দূরে। উটের পিঠে চড়িয়া যাইতে হইবে। এই পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা উট যায় উটের আড্ডার দিকে। সেই উটেই আমরা যাইব। আমি বিদেশী হাটের পণ্য একথা শুনিলে উট-ওলা আর আপত্তি করিবে না। পরদিনই একজন উট-ওলা আসিল, আমাকে এবং আমার সঙ্গীকে উটের পিঠে তুলিয়া লইল। দেখিলাম উট-ওলার সহিত আমার সঙ্গীর পূর্ব-পরিচয় আছে। মনে হইল কিছু ব্যবসার সম্পর্কও আছে। কারণ একটু পরেই সে থলি হইতে একটি মূল্যবান চীনের বাসন বাহির করিয়া বলিল—মরুভূমির মধ্যে এইটি কুড়াইয়া পাইয়াছি। চীনদেশ হইতে একদল বণিক অনেক জিনিসপত্র লইয়া বিদেশের বাজারে যাইতেছিল। একদল হুন আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করে। কিছু জিনিস হুনেরা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, কিছু জিনিস লইয়া বণিকেরা-পলাইতে পারিয়াছে। পলাইবার সময় কিছু জিনিস তাহারা এদিকে ওদিকে ফেলিয়া গিয়াছে। আমি যখন আসিলাম তখন দেখিলাম কিছু খালি পেটিকা ওদিকে ছড়ানো রহিয়াছে। তাহারই একটির মধ্যে এইটি পাইয়াছি। তুমি যদি লইতে চাও লও। যে মূল্য দিবে তাহাই লইব। আমার সঙ্গীটি তাহার হাত হইতে আংটিটি খুলিয়া দিল। বলিল—আমার পূর্ব-পুরুষরা এককালে চীনে ছিলেন। সে দেশকেই আমি স্বদেশ মনে করি। সে দেশের শিল্পীরা যে জিনিস প্রস্তুত করে তাহা আমার নিকট বহুমূল্য। আমার আংটিটি লইয়া ওটি আমাকে দিন। উট-চালক আপত্তি করিল না।

উটের আড্ডায় গিয়া দেখিলাম সেখানে অনেক উট। তাহারা সবলেই দূরদেশের যাত্রী। কেহ বোখারা যাইবে, কেহ তেহারানে, কেহ রোমে, কেহ সিডনে। আমাকে দেখিবামাত্র ক্রেতারা প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। অবশেষে পাঁচশত রৌপ্যমুদ্রা দিয়া একজন রোমীয় বণিক আমাকে খরিদ করিল। লোকটি বৃদ্ধ। তাহার আচরণে পিতৃসুলভ স্নেহের পরিচয় পাইলাম। দেখিলাম তিনিও আমার ভাষা জানেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাকে কোন হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবেন? তিনি বলিলেন, তুমি যদি ভালোভাবে থাকো তোমাকে বিক্রয় করিব না। ব্যবসা করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি তাহা লইয়া আমি ভারতবর্ষে চলিয়া যাইব। রোমের রাজারা বড় অত্যাচারী, রোম সাম্রাজ্যে আর থাকিব না। আমার আত্মীয়স্বজন সব মারা গিয়াছে। তোমাকে লইয়া ভারতবর্ষে নূতন ঘর বাঁধিব। তুমি আমার মা হইবে, আমি হইব

তোমার ছেলে। রাজী আছ তো? আমি বলিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে। সমস্ত রাত উটের পিঠে চড়িয়া অজানা ভবিষ্যতের নানা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে পথ চলিতেছিলাম। এমন সময় একদল ডাকাত আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ মারা গেলেন। আমাকে বন্দী করিয়া ডাকাতের দল ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া মরুভূমির মধ্যে ছুটিতে লাগিল। অবশেষে ডাকাতরা আমাকে তাহাদের সর্দারের কাছে লইয়া গেল। সর্দার আমাকে টিপিয়া টুপিয়া দেখিলেন এবং শেষে কহিলেন মালটি ভালো, কিন্তু আমাদের এখানে স্থানাভাব। মেয়ের সংখ্যা আর বাড়ানো উচিত নয়। এটাকে কাল হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া দাও। বেশ মোটাসোটা আছে, ভালো দাম পাওয়া যাইবে। আমি এখন যে রাজ্যের রাণী সেই পিরালা রাজ্যের নিকটই একটি বড় হাট বসে। সেই হাট হইতে তেমুজিন আমাকে কিনিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিল। আমিই তেমুজিনের প্রথমা পত্নী। বিবাহের পর আবিষ্কার করিলাম যে তেমুজিন যদিও পুরুষ কিন্তু তাহার পৌরুষ নাই। তেমুজিন কিন্তু লোক বড় ভালো। যদিও তাহার পূর্বপুরুষেরা এককালে যাযাবর হুন ছিল, কিন্তু তাহারা বহুদিন হইতে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের মতো চাষবাস করিয়া পিরালা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সকলেই তাহাকে ভালবাসে। হুন দস্যুরা মাঝে মাঝে তাহার রাজত্বে হানা দিয়া লুটপাট করিত। পিরালা রাজ্যের লোকেরা যতটা পারিত আত্মরক্ষা করিত। কিন্তু তাহাদের বহু ক্ষতি ও বহুলোকের প্রাণহানি দেখিয়া আমি তেমুজিনকে বলিলাম—বিষয়-আশয় থাকিলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র বাহিনী রাখিতে হইবে। আমি হুনের মেয়ে, আমি তোমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিব। পিরালা রাজ্যের পাশেই খেথুনরা থাকে। আমি তাহাদের দলপতিকে একদিন নিমন্ত্রণ করিলাম। তাঁহার একটা সেনাবাহিনী ছিল। তিনি বলিলেন আরব দেশ হইতে রোম হইতে তিনি শিক্ষক আনাইয়া এই সেনাবাহিনী করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই করিতে উপদেশ দিলেন। আমরা তাহাই করিলাম। প্রায় পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমরা একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইলাম। তোমাদের যেমন বিরানি জঙ্গল আছে আমাদের পিরালাতেও তেমনি আছে পোলং। পোলং জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া আমাদের শিক্ষকরা আমাদের যুদ্ধ শিখাইতেন। প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ শিখাইলে বিপদ আছে। শত্রুরা জানিতে পারিলে আক্রমণ করিবে এ ভয় ছিল। আমিও পোলং জঙ্গলে সৈন্যদের সহিত থাকিয়া যুদ্ধ-বিদ্যা শিখিয়াছি। তেমুজিনও শিখিয়াছিল, কিন্তু বড় দুর্বল ছিল সে। রাজা হিসাবে সে-ই প্রধান সেনাপতি হইয়াছিল। সেনাপতি হইবার পূর্ণ যোগ্যতা সে কিন্তু অর্জন করে নাই। আমি তাহার পাশে না থাকিলে বহুদিন পূর্বেই শত্রুরা আমাদের বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিত। খেথুনদের রাজা জিজিগম ভীষণ প্রকৃতির লোক, প্রত্যহ একটি করিয়া ভেড়া আহার করে। কাহারও সহিত হাসিয়া কথা কয় না। কিন্তু আমি তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম। এই বন্ধুত্ব আমাদের পিরালাকে রক্ষা করিয়াছে। ওই হুন সর্দার মালেক—আমাদের যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, জিজিগম সসৈন্যে সাহায্য না করিলে আমরা মুশকিলে পড়িতাম। যাই হোক এখন পিরালা ও খেথুন রাজত্বকে একটি বিরাট রাজত্ব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ আমরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তেমুজিন মারা যাইবার পর জিজিগম আমাকে বিবাহ

করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু আমি রাজী হই নাই। কারণ তাহার অনেক পত্নী। দুই একজনকে ডাইনী বলিয়াও সন্দেহ হয়। তোমাদের ভিংড়ার মতো তাহারা এমন অনেক কিছু কাজ করে যাহা ভয়ানক। দিনের বেলা তাহারা অপরূপ রূপসী, কিন্তু রাত্রে তাহারা ভয়ংকরী। অনেকে বলে রাত্রে তাহারা ব্যাঘ্রিনীর রূপ ধারণ করিয়া শত্রু নিপাত করে। আমি তাই জিজিগমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। সর্দার মালেকের গুপ্তধন জুনজিরা পর্বতে লুক্কায়িত ছিল। তাহা অধিকার করিতে পারিলে তাহার কিছু অংশ জিজিগমকে দিব। কিন্তু জুনজিরায় গিয়া কিছুই পাইলাম না। মনে হয় ঘুরঘুট তাহা সরাইয়া ফেলিয়াছে। তাই ভাবিতেছি ঘুরঘুটের পত্নী ভুলেরাকেই উপহার-স্বরূপ জিজিগমের নিকট পাঠাইয়া দিব। যুবতী নারী পাইলে জিজিগম খুব খুশী হয়। আপনি হন না?

এই বলিয়া শিকারা আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। আমি তাহার মতলবটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তো জান আমি তোমাদের মতো নই। আমি মাছ-মাংস খাই না, নারীসঙ্গও কখনও করি নাই। করিবার প্রবৃত্তি যে হয় না, তাহা নয়। আমি কিন্তু সে প্রবৃত্তি দমন করি। দমন করিয়া একটা বিশেষ ধরনের সুখ পাই। শিকারাকে কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম। শিকারা আবার বলিল—আমার জীবন-কাহিনী আপনাকে বলিলাম, তাহার কারণ আমি আপনাকে জীবনের সঙ্গী রূপে পাইতে চাই। আমি একাধিক পুরুষসঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত পুরুষের দেখা পাই নাই। আপনাকে দেখিয়াই আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল—হ্যাঁ এই তো একটা পুরুষের মত পুরুষ। আপনার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি, আপনাকে আমি চাই। যদি পাই তাহা হইলে আমার সৈন্যরা আপনার এলাকা রক্ষা করিবে, আমার সেনাপতিরা আপনাদের জন্য নূতন বাহিনী সৃষ্টি করিবে, আমার সমস্ত সামর্থ্য, সমস্ত প্রতাপ, সমস্ত সম্পত্তি আপনি ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমার বেদনা আপনাকে দূর করিতে হইবে, আমার পিপাসা আপনাকে মিটাইতে হইবে।

আমি তবু চুপ করিয়াই রহিলাম।

শিকারা তখন প্রশ্ন করিল—চুপ করিয়া আছেন কেন, কিছু একটা বলুন।

তখন বলিলাম—আমি খুব স্বাভাবিক মানুষ নই। স্বাভাবিক মানুষ হইলে আপনার এ প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করিতাম। পুরুষ-পশু স্ত্রী-পশু দেখিলে যে সব আচরণ করে, তাহা আমি করিতে পারি না। মাঝে মাঝে আমার যে উত্তেজনা হয় না তাহা নহে, কিন্তু সে উত্তেজনা দমন করিয়া আমি আনন্দ পাই। সেজন্য মনে হইতেছে আপনার জীবন-সঙ্গী হইবার যোগ্যতাই বোধহয় আমার নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই। কিন্তু আপনার মত শক্তিময়ী নারীর বন্ধুত্ব আমি কামনা করি। আমি বুঝিয়াছি আমাদের ভূসম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাহার আয়োজনও আমরা করিয়াছি কিন্তু ঠিক মতো নির্দেশ দিয়া আমাদের পরিচালনা করিবে এরূপ লোক আমরা পাই নাই। আপনি কি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন? আপনি আমাদের বন্ধু হইলে এ বিষয়ে আমাদের আর কোন দুর্ভাবনা থাকিবে না।

আমার কথা শুনিয়া শিকারা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার মনে হইল

যেন একটা হায়না ডাকিতেছে। হাসি থামাইয়া সে শেষে বলিল—স্বার্থের বন্ধন ছাড়া পৃথিবীতে কোন বন্ধনই টেকে না। আমি কোন স্বার্থে আপনার হিতৈষী হইব? আপনাকে জীবনসঙ্গী রূপে পাইলে আপনার সম্পত্তিকে আমার সম্পত্তি রূপে গণ্য করিতে পারি। কিন্তু আপনি যখন তাহাতে রাজী নন তখন আমি তাহা পারি না। আমার সেনাপতিরাই তাহাতে রাজী হইবে না। আপনি যদি আমাকে বিবাহ করিতেন তাহা হইলে আমার স্বামীরূপে তাহারা আপনাকে সম্মান করিতে বাধ্য হইত। আপনার আদেশ অনুসারে চলিতে আপত্তি করিত না। আপনাকে দেখিয়া সত্যই আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, আপনার পরিচয় পাইলে তাহাদেরও ভাল লাগিত। আপনিই তখন আমার রাজত্বের অধিপতিও হইতেন। আপনি এবং আমি এক বিশাল রাজত্বের রাজা ও রাণী হইতে পারিতাম। আপনাকে সঙ্গীরূপে পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। আমার জীবনের পিপাসা আপনিই মিটাইতে পারিবেন। আপনি ব্যাপারটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন।

আমি বলিলাম—ভাবিবার জন্য তাহা হইলে কয়েকদিন সময় চাই। তাছাড়া ইহার আর একটা দিকও আছে। আমাদের দলের দলপতিকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে। তাহার সম্মতি না থাকিলে এককভাবে আমি কিছু করিতে পারি না। করা উচিতও হইবে না। সময় মত আমি টালাকে সব খুলিয়া বলিব। শিকারা এমন আকুল ভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল যেন আমাকে গিলিয়া খাইবে। আমি আর কালবিলম্ব করিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম—যত শীঘ্র সম্ভব আপনাকে খবর দিব। আপনি এখন আপনার তাঁবুতে ফিরিয়া যান। এই বলিয়া আমি বিরানির জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘটনাটা কয়েক দিন পূর্বেই ঘটিয়াছে, আমি তোমাকে এখন বলিব না ভাবিয়াছিলাম। নিজেই ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলাম কি করা উচিত। কিন্তু ভাবিয়া কোনও কূল-কিনারা করিতে পারিলাম না। ভাবিতেছিলাম কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করিয়া এখান হইতে চলিয়া গেলে শিকারা হয়তো বুঝিবে তাহার প্রস্তাবে আমি রাজি নই। তখন তোমার সহিত আলাপ করিয়া সে যাহা হয় ঠিক করিবে। কিন্তু এটাও আমার খুব মনঃপূত হইতেছিল না, কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় তুমি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলে। সব তোমাকে খুলিয়া বলিলাম। এখন কি করা উচিত ভাবিয়া দেখ।

আমি বলিলাম, শিকারাকে বিবাহ করিয়া তুমি যদি আমাদের অধিপতি হও, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তুমি আমাদের মাথার উপরে থাকিলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব। আমি যদিও আমাদের দলের দলপতি, আমার বাবাই আমাকে দলপতি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমি মনে-মনে বরাবরই জানি তুমিই আমাদের প্রকৃত দলপতি। তুমি যাহা ঠিক করিবে তাহাই হইবে। শিকারাকে বিবাহ করিয়া তাহার সৈন্যসামন্ত যদি আমরা পাই, আমাদের সেনাবাহিনী নির্মাণে সে যদি আমাদের সাহায্য করে, তাহা হইলে ভালই তো হয়। শিকারাকে বিবাহ করিতে তোমার সত্যই কি খুব আপত্তি আছে? সারাজীবন অবিবাহিত থাকিয়া তুমি এ রকম অস্বাভাবিক জীবন যাপন করিবে কেন তাহাও তো বুঝিতে পারিতেছি না।

ইহার উত্তরে দোহা যাহা বলিয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। সেই আদিম যুগেও মানুষ যে এত মহৎ হইতে পারে ইহা শুনিয়া তোমরাও হয়তো বিস্মিত হইবে। কিন্তু

একটা কথা তোমরা বিশ্বাস কর। মনুষ্যত্বের আস্বাদ সে যুগেও কোন কোন মানুষ পাইয়াছিল। কোন কোন মানুষ মাঝে মাঝে মহত্ত্বের মহিমা উপলব্ধি করিত। স্বার্থপর হওয়া অপেক্ষা নিঃস্বার্থপর হওয়া যে বেশী তৃপ্তিকর ইহা সে যুগের দুই একটা মানুষ বুঝিয়াছিল। তাহাদের সেই ধারাই মানব-পশুর মধ্যে এখনও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাদের সমাজকে অলঙ্কৃত করে।

দোহা বলিল—আমি অবিবাহিত থাকিতে চাই তাহার আর একটা কারণ আমার বাবা কে ছিলেন তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি যে ডঙ্কার বংশধর তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ডঙ্কার বংশধরই এখানে বরাবর দলপতি থাকুক ইহাই আমার ইচ্ছা। আমি যদি বিবাহ করি আমারও একটা বংশ হইবে এবং তাহার সহিত তোমার বংশধরদের মিল যে হইবেই এমন কোন কথা নাই। খুব সম্ভব হইবে না। আমি সেটা চাহি না, তাই আমি বিবাহ করিব না। তোমার বাবা তোমাকে দলপতি নির্বাচন করিয়াছিলেন, তুমিও কালক্রমে তোমার বংশধরদের ভিতর হইতে দলপতি নির্বাচন করিবে ইহাই আমার ইচ্ছা। আমার বংশধররা থাকিলে তাহাতে বিঘ্ন হইবে, সুতরাং আমি বিবাহ করিব না ঠিক করিয়াছি।

আমি বলিলাম—আমার বংশে হয়তো দলপতি হইবার উপযুক্ত ছেলে না-ও জন্মিতে পারে, কিন্তু তোমার বংশে হয়তো জন্মিতে পারিত—

আমরা যেখানে বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম তাহার পাশেই একটা ঝোপ ছিল। সেই ঝোপের ভিতর হইতে কণ্টকা বাহির হইয়া আসিল।

আমি দোহাকে প্রশ্ন করিলাম—কণ্টকাকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিব?

দোহা আপত্তি করিল না।

সবিস্ময়ে দেখিলাম কণ্টকা ফুলের সাজে সাজিয়া আসিয়াছে। কণ্টকা একটু সাজসজ্জা-প্রিয়। আজ যেন সাজটা একটু বিশেষ ধরনের মনে হইল। আমাদের দেখিয়া বলিল—তোমরা দুজনে এখানে বসিয়া কি করিতেছ?

বলিলাম—পরামর্শ করিতেছি। শিকারা দোহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। কি করা উচিত তাহাই ভাবিতেছি।

কণ্টকা কোন মন্তব্য না করিয়া হাসিমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—শিকারা শিকার-প্রিয়, নিত্য নূতন শিকার করিতে চায়। আমি জানি সে তাহার প্রধান সেনাপতির শিবিরে রোজ রাত্রে যায়। প্রধান সেনাপতি জোখরু তাগড়া বলিষ্ঠ জোয়ান। তাহার সহিত শিকারা তাহা হইলে কি সম্বন্ধ ত্যাগ করিল? যদি করে তাহা হইলে জোখরু দোহার শত্রু হইবে, এ কথা কিন্তু আমি বলিয়া দিতেছি। আর জোখরু যদি শিকারাকে ত্যাগ করে তাহা হইলে শিকারার সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিবে। সুতরাং শিকারাকে বিবাহ করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না এখন। তাছাড়া, দোহার আশায় আমাদের চম্বা চিরকুমারী হইয়া আছে, আমার ধারণা, দোহারও কিছু দুর্বলতা আছে তাহার সম্বন্ধে—এ ব্যাপারটার কোনও মূল্যই দিবে না তোমরা? শিকারা আসিয়া ছোঁ মারিয়া আমাদের দোহাকে লইয়া যাইবে?

দোহা বলিল, আমাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যাওয়া সহজ নয়। আমি বিবাহই করিব না ঠিক করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে শিকারার কবল হইতে কি করিয়া আমরা উদ্ধার পাই? সে সৈন্য-সামন্ত লইয়া আমাদের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে,

বলিতেছে আপনি আমার জীবনসঙ্গী হউন—আমরা উভয়ে এক বিরাট রাজ্যের রাজা-রাণী হই, এ অবস্থায় কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমি যদি শিকারাকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করি তাহা হইলে আমরা সকলেই বিপন্ন হইব, তাই ভাবিতেছি কোনও ছুতায় কাল-হরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাহাই করিতেছি। তুমি ফুলের সাজ পরিয়া কোথায় যাইতেছ?

কণ্টকা হাসিয়া বলিল—ডিম্বা হইতে একটা নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, সেখানে যাইতেছি। কাল সেখানকার একজন লোক আসিয়া গোপনে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে আমি যেন গোপনেই সেখানে যাই। কিন্তু আমি দলপতির কাছে অনুমতি লইতে আসিয়াছি। তাহাকে না জানাইয়া অতদূরে যাওয়াটা সঙ্গত হইবে না। আমি আমাদের একটা ঘোড়াও লইয়া যাইব। হাঁটিয়া গেলে ডিম্বায় পোঁছিতে প্রায় কুড়ি দিন লাগিবে। ঘোড়ায় গেলে হয়তো শীঘ্র পোঁছিব। আমি একটা ঘোড়া পাইতে পারি কি?

আমি বলিলাম—ডিম্বা তো এখান হইতে অনেক দূর। সেখানে আমরা কেহ কখনও যাই নাই। শুনিয়াছি সেখানে ব্যাঘ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজত্ব করে। যদিও আমাদের মতো চাষবাসই করে, কিন্তু তাহারা হিংস্র প্রকৃতির লোক। বাহিরের কাহাকেও ঢুকিতে দেয় না। তুমি সেখানে বন্ধু যোগাড় করিলে কিরূপে? তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে? বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। সব খুলিয়া বল দেখি—

কণ্টকা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। কোন জবাব দিল না। তাহার পর বলিল—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি কোনও কথা প্রকাশ করিব না। শুধু একটা কথা বলিতে পারি সেখানে গেলে আমাদের মঙ্গল হইবে, অমঙ্গল হইবে না। যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি আমাকে গোপনে একা যাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তোমার অনুমতি লওয়াটা আমি সঙ্গত মনে করিলাম। তাই তোমাকে বলিলাম। আমাকে আর এ বিষয়ে বেশী প্রশ্ন করিও না, উত্তর দিব না।

দোহা হাসিয়া প্রশ্ন করিল—ফুলের সাজ পরিয়াছ কেন?

কণ্টকা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, ইচ্ছা হইল, পরিলাম। আমি বলিলাম, তোমার খুশী অনুসারেই তুমি চল। আমরা বাধা দিব না। একটা ভালো ঘোড়া লইয়া যাও। আর আমার পরামর্শ যদি শোন, আর একটা ঘোড়ায় দমকে লইয়া যাও। সে দূরে দূরে তোমার পিছু পিছু যাক।

কণ্টকা বলিল—না, আমি তাহাদের কথা দিয়াছি একাই যাইব। তবে সঙ্গে কিছু অস্ত্র লইব।

তাহার পর দোহার দিকে ফিরিয়া বলিল—শিকারাকে প্রশ্রয় দিও না। তাহার সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। বিরাট বিরানি জঙ্গল তোমাকে রক্ষা করিবে। আমি যতদিন পর্যন্ত না ফিরি ততদিন সেখানে আত্মগোপন করিয়া থাকাই ভালো। আমি চলিলাম—

কণ্টকা মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া ঝোপের মধ্যে অন্তর্ধান করিল।

দোহা বলিল—কণ্টকার উপদেশই পালন করিব। সম্প্রতি বিরানির মধ্যে বিরাট একটা গুহা করিয়াছি। তাহার চারিদিকে নানারকম গাছ পুঁতিয়াছি। গুহার

প্রবেশ-পথে দুইটি গাছ আছে, গাছকে ঢাকিয়া আছে দুইটি প্রকাণ্ড লতা। বাহির হইতে গুহার মুখ দেখা যায় না। গুহাটি মাটির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সেখানেই আমি থাকিব। শিকারা যদি আমার খোঁজ করে, বলিও আমি অন্যত্র গিয়াছি। পনেরো দিনের আগে ফিরিব না। তুমিও আমার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিও না। দেখা করিতে গেলেই ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইবে। আমি কেবল বিরানির একজন কর্মীকে বলিব আমি কোথায় আছি। সে যদি বোঝে কোনও কারণে আমাকে অবিলম্বে খবর দেওয়া উচিত, তাহা হইলেই আমাকে খবর দিবে। শিকারা যদি আসিয়া খোঁজ করে, বলিও আমি এখানে নাই।

পরদিনই শিকারা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম দোহার জন্য সে বড়ই উতলা হইয়া উঠিয়াছে। দেখা হইবামাত্র বলিল—আমি বিরানি জঙ্গল হইতে আসিতেছি। সেখানে দোহাকে তো দেখিলাম না। দোহার খোঁজেই গিয়াছিলাম। সেখানকার একজন লোক বলিল দোহা কোথায় গিয়াছে তাহা তাহারা জানে না। সে নাকি এখানে নাই। আপনি তাহার কোনও খবর জানেন কি—?

বলিলাম, আমাকেও সে বলিয়াছিল সে বিদেশে যাইবে। ঠিক কোথায় যাইবে তাহা বলে নাই—।

আমরা মিথ্যাভাষণে অভ্যস্ত ছিলাম না, তাই এই মিথ্যা কথাটা বলিয়া মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। আমার মনোভাব হয়তো আমার মুখে আভাসিত হইয়াছিল।

শিকারা বলিল—আমার নিকট সত্য গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা সত্য তাহা আমি জানি। দোহাকে আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মনে হয় দোহা আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়। তাই সে আমাকে এড়াইয়া চলিতেছে, তাই সে কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে। কিন্তু কতদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিবে? তাহাকে একদিন না একদিন ফিরিতেই হইবে। তাহার জন্য আমি অপেক্ষা করিব। আপনি দলপতি, আপনাকেও কথাটা বুঝাইয়া বলি। আমি সত্যই আপনাদের হিতৈষী, আমি আপনাদের আপন লোক হইয়া থাকিতে চাই, আমি আপনাদের অবলম্বন করিয়া এ অঞ্চলে প্রকাণ্ড রাজত্ব স্থাপন করিতে চাই। কিন্তু সর্বাগ্রে চাই দোহাকে। আমি অনেক পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছি, কিন্তু দোহার মতো বিরাট পুরুষ আগে কখনও দেখি নাই। আমাকে দেখিয়া অনেক পুরুষ মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু দোহা আমার সম্বন্ধে এমন উদাসীন কেন বুঝিতে পারিতেছি না।

বলিলাম—দোহা আপনার সম্বন্ধে উদাসীন নয়। তাহার কথাবার্তায় বুঝিয়াছি সে আপনাকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করে। আমাদের সহিত আপনি যে ব্যবহার করিতেছেন এ জন্য সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। কোনও নারীর সঙ্গই সে কামনা করে না। মাছ মাংস খায় না। তাহার স্বভাব সত্যই একটু অদ্ভুত। আমার মনে হয় সে কোনও গোপন কারণে এই খাপছাড়া জীবন যাপন করিতেছে। আমার মনে হয় না এ পথ হইতে কেহ তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে। দোহা বড় একরোখা লোক। সম্ভবত কোনও ব্রত-পালন করিতেছে সে। সে যদি আপনাকে বিবাহ করিত, আমি খুব খুশি হইতাম। নিশ্চিন্তও হইতাম। আপনার সেনাপতি জোখরু যদি আমাদেরও একটা সেনাবাহিনী গঠন করিয়া দিত, বাহিরের

শত্রু-ভয় আমাদের আর থাকিত না। কিন্তু দোহা যদি আপনাকে বিবাহ না-ই করে, তাহা হইলে এ বন্ধুত্ব কি থাকিবে না ?

শিকারা হাসিয়া উত্তর দিল—হয়তো মৌখিক বন্ধুত্ব থাকিবে। কিন্তু তাহা কি নির্ভরযোগ্য ? আত্মীয়তার বন্ধনই বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে দোহা একথা কেন বুঝিতেছে না ? যাই হোক, আমি কালই এখান হইতে চলিয়া যাইব। আমার পিরালায় একবার যাওয়া প্রয়োজন। ঘুরঘুট খাঁকে বিশ্বাস নাই। সে আবার হয়তো আমার রাজ্যে আক্রমণ করিবে। আমার নিকট হইতে ভুলেরাকে সে হয়তো লইবার চেষ্টা করিবে। তাই ভাবিতেছি ভুলেরাকে আপনার কাছেই কাড়িয়া রাখিয়া যাইব। ঘুরঘুট সত্যই একজন বীরপুরুষ, সে যাহাতে আমার দলে যোগ দেয় এই প্রস্তাব করিয়া তাহার নিকট একজন লোক পাঠাইব মনে করিয়াছি। ভুলেরাকে সাবধানে রাখিবেন সে যেন পলাইয়া না যাই। ভুলেরা-মূল্যেই আমি ঘুরঘুটকে কিনিব।

আমি বলিলাম—মাপ করিবেন, ভুলেরার দায়িত্ব আমি লইতে পারিব না। আমরা শান্তিপ্রিয় লোক। ভুলেরাকে আমরা আটকাইয়া রাখিয়াছি এ খবর পাইলে ঘুরঘুট খাঁ হয়তো আমাদেরই শত্রু হইয়া উঠিবে। সেটা আমি চাইনা।

শিকারা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল—শত্রুকে ভয় পান ? পৃথিবীতে সবাই শত্রু। শত্রুর সহিত হয় যুদ্ধ করুন, না হয় কায়দা করিয়া বন্ধুত্বের ভান করুন। আপনারা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু শান্তি চাহিলেই কি পাওয়া যায় ? অশান্তি কোন দিক দিয়া কখন আসিবে কে বলিতে পারে ? যেদিক দিয়াই আসুক, অশান্তি আসিবেই। যাই হোক, এখন চলিলাম। কিছুদিন পরে আবার আসিব।

পরদিন শিকারা তাহার সৈন্যসামন্ত লইয়া চলিয়া গেল। ভুলেরাকেও লইয়া গেল সে। শিকারা চলিয়া যাইবার পরদিনই দোহা বিরানি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বলিল, শিকারা আবার ফিরিয়া আসিবে। সে আমাদের এই অঞ্চলটা অধিকার করিতে চায়। আমাকে বিবাহ করিবার যে প্রস্তাবটা সে করিয়াছে তাহা একটা অজুহাত মাত্র। আমাদের অঞ্চলটা সে দখল করিয়া ভোগ করিতে চায়। তেমুজিনকে বিবাহ করিয়া সে তাহাকে পুতুলে পরিণত করিয়াছিল। আমাকেও তাহাই করিতে চায়। আমাদের বিরানি জঙ্গলে নানারকম ফলের গাছ আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রোপন করিয়া গিয়াছিলেন। সে সব দেখিয়া শিকারার চোখ-মুখে লোভের যে লালায়িত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি। তাহার পিরালা রাজ্য মরুভূমির ওপারে। সেখানে খেজুর ছাড়া অন্য গাছ জন্মায় না, কাছে-পিঠে কোন নদী নাই। জমি সব শুষ্ক। ফসলও ভালো হয় না। মাংসই উহাদের প্রধান খাদ্য। কিছুদিন আগেই উহারা মরুচারী দস্যু ছিল। এখন গৃহস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই আমাদের এই জনপদটা দেখিয়া শিকারার পছন্দ হইয়াছে। মনে হয় সৈন্যসামন্ত লইয়া সে আবার আসিবে এবং জোর করিয়া আমাদের সব অধিকার করিবে। আমার তো এখন সৈন্যসামন্ত কিছু নাই। তাই আমার মনে হয় তুমি আমাদের রাজার কাছে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা কর। তাঁহাকে

আমরা প্রতি বছর শস্য পাঠাই, চামড়া পাঠাই, ফল পাঠাই। মনে হয় তিনি আমাদের সাহায্য করিবেন।

আমি বলিলাম—আমাদের রাজা আছে শুনিয়াছি। তাঁহাকে দেখি নাই। তিনি বহুদূরে থাকেন। অনেক নদী পার হইয়া তাঁহার কাছে পৌঁছিতে হয়। আমরা তো কেহ কখনও সেখানে যাই নাই। আমাদের হাটের ব্যাপারী মর্দন আমাদের জিনিসগুলি লইয়া রাজার কর্মচারীর কাছে সেগুলি পৌঁছাইয়া দেয়। সে কর্মচারীর সহিতও আমাদের পরিচয় নাই। তবে মর্দনকে খবর দিয়া দেখি, সে কি বলে।

দোহা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—তাহাকেই বরং সেই রাজকর্মচারীর কাছে পাঠাও। মোট কথা, আত্মরক্ষার জন্য অবিলম্বে আমাদের কিছু একটা করা দরকার। কণ্টকা কি উদ্দেশ্যে যে কোথায় চলিয়া গেল তাহাও তো বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আর একটা কাজ কর, বিদেশের হাটে লোক পাঠাও। কিছু অস্ত্র কিনিয়া আনুক। আমাদের লোকবল আছে, তাহারা হয়তো যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত নয়, কিন্তু তাহাদের হাতে অস্ত্র দিলে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। আর কাল টুকচুম্বার তলায় আমরা একটা সভা করিয়া সকলকে ব্যাপারটা জানাইয়া দিব। তাহার পর প্রার্থনা করিব। টুকচুম্বাই আমাদের দেবতা, তাহার নিকট আমাদের বিপদের কথা বলিব।

আমি বলিলাম—আমার এক সৎমা মন্মন গরু পূজা করে, আর একজন সৎমা টুলা ছাগল পূজা করে, জিকটুর বিশ্বাস কাকেরা সন্তুষ্ট থাকিলে সমাজের মঙ্গল হয়। সে কাককে প্রায়ই খাবার দেয়। রম্ভা বিড়াল পূজা করে। ঝাঝা রোজ সূর্যপ্রণাম করে। আমি ইহাদের ডাকিয়াও আমাদের বিপদের কথা বলি। তাহারাও নিজের নিজের দেবতাকে ডাকুক।

দোহা বলিল, তা ডাকুক, কিন্তু কাল টুকচুম্বার তলায় সকলে যেন আসে। টুকচুম্বা আমাদের আদি দেবতা। আমাদের পূর্বপুরুষ ডঙ্কা স্বহস্তে ইঁহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমার জন্ম ওই টুকচুম্বার তলায়। আমার মা-ও আমরণ ওই গাছের তলায় ছিলেন। টুকচুম্বাকেও আমরা কাল পূজা করিব। এখন আমি চলি। বিরানিতে অনেক ডুমুর পাকিয়াছে, হাটে পাঠাইব। ওগুলির বদলে কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাইলে তাহাই আনিতে বলিব। তুমিও গমের গোলা হইতে কিছু গম বাহির করিয়া বিদেশের হাটে পাঠাও। সেখান হইতেও কিছু ছোরা তলোয়ার বল্লম আসুক।

দোহা চলিয়া গেল। আমি মর্দনের নিকট একজন লোক পাঠাইলাম।

মর্দন খুব বেঁটে, কিন্তু খুব শক্তিশালী সে। তাহার সমস্ত দেহটাই যেন একটা পেশীর প্রদর্শনী। হাত, পা, বুক গর্দান—সবই পেশী-সমৃদ্ধ। কুচকুচে কালো রং। মাথার চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট দুটি বেশ পুরু। আমাদের যাবতীয় বৈষয়িক কাজকর্ম সে-ই করে। নৌকা বোঝাই করিয়া সে-ই আমাদের মাল বিদেশের হাটে লইয়া যায়। পরিবর্তে বিদেশ হইতে নানারূপ জিনিস আনিয়া দেয়। অনেকদিন আগে আমার বাবার আমলে সে আসিয়া বাবার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। বলিয়াছিল, তাহার আত্মীয়-স্বজনরা তাহাকে নাকি দেবতা বানাইয়া পূজা করিবে এবং পূজা হইয়া গেলে মাটিতে জীবন্ত পুঁতিয়া দিবে। সেই ভয়ে সে পলাইয়া আসিয়াছে।

তখন তাহার বয়স অল্প ছিল। গোঁফ-দাড়ি হয় নাই। এখন তাহার প্রচুর গোঁফ-দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। বাবা আগে নিজেই নৌকা লইয়া হাটে মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গে থাকিত মর্দন। মর্দনের এ ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা। তাই বাবার মৃত্যুর পর মর্দনের উপর সব ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। মর্দন খুব বিশ্বাসী লোক। অবিশ্বাসী হইবার কোনও কারণও নাই। কারণ আমরা তাহাকে তাহার নিজের বা নিজের পরিবারবর্গের জন্য বিদেশ হইতে যে-কোনও জিনিস সংগ্রহ করিবার অধিকার দিয়াছি। তাহার চারটি পরিবার এবং অনেক প্রণয়িনী। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সে বিদেশের হাট হইতে প্রচুর শৌখীন জিনিস কিনিয়া আনে। নানা রঙের পুঁতির মালা, নানা ধরনের গহনা কাপড় তাহাদের জন্য সরবরাহ করে মর্দন। সে নিজের জন্য একটা চকচকে পাথর বসানো তামার আংটিও কিনিয়াছে। আমরা তাহার এইসব শৌখীনতায় কোন দিন বাধা দিই নাই। নানা দেশে ঘুরিয়াছে সে। বিদেশ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। আমাদের খাজনা সে-ই রাজকর্মচারীর কাছে প্রতিবৎসর লইয়া যায়।

সে যখন আমার কাছে আসিল তখন তাহাকে সব ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম। ইহাও জিজ্ঞাসা করিলাম, যে রাজাকে আমরা খাজনা দিই তিনি এ বিপদে আমাদের সাহায্য করিবেন কি না? কিভাবে তাঁহার নিকট আমরা আবেদন জানাইব? মর্দন মুখবিকৃত করিয়া মাথা চুলকাইল, তাহার পর বলিল—আমিও রাজাকে দেখি নাই। প্রতিবছর সুদ্‌মাকে আমরা খাজনা দিয়া আসি। গাংগাং নদী পার হইয়া দুইদিন পায়ে হাঁটিয়া তবে তাহার বাড়িতে পৌঁছানো যায়। আমার নিকট হইতে খবর পাইলে তিনি লোকজন পাঠাইয়া নৌকা হইতে জিনিসপত্র লইয়া যান। সুদ্‌মাকে দেখিলে বেশ বড়লোক মনে হয়। প্রকাণ্ড বাড়ি। লোকজনও অনেক। কিন্তু—

মর্দন আবার মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বলিলাম, থামিয়া গেলে কেন, কি বলিতে চাও বল। মর্দন বলিল—সুদ্‌মাও রাজাকে দেখে নাই। রাজার নামে হুমকি দিয়া সে আমাদের মতো ছোট ছোট জনপদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করে। সে সব খাজনা সে নিজেই ভোগ করে, অন্য কোথাও পাঠায় না।

আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। সবিস্ময়ে বলিলাম, রাজার খাজনা নিজেই ভোগ করে? রাজা কিছু বলে না?

মর্দন বলিল—রাজা বোধ হয় জানেই না যে সুদ্‌মা বলিয়া কোন লোক তাহার নাম করিয়া এইভাবে খাজনা আদায় করিতেছে। আমাদের খবরও বোধহয় রাজা জানে না। নাবিকদের মুখে শুনিয়াছি রাজা একটা নয়। অনেক রাজা। কেহ নীলনদের ধারে রাজত্ব করে। তাহাদের বড় বড় মন্দির, মন্দিরে নানারকম দেবতা। তাহারা বড় বড় পাথরের স্তন স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের চূড়া আকাশচুম্বি। তাহাদের ভিতর নাকি রাজাদের মৃতদেহ আছে। আরব দেশের মাথার উপরে ব্যাবলদের রাজত্ব। তাহারাও বড় বড় বাড়ি করিয়াছে। বাড়ির উপর বাড়ি। চারতলা পাঁচতলা। বাড়িকে ঘিরিয়া অদ্ভুত ঢালু রাস্তা। সে রাস্তা দিয়া উপর তলায় চড়া যায়। পাথরের ওপর কিংবা মাটির ফলকের উপর ছবি আঁকিয়া ইহারা লেখে। ইহাদের লোকজন সৈন্যসামন্ত বিস্তর। উহারা মূর্তি প্রস্তুত করে।

উহাদের নৌকাও খুব বড় বড়। আমার মনে হয় সুদ্মা ইহাদের চেনে না। ইহাদের নিজেদের মধ্যেও খুব ঝগড়া মারা মারি। প্রত্যেকেই অপর লোকের জমি দখল করিতে চায়। সকলেই লোভী। আমার মনে হয় ইহাদের খবর দিলে আমরা নিজেরাই বিপদে পড়িব। ইহারা আসিয়া আমাদের রাজ্য দখল করিবে এবং আমাদের সকলকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিবে। পরের রাজ্য দখল করিবার জন্য ওই সব রাজারা সর্বদাই উৎসুক। আমার বিবেচনায় উহাদের খবর না দেওয়াই উচিত। সুদ্মাকে বার্ষিক কিছু খাজনা দিলে সুদ্মা শান্ত থাকিবে। সে-ও আর আমাদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিবে না। আমার আর একটা কথাও মনে হয়। ভিংড়াকে তাড়াইয়া দিয়া আমরা ঠিক কাজ করি নাই। এসব ব্যাপারে দৈবীশক্তির সহায়তা প্রয়োজন ভিংড়া থাকিলে আমাদের এ সময় উপকার হইত। সে একজন বড় গুণিন ছিল। সে হয়তো কোথাও গিয়া আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি বলিলাম, ভিংড়া হয়তো গুণিন। কিন্তু সে যতদিন এখানে ছিল আমাদের কোন ইষ্ট করে নাই। অনেকের উপর অত্যাচার করিত। তাই দলপতি হিসাবে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া আমার দুঃখ হইয়াছে, ভয়ও হইয়াছে, কিন্তু তবু তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। সে কোথায় গিয়াছে জান ?

মর্দন যাহা বলিল তাহা খুব আশ্চর্যজনক। বলিল, আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। কিন্তু মেনকি দেখিয়াছে। সে তখন নদীতে স্নান করিতেছিল। সে দেখিল ভিংড়া একটা আঘাটায় আসিয়া লাফ দিয়া নদী পার হইয়া গেল। তাহার পর কিন্তু আর মানুষ রহিল না সে। প্রকাণ্ড একটা শকুনে রূপান্তরিত হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। মেনকি ভয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমাকে ইহা বলিল। মেনকি মর্দনের কনিষ্ঠা পত্নী। মেয়েটি যে খুব মিথ্যাবাদিনী এবং কল্পনা-কুশলা তাহা আমার জানা ছিল। কিছুদিন আগে সে আমাকেই বলিয়াছিল একদিন মাঠে সে যখন ঘাস কাটিতেছিল তখন সারা আকাশের গায়ে ছোট ছোট সাদা সাদা মেঘ। একটা মেঘ নীচে মাঠের উপর নামিয়া আসিল। মেঘের ভিতর হইতে বাহির হইল মেঘকন্যা। মেঘকন্যা তাহাকে বলিল, তোমাদের দলপতির গলায় একটি লালপাথরের মালা আছে, সেটি আমার চাই। সেটি আমাকে আনিয়া দাও, আমি পরিব। আমি কথাটা শুনিয়া অবিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু মেনকিকে সে কথা বলি নাই। ভাবিয়াছিলাম সে মর্দনের স্ত্রী, তাহাকে চটাইয়া লাভ নাই। আমার মালাটা তাহাকে দিয়াছিলাম। কয়েকদিন পরে দেখিলাম মেনকিই সেটি পরিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে বলিল, মেঘকন্যা বলিল, তুই আমার বোন, তুই মালাটা পর, তাহা হইলেই আমার পরা হইবে। তাই আমি পরিয়া বেড়াইতেছি। সুতরাং মেনকি মর্দনকে ভিংড়ার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা যে সর্বৈব বানানো তাহা বুঝিলাম, কিন্তু মর্দনকে বলিলাম না। মর্দনের মনে দুঃখ দিয়া লাভ কি। শুধু বলিলাম, ভিংড়া যখন উড়িয়া গিয়াছে তখন তাহাকে তো আর নাগালের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। এখন এ অবস্থায় কি করা যায় তাহাই বল ? মর্দন বলিল, রাজাদের কাছে যাইব না। তবে বলেন তো হাতী-বাবার কাছে যাইতে পারি। তাঁহার হাতী যদি দয়া করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে দেয় আর হাতী-বাবা যদি দয়া করেন, তাহা হইলে

তাহা হইলে আমাদের অনেক লাভ হইবার সম্ভাবনা। তিনি একজন মস্ত গ্বণিন। আমি হাতী-বাবার নাম শ্বনি নাই। হাতীও দেখি নাই। কারণ আমাদের এ অঞ্চলে হাতী নাই। তবে হাতী নামে যে বিরাটকায় একটা জন্তু আছে তাহা শ্বনিয়াছিলাম। মর্দনের কথা শ্বনিয়া আমার ঔৎস্বক্য হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—হাতী-বাবা কোথায় থাকেন? মর্দন বলিল—গাংগাং নদীর ওপারে গম্ভীরা জঙ্গলে। সেখানে পেঁাছিতে প্রায় কুড়ি দিন লাগিবে। জমানী নদীতে নৌকা ভাসাইয়া ট্বম্বার ঘাটে পেঁাছিতে হইবে। সেখান হইতে হাঁটাপথে দিন সাতেক গেলে গম্ভীরা জঙ্গলে পেঁাছানো যাইবে। গম্ভীরা বিশাল জঙ্গল। আর সে জঙ্গলের অধিপতি হাতী-বাবা—সে জঙ্গলে অনেক হাতী আছে।

হাতী-বাবা হাতী, না মান্বষ?

মান্বষ। একটি প্রকাণ্ড হাতী তাঁহার সঙ্গী। তিনি হাতীর সেবা করেন, হাতীও তাঁহার সেবা করে। হাতী-বাবার একটি কুড়াল এবং কাটারি আছে। তাহা দিয়া তিনি সমস্ত দিন হাতীর জন্য খাবার সংগ্রহ করেন। গাছের উপর উঠিয়া হাতীর জন্য কাঁচ কাঁচ ডাল-পাতা কাটিয়া নীচে ফেলেন, হাতী গাছের তলায় দাঁড়াইয়া সেগ্বলি কুড়াইয়া কুড়াইয়া খায়। হাতীর পিঠে চড়িয়া তিনি ঘ্বরিয়া বেড়ান। তাঁহার ঘর-বাড়ি নাই। যখন ব্ষ্টি হয় তখন হাতীর পেটের তলায় তিনি দাঁড়ান। যখন মাটিতে শ্বইয়া ঘ্বমান তখন হাতীটি তাঁহার কাছে বসিয়া থাকে। পারতপক্ষে তাঁহার কাছে কাহাকেও যাইতে দেয় না। হাতীটির বিশাল দাঁত, বিশাল কান, বিশাল শ্বঁড়। দেখিলেই ভয় করে। সেই জন্য কেহ হাতী-বাবার নিকটে যাইতে পারে না। —তবে লোকে বলে হাতীটি খাদ্যরসিক। ভাল ভাল খাবার দিলে সে প্রসন্ন হয়। গম, জই, কলা তাহার প্রিয় খাদ্য। খাবার দিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিয়া অনেকে হাতী-বাবার নিকটে যাইতে পারিয়াছে। অনেককে অনেক বিপদ হইতে হাতী-বাবা রক্ষা করিয়াছেন। ক্ষমতাবান লোক উনি। বলেন তো তাঁহার নিকট গিয়া চেষ্টা করি। তবে সঙ্গে কিছ্ব ভাল খাবার লইতে হইবে হাতীটির জন্য।

বলিলাম, বেশ, নৌকা বোঝাই করিয়া খাবার লইয়া যাও। কিছ্ব লোকজনও লও। আমারই তোমার সহিত যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু শিকারা কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার তো ঠিক নাই। দোহাকে জিজ্ঞাসা করি, দেখি সে কি বলে। শিকারার ভয়টা যদি না থাকিত আমি যাইতাম। চল দোহার কাছে যাই।

হাতির কথা শ্বনিয়া দোহা খ্বব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মর্দনকে বলিল, চল আমি তোমার সঙ্গে যাইব। টালা এখানে থাকুক। শিকারা যদি আসে, সে-ই তাহাকে সামলাইবে।

তাহার পর দিনই বহ্বরকম খাবার কয়েকটি নৌকায় বোঝাই করিয়া মর্দনের সহিত দোহা চলিয়া গেল। হাতীই তাহাকে প্রল্বব্ধ করিল। সে-ও কখনও হাতী দেখে নাই। আর একটা কারণেও বোধহয় সে স্থানত্যাগ করিল। সে-কারণটা—শিকারা। শিকারা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে সে যে কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই।

আমি একা পড়িয়া গেলাম। ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের জনপদের চৌহদ্দিটা আমি পরিদর্শন করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। আমাদের জনপদ সুবিস্তৃত। আমাদের ভান্ডারে যে সব অস্ত্র ছিল—বর্শা, তরবারি, খড়্গ, কুঠার, বড় ছোরা—সেগুলি সমর্থ লোকদের নিকট বিতরণ করিয়া তাহাদের বলিলাম, তোমরা আমাদের জনপদের সীমান্ত রক্ষা কর। আমার আশঙ্কা, বাহির হইতে কোনও শত্রু আসিয়া হয়তো হানা দিবে। তাহারা আমাদের যেন অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করিতে না পারে। আমরা আরও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য বিদেশে লোক পাঠাইয়াছি। সেগুলি আসিলে তাহাও তোমাদের দিব। তোমরা সতর্ক থাক। বাহিরের কোনও লোককে আমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে দিও না। দেখিলাম আমাদের জনপদের লোকেরা খুবই উৎসাহী। তাহারা নিজেদের মধ্যেই দল করিয়া আমাদের সীমান্ত রক্ষা করিতে লাগিয়া পড়িল। শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও। অনেক যুবতী এমন কি কিশোরীও অস্ত্র আস্ফালন করিয়া বলিল, তাহারা প্রাণ থাকিতে শত্রুকে প্রবেশ করিতে দিবে না।

কণ্টকা ছিল না, তাই আমি আমার অন্য পত্নীদের খবর লইতে লাগিলাম। কেহ খুশি হইল, কেহ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ বা অভিমানে মুখ ফিরাইয়া রহিল। লক্ষ্য করিলাম আমার একটি পত্নী, বাহুলা নামক একটি যুবকের সহিত একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে। বাহুলাকে সে রাঁধিয়া খাওয়ায়, মাঝে মাঝে তাহার সহিত রাত্রিবাসও করে নাকি। এ ঘটনা আমি উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। দেখিয়াও যেন দেখিলাম না—এই ভাব।

এমনি ভাবে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া দিন কাটিতেছিল এমন সময় একদিন একটা কান্ড ঘটিল। আমাদের পশ্চিম সীমান্তের প্রহরীরা একটি লোককে আমার নিকট ধরিয়া আনিল। বেশ বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় লোক। তাহার মাথায় প্রকান্ড জালা। সে নাকি বলিয়াছে আমি জালাটি তোমাদের দলপতিকে দিয়া যাইব। যদি আমাকে না যাইতে দাও আমি ফিরিয়া যাইতেছি। কিন্তু জানিও ইহাতে তোমাদেরই ক্ষতি হইবে। লোকগুলি তাই জালাসুদ্ধ লোকটাকে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে। লোকটি বলিল, আপনার অনুচরদের বলুন জালাটা আস্তে আস্তে আমার মাথা হইতে নামাইয়া দিক। সকলে মিলিয়া জালাটা নামাইয়া দিল। দেখিলাম জালাটা প্রকান্ড। তাহার মুখে কিছু খড় এবং সবুজ পাতা গোঁজা রহিয়াছে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম জালার মধ্যে কি আছে? সে বলিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার অধিকার আমার নাই। এইটুকু শুধু বলিতে পারি আপনার কাছে লোকজন থাকিলে জালার রহস্য আপনি জানিতে পারিবেন না। আপনি যখন একা থাকিবেন তখন জালার রহস্য আপনার নিকট প্রকাশিত হইবে। আমি চলিলাম। লোকটি এই বলিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। আমিও আমার অনুচরদের চলিয়া যাইতে বলিলাম। তাহারা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই জালার ভিতর হইতে শব্দ হইল —আমি তিরখন, গোপনে তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার অনুচররা কি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে? কাহারও সামনে আমি আত্মপ্রকাশ করিতে চাই না। আমি তখন কন্টকার শূন্যগৃহে ছিলাম। বলিলাম, না, এখানে কেহ নাই। তিরখন তখন আশ্চর্য কৌশলে জালার ভিতর হইতে বাহির হইল। দেখিলাম সে রোগা

হইয়া গিয়াছে। বলিলাম, এ কি ব্যাপার! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? সে বলিল, আমি আসিতেছি ঘুরঘুট খাঁ-র নিকট হইতে।

ঘুরঘুট খাঁ এখন কোথায়?

সে মারো পাহাড়ে আছে। ভুলেরা কোথায় জান?

ভুলেরা শিকারার কাছে আছে। শিকারা কিছুদিন এখানেই ছিল। তখন ভুলেরা তাহার সঙ্গেই ছিল। যাইবার সময় সে তাহাকে লইয়া গিয়াছে। হয়তো আবার কোনদিন আসিয়া হাজির হইবে, তাই আমরা ভয়ে ভয়ে আছি।

তাহার পর তিরখনকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। সে উঠিয়া গিয়া জালার ভিতর হইতে তাহার একতারাটি বাহির করিল এবং একতারা বাজাইয়া গান শুরু করিয়া দিল। সুরটি বড় অদ্ভুত। মাঝে মাঝে যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থামিয়া যায়, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে নাচিতে থাকে। কখনও মিনতি করে কখনও ধিক্কার দেয়। গানটির ভাষা অবশ্য হুনদের ভাষা। তিরখন আমাদের ভাষায় সেটিকে অনুবাদ করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম এই—

ওগো হাওয়া, ওগো হাওয়া
বিচিত্র তোমার আসা যাওয়া
কখনও তুমি ঝিরঝিরে
দোল দাও ছোট ফুলের পাপড়িকে।
কখনও মৃদু মৃদু
উড়িয়ে দাও প্রিয়ার ওড়নাখানি।
কখনও তুমি ঝড়
গাছপালা ভাঙো মড় মড়
সমুদ্রের ছোট্ট ঢেউকে
করে দাও মস্ত—আকাশচুম্বী।
এক দেশের ধুলোকে
নিয়ে যাও অন্য দেশে
ডুবিয়ে দাও নৌকো
ভেঙে ফেল ঘর-বাড়ি।
আবার যখন রামধনু ওঠে
হয়ে যাও ভারী মিষ্টি।
ওগো হাওয়া
আমার একটি মিনতি
আমার ছোট্ট নৌকোর
ছোট্ট পালে
বন্ধুর মতো এসো একবার
পার করে' দাও সেই নদীটি
যে নদীর ওপারে সে আছে।

গানের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া তিরখন বলিল, তোমাদের ছোট নৌকার ছোট পালে ওই হাওয়াটি বন্ধুর মতো আসিবে। ঘুরঘুট খাঁ-ই সেই হাওয়া। মারো পাহাড়ে

সে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। সে বলিয়া পাঠাইয়াছে তোমরা তাহার সহিত যদি যোগ দাও তাহা হইলে সে শিকারাকে আক্রমণ করিবে। ভুলেরা যদি বাঁচিয়া থাকে সে ভুলেরাকে কাড়িয়া আনিবে। ভুলেরাকে উহারা যদি হত্যা করিয়া থাকে সে হত্যার ভাষণ প্রতিশোধও লইবে ঘুরঘুট খাঁ। শিকারাকে বন্দী করিয়া সর্বসমক্ষে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে। জুনজিরা পাহাড় হইতে সে সর্দার মালেকের বিপুল ধনসম্ভার লইয়া আসিয়াছে। সেই ধনসম্ভার লইয়া বিদেশ হইতে অনেক সৈন্য কিনিয়া আনিয়াছে সে। তাহার ইচ্ছা, তোমরাও তাহার সহিত যোগ দাও।

যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আমি তিরথনকে সে কথা বলিতে পারিলাম না। একটু ঘুরাইয়া বলিলাম, আমার নৌকা ছোট, নৌকার পালও ছোট, কিন্তু ঘুরঘুট যে ঝড়। সে ঝড়ের দাপট কি আমার নৌকা সহিতে পারিবে ?

তিরথন বলিল, তোমাকে এখনই যে গানটি শুনাইলাম তাহার মর্ম তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই দেখিতেছি। ঘুরঘুট ঝড়, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সে মৃদু সমীরণও হইতে পারে। তোমার ছোট নৌকাকে সে ডুবাইবে না, পারে ভিড়াইয়া দিবে। দেখিতেছি তোমার অপেক্ষা তোমার পত্নী কণ্টকা বেশী বুদ্ধিমতী। তুমি যখন সর্দার মালেকের পাল্লায় পড়িয়াছিলে তখন তাহার কৌশলই তোমাকে সর্দারের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। সর্দার মালেক যখন মারা গেল তখন কণ্টকাই শিকারার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহাকে তোমাদের দেশে লইয়া আসে। এখন কণ্টকা বুঝিয়াছে যে শিকারা তোমাদের জনপদকে গ্রাস করিতে চায়, দোহাকে বিবাহ করিয়া এ অঞ্চলের সর্বেশ্বরী হইতে চায় সে। তাই সে গোপনে ঘুরঘুট খাঁ-র সন্ধান করিতেছিল। তোমাদের জনপদে যে সব মাঝি বিদেশ হইতে আসে, কণ্টকা তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া সচেষ্ট থাকিত যদি কেহ ঘুরঘুট খাঁ-র সন্ধান দিতে পারে। একজন মাঝির নিকট সে ঘুরঘুট খাঁ-র সন্ধান পায়। কোন পথে গেলে মারো পাহাড়ে যাওয়া যায় তাহারও নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এখন মারো পাহাড়ে গিয়া সে হাজির হইয়াছে। তাহার মোহিনী শক্তি দিয়া ঘুরঘুটকে বশও করিয়াছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো সে এখানে নাই। কোথায় গিয়াছে তাহা জানিতে কি ?

স্বীকার করিতে হইল, জানিতাম না।

তিরথন বলিল—সে এখন ঘুরঘুটের কাছে আছে। ঘুরঘুট তোমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে তোমার সম্মতির জন্য কণ্টকাই আমাকে এখানে পাঠাইয়াছে। এখন বল, কি করিবে ?

আমি একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম। সম্মতি দিলে ঘুরঘুট খাঁ সসৈন্যে এখানে আসিয়া পড়িবে। আমাদের লোকজনকে লইয়া এখান হইতে হয়তো সে শিকারাকে আক্রমণ করিবে। আমাদের জনপদের লোকেরা যুদ্ধের কৌশল জানে না। তাহারা দলে দলে মারা পড়িবে। অথচ, কণ্টকা ঘুরঘুটের নিকট গিয়া বসিয়া আছে। তাহাকেই বা উদ্ধার করি কি উপায়ে ? দোহাও এখানে নাই, হাতী-বাবার সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। সত্যই একটু মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। অবশেষে তিরথনকে আমার মনোভাব খুলিয়া বলিলাম।

দেখ ভাই তিরথন, যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না। কেবল আত্মরক্ষার জন্য আমরা একটি সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে চাই। সেই

জন্যই ঘুরঘুট খাঁ-র সাহায্য চাহিয়াছিলাম। শিকারার কাছেও চাহিয়াছিলাম। কিন্তু শিকারা দোহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। দোহা তাহাতে রাজী নয়। শিকারা এখন অবশ্য চলিয়া গিয়াছে, জানি মা আবার আসিয়া হানা দিবে কিনা। এখন আমার মনে হইতেছে কি কুক্ষণে সেদিন কণ্টকা তোমাদের ছাগলটাকে মারিয়াছিল। সেই সূত্র ধরিয়া একটা সর্বনাশ যেন আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ আমি মোটেই পছন্দ করি না, এ বিপদ হইতে তুমিই আমাকে উদ্ধার কর।

তিরখন মাথায় একবার হাত বুলাইল। তাহার পরও দাড়িতে কয়েকবার। সহসা তাহার চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল।

তাহার পর বলিল, দেখ টালা, যুদ্ধবিগ্রহ কেহই পছন্দ করে না। কিন্তু জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য। মরুভূমির তপ্ত বালুকে বা তপ্ত ঝড়কে কে ভালবাসে? কেহই না। কিন্তু তবু তাহাদের এড়াইবার উপায় নাই। তাহাদের সহিত লড়াই করিতে হয়। সে লড়াইয়ে কখনও আমরা জিতি, কখনও হারি। কষ্ট হয়, খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু এ কষ্টকে এড়াইবে কি করিয়া? দোহা যদি শিকারার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া এ অঞ্চলের মালিক হয় তাহা হইলেও সে নিস্তার পাইবে না, কারণ ঘুরঘুট খাঁ শিকারাকে স্বস্তি দিবে না। সে তাহাকে আক্রমণ করিবেই। ভুলেরাকে সে ভুলে নাই। ভুলেরা যদি বাঁচিয়া থাকে ভুলেরাকে সে উদ্ধার করিবেই। ভুলেরা যদি মরিয়া থাকে, সে মৃত্যুর প্রতিশোধ সে লইবেই। আর তোমরা যদি কোন পক্ষকেই আমল না দাও তাহা হইলে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না। তোমাদের সম্পত্তিই লুণ্ঠনকারীদের আহ্বান করিয়া আনিবে। সুতরাং তোমাদের একজন সবল মিত্র থাকা প্রয়োজন। আমার মনে হয় কামুকী শিকারার অপেক্ষা বীর ঘুরঘুট খাঁ বেশী নির্ভরযোগ্য। ঘুরঘুট অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। সে শিকারাকে বিধ্বস্ত করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তোমরা যদি শিকারার সহিত যোগ দাও, তোমরাও বিধ্বস্ত হইবে। তোমার পত্নী কণ্টকা বুদ্ধিমতী, তাই সে ঘুটঘুট খাঁ-র শরণাপন্ন হইয়াছে। আমার মনে হয়, যদি আপত্তি কর সে বলপ্রকাশ করিয়া তোমার সম্মতি আদায় করিবে। অর্থাৎ সে ঘুরঘুটকে লইয়া এদেশে আসিয়া হাজির হইবে এবং এদেশ অধিকার করিবে। শিকারার আধিপত্য সে কিছুতেই সহ্য করিবে না। তুমি সম্মত হও। সম্মত না হইলে তুমি রাজ্যও হারাইবে, পত্নীও হারাইবে।

আমি বলিলাম, দেখ তিরখন, আমার অনেক পত্নী। একজন যদি চলিয়া যায়, খুব বেশী অসুবিধায় পড়িব না। কিন্তু কণ্টকাকে আমি ভালবাসি। আমার বিশ্বাস, কণ্টকাও আমাকে ভালবাসে। আমার মনে কষ্ট দিয়া আমাদের সমস্ত জনপদকে বিপন্ন করিবে এ কথাও বিশ্বাস হইতেছে না। আমার মনে আর একটা কথাও জাগিতেছে। ভয় হইতেছে, খুলিয়া বলিলে তুমি হয়তো রাগ করিবে। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তোমার মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইতেছে না—

তিরখন বলিল, দেখ টালা, জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি। কষ্ট সহ্য করিবার অসীম ক্ষমতা আছে আমার। অনাহারে, অনিদ্রায়, মরুর তপ্ত বালুতে, শীতে তুষারঝড়ে দিন কাটাইয়াছি আমি। অনেক প্রভুর কশাঘাতে জর্জরিত হইয়াছি। তুমি এমন কি বলিতে পার যাহা এ সবের চেয়েও কষ্টকর? যাহা বলিতে

চাও, নির্ভয়ে বল, আমার কষ্ট যদি হয়ই সে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা আমার আছে।

তখন বলিলাম, কণ্টকার নামে তুমি যাহা বলিলে তাহা যে কণ্টকারই উক্তি তাহার কিছু প্রমাণ আছে?

তিরখন উঠিয়া পুনরায় জালার নিকট গেল এবং তাহার ভিতর হইতে ছোট একটি পুঁটুলি বাহির করিল। পুঁটুলির ভিতর হইতে কয়েকটি শুষ্ক ফুলের মালা এবং একটি পুঁতির হার বাহির করিল। এই হারটি আমি কণ্টকাকে উপহার দিয়াছিলাম, দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। তিরখন বলিল—কণ্টকা এইগুলি তাহার কথার প্রমাণ স্বরূপ পাঠাইয়াছে। চলিয়া যাইবার আগে সে নাকি এই ফুলের মালা ও পুঁতির হার পরিয়া তোমার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে। সে আর একটি অদ্ভুত কথাও তোমাকে বলিতে বলিয়াছে—এ কথার অর্থ আমি বুঝি না। সে বলিল, তুমি বুঝিবে।

কথাটি ছোট—চিক্-চিক্। মনে হয় কোনও পাখীর ডাক। কণ্টকা বলিল এই কথাটি বলিলেই তুমি নাকি বুঝিবে আমি তাহার দূত।

চিক্-চিক্ শব্দটি শুনিয়াই বুঝিলাম কণ্টকাই একথা বলিয়াছে তিরখনকে। কারণ ওই 'চিক্-চিক্' শব্দটি আমাদের দুইজনের মধ্যে একটি সাঙ্কেতিক শব্দ। উহার অর্থ—চল একটু নির্জনে যাই। আমাদের দুইজনের কথা ওটি, তৃতীয় লোক উহার অর্থ জানে না। ইহাও মনে পড়িল যেদিন কণ্টকা চলিয়া যায় সেদিন সে বিশেষ করিয়া ফুলের সাজে সাজাইয়াছিল নিজেকে। গলায় পুঁতির হারটিও ছিল। সুতরাং বিশ্বাস করিতেই হইল তিরখনের সহিত কণ্টকার দেখা হইয়াছিল। সহসা আর একটা সন্দেহও জাগিল মনে। কণ্টকাকে হত্যা করিয়া তাহার গলার হার আনাও তো অসম্ভব নয়। কিন্তু 'চিক্-চিক্' কথাটা? সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হইল। তিরখন সত্যই তাহার বন্ধুলোক। প্রথম দিনের পরিচয় হইতেই সে তাহার হিতৈষী। বরাবর তাহার মঙ্গলের চেষ্টাই করিয়াছে। তাছাড়া আর একটা কথা আমার মনে হইল। ইহারা যদি আমার বন্ধুত্ব কামনা করে তাহা হইলে কণ্টকাকে হত্যা করিলে কি তাহা সুলভ হইবে? আর একটা কথাও ভাবিলাম। ঘুরঘুট খাঁ আমার সম্মতি না লইয়া যদি সদলবলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে বাধা দেবার শক্তি কি আমার আছে? শিকারা তো আসিয়াছিল, তাহাকে বাধা দিতে পারি নাই। ঘুরঘুটকেও বাধা দিতে পারিব না। তবু সে যে দূত পাঠাইয়া আমার সম্মতি চাহিতেছে ইহা তাহার ভদ্রতারই প্রমাণ। খুব সম্ভবত কণ্টকার মোহে মুগ্ধ হইয়াছে লোকটা। এই মোহের সুযোগ লইয়া কণ্টকা তাহার সহিত আমাদিগকে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধিতে চায়। শিকারাকে প্রতিরোধ করাই তাহার উদ্দেশ্য।

তিরখন আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াছিল। আমাকে নীরব দেখিয়া সে বলিল, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি এখন ঘুরঘুটের সঙ্গে ভাব কর। ঘুটঘুট একটু গোঁয়ার গোছের, কিন্তু লোক খারাপ নয়। তোমরা তো অসহায়, ঘুরঘুটের মতো শক্তিশালী লোকের বন্ধুত্বই এখন তোমাদের দরকার।

প্রশ্ন করিলাম, সত্যিই কি ঘুরঘুট আমাদের বন্ধু হইবে, না স্বার্থের খাতিরে আমাদের দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে ?

তিরখন হাসিয়া কহিল, আমার ধারণা স্বার্থের বন্ধন না থাকিলে কোন বন্ধুত্বই টেঁকে না। আমরা যেটাকে প্রেম বলি সেটাও নিঃস্বার্থ নয়। তাহার মধ্যে মিলন-আকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকে। ঘুরঘুটের স্বার্থকে তুমি যদি তোমার নিজের স্বার্থ করিতে পার তাহা হইলে ঘুরঘুটও তোমার স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ভাবিবে। এই নিয়ম। এ নিয়ম তুমি মানিতে পারিবে কি না জানি না, কিন্তু আপাতত কিছুদিনের জন্যও ঘুরঘুটের সহিত বন্ধুত্ব কর। তাহাতে তোমার লাভই হইবে।

আমি বলিলাম, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু একটা কথা আছে। কণ্টকা আমার প্রিয়তমা পত্নী বলিয়া আমাদের জনপদে অনেকে তাহার উপর বিরূপ। মেয়েরা স্বাভাবিক ঈর্ষাবশেই বিরূপ আর পুরুষরা বিরূপ কারণ কণ্টকা অনেকের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কণ্টকার চাল-চলন কথাবার্তাতেও একটা অহঙ্কারের টনৎকার আছে। তাই তাহার শত্রু অনেক। এখন একথা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে যে আমি কণ্টকারই পরামর্শে ঘুরঘুটকে এ অঞ্চলে বন্ধুরূপে আমন্ত্রণ করিয়াছি তাহা হইলে অনেকেই চটিয়া যাইবে। কথাটা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। তখন আমাকে একটু অসুবিধায় পড়িতে হইবে। দোহা যদি এখানে থাকিত আর দোহাই যদি বলিত আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য ঘুরঘুটকে বন্ধুত্বে বরণ করিতেছি, তাহা হইলে আমার কোন দায়িত্ব থাকিত না। আমি তাহার কথা সমর্থন করিয়া খালাস পাইতাম। কিন্তু দোহা এখানে নাই, কবে ফিরিবে, তাহাও ঠিক নাই। তাই স্থির করিয়াছি টুকচুম্বার তলায় সকলনে সমবেত করিয়া সকলের নিকট কথাটা বলি। তাহারা যদি মত দেয় তাহা হইলে ঘুরঘুটের প্রস্তাবে রাজি হইব।

তিরখন বলিল—আর যদি মত না দেয় ?

যদি মত না দেয় তাহা হইলে তাহাদের বলিতে হইবে তোমরা এবার ঘুরঘুটের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। শিকারাও সসৈন্যে আক্রমণ করিতে পারে এ সম্ভাবনার কথাও ভুলিও না। তাহার পর আমাদের এই সুন্দর জনপদ হুনদের যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠিবে আর আমরা তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া থাকিব যদি তাহারা আমাদের একেবারে নিঃশেষে মারিয়া না ফেলে। আমার বিশ্বাস এসব কথা শুনিলে জনপদের অধিকাংশ লোকেরাই ঘুরঘুটের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। আমার মনে হয় আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজ করাই ভাল।

বেশ তাই কর। আমি কিন্তু সভায় যাইব না। আমি এইখানেই আত্মগোপন করিয়া থাকি।

এই বলিয়া তিরখন পুনরায় জালার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আমি উঠিয়া গিয়া দামামায় ঘা দিলাম।

দলে দলে নর-নারী আসিয়া টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইতে লাগিল। সেই বিরাট সমাবেশে আমি যখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলাম তখন সকলেই মন দিয়া তাহা শুনিল। তাহার পর যখন জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কি তাহা হইলে ঘুরঘুট খাঁ-র প্রস্তাব গ্রহণ করিব ? তোমাদের কাহারও যদি আপত্তি থাকে বল।

অনেকক্ষণ কেহ কিছু বলিল না।

তাহার পর আমাদের কৃষি-বিভাগের প্রধান কর্মী ঘান্ডা দাঁড়াইয়া উঠিল। সে বলিল—দলপতির আদেশ আমাদের সর্বদাই শিরোধার্য। কিন্তু আমরা জানিতে চাই—কণ্টকা কোথায়? এ ব্যাপারে তাহার সহিত ঘুরঘুট খাঁ-র কোনও সম্পর্ক আছে কি?

কি উত্তর দিব প্রথমটা ভাবিয়া পাইলাম না। শেষে মনে হইল সত্য কথাই বলা সমীচীন।

বলিলাম, কয়েকদিন পূর্বে কণ্টকা অন্তর্ধান করিয়াছে। সে কোথায় গিয়াছে আমাকে বলিয়া যায় নাই। ঘুরঘুটের নিকট হইতে যে লোকটি এখানে আসিয়াছে তাহার মুখে শুনিলাম কণ্টকা শিকারার ভয়ে ভীত হইয়া ঘুরঘুটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। কণ্টকার ভয়, শিকারা কিছুদিনের মধ্যেই এখানে স-সৈন্যে চলিয়া আসিবে এবং আমাদের জনপদ অধিকার করিয়া বসিবে।

আমার এক বৈমাত্রেয় ভাই ভালা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—শিকারা এতদিন আমাদের হিতৈষিণী ছিল। হঠাৎ সে শত্রু হইয়া গেল? সে স্পর্ধাভরে আমার দিকে চাহিয়া গোঁফ-দাড়ি চুমরাইতে লাগিল।

তখনও সত্য কথা বলিলাম।

বলিলাম, শিকারা দোহাকে বিবাহ করিতে চায়। দোহা কিন্তু তাহাতে সম্মত নয়। শিকারার ইচ্ছা দোহাকে বিবাহ করিয়া অবশেষে আমাদের উপর আধিপত্য করিবে। দোহা এ ফাঁদে পা দিতে রাজি হয় নাই, তাই শিকারা এখন আমাদের শত্রু। সে আক্রমণ করিবেই। তাই ঘুরঘুট খাঁ-র মতো একজন শক্তিশালী বন্ধু আমাদের প্রয়োজন।

আমার বৈমাত্রেয় ভাই ভালা আবার দাড়ি-গোঁফ চুমরাইয়া বলিল—'তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে কণ্টকা-মূল্যে আমরা ঘুরঘুট খাঁ-র বন্ধুত্ব কিনিতেছি?'

বলিলাম, তুমি যাহা বলিলে তাহার জন্য এখনি তোমাকে আমাদের জনপদ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি। দলপতি হিসাবে সে অধিকার আমার আছে। কিন্তু আমি তাহা করিব না। তোমার অকপট উক্তিতে আমি খুশী হইয়াছি। উত্তরে বলিতেছি—আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য যদি কণ্টকা মূল্যেই ঘুরঘুটের বন্ধুত্ব ক্রয় করি, তাহাতে ক্ষতি কি? কণ্টকা আমার সম্পত্তি, তোমার তো নয়। তুমি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছ কেন—

ভালা গোঁফ-দাড়ি চুমরাইতে লাগিল। কোন জবাব দিল না।

আমি বলিলাম—আমরা এখন বিপন্ন। আমাদের সৈন্য নাই। যুদ্ধের কায়দা-কানুন আমরা জানি না। ঘুরঘুট খাঁ-র সহায়তায় আমরা শক্তিশালী হইব এই ভরসায় তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাহিতেছি। তোমরা মনস্থির করিয়া আমাকে জানাও তোমাদের সম্মতি আছে কি না।

সমবেত জনতা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

হাত তুলিয়া কেহই আমার প্রস্তাব সমর্থন করিল না।

আমি কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, এমন সময়ে একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে একজন অশ্বারোহী চীৎকার করিতে করিতে

আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সমবেত জনতার সম্মুখে আসিয়া হাত তুলিয়া বলিল —সাবধান হও, সাত দিনের মধ্যেই শিকারা সসৈন্যে আসিয়া তোমাদের আক্রমণ করিবে। ঘুরঘুট খাঁ তোমাদের সাহায্য করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহার কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও।

অশ্বারোহীর মাথায় শিরস্ত্রাণ, অঙ্গে বহুমূল্য পোশাক, কোমরবন্ধে শাণিত ছুরিকা। মুখে চাপ চাপ দাড়ি। সে যেমন দ্রুতবেগে আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতবেগেই চলিয়া গেল।

আমরা সকলে হতভম্ব হইয়া গেলাম।

আমি আবার বলিলাম—এই অশ্বারোহী কে তাহা আমি জানি না। কিন্তু যে-ই হোক, লোকটি আমাদের হিতৈষী। এখন তোমাদের মনোভাব কি জানাও। আমি আর একটি শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। ওই দেখ টুকচুম্বার শাখায় একটু ফুল ফুটিয়াছে। কাল আরও অনেক ফুল ফুটিবে, গাঁটে গাঁটে অনেক কুঁড়ি দেখিতে পাইতেছি।

সহসা সহস্র বাহু একযোগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল। বুঝিলাম জনপদের সমর্থন মিলিয়াছে। আমার মনে কিন্তু স্বস্তি ছিল না। আমার বার বার মনে হইতেছিল এইবার আমাদের সুখশান্তি অন্তর্হিত হইল।

বাড়ি ফিরিয়া দেখি আমার বাসায় তন্বী চম্বা নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে সুন্দর একটি ছিট। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের জনপদে চম্বাই ছিল শিল্পী। আমাকে দেখিয়া চম্বা বলিল—দলপতি, তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। কিছুদিনের মধ্যেই এ স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার স্থান নাই। আমি শান্তি ভালবাসি, শান্তির পরিবেশেই আমি আমার কাজ করিতে পারি। মারামারি হানাহানিতে আমার কল্পনা মরিয়া যাইবে। দোহাও এখানে নাই। তাই ঠিক করিয়াছি আমিও এখানে থাকিব না। তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি। এই ছিটটি আমি প্রস্তুত করিয়াছি। আমার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তুমি এটিকে রাখিয়া দাও।

চম্বা ছিটটি আমার পায়ের নিকট রাখিয়া দিল। প্রশ্ন করিলাম—তুমি কোথায় যাইবে?

তা জানি না। আপাতত দু' চক্ষু যেখানে যায় সেইখানেই যাইব। তাহার পর যেখানে শান্তি পাইব সেখানেই থাকিব।

দলপতি হিসাবে আমি তাহাকে বাধা দিতে পারিতাম। কিন্তু দিলাম না। চম্বা—শিল্পী চম্বা—চলিয়া গেল।

তিরখন এতক্ষণ জালার ভিতর বসিয়া ছিল। আমার সাড়া পাইয়া জালা হইতে বাহির হইয়া আসিল। সব শুনিয়া বলিল—অশ্বারোহীটিকে চিনিতে পারিলে?

না—

ও তোমার পত্নী কণ্টকা। কথা ছিল, আমি এখানে পৌঁছিয়াছি এ সংবাদ পাওয়ার পর ও এখানে ছদ্মবেশে আসিবে। কণ্ঠস্বরও বোধহয় বিকৃত করিয়াছিল তাই চিনিতে পার নাই।

আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

তিরখনও কোন কথা বলিল না।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—তিরখন, এইবার কি হইবে বল তো—

তিরখন হাসিল। তাহার পর জালার ভিতর হইতে তাহার একতারাটি বাহির করিয়া গান ধরিল—

এখন তো আকাশ পরিষ্কার
শিশিরও পড়ছে
গাছেও ধরেছে অজস্র কুঁড়ি
ফুল হয়তো ফুটবে।
কিন্তু আগামী কাল যে ঝড় হয়ে
সব তছনছ করে দেবে না
এর জিম্মাদারী
কে হবে—কে হবে—কে হবে!
তাকে তুমিও চেন না
আমিও না—

কয়েকদিন পরেই ঘুরঘুট আসিয়া পড়িল। মহাসমারোহে আসিল। বহু অশ্বারোহী, বহু পদাতিক, বহু রকম অস্ত্রশস্ত্র, বহু কাড়া-নাকাড়া-দামামা লইয়া এমন একটা জাঁকজমক করিয়া সে হাজির হইল যে আমরা একটু ভয় পাইয়া গেলাম। শুধু সৈন্যসামন্ত ও ঘোড়া নয়। তাঁবুও আসিল প্রচুর। বিরানি জঙ্গলের পাশ দিয়া যে জমানি নদীটি বহিয়া গিয়াছে তাহারই তীরে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের জনপদের ভিতর অতবড় বাহিনীর স্থান-সংকুলান হইত না। তাহাদের সঙ্গে মেয়েও আসিয়াছিল। নানা চেহারার অনেক মেয়ে। তাহারা আসিয়াছিল 'ইউত' নামক এক প্রকার শকটে চড়িয়া। এক একটি শকট আয়তনে বেশ বড়। তাহার ভিতর একটি পুরা গৃহস্থালীর সমস্ত আয়োজন বিদ্যমান—এমন কি উনুন পর্যন্ত। প্রত্যেক 'ইউত'' গম্বুজাকৃতি তাঁবু দিয়া ঢাকা। গম্বুজের উপরে ধুম-নির্গমনের পথ। দশ-বারোটি প্রকাণ্ড বলদ এক একটি 'ইউর্ত'' টানিয়া লইয়া যায়। এইরূপ বহু ইউর্ততে চড়িয়া বহু নারী-সমাগম হইল। এতগুলি নরনারীর এতগুলি ঘোড়া-গরুর খাওয়ার ব্যবস্থা কি করিয়া করিব ভাবিয়া আমি একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুরঘুট খাঁ আমাকে নিশ্চিন্ত করিল। সে প্রথমেই ঘোড়া হইতে নামিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল। তাহার পর বলিল—আমি আপনার তাঁবেদার। যাহা হুকুম করিবেন তাহাই করিব। আমাদের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমরা হুন, আমরা স্বাবলম্বী, আমাদের খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের সঙ্গেই থাকে। আমাদের সমস্ত রসদ বাহির হইতে প্রত্যহ আসিবে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। খচ্চর বাহিত হইয়া, নৌকায় করিয়া, শকটে বোঝাই হইয়া আমাদের খাবার বাহির হইতে প্রত্যহ আসিবে। আপনাদের নিকট হইতে আমরা কোনও খাদ্যদ্রব্য লইব না। আপনারা কেবল প্রশস্ত স্থান দিন একটা যেখানে আমরা আড্ডা গাড়িতে পারি।

জমানি নদীর তীরে সুবিস্তৃত ফাঁকা মাঠ দেখিয়া ঘুরঘুট খুশি হইল। তাহার পর বলিল—আপনাদের জনপদের যে সব যুবকদের লইয়া আপনারা সৈন্যদল গঠন

করিবেন তাহাদেরও এইবার আমার কাছে পাঠাইয়া দিন। আমি অবিলম্বে তাহাদের শিক্ষা দিতে শুরু করিব। হূন যোদ্ধার তিনটে গুণ প্রয়োজন। তাহাকে ক্ষিপ্র অশ্বরোহী, দুর্দান্ত সাহসী ও বিশ্রামহীন পরিশ্রমী হইতে হইবে। সিংহের বিক্রমের সহিত শ্যেনপক্ষীর ক্ষিপ্রতা ও খচ্চরের সতর্ক সহিষ্ণুতা আয়ত্ত না করিলে হূনযোদ্ধা হওয়া যায় না। এজন্য অন্তত একবৎসর সময় লাগিবে, তাই আর কালবিলম্ব করিতে চাই না। আর একটা কথা, আমি এখান হইতেই শিকারার রাজ্য আক্রমণ করিতে পারি। আমার স্ত্রী ভুলেরাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নাই। আপনার স্ত্রী কণ্টকা শিকারার সহেলি। তাহাকে শিকারার নিকট পাঠাইয়াছি। যদি যে ভুলেরাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে। না, ভয় পাইবেন না। একশত অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া আমার দূতরূপে সে শিকারার নিকট গিয়াছে। শিকারা তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে সাহস করিবে না। শিকারা যদি বুদ্ধিমতী হয়, ভুলেরাকে কণ্টকার সহিত ফিরাইয়া দিবে। যদি না দেয় তাহা হইলে শিকারাকে আমি ধ্বংস করিব। মারো পর্বতের নিকটবর্তী সমস্ত স্থান আমি অধিকার করিয়াছি। আমি সেখানেও একটা বিরাট সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছি। আমার বন্ধু জারিলা তাহাদের সেনাপতি। বিপুল শক্তিশালী লোক সে। কোনও যুদ্ধে কখনও হারে নাই। ভুলেরাকে লইয়া কণ্টকা যদি না ফেরে তাহা হইলে শিকারার সহিত তুমুল যুদ্ধ অনিবার্য। সে যুদ্ধে আপনাদেরও যোগ দিতে হইবে। হাতে কলমে না শিখিলে কোন কাজই শেখা যায় না, আপনার জনপদের যুবকেরা কালই আমার সহিত দেখা করুক। ঘুরঘুট খাঁ এক নিশ্বাসে একটানা এতগুলি কথা বলিয়া গেল। মনে হইল যেন মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে। আমাকে কিছু বলিবারই অবসর দিল না সে। অবশেষে সে থামিল এবং আমার হাত দুইটি ধরিয়া সোচ্ছ্বাসে করমর্দন করিল।

বলিলাম, আপনারা বন্ধুরূপে আসিয়াছেন বন্ধুরূপেই আমাদের মধ্যে থাকুন। আপনাদের সংবর্ধনায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবে, ক্ষমা করিয়া লইবেন। কণ্টকার জন্য সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়া আছি। সে কবে ফিরিবে? কতদিন তাহার জন্য আমি অপেক্ষা করিব?

ঘুরঘুট বলিল—আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই তাহার ফিরিবার কথা। পূর্ণিমা পর্যন্ত তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিব। যদি কোন খবর না আসে, শিকারার পিরালা রাজ্য নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব। কণ্টকার সহিত একশত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য গিয়াছে। তাহারা সকলেই আমার বিশ্বস্ত অনুচর। প্রাণ থাকিতে তাহারা কণ্টকার অনিষ্ট হইতে দিবে না। আপনার চিন্তার কোনও কারণ নাই। আপনি ধৈর্য ধরুন।

পূর্ণিমা আসিল এবং চলিয়া গেল কিন্তু কণ্টকা ফিরিল না। মারো পর্বত হইতে ঘুরঘুটের সেনাপতি জারিলা বহু সেনা-সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের জনপদের অনেক যুবক পিরালায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহাদের মনের খবর জানি না, বাহিরে দেখিলাম তাহারা খুব উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। ঘুরঘুটের বড় বড় ঘোড়ায় চড়িয়া তরোয়াল উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদের ছুটাছুটির ধুম পড়িয়া গেল। যুদ্ধ যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস তাহা তখনও

তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। প্রকৃত যুদ্ধে যে কি বিভীষিকা তাহা আমারও অজানা ছিল। মুখে ঘুরঘুটের বীরত্ব আস্ফালনে সায় দিতেছিলাম বটে কিন্তু মনে মনে আমিও শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলাম। কণ্টকার জন্যও খুব চিন্তা হইতেছিল। মাঝে মাঝে সন্দেহ হইতেছিল—সে বাঁচিয়া আছে তো! ঘুরঘুট চতুর্দিকে গুপ্তচর পাঠাইয়াছিল। তাহারাও কেহ ফিরিয়া আসে নাই। আমার দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। এমন সময় একজন গুপ্তচর ফিরিল। সে আসিয়া খবর দিল জিগাসা নদীর তীরে ধনুর্বাণধারী কিছু লোক আড্ডা গাড়িয়াছে। তাহাদের দলপতির নাম ভিংড়া। আর তাহার সহকারীরূপে যে লোকটি সেখানে রহিয়াছে তাহার নাম ভালা। টেংরু, দামভা, জেইজেই নামে আরও তিনজন আছে। গুপ্তচরের সন্দেহ, তাহারা এই জনপদেরই লোক। বুঝিলাম আমার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা আমার বিরুদ্ধে একটা দল পাকাইতেছে। বিতাড়িত ভিংড়াকে তাহারা দলপতি করিয়াছে। ঘুরঘুট জিগাসা করিল উহাদের কি ও অঞ্চল হইতে তাড়াইয়া দিব? উহারা যদি শত্রু হয় তাহা হইলে উহাদের অবিলম্বে বিনাশ করাই কর্তব্য। আমি মানা করিলাম। বলিলাম—এখন উহাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। উহারা আমার আত্মীয়। হয়তো শেষে উহারা আমাদের দলেই যোগ দিবে। দিন তিনেক পরে দ্বিতীয় গুপ্তচরটি ফিরিল। সে শিকারার পিরালা রাজ্যের দিকে গিয়াছিল। সে বলিল পিরালা রাজ্যে ভীষণ উত্তেজনা। কণ্টকা ভুলেরাকে হরণ করিয়া পলাইয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। যে একশত অশ্বারোহী সৈন্য কণ্টকার সহিত গিয়াছিল শিকারা তাহাদের সকলকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। শিকারার সৈন্যবাহিনীতে একটা সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। শিকারার সেনাপতি জোখরু খেখুন সম্প্রদায়ের বহু লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করিতেছেন। পোলং জঙ্গল হইতে মশাল প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক গাছ কাটা হইতেছে। গুজব, শিকারা শীঘ্রই আমাদের আক্রমণ করিবে। এইসব শুনিয়া আমার মনের অবস্থা যাহা হইল তাহা অবর্ণনীয়। দোহা থাকিলে তাহার বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতাম। কিন্তু সে যে কবে ফিরিবে তাহা তো অনিশ্চিত। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম টুকচুম্বায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। টুকচুম্বা যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

ঘুরঘুট খাঁকে বলিলাম—টুকচুম্বায় ফুল ফুটিলে আমরা তাহাকে পূজা করি। তাহার তলায় দুধ ঢালি। অনেক সময় পশুও বলি দিই। তাহার পর তাহাকে ঘিরিয়া নাচ-গান করি।

ঘুরঘুট বলিল—আমার আপত্তি নাই। আপনাদের বৃক্ষদেবতাকে পূজা আপনারা করুন। কিন্তু বেশি উন্মত্ত হইয়া উঠিবেন না। যে-কোনও মুহূর্তে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে, এ সময় বেশি উন্মাদনা মারাত্মক। যুদ্ধের সময় যে-কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলা পরাজয়ের কারণ হইতে পারে।

ঘুরঘুট খাঁ-র কথা যুক্তিযুক্ত, তবু তাহার কথায় মনে আঘাত লাগিল। মনে হইল তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটা প্রভু-সুলভ সুর শুনিতে পাইলাম। কষ্ট হইল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

দামামায় ঘা দিলাম। দলপতি-রূপে আদেশ দিলাম টুকচুম্বায় পূজা হইবে।

পরদিন যথারীতি সবই হইল। প্রচুর দুধ ঢালা হইল, একটি মেষ বলি দিয়া তাহার রক্তে টুকচুম্বার কান্ড রঞ্জিত করিলাম। নাচ-গান-বাজনাও হইল প্রচুর। ঘুরঘুটের দলের অনেকে আসিয়া যোগ দিল। কিন্তু আমার মনে হইল পূজার সুরটি যেন ঠিক বাজিতেছে না। কোথায় কিসের যেন একটা অভাব রহিয়া যাইতেছে। হয়তো অভাবটা আমার মনের মধ্যেই ছিল। অবশ্যম্ভাবী বিপদের করাল ছায়া আমার মনের দীপ্তিকে ঢাকিয়া দিয়াছিল।

পরদিনই শিকারা আসিয়া প্রচন্ড আক্রমণ করিল আমাদের। কৃপাণ ও বর্শা হস্তে বীরবিক্রমে বহু অশ্বারহী আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমিও অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া একটা ঘোড়ার উপর চড়িয়াছিলাম। ঘুরঘুট আমার বুকে পিঠে উরুদেশে বাহুতে লৌহবর্ম পরাইয়া দিয়াছিল। আমার হাতেও একটা বর্শা ছিল। সহসা দেখিলাম একটা অশ্বারোহী উন্মুক্ত কৃপাণ লইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার বর্শাটা তাহার স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। বর্শার ফলক স্কন্ধকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া দিল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল। তখম আমি আমার কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া সবেগে সৈন্যব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার অসির আঘাতে একজনের হস্ত ছিন্ন হইল, একজনের গলদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। আমার চারিদিকে রক্তের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। দেখিলাম আমার প্রিয় ভৃত্য দম আমার ঠিক পাশে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছে। অপর পার্শ্বে রহিয়াছে ক্রীতদাসী বোরিলা। তাহারও অঙ্গে যোদ্ধৃবেশ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ। দম এবং বোরিলা আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার পার্শ্বরক্ষীরূপে আসিয়াছিল। দেখিলাম তাহারা প্রচন্ড বিক্রমে শত্রুনিধন করিতেছে। ঘুরঘুট খাঁ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার সম্মুখে ও পশ্চাদভাগে একদল করিয়া বর্শাধারী অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া বিপদপক্ষের সৈন্য আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বিশেষ সফল হইতেছিল না। চারিদিকে তুমুল চীৎকার, আর্তনাদ, চারিপাশে অশ্ব, অশ্বারোহী, রক্ত, আর ছিন্নভিন্ন শব-স্তূপ। আমি মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল আমরা মানুষ নই, আমরা পশুরও অধম, আমরা নরঘাতী রাক্ষস। নিজের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা মনের মধ্যে আবর্তিত হইতেছিল। হঠাৎ একটা গগনভেদী আর্তনাদ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম আমাদের কৃষিবিভাগের বিরাটকায় বলিষ্ঠ ঘানডার দক্ষিণ বাহুটি ছিন্ন হইয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল। দক্ষিণ স্কন্ধমূল হইতে ফোয়ারা দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঘানডা মাটিতে পড়িয়া আর্তনাদ করিতে করিতে আমার চোখের সম্মুখেই মরিয়া গেল। তাহার মৃতদেহের উপর দিয়া একের পর এক অশ্ব ছুটিয়া গেল। ঘানডা আমাদের জনপদের প্রাণস্বরূপ ছিল, সে প্রাণ সহসা নিবিয়া গেল, ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ঘুরঘুটের অনেক সৈন্যের হাতে কুঠার ছিল। দেখিলাম সেই কুঠার দিয়া তাহারা শিকারার সৈন্যদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেছে। সহসা আমার সামনের সৈন্য-প্রাকার ভেদ করিয়া একটা প্রকান্ড জোয়ান খড়্গ আস্ফালন করিতে করিতে আমার খুব নিকটে আসিয়া পড়িল। হয়তো সে খড়্গ আমার উপরই পড়িত কিন্তু কোথা হইতে একটা তীক্ষ্ন তীর আসিয়া তাহার

গলদেশে বিঁধিল—সে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিকারার আর একদল খড়্গধারী সৈন্য আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিতে লাগিল, আমার পিছন হইতে আমার রক্ষী সৈন্যরা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমিও আমার অসি তুলিয়াছিলাম কিন্তু সহসা পিছন দিক হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল, পালাও—পালাও—পিছু হটিয়া এস। ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া দেখিলাম ঘুরঘুট খাঁ রেকারের উপর দাঁড়াইয়া আদেশ দিতেছে। ঘুরঘুটের সব সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতেছে। ঘুরঘুটের কাছে যাইতেই সে বলিল—আমাদের অনেক সৈন্য এবং অনেক অশ্ব মারা গিয়াছে। শিকারার নূতন সৈন্যদল আসিতেছে। আমিও মারো পাহাড়ে আরও সৈন্য আনিতে পাঠাইয়াছি, তাহারা যতক্ষণ না আসে আমরা বিরানি জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করিয়া থাকিব। আপনি ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। আপনার ভাই ভিংড়া ও ভালা ধনুর্বাণধারী একদল সৈন্য লইয়া আমাদের সৈন্যদেরই মারিতেছে। আপনাকে লক্ষ্য করিয়াও তাহারা একটা তীর ছুঁড়িয়াছিল কিন্তু তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আপনার আততায়ীর কণ্ঠে গিয়া বিঁধে। আমার সৈন্যদল যতক্ষণ না আসিয়া পৌঁছায় ততক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত থাক। আসুন আমরা বিরানি জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়ি।

আমি বলিলাম—তাহা হইলে তো শিকারা এখনই আমাদের জনপদ দখল করিয়া লইবে। ঘরে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে। অবশেষে বিরানিতেও প্রবেশ করিবে। আসুন, না পলাইয়া আমরা উহাদের বাধা দিই। আমাদের জনপদের লোকসংখ্যা কম নয়। তাহাদের কাছে কিছু কিছু অস্ত্রও আমি দিয়াছিলাম। আমরা পলাইব না, যতক্ষণ প্রাণ থাকে প্রতিরোধ করিব। আপনি ও আপনার সৈন্যরা যদি পিছু হটিতে চান, আমি বাধা দিব না। কিন্তু আমরা পলাইব না, আমরা যুদ্ধ করিব। আমাদের দেবতা মহাবৃক্ষ ওই টুকচুম্বা সহস্র সহস্র ফুল ফুটাইয়া আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব। আপনি যদি পশ্চাদপসরণ করিতে চান করুন। আমি ঘোড়ার মুখ ফিরাইলাম।

আমি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার সম্মুখ দিকে আগাইয়া গেলাম। ঘুরঘুটের সৈন্যরা ঘুরঘুটের আদেশে সকলেই পলাইতেছে। শিকারার সৈন্য তাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ঘুরঘুটের সেনাদল সকলেই বিরানির দিকে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দেখিলাম সম্মুখে কয়েকটা অশ্বারোহীহীন অশ্ব পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। তাহাদের আশেপাশে কাটা হাত, ছিন্ন মুণ্ড আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শব। সহসা একটা বল্লম আসিয়া আমার বুকে লাগিয়া প্রতিহত হইল। ঘুরঘুট আমাকে বর্মাবৃত করিয়াছিল, বল্লম আমার গায়ে বিঁধিল না। আমি অসি নিষ্কাষিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে সজোরে আঘাত করিলাম। তাহার নীচের চোয়ালটা খসিয়া গেল। অদ্ভুত ভয়ঙ্কর মূর্তি লোকটা তবু কিছুদূর আগাইয়া আসিল, তাহার পর পড়িয়া গেল। হঠাৎ পিছনে একটা রে রে রে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা ছাড়াইয়া গেল। জনপদের আবাল-বৃদ্ধবণিতা সকলেই একযোগে বিরাট সমুদ্র-তরঙ্গের মত ছুটিয়া আসিতেছে। কাহারো হাতে লাঙ্গল, কাহারো হাতে খুন্তা, কাহারও হাতে কোদাল, কাহারও হাতে

কুঠার। দেখিলাম বুধো ঝাঝা, মন্মন, টুলা, ভর্ণা, বাবলা ও প্রত্যেকেই বড় বড় কাটারি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। অনেক মেয়েদের হাতে বঁটি। আমাদের জনপদের আহত আত্মসম্মান জাগিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার প্রাণে যে কি আনন্দ হইল তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। আশা হইল আমাদের মধ্যে অনেকে মরিবে কিন্তু পরাজয়-স্বীকার করিবে না। শিকারার সৈন্যরা সবাই অশ্বারোহী, তাহাদের হাতে খড়্গ, অসি, বল্লম, কুঠার। এ যুদ্ধ অসম যুদ্ধ। তবু যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া অসি চালাইতে লাগিলাম। আমাদের নিজেদের কিছু অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, তাহারাও মরীয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর বুঝিলাম আমাদের অনেক লোক মরিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা বাধা দিয়াছে। শিকারার বাহিনীও অবাধে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আমার জনপদবাসীরা তাহাদের গতিরোধ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, কোদাল, লাঙল, বঁটি, কাটারি প্রভৃতির বিষম প্রহারে ঘোড়াগুলির মুখ চোখ নাক মুখ জখম হইতেছিল, তাহারা পিছু হটিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিল। আমার মনে হইল, আহা, এ সময়ে আমাদের যদি আরও কিছু অশ্বারোহী সেনা থাকিত তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণরূপে শিকারার গতিরোধ করিতে পারিতাম। সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যের বিরুদ্ধে পদাতিকরা কতক্ষণ যুঝিতে পারে। এ সময় আকুল চিত্তে কিছু অশ্বারোহী সৈন্যের অভাব বোধ করিতে লাগিলাম। ঘুরঘুট খাঁকে খবর পাঠাইলাম সে আবার আসিয়া আক্রমণ করুক। কিন্তু সে আসিল না। বলিয়া পাঠাইল মারো হইতে তাহার নূতন অশ্বারোহী সৈন্যরা না আসা পর্যন্ত বিরানি জঙ্গলেই তাহারা বিশ্রাম করিবে। শিকারার সৈন্যরা আমাদের অসহায় প্রায়-নিরস্ত্র জনপদবাসীদের নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড বল্লমের আঘাতে অনেকে ভূশায়ী হইল। ঘোড়ার পায়ের তলাতেও নিষ্পিষ্ট হইল অনেকে। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় সহসা একটা তূর্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পর ঘন ঘন তূর্যধ্বনি হইতে লাগিল। দেখিলাম আমাদের মাঠের দিক হইতে অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য আসিতেছে। কাহার সৈন্য? ঘুরঘুটের নূতন সেনাদল কি আসিয়া পড়িল? কিন্তু ইহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তো অন্যপ্রকার, চেহারাও অন্য রূপ। ঘুরঘুটের সৈন্যদলের পোশাক কৃষ্ণবর্ণ, ঘুরঘুটের সৈন্যদলের অধিকাংশ লোকও কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু ইহাদের পোশাক সবুজ, ইহাদের বর্ণ গৌর। ইহাদের চোখ টানা টানা, চোখের মণি কুচকুচে কালো। সৈন্যদলের পুরোভাগে প্রকাণ্ড ঘোড়ার উপর চড়িয়া যে আমার দিকে দ্রুতবেগে আগাইয়া আসিল দেখিলাম সে অশ্বারোহী নয়, অশ্বারোহিনী। চীৎকার করিয়া সে বলিল—আমাকে চিনিতে পার টালা? আমি সুলমা। সেই যে অনেক দিন পূর্বে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া পলাইয়া ছিলাম। কিন্তু এসব কি?

বলিলাম—আমরা আক্রান্ত হইয়াছি। পিরালা রাজ্যের শিকারা আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। আমাদের নিজেদের সৈন্যবাহিনী নাই, কি হইবে জানি না।

সুলমা বলিল—ভয় কি। আমি তোমাদের জন্যই সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। আমাদের সেনাপতি আখেব খুব বড় যোদ্ধা। তোমার কপাল হইতে

রক্ত পড়িতেছে। তুমি চল—আখেবের কাছে চল—সে যুদ্ধের সব ভার লইবে। তুমি চলিয়া এস।

যুদ্ধের কোলাহল হইতে সুলমা আমাকে বাহির করিয়া লইয়া গেল। তাহার সেনাপতি আখেব বিরাটকায় লোক। ধপধপে ফরসা রং, মুখে বাদামী রঙের চাপ দাড়ি ও গোঁফ। মাথার শিরস্ত্রাণ হইতে স্বর্ণজ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সুলমা যে ভাষায় তাঁহার সহিত কথা কহিল সে ভাষা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা বুঝিলাম সুলমাই এ বাহিনীর প্রকৃত নেত্রী, আখেব তাহার ভৃত্য মাত্র।

সুলমার কথা শুনিয়া আখেব চীৎকার করিয়া উঠিল—জাম্বারিন্ কা হাফ্‌তা কা কাফ্‌তা। সঙ্গে সঙ্গে সুলমার সৈন্যবাহিনী সবেগে শিকারার সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কা হাফ্‌তা কথার মানে বোধহয় অবিলম্বে আক্রমণ কর। যুদ্ধ আবার তুমুল হইয়া উঠিল।

সুলমা বলিল—চল আমরা একটু দূরে নির্জনে যাই, তোমাকে অনেক কথা বলিবার আছে।

কাছে-পিঠে কোনও নির্জন জায়গা ছিল না। ভিংড়া যে পাহাড়টায় থাকিত সেই দিকেই আমরা অশ্ব-চালনা করিলাম।

আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না কিন্তু সেই পাহাড়ের সানুদেশে অবতরণ করিয়া আমি হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম সুলমা কাঁদিতেছে। তাহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রুর প্রস্রবণ নামিতেছে।

এ কি সুলমা, তুমি কাঁদিতেছ কেন ?

দুঃখে নয়, আনন্দে কাঁদিতেছি। আনন্দ তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি বলিয়া। আনন্দ তোমার বিপদের সময় অশ্বারোহী সেনা দিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে পারিয়াছি বলিয়া। এখান হইতে চলিয়া যাইবার পর আমার জীবনের একটি মাত্রই লক্ষ্য ছিল তোমাদের জন্য একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত করিব। ইহার জন্য যাহা যাহা করিয়াছি তাহার বিবরণ আর একদিন বলিব। দীর্ঘ সে কাহিনী। আমার একটি প্রশ্ন—আমাকে এখনও তুমি ভালবাস তো ?

বলিলাম—বাসি। তুমি যেদিন ঘোড়ায় চড়িয়া গেলে সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মনে মনে প্রত্যাশা করিয়া আছি তুমি ফিরিয়া আসিবে। আজ সে প্রত্যাশা সফল হইয়াছে। আজ সত্যই বড় আনন্দের দিন। সুলমা তুমি কাঁদিও না।

সুলমা কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—কিন্তু একটা কথা না বলিলে আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হইবে না। সুদীর্ঘকাল তোমার সহিত আমার ছাড়াছাড়ি। এই সময়ে আমি একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছি। আমার একটি ছেলে হইয়াছে। তাহাকে দেশে রাখিয়া আসিয়াছি। কে তাহার বাবা সঠিক আমি জানি না। তুমি এ-সব কথা শুনিয়াও কি আমাকে আর ভালবাসিতে পারিবে ? আমার পুত্রকে তোমার নিজের পুত্রের মতো গ্রহণ করিবে ?

আমি ইহা শুনিয়া খুব বিস্মিত হইলাম না। সে যুগে যৌন-ব্যাপারে স্বাধীনতা এমন সীমাবদ্ধ ছিল না। বিস্মিত হইলাম না, কিন্তু মনে মনে ব্যথিত হইলাম। একটু ঈর্ষাও হইল।

বলিলাম, তোমার ছেলেটি কত বড় ?

আগামী শুক্লপক্ষে সে সাত মাসে পড়িবে। তাহাকে ধাত্রীর কাছে রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, এইখানেই তাহাকে লইয়া আসিব।

আমি মাথা হেঁট করিয়া কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিলাম। ভাবিলাম আমিও জীবনে একাধিক স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। এই কারণে সুলমাকে ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই।

বলিলাম, যুদ্ধটা শেষ হোক। তখনও আমরা যদি বাঁচিয়া থাকি তোমার ছেলেকে এখানে আনাইবার ব্যবস্থা করিব। তাহাকে আমার পুত্রের মর্যাদাই দিব। তুমি কিন্তু আমাকে আর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। তোমাকে আর কাছ-ছাড়া করিব না।

সুলমা আমাকে আবেগ-ভরে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—বিশ্বাস কর একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের ভালবাসি নাই। ভালবাসি শুধু তোমাকে। না বাসিলে ফিরিতাম না। বিশ্বাস কর, তোমার সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্যই অনেক পুরুষকে প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে। তোমার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করাই আমার জীবনের ব্রত ছিল। সে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আমার মনে আজ যে কি আনন্দ, কি গর্ব, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না—

সহসা একটা তীক্ষ্ণ শব্দে সচকিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম একটা বাদামী রঙের বাজ চক্রাকারে উড়িয়া উড়িয়া শব্দ করিতেছে—কেক্ কেক্ কেক্-কীঈঈ। এ পাখী আগে দুইবার আমাদের জনপদে আসিয়াছিল। প্রথমবার—যেদিন দোহা ভালুক মারিয়া আনে। ভালুকের মাংস খাইবার অনুমতি এই পাখীটিই দিয়াছিল। ভিংড়া ইহার দিকে তীর ছুঁড়িয়া ছিল কিন্তু মারিতে পারে নাই। দ্বিতীবার দোহা ইহাকে ধরিয়া তাহার 'ফান্‌ডি'তে রাখিয়াছিল। সবুজ রং মাখাইয়াছিল।

কেক্—কেক্—কেক্—কীঈঈ—

চক্রাকারে উড়িয়া উড়িয়া পাখীটা কয়েকবার ডাকিল, তাহার পর টুকচুম্বার দিকে উড়িয়া চলিয়া গেল।

কি কথা বলিয়া গেল পাখীটা ? মনটা কেমন তোলপাড় করিয়া উঠিল। ও কি সংবাদ আনিয়াছে ? সুলমা প্রশ্ন করিল—কি দেখিতেছ ?

ওই পাখীটা। উচ্চকণ্ঠে ও কি বলিয়া গেল ? কর্করা পাখীরা যখন ডাকিতে ডাকিতে আকাশ জুড়িয়া আসিত তখন আমরা ভীত হইতাম। তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের গমের ক্ষেতে নামিয়া ফসল নষ্ট করিত। এ পাখী কি সঙ্কেত বহন করিয়া আনিল ?

সুলমা বলিল—আমাদের দেশে ও পাখীর নাম রাজাবাজ। ও সাপ ধরিয়া খায়। আমরা উহাকে খুব সম্ভ্রম করি, কারণ ও পাপীকে শাস্তি দেয়। তুমি ভয় পাইও না, রাজাবাজ মঙ্গলের বার্তাবহ।

এমন সময় একজন অশ্বারোহী আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। যুদ্ধের কোলাহল দূর হইতে অস্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

অশ্বারোহী আসিয়া বলিল—ঘুরঘুট খাঁ-র নূতন সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারাও যুদ্ধে নামিয়াছে। ওদিকে শিকারার সৈন্যদলেও খেখুন সম্প্রদায়ের সৈন্যরা আসিয়া যোগ দিয়াছে। আখেবের সৈন্যদলও প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতেছে।

ঘুরঘুট খাঁ খবর দিলেন আপনি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবেন না। সেখানে হত্যার তাণ্ডব চলিয়াছে। তিনি বলিলেন, আপনি যুদ্ধ হইতে দূরে থাকুন। তিনি আমাকে আপনার শরীর-রক্ষী হিসাবে পাঠাইয়াছেন।

ভিংড়ার পরিত্যক্ত ঘরটাতেই আমরা থাকা স্থির করিলাম।

অশ্বারোহীকে বলিলাম, আমাদের দুইজনের খাইবার এবং থাকিবার ব্যবস্থা পাহাড়ের ওই পাথর-ঘেরা গুহাটায় আপাতত কর। ঘুরঘুট খাঁকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বল যে অন্তত দশজন সশস্ত্র প্রহরী যেন এই পাহাড়তলীকে পাহারা দেয়। আমার ভৃত্যদ্বয়কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।

অশ্বারোহী বলিল—দম মারা গিয়াছে। শিকারার এক সেনা কুঠার দিয়া তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে।

তুমি কি দমকে চিনিতে ?

দমের চারিটি পত্নী শোকে হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে। তাহাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়াই শুনিলাম যে দম আপনার প্রিয় সহচর ছিল, সে মারা গিয়াছে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

অশ্বারোহীটি বলিল, শীঘ্রই আপনার জন্য একটি ভৃত্যের ব্যবস্থা করিতেছি।

অশ্বারোহীটি দ্রুতবেগে পুনরায় চলিয়া গেল।

সুলমা বলিল—আমি তো আছি। অন্য ভৃত্যের প্রয়োজন কি।

তাহাকে চুম্বন করিলাম।

উভয় পক্ষেই প্রচুর সৈন্য, প্রচুর অশ্ব, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, প্রচুর উত্তেজনা। দশ দিন কাটিয়া গেল তবু যুদ্ধ থামিবার লক্ষণ নাই। আকাশে বহু শকুনি শৃধিনী কাক উড়িতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া তাহারা পচা মড়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। তাড়াইয়া দিলে খানিকটা সরিয়া যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার আসিয়া বসে। শকুনি-গৃধিনীরা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। বিকট দুর্গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। হাহাকার, আস্ফালনে, অশ্বের হ্রেষায় চীৎকারে দশদিক কম্পিত। তা সত্ত্বেও যুদ্ধ চলিতেছে এবং মনে হইতেছে আরও বেশ কিছুদিন চলিবে। যতক্ষণ না উভয় পক্ষের সব নিঃশেষ হইতেছে ততদিন চলিবে।

আমি ভিংড়ার গুহায় একাই ছিলাম, আমার খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট ছিল না, কিন্তু আমার মনে তুষানল জ্বলিতেছিল, আমি যেন কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম।

কণ্টকা বা ভুলেরার কোনও খবর আসে না। সুলমা রোজ সকালে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলিয়া যাইত এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া যুদ্ধের সব খবর আমাকে শুনাইত।

সে একদিন আসিয়া বলিল—শিকারাকে ঘুরঘুট বন্দী করিয়াছে। তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একটি ঘরের ভিতর রাখা হইয়াছে। ঘরটি ঘিরিয়া বহু সশস্ত্র সৈন্য দিবারাত্রি পাহারা দিতেছে। কিন্তু তবু যুদ্ধ এখনও থামিবার কোনও লক্ষণ নাই। কারণ শিকারার সেনাপতি জোখরু এবং খেখুনদের রাজা জিজিগম আরও

অনেক অশ্বারোহী সৈন্য আমদানী করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যদের এখন বিরানি জঙ্গলে পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহারা সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করুক। সকলে একসঙ্গে জটাপটি করিয়া লাভ নাই। এখন ঘুরঘুট খাঁ-র সৈন্যরা লড়িতেছে। প্রয়োজন হইলে আমার সৈন্যরা তাহাদের সহিত যোগ দিবে। মড়াগুলি পুঁতিয়া ফেলিবার জন্য একদল লোক লাগাইয়াছি। তাহারা আমাদের মাঠে করব খুঁড়িতেছে…।

সুলমা একটুও বিচলিত হয় নাই। অনায়াস নিপুণতা সহকারে সে সমস্ত ব্যাপারটার হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রের ত্রিসীমানায় যাইতে দেয় না।

একদিন হঠাৎ বলিল—আমি কণ্টকার খোঁজে দশজন অশ্বারোহী পাঠাইয়াছি।

কণ্টকার খোঁজে? কেন?

আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি মনে মনে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছ।

আমি একথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমার চরিত্রের এ দিকটা তো আগে দেখি নাই।

সুলমা মুখ টিপিয়া হাসিল কেবল। তাহার হাসিটি সত্যই অপূর্ব।

যুদ্ধ শেষ হইবার কোন লক্ষণ নাই। দুই পক্ষেই নূতন অশ্বারোহী দল আসিয়া যোগ দিতেছে। শেষ হইবার কোনও আশা দেখিতেছি না। দুই পক্ষই নানা স্থান হইতে রসদও সরবরাহ করিতেছি। আমাদের জনপদ শ্মশান হইয়া গেল। একদিন শুনিলাম তিরখনও মারা গিয়াছে। তাহার একটা কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল—আমরা হুনেরা কখনও সঞ্চয় করি না। আমাদের যাহা প্রয়োজন লুটপাট করিয়া সংগ্রহ করি। আমাদের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি করিবার বাসনা যখন জাগিবে তখনই আমাদের ধ্বংসের বীজ আমরা বপন করিব। তোমরা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বিষয়-সম্পত্তি করিয়া সেই বীজ বপন করিয়াছ। বিষয় করিলেই সে বিষয় হরণ করিবার জন্য চোর-ডাকাত আসিবে, বিষয়ের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ হইবে। বিষয় তোমার শান্তি অপহরণ করিবে, তোমার বিষয় যত বিস্তীর্ণ হইবে তোমার অন্তর্দাহও তত বাড়িবে। বিষয় বিষ, বিষয় গরল। তিরখনের কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। আমরা মানবসভ্যতার যে স্তরে উপনীত হইয়াছিলাম সেই স্তরে আমরাই প্রথমে জমি দখল করিয়া জনপদের পত্তন করি। আমরাই প্রথম গরল পান করিয়াছি। দেখিতেছি সে গরলের ক্রিয়াও শুরু হইয়া গিয়াছে। আমার চোখের সম্মুখেই আমাদের জনপদ শ্মশান হইয়া যাইতেছে। হয়তো মানব-সমাজে এই কাহিনীই নানারূপে বারংবার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, বহু সভ্যতার উত্থান ও পতন হইবে, বহু জনপদ শ্মশান হইবে, বহু নারী স্বামী-হারা সন্তান-হারা হইবে, বহু পুরুষ স্ত্রী-হারা সন্তান-হারা হইয়া হাহাকারে আর্তনাদে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিবে, তবু মানুষ এই হলাহল পান করিতে ছাড়িবে না। হয়তো চিরকাল এই নিদারুণ মহানাটকের অভিনয় চলিতেই থাকিবে।

যুদ্ধ চলিতেছিল।

কিন্তু এমন একটা অভিনব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল যে যুদ্ধ হঠাৎ থামিয়া গেল। যে যেদিকে পারিল দুদ্দাড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল। বিশাল এক হস্তী-বাহিনী লইয়া দোহা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। তাহার সঙ্গে হাতী-বাবা। দোহা ও

হাতী-বাবা যে হাতীটির উপর চড়িয়া ছিল সেটি পর্বতাকার, বিশাল তাহার দাঁত, প্রকান্ড মাথা, প্রকান্ড কান। শুঁড় দোলাইতে দোলাইতে সেই মহামাতঙ্গ সদলবলে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল তখন সমস্ত ঘোড়ারা ভড়কাইয়া যে যেদিকে পারিল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। হাতীর দল রণক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিল। ঘুরঘুট দোহাকে চিনিত, সে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল। ঘোড়াটা সবেগে পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে রণক্ষেত্র অশ্বারোহী-শূন্য হইয়া গেল। চারিদিকে কেবল বিরাটকায় হাতীর দল। সহসা লক্ষ্য করিলাম একটি হাতীর পিঠে চম্বা বসিয়া আছে।

হাতী দেখিয়া আমিও ভয় পাইয়াছিলাম। কাছে যাইতে সাহস হইতেছিল না। দোহা হাতী হইতে নামে নাই। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে ডাকিল।

কাছে এস, ভয় নাই।

তাহার পর হাতী-বাবার কানে কানে কি বলিল। বোধহয় আমার পরিচয় দিল। আমি সভয়ে হাতীর কাছে গেলাম। হাতী-বাবা হাতীর ভাষায় কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম হাতীটা হাঁটু গাড়িয়া শুঁড় তুলিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। প্রত্যেক হাতীর পিঠেই একজন মাহুত ছিল। তাহারাও জয়ধ্বনি করিয়া আমাকে সংবর্ধনা করিল।

যুদ্ধ থামিয়া গেল।

ঘুরঘুট আসিয়া আমাকে বলিল—বন্দিনী শিকারার কি ব্যবস্থা করিবেন? আমার ইচ্ছা রাক্ষসীটাকে হত্যা করিয়া ফেলি।

আমি বলিলাম—আমরা তো অনেক হত্যা করিলাম, আবার কেন? শিকারাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কি আমাদের বন্ধু হইবে?

ঘুরঘুট একটু বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—শিকারা বলিতেছে দোহাকে আমি ভালবাসি। দোহাই আমার বিচার করুক। সে যে দন্ড দিবে তাহাই আমি মাথা পাতিয়া লইব।

দোহা বলিল, আমি বিচার করিতে অক্ষম। হাতী-বাবাই করুন।

হাতী-বাবা বলিলেন—আমার হাতীই বিচারক হোক। সে আমার চেয়ে বেশী বিজ্ঞ। উহার বুদ্ধি আমার অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম।

বন্দিনী শিকারাকে হাতীর সম্মুখে দাঁড় করানো হইল। হাতী-বাবা হাতীর ভাষায় তাহাকে কি বলিলেন, বুঝিলাম না। সম্ভবত বিচার করিতেই বলিলেন।

হাতী হঠাৎ আগাইয়া গিয়া শিকারাকে শুঁড়ে জাপটাইয়া উপরে তুলিল, তাহার পর সজোরে মাটিতে আছাড় মারিল এবং রোষভরে পা দিয়া তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিকারা রক্তাক্ত মাংসপিন্ডে পরিণত হইয়া গেল।

পরদিন হাতী-বাবা হাতীর দল লইয়া চলিয়া গেলেন। যে হাতীটিতে চম্বা চড়িয়া আসিয়াছিল সে হাতীটি তিনি দোহাকে উপহার দিয়া গেলেন।

টুকচুম্বা লাল ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল আমাদের জনপদের রক্তাক্ত বেদনা যেন টুকচুম্বার সর্বাঙ্গে মূর্ত হইয়াছে। আমরা যাহারা বাঁচিয়া ছিলাম তাহারা সকলে একদিন টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিলাম। দোহা হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘুরঘুটও সে প্রার্থনা-সভায় ছিল। সে-ও দেখিলাম খুব বিচলিত হইয়াছে। তাহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া

পড়িয়াছিল। সে আশা করিতেছিল তাহারা হয়তো মারো পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। সে-ও যাইবে-যাইবে করিতেছিল। এমন সময় আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত কিংখাবে-মোড়া একটি স‌ুদৃশ্য পালকি একদিন আমাদের নদীর প‌ূর্বতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পালকির সহিত পালকির বেহারা ছাড়া দ‌ুইজন অশ্বারোহী ছিল। একজন অশ্বারোহী আমাদের ভাষায় বলিল—কণ্টকা ও ভুলেরা উর নামক রাজ্যে আছে। এদেশে য‌ুদ্ধ হইতেছে বলিয়া তাহারা উর রাজ্যে আত্ম-গোপন করিয়াছে। এই পালকি তাহারা ঘ‌ুরঘ‌ুট খাঁ-র জন্য পাঠাইয়াছে। ঘ‌ুরঘ‌ুট খাঁ এই পালকি চড়িয়া যেন চলিয়া আসেন। উর রাজ্যে বিদেশী অশ্বারোহীদের প্রবেশ নিষেধ। তাই পালকি পাঠানো হইল। ভুলেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কণ্টকাও ভালো আছে। য‌ুদ্ধ থামিয়াছে খবর পাইলেই সে ফিরিয়া আসিবে। ঘ‌ুরঘ‌ুট পরদিনই পালকি করিয়া চলিয়া গেল।

নাটকটা বেশ মিলনান্তক হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়োগের স‌ুর বাজিল। একদিন সহসা কয়েকটা তীর আসিয়া আমার গলায়, পিঠে ও ম‌ুখে বিঁধিল। দেখিলাম দ‌ূরে ভিংড়া ও ভালা ছ‌ুটিয়া পলাইতেছে। তীরগ‌ুলি বিষাক্ত ছিল, আমার মৃত্যু হইল।

দ্বিজেন্দ্র-দর্পণ

উৎসর্গ

আদর্শ শিক্ষক

চিরন্তন অধ্যক্ষ

স্বর্গীয় গিরিধর চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলাল

এই প্রবন্ধে ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্য অঙ্কন করিবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু প্রথমেই মনে একটা প্রশ্ন জাগিতেছে—ব্যক্তিত্ব, যাহা স্বতঃই আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, তাহার স্বরূপ কি ভাষার বা বর্ণনার সাহায্যে নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট করা সম্ভব? বিখ্যাত ইংরেজী লেখক মম বলিয়াছেন, ভাষার সাহায্যে কোন মানুষের রূপ নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা যায় না। প্রত্যক্ষের দর্পণে যাহা অপরোক্ষ করি ভাষার মাধ্যমে তাহা অবর্ণনীয়। ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও বোধহয় সে কথা সত্য। কারণ কাহারও ব্যক্তিত্ব তাহার গুণাবলীর বা কীর্তিকলাপের ফর্দ মাত্র নহে, তাহা তাহার দোষের বা পতন-ত্রুটির অবিমিশ্র বর্ণনাও নহে, তাহা প্রাণ-রসে সঞ্জীবিত অদ্ভুত অনন্য এমন একটা প্রকাশ, যাহা চলনে বলনে, হাসিতে ভঙ্গিতে, আলাপে-আলোচনায়, খেয়ালে মুদ্রাদোষে, মহত্ত্বে নীচতায়, অনুরাগে-বিরাগে ক্ষণে ক্ষণে বহু-দ্যুতি হীরকের মতো ঝকমক করিতে থাকে, যাহা বাহিরে একরূপ, অন্তরে একরূপ, অন্তরঙ্গ বন্ধু মহলে যাহা উচ্ছল, অপরিচিতের নিকট যাহা গম্ভীর—সেই বহুরূপী ব্যক্তিত্বের চিত্র ভাষা দিয়া আঁকা যায় না, ফোটোগ্রাফের বিজ্ঞানকে তাহা ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়ে। শেলীর জীবনচরিতলেখক আঁদ্রে মোরোয়া তাঁহার বিখ্যাত 'এরিয়েল' নামক পুস্তকে, এমিল লাডভিগ তাঁহার নেপোলিয়ন এবং ক্লিওপেট্রার জীবনচরিতচিত্রণে, জন ডিক্সন তাঁর বিখ্যাত লেখক কোনান্ ডয়েলের জীবন-আলেখ্যে, লিটন স্ট্র্যাচি ভিক্টোরিয়ার জীবন-চরিতে এই ব্যক্তিত্বকেই ভাষার ছাঁচে ধরিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি সুখ-পাঠ্য, বস্তুত বিখ্যাত লেখকদের লেখা জীবন-চরিত মাত্রেই সুখ-পাঠ্য গ্রন্থ,—কিন্তু তাহাতে ওই অবর্ণনীয় ব্যক্তিত্ব নামক আশ্চর্য প্রকাশটি, যাহা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একটা বিশেষরূপে বিকশিত বিচ্ছুরিত হইয়া অবশেষে মহাকালের মহাশূন্যে বিলীন হয়, তাহার স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে কি? সন্দেহ হয়। জীবনচরিত-লেখক যে চিত্র আঁকেন তাহা তাঁহার নিজের সৃষ্টি, সে সৃষ্টিতে তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোছায়া পড়ে; বিধাতার সৃষ্টি 'ব্যক্তিত্বের' সঙ্গে তাহার অমিল থাকার সম্ভাবনাই বেশি মনে হয়।

তবু জীবন-চরিতেই ব্যক্তিত্বের সন্ধান করিতে হইবে। উহার মধ্যেই আভাসে-ইঙ্গিতে, দুই একটি আচরণে বা আলাপে হয়তো ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় পাইব। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে—'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।' সেই একটুকু ছোঁয়া বা একটুকু কথা জীবন-চরিতের পাতাতেই পাওয়া যায়। তাহা লইয়াই ফাল্গুনী রচনা করিতে হইবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে বিজ্ঞানও অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন। কিন্তু রহস্যের সমাধান হয় নাই। একই পরিবেশে একই পিতা-মাতার সন্তান কেন বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হয়, এ রহস্যের সমাধান জন্ম-বীজের মধ্যে যে genes-এর মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া বিজ্ঞানীরা বলেন,—সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। শুনিয়াছি নানা প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া জার্মানিতে এবং রাশিয়ায় মানুষের ব্যক্তিত্ব বদলাইয়া

ফেলিয়াছে। অনেক শিবকে তাহারা বাঁদর করিয়াছেন, কিন্তু বাঁদরকে শিব করিয়াছেন এ রকম খবর শুনি নাই। আমাদের পুরাণে এরকম খবর দুই একটা আছে, দস্যু রত্নাকর কবি বাল্মীকি হইয়াছিলেন, রাক্ষস রাবণের ভ্রাতা রামভক্ত বিভীষণে রূপান্তরিত হইয়া রাবণ-নিধনে সহায়তা করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃতেও মাতাল জগাই-মাধাই পরম ভক্তে পরিণত হইয়া আজও আমাদের কাছে অভিনন্দন লাভ করিতেছেন। কিন্তু এসব রূপান্তর আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে হয় নাই। হইয়াছিল সেই বিস্ময়কর মানসিক বিবর্তনে—যাহার ঠিক সংজ্ঞা আমরা এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। তপস্যা, ভক্তি, পূর্বজন্মের সুকৃতি—প্রভৃতি নানা নাম দিয়া আমরা তাহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু তাহা প্রয়াস মাত্র, রহস্য রহস্যই থাকিয়া গিয়াছে।

বংশ-মহিমা—ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'পেডিগ্রি'—তাহা অবশ্যই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক। অনেক উন্নাসিক ব্যক্তিকে মন্তব্য করিতে শুনিয়াছি যে, পেডিগ্রি আবার কি! মানুষ মাত্রেই সমান। পেডিগ্রির ছাপ মারিয়া একটা মানুষকে আলাদা করিয়া দেখার প্রয়োজন নাই। তাঁহারাই কিন্তু যখন কুকুর বিড়াল বা গরু কিনিতে যান তখনই পেডিগ্রির খবর লন, বাজারে কোনও জিনিস কিনিতে গেলে সন্ধান করেন, made in England, বা made in Germany ছাপ দেওয়া কোন জিনিস আছে কি না। মানুষের বেলাতেই তাঁহারা মনে করেন সবাই তুল্য-মূল্য। তাঁহাদের কথা শুনিয়া Ben Jonson এর বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে—"It is the highest of earthly honours to be descended from the great and good. They alone cry out against noble ancestry who have none of their own."

দ্বিজেন্দ্রলাল বিরাট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে যে বিরাটত্ব দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের যে ওজস্বিতা ও দীপ্তি তাঁহার চরিত্রে সমুজ্জ্বল, তাহা এই বিরাট বংশের উত্তরাধিকার। তাঁহার জীবনচরিতে তাঁহার বংশের বিস্তৃত পরিচয় আছে। সে পরিচয় মহিমাময়। তাঁহার সবিস্তার উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই কেবল উদ্ধৃত করিতেছি।

"নদীয়ার মহারাজের প্রসিদ্ধ দেওয়ান মনস্বী কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের জনক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মাতা শান্তিপুরের গোস্বামী অদ্বৈতাচার্যের বংশের কন্যা ছিলেন। পিতৃ-মাতৃ উভয় পক্ষেই দ্বিজেন্দ্রলাল সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের বংশধর ছিলেন।" মনস্বী কার্তিকেয়চন্দ্র রায় বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে গুণের জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়াছেন তাহা তাঁহার চরিত্রের অটলতা। সদ্য-আগত বিদেশী প্লাবনের জোয়ারে যখন সব কিছু ডুবিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, "যখন কৃষ্ণনগরের প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত, যখন সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড়প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পূর্ণ থাকিত, যখন

লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন"—শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী তৎকালের বঙ্গসমাজে দুর্নীতি-প্লাবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন[১] তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়কে সে প্লাবনের মধ্যে তুঙ্গ-শির পর্বত বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। শুধু চরিত্রে নয় বিদ্যাতে এবং প্রতিভাতেও তিনি উত্তুঙ্গ ছিলেন। বাঙ্গালা, পার্শী ও ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন তিনি। সুগায়ক ছিলেন ; গ্রন্থকারও ছিলেন। তৎপ্রণীত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' ও 'আত্মজীবন চরিত' বঙ্গভাষায় চরিতাখ্যান বিভাগে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। "তাঁহার চরিত্রে একদিকে যেমন আন্তরিক বিনয় ছিল, অন্যদিকে তেমনি অনমনীয় তেজস্বিতা ছিল। তিনি সত্যের অনুরোধে, কর্মচারী হইয়াও অনেক সময় মহারাজদিগের মুখের উপর অতি স্পষ্ট ও কঠোর প্রতিবাদ করিতেন ; কর্তৃপক্ষ কোন সাহেবও কখনও অন্যায় করিলে নির্ভীক ভাবে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিতেন।"[২]

তাঁহার নির্ভীক আচরণ কিন্তু তাঁহাকে বন্ধু-বিহীন করে নাই। তিনি বিজ্ঞাপন-পরাঙ্মুখ আড়ম্বরহীন আত্মগোপন-ক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বন্ধুবর্গের তালিকা বিস্ময়কর। "প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র, লোহারাম শিরোরত্ন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যগুরু দীনবন্ধু, মহাকবি মধুসূদন, বিখ্যাত বক্তা রামগোপাল ঘোষ, বারাসাতের কালীকৃষ্ণ মিত্র, দ্বারকনাথ দে, পূর্ণচন্দ্র রায় প্রমুখ বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বলকারী ব্যক্তিবর্গ কার্তিকেয়চন্দ্রের গুণমুগ্ধ, অকৃত্রিম সম-প্রাণ বন্ধু ছিলেন। সৌরভসমৃদ্ধ মকরন্দপূর্ণ কুসুম গহন বনে ফুটিলেও অলিদল আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার রোগ-শয্যাপার্শ্বে তৎকালীন ছোট লাট সার রিভার্স টমসনও অযাচিত-ভাবে আসিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য।"[৩] অর্থাৎ সে যুগে তিনি বিদগ্ধ সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্র জননী প্রসন্নময়ী আদর্শ হিন্দুগৃহিণী ছিলেন। মনে হইত তিনি স্বামী পুত্র পরিজন ও আশ্রিত অভ্যাগতগণের সেবা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই যেন জীবন ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু "প্রীতি, করুণা, সরলতা ও অমায়িকতার প্রতিমূর্তি হইলেও দেবী প্রসন্নময়ীর চরিত্রে তেজস্বিতার অভাব ছিলনা। পালয়িত্রী স্বয়ং মহারাণীকেও তিনি কোনদিন কোন কারণে তিলার্ধ স্তুতিবাক্যে তুষ্ট করেন নাই।"[৪] অথচ তিনি পরম স্নেহময়ী ছিলেন, অপরের দুঃখে করুণায় বিগলিত হইতেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে তাঁহার পিতামাতার এই গুণাবলীর প্রকাশ দেখিলে মনে হয়, দর্পণে যেন প্রতিবিম্ব দেখিতেছি ; একই নদীর ধারা যেন একই জলরাশি বহন করিয়া ভিন্ন রূপে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল

(১) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২২ দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত ; ২য় সংস্করণ

(২) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২৫-২৬

(৩) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২৭

(৪) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৩৭

সর্বতোরূপে পিতামাতার গৌরবময় চারিত্রিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ভাগ্য, ইহা তাঁহার গৌরব।

কিন্তু তাঁহার জীবনে তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান আমরা পাই কি? বাল্যকালেই তাঁহার জীবনে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল? তাঁহার জীবনীকার বলিতেছেন[৫], ছেলেবেলায় ধাত্রীর ক্রোড় হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি মারাত্মক রূপে আহত হন। এজন্য তাঁহার মুখখানা চিরদিনের জন্য বাঁকিয়া গেল—শেষ বয়সে মুখের বক্রতা অবশ্য খানিকটা কমিয়াছিল। আর একবার ঢেঁকির উপর হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আর একটি খবর ছেলেবেলা হইতে তিনি দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া রোগে প্রচুর ভুগিয়াছিলেন। এই সব সংবাদগুলি প্রণিধানযোগ্য মনে করি। যে ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ বাল্যকাল হইতেই নির্মিত হয়, সেই বনিয়াদের উপর অনিবার্য দুরতিক্রম্য আঘাত ব্যক্তিত্বকেই যেন বিচিত্র ভাবে ভিতরে ভিতরে বদলাইতে থাকে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মম খোঁড়া এবং তোতলা ছিলেন, শেলী বাল্যকালে ইটন বিদ্যালয়ে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকালে প্রায়বন্দী-অবস্থায় ভৃত্যরাজকতন্ত্রের অধীনে থাকিতে হইয়াছিল। কীট্‌সের বাল্যজীবনও দুঃখময়[৬]। কিন্তু সে দুঃখ অন্য রূপ, তাহা দৈহিক নহে, মানসিক। খানিকটা দৈহিক দুঃখ অবশ্য ছিল, তিনি বেঁটে লোক ছিলেন, উচ্চতা ছিল মাত্র ৫ ফিট্‌। এইজন্য এই হ্রস্বতার জন্য তিনিও স্কুলজীবনে যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার আসল দুঃখ বাল্যেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতামহ খাম-খেয়ালী ও পেটুক লোক ছিলেন এবং মা ছিলেন রতি-উন্মাদিনী মহিলা—npmphomaniac। কীট্‌সের মন বাল্যজীবনে সেই সুখময় স্নেহময় নিরাপদ আদর্শ আশ্রয় পায় নাই যাহা পাইবার জন্য প্রত্যেক শিশু উন্মুখ ও আকুল। কীট্‌স্‌ সারাজীবন অসুখী ছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন "My mind has been the most discontented and restless one that ever was put into a body too small for it".[৭] বায়রনও খঞ্জ ছিলেন। এই খঞ্জত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের উপর দাগ রাখিয়া গিয়াছে। বাল্যকালে বায়রনকে অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও দিন কাটাইতে হইয়াছিল।

প্রতিভাবান শক্তিশালীদের জীবনে বাল্যকালের এই সব অনিবার্য পীড়নের সাধারণত দুই-তিন রকম প্রকাশ দেখা যায়। অনেক সময় ছেলেটি দুর্দম বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। শেলীর জীবনে ইহা দেখা গিয়াছে। বাল্যকালেই তিনি নির্যাতনকারী বালকদের বিরুদ্ধে একাই রুখিয়া দাঁড়াইতেন। "They soon discovered that the smallest threat threw him into a passion of resistance. His eyes, dreamy when at peace, acquired under the enthusiasm or

(৫) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৪৩-৪৪-৪৫

(৬) দ্রষ্টব্য :—'Introduction to Keat's Works' by Harold Edgr Briggas. pp (XVI)

(৭) Do-pp. XVIII

indignation a light that was almost wild, his voice became agonised and shrill."[৮] রবীন্দ্রনাথকেও পাঠশালায় এ দুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লাজুক ছিলেন। শেলীর মতো হাতাহাতি মারামারি করিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকারও বলিতেছেন, দ্বিজেন্দ্রলালও ছেলেবেলায় লাজুক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি যেন বিশেষ ভাবেই স্বতন্ত্র ছিল। তিনি তাঁহার সহপাঠীদের সহিত মিশিতে পারিতেন না। তাহাদের সহিত খেলায় যোগ দিতেন না। Wordsworth ও Shelley-র বাল্যকালের মানসিকতার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিকতার মিল আছে। তাঁহার বাল্যের রচিত গানগুলিও করুণ ও বিষাদমাখা। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এই অল্প বয়সে তোমার হৃদয়ে কি বিষাদ বা দুঃখ থাকিতে পারে যাহাতে তোমার প্রায় প্রত্যেক গানেরই সুরে এমন বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে?"[৯] এ বিষাদ অবচেতন লোকের বিষাদ, যে বিষাদের বীজ ভাগ্যবিধাতা শারীবিক পীড়া ও পীড়ন রূপে তাঁহার জীবনে বপন করিয়াছিলেন। তিনি লোকচক্ষু এড়াইয়া নির্জন প্রকৃতির ক্রোড়ে আত্মসমাহিত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। এই সময় তাঁহার স্বভাবজাত কবিত্বও বিষাদময় সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জীবনীকার বলিতেছেন—"এই স্বভাবকবি বাল্যকালে অত্যন্ত অল্পভাষী ও গম্ভীর ছিলেন। অন্যমনে ও বিষণ্ণভাবে তিনি নিয়ত যেন আপনাতে আপনি নিমগ্ন থাকিতেন···তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত তিনি যেন কোন এক অজ্ঞাতলোকের অধিবাসী, দৈবাৎ ভ্রম-ক্রমে এই কোলাহল-ক্ষুব্ধ মর্ত্যলোকে আসিয়া পড়িয়াছেন। এখানে যেন কোন কিছুর সঙ্গে তাঁহার মনের ঠিক মিল হইতেছে না।"[১০] জীবনটাকে চিরকালই তাঁহার কোলাহল বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাঁহার একটা বিখ্যাত গানের প্রথম ছত্রই হইতেছে "জীবনটাতো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল"। তিনি শুধু যে তাঁহার সমবয়সী সহপাঠীদের সম্বন্ধেই উদাসীন ছিলেন তাহা নয়, নিজের সম্বন্ধেও ছিলেন! অনেকে তাঁহাকে বৈরাগী ভোলানাথ আখ্যা দিয়াছিল। যখন তাঁহার আট নয় বৎসর বয়স প্রায়ই তখন তিনি স্কুলের বইখাতা হারাইয়া স্কুলে শাস্তি ভোগ করিতেন। তথাপি তিনি স্কুলের শিক্ষককে অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিয়া বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। ক্লাসে শুনিয়া শুনিয়াই তিনি সব পড়া মুখস্থ বলিতে পারিয়াছিলেন। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির নানা ঘটনা তাঁহার জীবনীকার সবিস্তারে লিখিয়াছেন। বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সে ছেলেবেলা থেকে কেমন যেন একটু 'উদোমাদা' 'পাগলাটে' ধরণের ছিল। নিজের শরীর কিংবা বেশবিন্যাস প্রভৃতিতে তার আদপে কোনই খেয়াল ছিলনা। যাহাকে 'কাছা খোলা' লোক বলে সে একেবারে ঠিক তাই···। চুল আঁচড়ানো একটা ব্যাপার সে জানতই না···"[১১]।

(৮) Ariel—Andre Maurois (Jaico edition pp 11)

(৯) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫০-৫১

(১০) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫০-৫১

(১১) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫২

এই লাজুক প্রকৃতির উদোমাদা স্বভাব-কবি বালকটির ব্যক্তিত্বে তখনই কিন্তু আর একটি নূতন ধরণের সুর পড়িতেছিল। তাহা আত্মসম্মান-বোধ এবং দেশের পরাধীনতার সম্বন্ধে সচেতনতা। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই তাঁহার সমস্ত চরিত্রমাহিমা, তাঁহার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি, তাঁহার তীক্ষ্ণ-ধী, তাঁহার অদ্ভূত স্মরণশক্তি ক্রমশই তাঁহাকে স্বদেশ-প্রেমের দিকে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। আজকাল যেমন নানারূপ প্রেম সঙ্গীত সর্বত্র প্রচলিত, সেকালেও তেমনি ছিল। কিন্তু এসব সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি বাল্যকালে যেসব সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গীত। আর্যগাথা প্রথম ভাগ নামে ইহা যখন প্রকাশিত হয়, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল উহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন —"যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, আর্যগাথা তাঁহাদের জন্য রচিত হয় নাই এবং তাঁহাদের আদর প্রত্যাশা করে না।"[১২] আর্যগাথায় আর্যবীণার দ্বিতীয় গানে দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্টভাষায় সক্ষোভে বলিয়াছেন—"যতদিন না দুঃখিনী মাতৃভূমির এই দুঃখ দৈন্য ও হীনতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় ততদিন ভারতবাসীর মুখে প্রেম-সঙ্গীত ভাল দেখায় না।"[১৩] বাল্যকাল হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল সুনীতিপরায়ণ। আদর্শবাদী লোক ছিলেন। যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে দেশের লোকের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটিতে পারে সেরূপ সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁহার মনঃপূত ছিল না। এই জন্যই উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিয়াছিল। তাঁহার এ মতবাদ যুক্তিসহ কি না তাহা বিচারের স্থান এ প্রবন্ধে নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও মতামত কিরূপ ছিল তাহাই কেবল বলিতেছি। তাঁহার এই অত্যন্ত শুচি আদর্শের উপাদান তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতা ও মাতার চরিত্র হইতে। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র ও দেবী প্রসন্নময়ীর সুন্দর অথচ বলিষ্ঠ আদর্শের পরিবেশে তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে পরিবেশে কোনও কলঙ্কের, কোনও পদস্খলনের মলিনতা ছিল না। তিনি এক শুভ্র মহিমাময় পরিবারের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও সাহিত্যে তাহারই ছাপ পড়িয়াছে। কবি ব্রাউনিং স্বপ্নময় পরিবেশে মানুষ হইয়াছিলেন। স্কুলেও বেশীদিন পড়েন নাই—"He managed his own education with the assistance of a tutor in Italian, a music master, his father's fine library of some six thousand volumes and the Dulwich Art Gallery which lay a shott wood-land walk from his home and contained paintings by Audren del Sarto, Raphael and Titian…and others.[১৪] এই পরিবেশের প্রভাব ব্রাউনিংয়ের চরিত্রে এবং সাহিত্যে সুস্পষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালও আদর্শ পরিবারের মহত্ত্ব-মাধুর্যরসে অবগাহন করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রেও সে প্রভাব উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার এই আদর্শ-নিষ্ঠার আর একটা কারণও মনে রাখা উচিত। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগের জঘন্য পরিচয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও

(১২) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৮৮

(১৩) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৮৯

(১৪) Introduction to Browning's works—K. L. Knickerbocker

তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক বিখ্যাত পুস্তকে।[১৫] তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতি আগেই দিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার কৈশোরে ও যৌবনে বঙ্গসমাজে নানারূপ আন্দোলন হইয়াছিল সন্দেহ নাই। দুর্গামোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু, প্যারিচরণ সরকার প্রভৃতি প্রতিভাশালী বাঙালী মনস্বিগণ—যাঁহাদিগকে শাস্ত্রী মহাশয় নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় সমাজ কিছুটা সংস্কৃত হয়তো হইয়াছিল, কিন্তু সমাজের নোংরামি সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। এই নোংরামি এবং তৎকালীন সমাজ সংস্কারকদের আদর্শ দ্বিজেন্দ্র-চরিত্রকে যেন আরও পবিত্র, আরও নিষ্ঠাবান, আরও আদর্শমুখী করিয়াছে। নিউটন যাহাকে equal and opposite reaction বলিয়াছেন, ইহা যেন তাহাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব কি দ্বিজেন্দ্রলালের উপর পড়িয়াছিল? তাঁহার জীবনীতে ইহার কোনও প্রমাণ নাই। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পার্লামেণ্ট অব রিলিজনে স্বামিজী বক্তৃতা দেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স ত্রিশ বৎসর। তখন তিনি বাংলাদেশে চাকুরী করিতেছেন। পার্লামেণ্ট অব রিলিজন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের জীবনচরিতে লেখা আছে'—"The world's Parliament of Religion which was held in the city of Chicago in September 1893 was undoubtedly one of the greatest events in the history of the world, making an era in the history of religions, especially of Hinduism.":[১৬] এত বড় ঘটনা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বের উপর কোন ছাপ ফেলে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। ছাপ নিশ্চয়ই পড়িয়াছিল—এত বড় একটা ঘটনা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন একথা ভাবা যায় না। কিন্তু কেন জানি না তাঁহার জীবনীতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। বিবেকানন্দের জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেম ও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা-নাটকে ব্যক্ত স্বদেশ-প্রেম কিন্তু একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যকালে লাজুক ও উদাসীন প্রকৃতির বালক ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র তখন তাঁহার আর এক মূর্তি আমরা দেখিতে পাই। তখন তিনি লাজুক উদোমাদা নন। তখন তিনি বীর-বিক্রম সিংহ। সেবার গড়ের মাঠে Calcutta International Exhibition হইয়াছিল। সেই Exhibitionএ কয়েকজন পুরুষ-অভিভাবক-হীন মহিলাকে কয়েকটা দুরাচার ফিরিঙ্গী যুবক জঘন্য ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া জ্বালাতন করিতেছিল। সেখানে বাঙালী আরও অনেক ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুবান্ধবও ছিলেন কয়েকজন,—কিন্তু কেহই ওই অসহায়া মহিলাদের সম্মান বাঁচাইবার জন্য আগাইয়া গেলেন না। সবাই গা বাঁচাইয়া সরিয়া পড়িলেন। আগাইয়া গেলেন কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল।[১৭] একাই তিনি একদল গুণ্ডা ফিরিঙ্গীদের সম্মুখীন হইয়া কেবল মাত্র ঘুষির জোরে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রাণ সংশয় করিয়া ফেলিলেন। অত জনের অবিশ্রাম প্রচণ্ড প্রহার নীরবে সর্বাঙ্গে পাতিয়া লইয়া,

(১৫) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২২
(১৬) Life of Swami Vivekananda pp. 3 65
(১৭) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৮২-৮৩-৮৪

ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া হয়তো তিনি প্রাণ হারাইতেন যদি না সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন যুবক আসিয়া তাঁহাকে বাঁচাইতেন।[১৮] আর একবার ট্রামেও তিনি এক সাহেবকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সাহেবটা তাঁহাদের মাঝখানে কর্দমাক্ত বুট সুদ্ধ পা-টা তুলিয়া দিয়াছিল। সরাইয়া লইতে বলিলে—'নিগার' আখ্যায় অভিহিত করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সাহেবের চরণখানি এক পদাঘাতে বেঞ্চি হইতে নীচে নামাইয়া দিলেন।[১৯] দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বে আত্মসম্মান বোধের আরও নানা নিদর্শন আছে। তিনি যে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, পিতা-মাতা-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন যে প্রকারান্তরে আত্মসম্মানই ক্ষুণ্ণ করা, ইহা যে আত্মসম্মান-হানিকর এ প্রত্যয় এ বোধ তাঁহার বরাবর ছিল। তখন বিলাত যাওয়া একটা সৌভাগ্যজনক ব্যাপার ছিল, সকলের পক্ষে ইহা সহজ সাধ্যও ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এম. এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যিনি প্রথম হইয়াছিলেন তিনি যখন বিলাত যাইতে অসম্মত হইলেন তখন দ্বিজেন্দ্রলালকেই ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সে বৃত্তি লইয়া বিলাতে গিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার প্রস্তাব করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তখনও ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছেন এবং একটা স্কুলে মাস্টারী করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন, 'আমার নিজের কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আমার বাবা মা অনুমতি না দিলে আমি যাইতে পারিব না। সে অনুমতি সহজে পাওয়া যায় নাই। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র বুদ্ধিমান দূরদর্শী লোক ছিলেন, পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় তিনি অনুমতি দিলেন। কিন্তু প্রসন্নময়ী সহজে অনুমতি দেন নাই। অবশেষে তাঁহার অন্য পুত্রেরা যখন তাঁহাকে বুঝাইল যে বিলাত গেলে দ্বিজুর শরীরটা সারিয়া যাইবে তখন তিনি অনুমতি দিলেন। বিলাত যাত্রার আগের দিন রাত্রে মাতা-পুত্র গলা জড়াজড়ি করিয়া অনেক অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীকার সবিস্তারে এই করুণ দৃশ্যটির বর্ণনা করিয়াছেন।[২০] বিলাত হইতে ফিরিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল পিতামাতা কাহাকেও দেখিতে পান নাই। তাঁহার মর্মভেদী নিদারুণ শোকের বর্ণনা তাঁহার জীবনীকার দিয়াছেন।[২১] ইহাও দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ রূপ। হয়তো ইহা আত্মসম্মান বোধেরই আর একটা প্রকাশ। যে সত্তার সম্মান করিয়া আমরা মনুষ্যত্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হই সেই সত্তার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যাঁহাদের প্রভাবে সেই সত্তা পুষ্ট ও বিকশিত হইয়াছে তাঁহাদের বিরহে শোক এবং আনন্দে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া আমরা আমাদের আত্মসম্মান

(১৮) *এই চিত্রটি শেলীর স্কুলজীবনের একটি চিত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শেলীর স্কুলের পালের গোদা ছাত্ররা মিলিয়া দল পাকাইয়া* 'Shelley-bait' *এর আয়োজন করিত।*—'Some Scout would discover the strange lad reading poetry by the river side and at once gave the "view hallo." Shelley with his hair streaming on the wind would take flights accross the meadow, through the college cloisters, the Eton streets. Finally surrounded like a stag at bay, he would utter a prolonged and piercing shrick, while his tormentor would 'nail' him down with balls slimy with mud, ('Ariel' Pp12)

(১৯) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৮৪

(২০) দ্রষ্টব্য ঃ—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৯৩

(২১) দ্রষ্টব্য ঃ—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ১৭৮ ঃ পৃঃ ১৯৫

বোধকেই ভাবাবেগে অর্চনা করি। যাহার আত্মসম্মান বোধ নাই, সে পশু, কোনও মহৎ কর্ম্মে সে প্রেরণা পায় না, কোন কিছুই তাহাকে বিরাট ভাবে বিষণ্ণ বা উদ্দীপ্ত করে না। মিলটনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে করুন—"The pious and just honoring of ourselves may be thought the fountain-head from whence every laudable and worthy enterprise issues forth" বিরাট শোক, বিরাট আনন্দ, বিরাট আকাঙ্ক্ষা, বিরাট উচ্চাশা সবই laudable enterprise—সবই বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের প্রবল প্রকাশ। পত্নীর অকাল-মৃত্যুতেও দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার শোকাচ্ছন্ন এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাঁহার কাব্যসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। সামান্য একটু উদ্ধৃত করি—

"এই তো ছিল দেবী মূর্তি, আলাপ বিলাপ হাস্য রোদন
কঁছিল তো কাছে
কোথায় গেল ? ফিরিয়ে দাও হে বিশ্বপতি, দাবী করছি
বল কোথায় আছে ?
এই সে ছিল গেল কোথায় ? দেখা হবে আবার, কিম্বা
এ চির-বিচ্ছেদ ?
আমি পার্লাম না কো, তবে তুমি করে' দাও হে প্রভু
এ রহস্য-ভেদ।

* * * * * * * * *

—লুটে পুটে নিল
এমন সময় এসে কে গো আমার কুঁড়ে ঘরে
আগুন ধরিয়ে দিল
অমনি আমার কুঁড়ের সঙ্গে সোনার স্বপ্ন আমার
হয়ে গেল ছাই
গেছে, গেছে, সবই গেছে—উড়ে পুড়ে গেছে—
চিহ্নমাত্র নাই।[২২]

চারিদিক হইতে নানাভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি পুনরায় বিবাহ করেন নাই। সুরবালা দেবীর প্রতিই তিনি আমরণ তাঁহার প্রেমার্ঘ্য নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাতৃহারা ছেলেমেয়ে দুটিই তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহার প্রাণের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। অনেকেরই জীবনে পিতৃমাতৃশোক, পত্নীশোক আসে। অনেকেই সে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে এই শোক যে বিরাট বিশাল উদাত্ত গভীর মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। তাঁহার ব্যক্তিত্বে একটা গাঢ় বন্ধ উদার গম্ভীর অথচ পরিহাস,—কুশল স্বচ্ছতা দেখিতে পাই। প্রসঙ্গত আমার একটা ধারণার কথা উল্লেখ করি। দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে বক্তৃতাও করিতে

(২২) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃ: ২৮৬

পারিতেন।[২৩] ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁহার জ্ঞান প্রগাঢ় ছিল এবং উভয় সাহিত্যেরই তিনি 'ক্ল্যাসিক্যাল' সাহিত্যই পাঠ করিয়াছিলেন, যাহা মহাকালের বিচারে রসোত্তীর্ণ, চিরন্তন সারস্বত-সমাজে যাহা সমাদৃত, তাহাই তাঁহার প্রিয় ছিল। আমার মনে হয় ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের ভাষা ও ভাব তাঁহার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করিয়াছে।

ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের গম্ভীর সুসংস্কৃত ব্যঞ্জনাময় ভাষার ন্যায়ই তাঁহার ব্যক্তিত্বেরও মহিমা—জনসনের সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া দেয়—'Language is the dress of thought.' আর 'থট্‌স' এর বহিঃ প্রকাশই তো ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যেও এই গুরুগম্ভীর উদার উদাত্ত ক্ল্যাসিক্যাল ভাব দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-বলে নব-রূপ লাভ করিয়াছে। বন্ধুবর প্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন—"তাঁহার ভাষা না কি ধনুষ্টঙ্কারের ভাষা।"[২৪] কথাটা এক হিসাবে অতি সত্য। প্রতিভার ধনুকে ক্ল্যাসিক্যাল ভাবের জ্যা পরাইয়া তদানীন্তন সাহিত্যে সমাজে সত্যই একদা তিনি সব্যসাচীর ন্যায় টঙ্কার তুলিয়াছিলেন, যে টঙ্কারের রেশ আজও মিলাইয়া যায় নাই, বোধ হয় কোন দিনই যাইবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বের আরও নানা খবর পাই তাঁহার বিলাতের পত্রগুলিতে। বিলাতের পত্রগুলি যখন তিনি লেখেন তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই তাহার লিপি-কৌশল, তাঁহার বিদ্যাবত্তা, তাঁহার চিন্তার বহুমুখী প্রসার, তাঁহার ভাষা, তাঁহার রসিকতা আমাদের বিস্মিত করে। এই বিলাতের পত্রগুলিতে শুধু তাঁহার ব্যক্তিত্বের নানা নিদর্শনই বিধৃত হয় নাই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পূর্বাভাষও আছে—প্রত্যুষের ঊষারুণ-রঞ্জিত আকাশপটে যেমন উদীয়মান দিবসের আগমনী বার্তা লেখা থাকে, ওই বিলাতের পত্রগুলিতে তেমনি কবি, নাট্যকার, স্বদেশ-প্রেমিক, ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-দীপ্তি আভাসিত হইয়াছে।

তাঁহার ব্যক্তিত্বের কয়েকটি নমুনা বিলাতের পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।[২৫]

প্রথমে জাহাজ যখন ছাড়িল—তখন তাঁহার মনের ভাব তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন —"কাতর-হৃদয়ে, সজল-নয়নে প্রেম-প্লাবিত অন্তরে যেদিকে ভারত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সেইদিকে চাহিয়া আমার জীবনের যাত্রা, শৈশবের দোলা, ভালবাসার চির-পাত্রী ভারত জননীর নিকট বিদায় লইলাম।" জাহাজে কয়েকদিন পরেই সাহেবদের সহিত তাঁহার খিটিমিটি বাধিল। লঙ্কায় যখন জাহাজ নোঙ্গর করে তখন লঙ্কার কোনও ফেরিওলা মুক্তা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল—সে প্রথমে একটি মুক্তার দাম একশ টাকা চাহিল, পরে এক সাহেব অনেক দর-দস্তুর করিয়া তাহা দুই টাকাতে খরিদ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দিকে চাহিয়া বলিল,—'These are worse than Calcutta shop-keepers. They come down only from Rs 10/- to Rs 3/- and not from Rupees Hundred to Rs 2/-.'—ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল জবাব দিয়াছিলেন,—'But they are better than English shop-keepers, for they would ask for Rs 100/- and would stick to it though the real price were Rs 2/-.'—বলা বাহুল্য সাহেব খুশি হইলেন না।

(২৩) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃ ৭৫
(২৪) দিলীপকুমার রায়ের পত্র
(২৫) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১০২-১০৩

ধর্ম লইয়াও তর্ক হইয়াছিল কয়েকজন সাহেবের সঙ্গে। সাহেবরা ব্রাহ্মধর্মটা যে কিছুই না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—খৃষ্টধর্মই সত্য, কারণ পৃথিবীর সকল সভ্য ও পরাক্রান্ত জাতিই খৃষ্টান। যদি ব্রাহ্মধর্ম সত্য হইত তাহা হইলে সভ্যজাতি খৃষ্টান না হইয়া ব্রাহ্ম হইত অথবা ব্রাহ্মরা পরাক্রান্ত হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তর দিলেন—গ্রীক-রোমীয়-মুসলমান জাতিও এক সময় খুব পরাক্রান্ত ছিল, অতএব তাহাদের ধর্ম যে আদ্যন্ত সত্য ছিল তাহা প্রমাণ হয় না। পার্থিব বাহুবলের সহিত নৈসর্গিক ধর্মের কোন সংশ্রব নাই। একজন সাহেব বলিলেন—হিন্দু ধর্মটা মিথ্যা কারণ তাহারা পৌত্তলিক। দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিয়া উত্তর দিলেন—খৃষ্ট ধর্মটা খুব ভুল। সাহেব প্রশ্ন করিলেন কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল যে উত্তর দিয়াছিলেন তার মধ্যে সেদিন যেন ব্যঙ্গ-হাস্য-কৌতুকের অকুতোভয় শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলালকেই দেখা গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"পরমেশ্বর ছয়দিনে জগৎ তৈয়ারি করিলেন কেন? একদিনেই তো পারিতেন। আর করিলেন তো একদিন আবার বিশ্রাম করেন কেন? পৃথিবীটা তৈয়ার করিতে কি বড় বেশি পরিশ্রম হইয়াছিল?" বলা বাহুল্য ইহা সাহেবের শ্রুতিসুখকর হয় নাই। ইলবার্ট বিল লইয়াও তর্ক হইয়াছিল একদিন।

সাহেব বলিলেন—"ইলবার্ট বিলে হিন্দুরা বড় মূর্খতা ও ধৃষ্টতা করিয়াছে।"

"কেন—"

"আমরা ইংরেজ জাতি বাঙ্গালী হইতে বিভিন্ন। বাঙ্গালীদের কি অধিকার যে আমাদের দোষাদোষ বিচার করে?"

"ইংরেজের কি অধিকার যে বাঙ্গালীকে জয় করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করে? যাহাতে পরাক্রান্ত মনুষ্য দুর্বলকে অযথা পীড়ন করিতে না পারে ইহার জন্য যদি আইন-আদালত থাকে তবে পরাক্রান্ত জাতি দুর্বল জাতিকে যাহাতে পীড়ন করিতে না পারে ইহার জন্য কি আরও উচ্চতর আইন ও আদালত থাকা উচিত নয়?"

মনে রাখিবেন League of Nations বা U. N. এর কথা তখন স্বপ্নাতীত ছিল।

সাহেব বলিলেন—"তোমরা তিন-চারি বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমাদের দেশের রীতি-নীতি কিছুই জানিতে পার নাই। আমাদের উপর বিচার করিবে কিরূপে?"

"আর তোমরা আমাদের রীতি-নীতি বোধহয় বিলাত হইতেই দৈবশক্তিতে জানিতে পার এবং তাহার জন্যই আমাদের বিচার করিতে পার?"

"Two blacks make no white."

দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তর দিলেন,—"But two equal forces balance each other—"

মনে রাখিবেন সময়টা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। তখনও কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনও হয় নাই। আমাদের দেশের স্বদেশ-প্রেম ভ্রূণরূপে তখনও দেশের অন্তরে নিবদ্ধ। তাহার বহিঃপ্রকাশ বড় একটা হয় নাই। আর একজন সাহেব প্রশ্ন করিলেন—"তুমি তাহা হইলে Patriot?"

"না, আমি অত উচ্চ নামের যোগ্য নহি।"

সাহেব বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করি ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, আর

এক জাতি আসিয়া বাঙালীকে ছিন্নভিন্ন করে, তাহারা যেরূপ ইংরেজ বিশ্বেষী সেইরূপ ফল পায়।”

দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তর দিলেন—“আমিও দেখিতে ইচ্ছা করি যে, ইংরেজেরা একবার ভারত হইতে চলিয়া গেলে···সাহেবেরা কিরূপে অনাহারে মরে—”

কয়েকদিন পরে দুই একজন সাহেব তাঁহাকে বাঙ্গালা গান গাহিতে অনুরোধ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, “আমি গাহিতে জানি, কিন্তু গাইব না। আপনারা বাঙ্গালা বোঝেন না, কেবল হাসিবেন। আমার গান আপনাদের হাস্যের বিষয় করিতে চাহি না।” আত্মসম্মানের এই প্রকার নমুনা তাঁহার জীবন চরিতের পাতায় পাতায়। বিলাত প্রবাসকালে, তাঁহার চাকুরী-জীবনে, তাঁহার সমাজ-জীবনে কোথাও তিনি নিজের আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। আত্মসম্মানের মেরুদণ্ডের উপরই যেন দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্ব বিধৃত হইয়া আছে। সে ব্যক্তিত্বের নানা রূপ, নানা রং, নানা ছন্দ কিন্তু সবারই ভিত্তিমূলে আছে তাঁহার আত্মসম্মান বোধ। বিলাত প্রবাসকালে তিনি সে দেশের পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি, রীতি-নীতির সহিত স্বদেশের পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি ও রীতি-নীতির যে সব তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সমালোচক ব্যক্তিত্বেরও একটা পরিচয় পাই। তিনি স্বদেশের জিনিষ মাত্রকেই যে ভালো বলিয়াছেন তাহা নয়, বিদেশের অনেক জিনিসেরও তিনি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ যে নিদারুণ দারিদ্র্যে অশিক্ষায়, কুসংস্কারে, পরাধীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত এ কথা তিনি একবারও বিস্মৃত হন নাই।

বিলাতে আসিবার সময়ে তাঁহার জাহাজ সুয়েজ বন্দরে প্রবেশ করিয়া অবশেষে যখন সায়েদবন্দরে নোঙ্গর করিল তখন একজন সহযাত্রী তীরে নামিয়া কতকগুলি ‘ফটোগ্রাফ’ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল চিঠিতে সেগুলির নামকরণ করিয়াছেন—‘সুয়েজ-কলঙ্ক ফটোগ্রাফ’। লিখিয়াছেন “মানুষের চরিত্র-মলিনতার বিভীষিকাময় চিত্র, পাশব প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অধোগমনের আদর্শ। মানুষ ইহার নিম্নে আর পতিত হইতে পারে না। আমি যেন কোথায় পড়িয়াছি বোধ হয় যে, তিনটিতে মানুষের প্রকৃতি জানা যায়। প্রথম পুস্তক, দ্বিতীয় সঙ্গী, তৃতীয় ছবি। মানুষ কি বই পড়ে, কাহার সঙ্গে বেড়ায় ও কি ছবি ঘরে রাখে ইহা দেখিয়া সে কি প্রকার মানুষ তাহা জানা যায়। যদি ছবি দেখিয়া জাতি ঠিক করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে সুয়েজবাসী অধঃপতিত অপবিত্রতার সীমান্ত। আর সুয়েজ দেখে ও পোর্ট সায়েদ দেখে যদি আফ্রিকার অবস্থা বিচার করা যায় তাহা হইলে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে নিকৃষ্টতম, অসভ্যতম, অপবিত্রতম। এই আফ্রিকাতে যে একদিন উজ্জ্বল, উন্নত, সভ্য মিসর ছিল—যেখানে একদিন গিরিবৎ স্থির ও তুঙ্গ পিরামিড নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না; বোধ হয় না যে হানিবাল-প্রসবিনী কার্থেজ একদিন এই আফ্রিকার কূলে গর্বে রোমের অদম্য শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া বিরাজ করিত; বোধ হয় না যে জগতের গৌরব পণ্ডিতগণের বাসভূমি আলেকজান্দ্রিয়া এই আফ্রিকাতে ফেনময় সিন্ধুর ক্রোড়ে অবস্থিত—” এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া তিনি অবশেষে স্বদেশপ্রেমের মহাসমুদ্রে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। লিখিতেছেন—“সুখী ভারত! তুমি এতদিন পরাধীন থাকিয়াও এতদূর পতিত হও নাই। কারণ আফ্রিকা যথার্থই আজ অসভ্য অজ্ঞান তিমিরাবৃত। ভারত! তুমি অত্যাচারের পীড়নের অধীনতার

ক্রোড়ে পালিত হইয়াও এতদূর অধোগামী হও নাই। এখনও হিন্দুর আশার দিন আছে, উন্নতির উপায় আছে। হিন্দু! তুমি এখনও উন্নতমনা, এখনও অকলঙ্কিত-চরিত্র; কেবল এখন আর তুমি দেশের জন্য, ধর্মের জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পার না। তোমার সে অতুলনীয় বীরত্ব আর নাই।..."

স্বদেশের প্রসঙ্গে তিনি অতিশয়োক্তির সীমাও ছাড়াইয়া যাইতেন। জীবনে তিনি নানা স্থানে গিয়াছেন, নানা পরিস্থিতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, জীবন-সমুদ্রে তাঁহাকে বহুবার হাবুডুবু খাইতে হইয়াছে, অপ্রত্যাশিত নানা আঘাতে তিনি বারবার মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার স্বদেশ প্রেম, তাঁহার ন্যায়পরতা কোনও দিন অবনত হয় নাই। পারিপার্শ্বিক তাঁহাকে হয়তো প্রভাবিত করিয়াছে, কিন্তু গ্রাস করিতে পারে নাই। তাঁহার বংশগরিমা, তাঁহার পিতামাতার পুণ্যদীপ্তি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও আমরণ তাঁহাকে দ্যুতিমান করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার জীবনচরিত্র পাঠ করিলে George Eliot-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে—'Breed is stronger than the pasture'।

দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসূচক আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। (ক) বিলাত প্রবাসকালে তিনি মহাকবি সেক্সপীয়রের জন্মস্থান কেনিলওয়ার্থ-নগর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানগুলি দর্শন করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন। অনেকেই হয়। কিন্তু তিনি বিলাতে কুকুর-প্রদর্শনী এবং চোর-সম্মিলনী দেখিতেও ভুলেন নাই। কুকুর প্রদর্শনীতে একজন ডাচেস একটি কুকুর পাঠাইয়াছিলেন তাহার দাম এক লক্ষ টাকা। পাঁচ হাজার ছয় হাজার—সাধারণ ভালো কুকুরের দাম। বিলাতের পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন "আমাকে বিক্রয় করিলে কেহ একলক্ষ টাকা দেয় না? কবি টমাস হুড বলিয়াছেন

'Oh, God that bread should be so dear
And flesh and blood so cheap'
আমি বলিতে পারি—
Oh God that dog should be so dear
And human beings cheaps.[২৬]"

চোর-সম্মিলনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এ সম্মিলনীতে দেশের যত চোর তাহাদের একত্র করিয়া এক মহা-ভোজ দেওয়া হয়...যে যত চুরি করিয়াছে—সে তত অহঙ্কারী... যে কম জেল খাটিয়াছে তাহারই পরাজয়।

'অহো মনুষ্য, তোমার অধোগতি ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এখন দেখিতেছি, এমন বিষয় নাই যাহাতে পতিত অবস্থায় তুমি গৌরব করিতে পার না।..."[২৭]

(খ) দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে একজন বিদেশিনী মহিলার প্রণয়-জালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। "মহিলাটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, বিদুষী এবং গ্রন্থাদি রচনা করিয়া তখনই সমাজে যশস্বিনী হইয়াছিলেন।"[২৮] দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে বলিয়াছেন একদিন একটি

(২৬) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৫৪
(২৭) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৫৫
(২৮) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৭০

গোলাপ ফুল উপহার দেওয়া ছাড়া তিনি আর কখনও তাহাকে কোনরূপ প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু ওই গোলাপই শেষে প্রলাপ হইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সেই কুমারীটির পিতা দ্বিজেন্দ্রলালকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার কন্যাকে তিনি যদি বিবাহ করিতে সক্ষম না হন তবে সে ভগ্ন-হৃদয়ে নিশ্চয়ই মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল তো অবাক এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যদিও তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদে তখন শোকাচ্ছন্ন, যদিও তিনি তেমন প্রেমার্দ্রও হন নাই, তবু তাঁহার মনে হইয়াছিল—আর সে শ্মশান-সম শূন্য স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া কি হইবে? এমন সুযোগ মিলিল যদি হেলায় হারাইও না'। অভিলাষটি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট অকপটে ব্যক্ত করিলেন। নৃত্যগোপাল বাবুই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন—"বিলাতী 'মেম' বা ম্যাম বিবাহ করিয়া ভারতবাসী কিছুতেই কোনদিন দাম্পত্যসুখের অধিকারী হইতে পারে না। উভয় জাতির চিন্তা, আদর্শ, স্বভাব ও আচরণের আদ্যোপান্ত আকাশ-পাতাল পার্থক্য ও বৈষম্য"। নৃত্যগোপালের চেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রলাল এ আকাঙ্ক্ষা অবশেষে বর্জন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে এজন্য তিনি নৃত্যগোপাল বাবুর কাছে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। নিজেই বলিয়াছেন—"নৃত্যগোপালের কাছে আমি যে কী অপরিসীম ঋণী তা' আমি একমুখে বলে' শেষ করতে পারি না। সে যে আমার কতবড় উপকার করেছিল তা আমার যত বয়স বাড়ছে ততই আমি সব রকমে বুঝতে পারছি। তার সে উপকার আমি মরে' গেলেও হয়ত ভুলতে পারব না।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক বন্ধুবর্গ একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাহার স্বজন-বান্ধব, এমন কি তরুণ বয়স্ক পুত্রকন্যার নিকটে পর্যন্ত দর্পভরে বলিতেন'—"বিলাতে আমার জীবন যে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কভাবে কেটেছে একথা আমি যেমন জোর করে, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, খুব অল্প লোকই তেমন পারে—"

(গ) বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় বলিয়াছেন—"তিনি দেশে আসিয়া ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নিজেকে অবনত না করিয়া ছোটলাটের সহিত যেরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্তা কহিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ভাল চাকুরি পাইলেন না। তাঁহার ন্যায় কৃষি-কর্ম শিক্ষা করিয়া একজন বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী Statutory civilian লইলেন, দ্বিজেন্দ্র ডেপুটি হইলেন"।[২৯] তাঁহার স্বাধীন চিত্ততা, ন্যায়পরতা এবং স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি চাকুরী জীবনেও অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়াছেন। তবু সাহেব-মনিবদের পায়ের তলায় নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারেন নাই। সুজা-মুটার সেটেলমেণ্ট অফিসার রূপে তিনি লাটসাহেবের সহিত সংঘর্ষেও পরাঙ্মুখ হন নাই, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কেস করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। এ তেজস্বিতা সে যুগের কর্তাভজা মনোবৃত্তির অন্ধকারে আজও অগ্নি-অক্ষরে লিখিত আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও কিছু করিতেন না। বিলাত-ফেরত বলিয়া তাঁহাকে সামাজিক পীড়নের সম্মুখীনও হইতে হইয়াছিল। অনেক আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে অনেকে তাঁহাকে 'একঘরে'

---

(২৯) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২০১

করিবার ভয় দেখাইলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ভয়ে ভীত হইবার পাত্র নন। বিলাতে থাকিবার সময় তিনি 'পতাকা' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—"অনেকেই সমাজ-চ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানিনা এ আশঙ্কার কারণ কি। সমাজ? কেন, প্রতি মনুষ্য লইয়াই তো সমাজ। সমাজ আমাকে চ্যুত করিবে? তাহাতে কি আমারই ক্ষতি কেবল? তাহার নহে? সমাজ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া হীনবল হইল না?…ক্রমশঃ নতুন সমাজ গঠিত হইবে নূতন ও সভ্যতর আচার অনুষ্ঠিত হইবে"।[৩০] অবশেষে সমাজ তাঁহাকে সত্যই 'একঘরে' করিল। ইহার ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল যে ব্যঙ্গশানিত অট্টহাস্য করিলেন তাহা তাঁহার বহু হাসির গানে এবং 'একঘরে' নামক পুস্তিকার পাতায় পাতায় আজও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 'একঘরে' হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"কিন্তু আমরা যে একঘরে, এ একঘরেতে সাহসও নাই, কারণ ইহাতে শাস্তি নাই, বা কণামাত্র স্বার্থত্যাগ নাই। এ একঘরের একমাত্র স্বার্থত্যাগ কন্যার বিবাহে পাত্রের অসম্ভাব। আমি তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে সব সমাজেই কন্যার বিবাহ হইতেছে। অর্থব্যয় করিলে জামাতার অভাব হয় না। আর তাহা হইলেও কন্যার বিবাহের জন্য যদি এত মিছাকথা, ভীরুতা, ও লুকোচুরি তো ইহার চেয়ে কন্যা চিরকাল অনূঢ়া থাকাও ভালো। এ একঘরের আর একটি আরামময় ভীতি যে ছেলের বিবাহে বা পৈতায় কেহ আমাদিগের সহিত খাইবে না। সুখী আমরা! আমরা পূর্ণান্তঃকরণে বলি 'তথাস্তু।' বলা বাহুল্য যে আমরা হিন্দুর ফলারের বা ভোজের পক্ষপাতী নহি। আমরা কোন হট্টগোলময়, ছিন্নকদলীপত্রময়, 'মহাশয় এ-পাতে নয়', গড়ায়িত ধধিময়, হারাইত চটিজুতাময়, হিন্দু ফলারে বা ভোজে খাইতে উচ্চাভিলাষী নহি"।[৩১]

এই 'একঘরে'র বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রূপ তাঁহার হাসির গানেরও নানা স্থানে আছে। তাঁহার বিখ্যাত 'বলি তো হাসবে না' কবিতাটাই মনে করুন।

"যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে
প্রায়শ্চিত্ত করে
যবে কোন মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত
ধর্ম ভাঙে গড়ে
যবে কোন প্রবীন ষণ্ড মহাভণ্ড
পরেন হরির মালা
তখন ভাই হাসি ঢেকে নাহি ক্ষেপে
রইতে পারে কোন—
হা-হা-হা-হা - হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ।"

তাঁহার প্রতাপসিংহ নাটকে মানসিংহের মুখ দিয়া তিনি হিন্দুধর্মের 'শূন্যগর্ভ জীর্ণ' আচারের বিরুদ্ধে' যাহা বলাইয়াছেন তাহাও এই 'একঘরে' হওয়ার প্রতিক্রিয়া। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রেও একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। তিনি মনে প্রাণে স্বদেশী হইলেও কিছুদিন বাহিরে 'পাক্কা' সাহেব হইয়া উঠিয়াছিলেন। যিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমরা সাহেব সঙ্গে পটি, মিস্টার নামে রটি, যদি সাহেব না বলে 'বাবু' কেহ বললে মনে মনে ভারি চটি।" তিনি নিজেই একদিন মিস্টার নামে সমাজে

---

(৩০) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২০৭

(৩১) দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী (সংসদ সংস্করণ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০৫-৬০৬

নিজেকে পরিচিত করাইয়াছিলেন, বাবু বলিলে সত্যই মনে মনে চটিতেন, বাড়িতেও সাহেবী পোষাক পরিয়া থাকিতেন, টেবিলে খানা খাইতেন, গোসল খানায় স্নান করিতেন, পৈতাটা পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। যে সমাজ তাঁহাকে একঘরে করিয়াছিল প্রকাশ্যে সে সমাজের বিরুদ্ধ-আচরণ করিয়া তিনি যেন তাহাকে ঠাস ঠাস করিয়া চড়াইয়া গিয়াছেন। শ্বশুরবাড়িতেও অদ্ভূত সাহেবী পোশাকে গিয়া হাজির হইতেও তাঁহার বাধে নাই। প্রসাদ দাস গোস্বামীর একটি পত্রে দেখিতেছি :

"বিবাহের দু'একদিন পরে দ্বিজু সস্ত্রীক আমার সহোদরার সহিত (সুরবালার মাতামহীর) শ্রীরামপুরে আমার মাতা ঠাকুরাণী ও স্ত্রীকে প্রণাম করিতে যায়। সেদিন দ্বিজুর এক অপূর্ব হাস্যোদ্দীপক মূর্তি। আগাগোড়া লাল মখমলের পোশাক, ছোট প্যান্ট, হাফ্‌কোট, একটা গোরাই ধরণের ক্যাপ বা টুপি মাথায়"।[৩২]

সিভিল লিস্টে তাঁহার নামটা পর্যন্ত পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হইত। তখন তাঁহার নাম ছিল মিস্টার দ্বিজেনলালা রে (Mr. Dwijen Lala Ray)। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ভাগলপুরে তাঁহার যখন আলাপ হয় তখন তিনি তাঁহাকে যে গান গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহা কোন স্বদেশী গান নহে। সে গানটির প্রথম দু'টি কলি এই—'She is a fisherman's daughter: And I,ll marry her—'।[৩৩]

'একঘরে' করার পর হইতে তিনি সমস্ত স্বদেশী আচরণের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চলনে বলনে, হাব-ভাবে, আচার-আচরণে সাহিত্যে ইহা জীবন্ত প্রতিবাদের মতো মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সাহেবীয়ানা এবং বাঙালীয়ানার একটা সমন্বয় প্রচেষ্টাও অনেক সময় হাস্যকর ভাবে তাঁহার বেশ ভূষায় ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। "শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী এ বিষয়ে একটি কৌতুকজনক বিবরণ দিয়াছেন। তখন গভর্ণমেণ্ট জরিপ-জমাবন্দীর কার্য শিখিবার জন্য তাঁহাকে রায়পুর জেলায় প্রেরণ করেন। প্রায় তিনমাস তিনি রায়পুরে ছিলেন।" শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী লিখিতেছেন—"সেখানে এক দরবার হয়। দ্বিজু সে দরবারে ধুতি, চাদর, লাল কোট ও বিলাতী হ্যাট্ পরিয়া হাজির হন। সকলে তাঁহার এই অদ্ভুত বেশ দেখিয়া তো অবাক। কমিশনার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন-লোকটা কি পাগল? নইলে এরূপ পোষাকের অর্থ কি!... বিলাতী ও দেশী পোশাক মিশাইয়া পরিয়া তিনি তদ্দ্বারা এই দুই বিভিন্ন জাতির মিলনের পরিচয় দিতে চাহিয়াছিলেন..."[৩৪]

অর্থাৎ তিনি খেয়ালী মানুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ অসংখ্য ঘটনায় তাঁহার এই খেয়ালী চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। তিনি যাহা করিতেন তাহা সজোরে সদম্ভে কাহারও তোয়াক্কা না রাখিয়া, কে কি বলিতেছে সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া করিতেন। তিনি তাঁহার জীবনীকার দেবব্রত রায়চৌধুরীকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন —"এটা আমি নিজে বেশ বুঝতে পারি আমার এ ব্যর্থ জীবনের যদি কিছুমাত্র বিশেষত্ব থাকে তা এক সোজা-কথায় 'কারো তোয়াক্কা-রাখি-না-বাবা-তা"।[৩৫]

(৩২) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২২৭
(৩৩) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২২৬
(৩৪) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২০২
(৩৫) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২০৩

তাঁহার জীবনের অনেক আপাত-অশোভন আচরণের মূলেও এই মনোভাব কাজ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু যে-ই তাঁহার মনে হইল যে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা অস্পষ্টতা-দোষে দুষ্ট, অনেক কবিতা লালসা-রসে-ক্লিন্ন, লোকেন পালিতের মতো মার্জিত-রুচি সাহিত্য-রসিকের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক করিয়াও তিনি যখন তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারিলেন না, তখন যাহা তাঁহার মনে হইয়াছিল তাহা তিনি একটি পত্রে দেবব্রতবাবুকে লিখিয়াছিলেন—"স্বয়ং পালিতের মতো বিজ্ঞ ও বিদ্বান লোকেরই যখন এই দশা তখন আর অন্যের কথা কি ? নব্য সাহিত্যিক ও কবির দল রবিবাবুর গুণের তো আর নাগাল পাবেন না কেবল এই সব নিকৃষ্ট স্টাইল ও আইডিয়ার অনুকরণ করে' ক্রমে আমাদের আরাধ্যা মাতৃভাষার মন্দিরে আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা জমিয়ে তুলবেন··· ··Honest Controversy-কে আমি বাঞ্ছনীয়ই মনে করি। কিন্তু কেউ যদি আমাকে এজন্য বিদ্বিষ্ট ভাবে সে কিন্তু বড়ই অন্যায় ও আক্ষেপের কথা হবে। কিন্তু greatest good to the greatest number হিসাবে আমার এ কাজটা কি মূলে অন্যায় ? আমার তো তা একটুও মনে হচ্ছে না······ লোকমতকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। জীবনে এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত যা কখনও করলাম না আজ কিনা সেই লোকের নিন্দার ভয়ে হক্ কথা বলতে পিছু হটব ? তেমন কাপুরুষ শর্মা নন। হুঃ—ভারি তো আমার ভয়—ফুঃ—"

এই পত্রের ভাব ও ভাষাতেই দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এই দিকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এই দিকটার আর একটা বড় পরিচয় পাই যখন দেখি সে যুগে তিনি বেঙ্গল পার্টিশনের সমর্থন করিয়াছিলেন। দেশ সুদ্ধ লোক যখন লর্ড-কার্জন-কৃত বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিতেছে, সেই আন্দোলনের ফলে যখন পার্টিশন রদ হইবার উপক্রম হইল, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন—"partition-এর সময় আমি বলেছিলাম যে এর একটা খুব bright side (উজ্জ্বল দিক) আছে। তোমরা তো তখন আমার উপর খড়্গহস্তই ছিলে। সে ভালোর দিকটা এই যে একদিকে বাঙালীরা আসামীদের শিক্ষিত করুক, আর একদিকে বিহারীদের শিক্ষিত করুক। নইলে একা বাঙালীদের আর বল কতটুকু।"

কিছুদিন আগে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে পার্টিশনে তা ভাঙ্গিতে পারিবে না।

বাঙালীর আপনাদের মধ্যে একতা-স্থাপন করার পূর্বে তাহাদের মনের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব দূর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিত হইবে না"।[৩৬]

বিলাতী জিনিস বয়কটেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন "আমি বলি এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেই সম্ভব নয়"।[৩৭] ওই পত্রেরই আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন "স্বাভাবিক মনের আবেগে যদি আমরা মাকে 'মা' বলিয়া পূজা না করি, যদি পরের দ্বারা অনাদৃত আহত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মর্যাদা দিতে না চাই, যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই

(৩৬) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩৯৬

(৩৭) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩৯২

মার দৈন্য ক্লেশ দূর করিতে না পারি, তবেই তো ভয়—বুঝিবা আমাদের এ পূজা আন্তরিক নহে ; তবেই তো ভয় হয়তো বা আমাদের এ অবস্থা ও ইচ্ছা স্থায়ী নয়, স্বাভাবিক নয়—এসব পদ্মদলের বারিবিন্দুসম চপল ও ক্ষণস্থায়ী।"[৩৮]

ওই একই ব্যক্তি কিন্তু একদিন 'বন্দেমাতরম্' গানের প্রবল আবর্তে ভাসিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন" দেখলাম সংখ্যাতীত যুবকবৃন্দ—পরিধানে পীতবাস, হস্তে বিবিধ মন্ত্রাঙ্কিত গৈরিক পতাকা—দলবদ্ধ হইয়া সেই বিরাট প্রসেশানের পুরোভাগে মাতৃনাম গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন, আর সঙ্গে অগণ্য লোক মন্ত্রমুগ্ধ-চিত্তে সে মহাগীত-স্রোতে ভাসয়া যাইতেছে।

"দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ-সমক্ষে আসিয়া (তাঁহাকে দেখিয়াই হোক অথবা অন্য যে হেতুতেই হোক) সহসা সেই অসংখ্য জনসঙ্ঘ সংক্ষুব্ধ ও গতিহীন হইয়া পড়িল। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল সে ভাব-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া একেবারেই প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়া আসিয়া স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মেঘ-মন্দ্রবৎ মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে অকস্মাৎ অম্বর-তুলে ভাব রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন"।[৩৯]

অথচ এই লোকই আন্তরিকতাহীন 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের চীৎকার সহ্য করিতে পারিতেন না, হুজুগে-মাতা শোভাযাত্রার উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন।[৪০]

আপাত-বিপরীত এইরূপ অনেক আচরণ তাঁহার ব্যক্তিত্বে দেখা গিয়াছে, ইহার কারণ তিনি সরল, সত্যনিষ্ঠ, স্পষ্টবক্তা, তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। রাখিয়া ঢাকিয়া গা বাঁচাইয়া লোকের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া তিনি চলিতে শেখেন নাই। যখনই যাহা ন্যায়সঙ্গত মনে হইয়াছে তাহা বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-প্রতিভার তিনি একজন বড় গুণগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু যেখানে রবীন্দ্ররচনায় কোন দোষ দেখিয়াছেন তখনই তাহা স্পষ্টভাবে বলিতে ইতস্তত করেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বরিশালে বঙ্গ সাহিত্যের একটি সভা ডাকা হয়। সে সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি একটি পত্রে বলিতেছেন "আমি যদিও রবিবাবুর ঐসব লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠেই মানি যে বর্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।··· কিন্তু তবু শুধু এই সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি সম্বন্ধে যদি আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাক তাহা হইলে আমি বলি—শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু অথবা নবীনচন্দ্র সেনকে আগে সভাপতি করা উচিত ছিল। তিনি যতবড় সাহিত্যিকই হোন না, ইঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার বয়স অল্প। সুতরাং ইঁহাদের দাবিকে অগ্রগণ্য না করায় আমার মতে অবিবেচনা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহই তো আর চিরজীবী নন। Seniority একেবারে অগ্রাহ্য করিতে নাই···তাছাড়া ইঁহাদের মধ্যে যোগ্যতায়ও কেহ তুচ্ছ নন—"।[৪১]

দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্ট বক্তা, একরোখা, তোয়াক্কাহীন লোক ছিলেন বলিয়া যে সকলেরই

(৩৮) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩৯২
(৩৯) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩৯৮
(৪০) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৪৪৬
(৪১) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৪৪৯

অপ্রিয় ছিলেন তাহা নয়। বহু লোক তাঁহাকে ভালবাসিত। আড্ডাধারী লোক ছিলেন তিনি। 'পূর্ণিমা-মিলন'-এর ইতিহাস তাঁহার ব্যক্তিত্বে আজও দীপ্ত হইয়া আছে। অনেক গুণ না থাকিলে আড্ডাধারী হওয়া যায় না। বন্ধুবর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহার 'আরো আড্ডা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"বর এবং কনে, দুটো মানুষ না থাকলে যেমন বিয়ে হয় না তেমনি আড্ডা বললেই দুটো বিশেষ মানুষের দরকার। আর সবাই বরযাত্রী। আড্ডার এই দুটি বিশেষ মানুষের মধ্যে একজন হলেন স্বয়ং আড্ডা-ধারী। আড্ডার সৌরজগতে তিনি সূর্য। তাঁকে কেন্দ্র করেই আড্ডার চক্র ঘোরে।...আড্ডার দ্বিতীয় বিশেষ লোকটি হলেন নাপিতের ক্ষুর শাণ দেবার জন্যে যে পাথর থাকে সেই শাণ-পাথর। এক এক আড্ডায় তাঁর এক এক রকম উপাধি।...কোথাও তিনি মামা, কোথাও খুড়ো। হাসির ক্ষুর ভোঁতা হলেই তাঁর উপর শাণ দিয়ে নেওয়া হয়। আড্ডাধারীর মতো তিনিও আড্ডার অপরিহার্য অঙ্গ। এ ছাড়া প্রত্যেক আড্ডায় একজন কি দু'জন এমন লোক থাকেন কথামৃতের ভাষায় যাঁদের বলা যায়, রসদ-জোগানদার—আড্ডার মধ্যমণি। যে আঠায় আড্ডা জোড়া বেঁধে থেকে তাঁর মুখের কথায় থাকে সেই আঠা......" দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী হইতে তাঁহার আড্ডার যতটুকু খবর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা হইতে মনে হয় তিনি নানা আড্ডায় একাই উক্ত তিন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—"প্রকৃত আড্ডাধারীর একমাত্র বিশেষণ সে রসিক, সে ভদ্র, সে শিখেছে কি করে নিজেকে আড়াল রেখেও নিজের ব্যক্তিত্বকে সুন্দর ও অক্ষুন্ন রাখা যায়।"[৪২]

দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ বন্ধুবর্গের কাছে অবারিত-দ্বার ছিল। সে কালের বিদগ্ধ সমাজের তিনি একজন লোভনীয় এবং মাননীয় আড্ডাধারী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে হীরক-দ্যুতির নানা বর্ণ বিচ্ছুরিত হইত।

পরিশেষে দ্বিজেন্দ্রলাল-ব্যক্তিত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বিলাত-ফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে ফিরিয়া কিছু দিন পাক্কা সাহেব হইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে একঘরে করিয়াছিল, হিন্দুধর্মের নানা কুৎসিৎ গোঁড়ামি ও আচরণকে তিনিও ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া মনে হয় মনে-প্রাণে তিনি বরাবর হিন্দুই ছিলেন। বিবাহ করিবার সময় তিনি অগ্রজদের সম্মতি লইয়া সাবেক হিন্দু নিয়ম অনুসারে হিন্দুমতে বিবাহ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপকুমারের যজ্ঞোপবী-তের সময় দেবকুমার-বাবুকে সোচ্ছ্বাসে তিনি বলিয়াছিলেন "ভেবেছিলাম এ জীবনে বুঝি কেবল ঐ একঘরে হয়েই কাটাতে হবে। কিন্তু আজ ভাই আমি একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করছি ...... যখন বৈদিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছিল আমার মনে এমনই একটা অস্থিরতা ও অনুতাপ এল যে তা' কি আর বলব। এসব অনুষ্ঠানের আচার ও মন্ত্রাদিতে কি যে একটা বৈদ্যুতিক পবিত্র প্রভাব আছে তা এর আগে আমি কখনও কল্পনাও কর্তে পারি নি। কি চমৎকার উপদেশ! কি অপূর্ব সব সুন্দর ব্যবস্থা। আমরা কি ছিলাম আর আজ এ কি হয়েই যাচ্ছি—কেবল যেন এই চিন্তাটা আজ আমাকে কশাঘাত করে' ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়ে তুলছে। আচ্ছা, আবার কি আমরা, তেমন হব না?"

(৪২) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৪-২১

তাঁহার বহু নাটকের বহু স্থানে বহু সঙ্গীতে তাহার এই হিন্দুমনোভাবের উজ্জ্বল পরিচয় জাজ্বল্যমান হইয়া আছে।[৪৩]

দেবকুমারবাবুকে লিখিত একটি পত্রে দেশ সম্বন্ধে যে কথা তিনি বলিয়াছেন তাহাও তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচায়ক—

"আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব। এ আঁধার চিরদিন কখনও আমাদের ছেয়ে থাকবে না, থাকতে পারে না। এ স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, অথবা প্রলাপ বা শূন্য অহঙ্কার নয়। "আসিবে সে দিন আসিবে"। আমি 'দেশ' চিনি না, বিদ্বেষ মানি না। আমি চাই শুধু ওই বীর্যবল—ব্রহ্মচর্য, চাই শুধু ওই সত্য-নিষ্ঠা, চাই শুধু আসল খাঁটি ধ্রুব ও নিটোল ধর্ম-বল, আর ঐ এককথায় মনুষ্যত্ব।"

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বে ভারতের বিরাট আদর্শই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা নানা বর্ণে নানা রূপে ওই আদর্শকেই রঞ্জিত করিয়া মহিমান্বিত করিয়াছে। প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও শিল্পী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই আদর্শ-স্বপ্ন বঙ্গবাণীর বিরাট চিত্রশালায় নানা-রূপকথালোক সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। সে রূপকথা লোকের রূপ-বৈভব তাই আজও অম্লান।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

কবি কাহাকে বলে এবং কবিত্বের প্রধান প্রধান লক্ষণ কি কি ইহা লইয়া চুল-চেরা তর্ক সর্বদেশের সাহিত্যে এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পর বিরোধী কোলাহল এমন তুমুল হইয়া পড়িয়াছে যে কেবলমাত্র তাঁহাদের আলোচনা পাঠ করিয়া কবি বা কবিত্ব সম্বন্ধে কোনও ধারণা করা যায় না। মনে হয় তাঁহারা এক-একটা বিশেষ মতবাদের চশমা পরিয়া সেই মতবাদটাই যে সত্য ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গলদঘর্ম হইয়া পড়িয়াছেন। কষ্টিপাথর কিন্তু কোন আলোচনা-আড়ম্বর না করিয়া নির্ভুলভাবে নির্দেশ করিতে পারে সোণা কি। রসিকের চিত্তও তেমনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারে কবি কে। তাঁহার রসবোধের কম্পাস নির্ভুলভাবে নির্দেশ করে কোথায় কবিত্বের ধ্রুবতারা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কোন তর্ক, বিদ্যা-আস্ফালন অথবা আড়ম্বরের সাহায্যে তাহাকে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত আলঙ্কারিক সাহিত্যের রস-সম্বন্ধে একটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিলাতী গ্রন্থকাররা বড় বড় গ্রন্থ রচনা করিয়াও অমন স্পষ্টভাবে বলিতে পারেন নাই।

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ।

যাহা মনে সত্ত্বগুণের উদ্রেক করে, যাহা অখণ্ড অর্থাৎ দেশ-কালের গণ্ডী যাহাকে খণ্ডিত করিতে পারে না সর্বদেশে সর্বকালে যাহা রসিক চিত্তকে পুলকিত করে, যাহা আনন্দ-চিন্ময় অর্থাৎ যাহা আনন্দস্বরূপ যাহা জড়বস্তু নহে, যাহা বেদ্যান্তর স্পর্শ শূন্য

(৪৩) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫৪৬

অর্থাৎ যে রস আস্বাদন করিবার সময় চিত্তকে অন্য কোন বেদ্য রস স্পর্শ করে না ; যে রস আস্বাদন করিবার সময় রসিক তন্ময় আত্মহারা হইয়া পড়েন ; যাহা ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর —অর্থাৎ যোগী, জ্ঞানী এবং ভক্তগণ যাহা অন্বেষণ করেন এবং আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হন—সাহিত্যের রস তাহারই সহোদর।

Vincent Buckley তাঁহার Poetry and Morality নামক পুস্তকে Matthew Arnold সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন—"......his basic position is quite simple : it is the notion that poetry is in some real sense, a religious act···He wants from poetry teaching and consolation and moral vitality : the teaching and consolation and moral energy which many others in his time, as in ours expected from religion"[১]

ম্যাথু আর্নল্ড আরও বলিয়াছেন—"More and more mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life for us, to console us, to sustain us" অর্থাৎ আমাদের জীবনে ধর্মের যাহা ভূমিকা, কবিতারও তাহাই ভূমিকা। ধর্মের আচার-বিচার মাঝে মাঝে বদলায় কিন্তু কাব্যের আদর্শ অপরিবর্তনীয়। তাহা চিরন্তনের বাণী বহন করে, তাহার দ্যুতি শাশ্বতের আলোকে সমুজ্জ্বল। পৃথিবীর বড় বড় কবিরা যদিও স্বকীয় প্রতিভাবলে নিজের জগৎ, নিজের স্বর্গ সৃষ্টি করেন, সে জগতের সে স্বর্গের অনন্যতাই যদিও তাঁহাকে স্রষ্টার গৌরবে গৌরবান্বিত করে, তবু সব কবিরই শেষ-কথা জীবন-দর্শন জীবন-স্পর্শন, জীবনকে প্রতিভার অনুভূতিতে অলঙ্করণ এবং সর্বশেষে এমন একটা অপূর্ব উপলব্ধি যাহা অনবদ্য। কবিতার উদ্দেশ্য শুধু বাসনা-কণ্ডূয়ন নিবৃত্ত করা নহে—তাহার কাজ নব-উপলব্ধির বার্তা বহন করা। সে উপলব্ধি প্রত্যেক কবির পৃথক, সে পার্থক্য উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে প্রত্যেক কবির বাচন-ভঙ্গীতে, লিপিকৌশলে এবং শব্দ-শিল্পে। T. S. Eliot তাঁহার On poetry and poets নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন—"I suppose it will be agreed, that every good poet, whether he be a great poet or not has something to give us besides pleasure : for if it were only pleasure the pleasure could not be of the highest kind. Beyond any specific intention which poetry may have, there is always the communication of some new experience or some fresh understanding of the familiar or the expression of something we have experienced but have no words for, which enlarges our consciousness or refines our sensibility"[২]

উদাহরণস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের 'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'তাজমহল' কবিতা দুইটির উল্লেখ করিতে চাই। সমুদ্র এবং তাজমহল লইয়া অনেক বড় কবি অনেক উৎকৃষ্ট গম্ভীর কবিতা লিখিয়াছেন। সমুদ্র এবং তাজমহল লইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনবদ্য। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা দুইটি বিভিন্ন প্রকারের। বন্ধুর সঙ্গে বৈঠকখানায়

(১) Poetry and Morality by V. Buckley pp. 25 26

(২) On Poetry and Poets—T.S. Eliot pp. 18

বসিয়া লোকে যেমন আড্ডা দেয়, সমুদ্রের সঙ্গে তিনি তেমনি যেন আড্ডা দিয়াছেন এবং সেই আড্ডা দিতে দিতে এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা পাঠকের মনে 'some fresh understanding of the familiar or the expression of something we have experienced but have no words for'—এলিয়টের উক্ত বাক্যগুলির প্রতিধ্বনি জাগায়। তাজমহল কবিতাটিও নূতন ধরণের। কবির দৃষ্টিভঙ্গি কল্পনা-কিরণে তাজমহলকে যেন নূতন মাধুরী দান করিয়াছে। দুইটি কবিতাই বড় কবিতা। এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা যাইবে না। তবু 'তাজমহল' কবিতার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না।

…মৃত্যু কে বলে বিচ্ছেদ ?
মৃত্যু এক প্রকাণ্ড বিবাহ, যাহে লুপ্ত বস্তুভেদ।
সে বিবাহে প্রদীপ জ্বলে না—সে বিবাহে
সুগন্ধ ফুলের মালা দোলে না তোরণে ;
নেপথ্যে ওঠে না শঙ্খ হুলুধ্বনি তাহে ;
নাহি জন-কোলাহল ; সেই শুভক্ষণে
বাজে না মঙ্গল বাদ্য সুমধুর রবে,
সিংহদ্বারে। সে বিবাহ সম্পাদিত হয়
গাঢ় অন্ধকারে, ঘন স্তব্ধ নিরুৎসবে
যার সাক্ষী পরকাল মহাশূন্যময়।
যার পুরোহিত কাল—আশীর্বাদে তার
ব্যাপ্তি সহ মেশে সৃষ্টি, জ্যোতিঃ সহ মেশে অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথও মহাকাল বিলোচনকে বিবাহের বর-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। সে কবিতাও অপরূপ কবিতা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার সুর অন্য, ভাষা অন্য, ছন্দ অন্য—এককথায় তাহা আর কাহারও মতো নয়—তাহা অনন্য। 'মন্দ্র' সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"মন্দ্র কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলা-কৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে"। মনকে তরঙ্গিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট গুণ। তাঁহার সরল বেপরোয়া অনন্য দৃষ্টি, তাঁহার ভাষার এবং মিলের নূতনত্ব আমাদিগকে সত্যই চকিত করিয়া দেয়। তাঁহার বেপরোয়া ভাব দেখিয়া সত্যই আমরা অবাক হইয়া যাই। উত্তুঙ্গ হিমালয়ের বিষয়ে কবিতা লিখিতে গিয়া তাহার সহিত ইয়ার্কি করিয়া তিনি তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া শুরু করিয়াছেন। পৃথিবীতে সবাই কর্মে ব্যস্ত, তুমিই কেবল ঘুমাইতেছ—?

"এ কি ঘুম বাপ, শুনিয়াছিলাম কুম্ভকর্ণ নামে ভীষণ
রক্ষ ছিল এক ; ছ'মাস করিয়া ঘুমাত সে রক্ষঃ ফি সন।
তবু সে জাগিত একদিনও। তুমি, ইতিহাস যতদিনের
পাওয়া যায়, এই একই ভাবে আছে। শোন মিনতি এ দীনের

একবার জাগো! শুধু একবার—হে কুঁড়ের বাদশাহ
দেখি না অন্তত একবার ভুলে নয়ন তুলিয়া চাহ।"

ইহার উত্তরও তিনি হিমালয়ের মুখে দিয়াছেন ঃ—

"এ সব কুঁড়েমি? এ বিশ্বের আমি লাগি না কি কোন কাজেই?
ফল শস্য কিছু পারি না ক দিতে, পুরাতে জীবের উদর;
পড়ে আছি এক আলস্যের স্তূপ কঠিন অনড় ভূধর?
তাহার উপরে অগ্ন্যুৎপাতে কভু বিশ্বের অনিষ্ট ঘটাই?
কিন্তু ব্যোম হতে গঙ্গা নামে যবে কে ধরিয়াছিল জটায়?
ব্যোমই সে বিষ্ণু আমিই ধূর্জটি, সে জটা আমারই শিখর
লতা গুল্মময়। সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি নদ-নদী নিকর
আমিই বহাই না ক্ষেত্রে গ্রামে বনে? আমি অনুর্বর না হয়
কিন্তু সুশ্যামল ক্ষেত্র দেখ যত কে করে উর্বর তাহায়?

* * *

ধ্যানে নব সত্য আবিষ্কার করি, ধরণীরে নিত্য শেখাই
নিজে নিরানন্দ নিঃসঙ্গ পড়িয়া দূরে আছি একা একাই।"

এবং সর্বশেষে কবিতাটি শেষ করিতেছেন এই দুই ছত্রে—

"—কল্লোলিয়া যাক ঘটনার সম পদতলে জল-নিধি
তুমি থাক দৃঢ় দৃঢ় যেই মত আদি নিয়ম ও বিধি।"

তাঁহার অনেক কবিতারই আরম্ভ লঘু পরিহাসের সুরে, কিন্তু কবিতা যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে আর লঘুতা নাই, সেখানে তিনি গম্ভীর, আদর্শবাদী। অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্য ও করুণ রসে তাঁহার অনেক আপাতলঘু পরিহাস-প্রবণ কবিতার পরিসমাপ্তি। 'আলেখ্য' পুস্তকের বিবাহযাত্রী কবিতাটি মনে পড়িতেছে। তাহার আরম্ভটা এইরূপ—

"দেখলাম একটা যাচ্ছে বিয়ে সমারোহে রাস্তা দিয়ে
রাস্তার দুধারে চলেছে দুই এসেটেলিন ল্যাম্পের সারি
প্রথমত ঢোল ও কাঁশী তাহার পরে দক্ষ বাঁশী
তাহার পরে গোরার বাদ্য তাহার পরে সানাইদারি
বাঁশী সানাই ঢক্ক ঢোল কচ্ছে মিলে হট্টগোল
সবই কাছে নাইক কেবল মৃদঙ্গ ও হরিবোল।
একটি যুবা সুগৌর হৃস্ব চ'ড়ে একখান চতুরশ্ব
মন্দগতি 'ফেটিনাখ্য' যানে যাচ্ছেন সগৌরবে
অতি সুপ্রসন্ন মূর্তি পরণে তাঁর রেশমি কুর্তি
রেশমি ধুতি জরির টুপি—বয়স বছর পঁচিশ হবে
সুবিস্তৃত পরিসর যেন বিন্ধ্য মহীধর
কিম্বা ইন্দ্র ঐরাবতে; তিনি হচ্ছেন বিয়ের বর।

যে কবিতার শুরু এই সুরে সে কবিতার শেষের দিকে তিনি বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"হে কাম্য বিবাহ-যাত্রী! এই যে আলোকিত রাত্রি
এই যে যাত্রা সমারোহে দেখছ অদ্য সগৌরবে;

ভাবছ কি হে একদিন আবার (বটে সময় হ'লে যাবার)
একদিন আবার অন্য রকম সমারোহে যেতে হবে ?
(তবে কি সেটা ঠিক নয়ক শ্বশুর বাড়ির দিক
আলোক কিম্বা বাদ্যও তাতে থাকবে নাক সমধিক ।)
সে দিন বিনা গণ্ডগোলে (হুন্দমুন্দ হরিবোলে)
মন্দগতি বাহক স্কন্ধে সোজা পথে চলে যাবে
(এমন সমারোহ আহা ! তুমিই দেখবে নাকো তাহা
কিন্তু পথের অন্য সকল পথিক মাত্রেই দেখতে পাবে)
দেখবে তারা যচ্ছে বেশ নাইক কষ্ট দুঃখ লেশ
কিন্তু যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের কষ্টের পরিশেষ ।

* * *

হে কাম্য শকটারূঢ় বলব না আজ সে নিগূঢ়
সেই সে নিত্য সত্য রূঢ় ! তোমার সুখের রাত্রি হেন
তোমার সুখে সমুৎসাহে কেবা বাধা দিতে চাহে
তোমার পূর্ণ শরচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত কর্ব কেন ?
যাও বিয়ে কর্তে যাও— সে সব কথা ভেবে না-ও
অদ্য তোমার সুখের রাত্রি যত পার হেসে নাও ।"

তাঁহার বহু কবিতায় এরূপ ভাব-বৈপরীত্য আছে । নানা পুষ্প সমন্বিত কাননের ন্যায় তাঁহার অনেক কবিতাতেই বহু ভাবের শোভা যুগপৎ বিকশিত হইয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে । ইহা দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছেন— "কাব্যে যে নয় রস আছে অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন । তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা মাধুর্য· বিস্ময় কখন যে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই···" ।

শুধু রসের ক্ষেত্রে নহে রসের বাহন ভাষা ছন্দ ও মিলের ব্যাপারেও দ্বিজেন্দ্রলাল অকুতোভয় । তাঁহার আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য বইগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় গদ্যের তেজী ঘোড়াকে ছন্দমিলের বল্‌গায় বাঁধিয়া সাহিত্যের রাজপথে দুর্গম বেগে তিনি গাড়ি হাঁকাইতেছেন । গাড়ি মাঝে মাঝে বেসামাল হইয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে মনে হয় উলটাইয়া গেল বুঝি, কিন্তু উলটাইতেছে না, আবার সোজা হইয়া অপরূপ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে । সার্কাসে দেখিয়াছি ছাতা হাতে করিয়া সরু তারের উপর দিয়া একটি মেয়ে হাঁটিয়া চলিয়াছে, পড়ি-পড়ি করিয়াও পড়িতেছে না, গানের আসরে শুনিয়াছি বড় বড় ওস্তাদেরা সুরের নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদের দিশাহারা করিয়া দিয়া—ঠিক সমে আসিয়া থামিতেছেন 'যমুনা কী তীর' বা 'বাজুবন্ধ খুলি খুলি যায়'—। এ-ও যেন অনেকটা সেইরূপ বিস্ময় । কবিতা ও গদ্যের অপূর্ব অদ্ভুত বিসদৃশ অথচ মনোহর রূপ । দ্বিজেন্দ্রলালের এ কৃতিত্ব অতুলনীয় । আলেখ্য কবিতা গ্রন্থ সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় বলিয়াছেন "উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়—এ কবিতাগুলি যেন শুচি-শান্ত হিন্দু সংসারের মোটা রেশমী সুতায় বোনা লাল পেড়ে শাড়ী-পরা নিরাভরণা প্রৌঢ়া গৌরাঙ্গী গৃহলক্ষ্মী" ।

কিন্তু গৌরাঙ্গী গৃহলক্ষ্মীটি সব সময়ে শান্ত নন। মাঝে মাঝে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে চমক্‌প্রদ আভরণও পরিয়াছেন। প্রমাণ নর্তকী কবিতা।

'আলেখ্য' গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের একটা পরিচয় পাই। আলেখ্য পুস্তকের ছন্দ আলোচনা শেষ করিয়া শেষে তিনি লিখিয়াছেন—

"তারপর ভাব। এইখানেই গোল। এখন আমার বক্তব্যটি জোর ক'রে বলতে গেলে অনেক তর্ক-প্রিয় ও ব্যঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তি তর্ক ও ব্যঙ্গ কর্বেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক বা ব্যঙ্গ করতে আমার আপত্তি নাই। তবে কোন বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গীয় মাসিক পত্রিকার এই লেখকদের সঙ্গে আমার তর্ক বা ব্যঙ্গ করবার প্রবৃত্তি নাই। সেইজন্য এই কবিতাগুলির ভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের নিজের নীরব থাকাই ভালো। তবে এটুকু আমার স্বীকার করায় দোষ নাই যে এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোনও কবিতা পড়ে' তার মানে দশজনে দশরকম বের ক'রে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে ত একরকমই আছে। কোন কবিতার দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায় সেখানে আমি বলব সেটা আমার ভাষার দোষ। 'বৃহৎ' ভাব দাবী করব না…"

বলা বাহুল্য শেষের শ্লেষোক্তিটি রবীন্দ্রনাথের আবছা অস্পষ্ট mystic কবিতাকে লক্ষ্য করিয়া। যে আস্তিক্যবোধ, যে ভগবৎ ভক্তি থাকিলে মানুষ বুঝিতে পারে যে রহস্যময় অনুভূতিকে স্পষ্টরূপ দেওয়া যায় না, পরম ব্রহ্মকে অপরোক্ষ করিলেও বর্ণনা করা যায় না, সে আস্তিক্যবুদ্ধি সে ভাগবতী অনুভূতি দ্বিজেন্দ্রলালের কম ছিল। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মনে করিতেন দ্বিজেন্দ্রলাল নাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনীকার দেবকুমারবাবু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবতঃ কতকটা নিরাশাবাদী অর্থাৎ pessimist। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যভাবের দার্শনিক। তিনি তার্কিক ও যুক্তিবাদী।…এইজন্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া তাঁহার কবিতার স্থান উচ্চ নহে। তাঁহার কবিতা পাঠে সন্দেহ হয় তিনি Personal God মানিতেন না।…তাঁহার কবিতায় দেখা যায় তিনি স্বর্গ নরক ঈশ্বর দেবদেবী সম্বন্ধে বস্তুত বড় বেশী আস্থাবান ছিলেন না। ভাল-মন্দ…তিনি প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া দেখিতেন এবং প্রধানত তিনি পুরুষাকার ও নীতি মানিতেন।"[৩]

'গান'-এর কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর একটি পত্রে দেখিতেছি—"দ্বিজেন্দ্রের একদিনের তর্ক আমার মনে পড়ে। তখন তিনি ঘোরতর জড়বাদী। এ বিশ্বজগৎ নৈসর্গিক সৃজন বলিয়া তর্ক জুড়িলেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ২টা পর্যন্ত সে ঢেউ চলিল। তর্কযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের এমন সুযোগ দিতে, অতি কম লোকই তাঁহার মত পারে। দ্বিজেন্দ্র হাসিতে হাসিতে তর্ক শেষ করিলেন, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এইসব কথা শুনিয়াও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার কোন হ্রাস হইত না।…"[৪]

এই সব কারণেই হয়তো তিনি কবিতায় অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে বা 'মেয়েলি' ভাব সহ্য করিতে পারিতেন না। মনে রাধা-ভাব না জাগিলে কবিতায় প্রেমিকার আকুলতা

(৩) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৬৬৪
(৪) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৬৮৮-৮৯

ফোটানো যায় না। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় তিনি নিজেকে নারীর জবানীতে প্রকাশ করিয়াছেন। "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান"—"সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি, কি ঘুম তোরে ধরেছিল হতভাগিণী"—"মাগো, রাজার দুলাল চলি গেল মোর ঘরের সমুখ পথে, আমি বক্ষের হার না ফেলিয়া দিয়া রহিব বল কি মতে"—রবীন্দ্রকাব্য হইতে এরূপ অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অন্তরে রহস্যময় অবর্ণনীয় আধ্যাত্মিক প্রেরণা না পাইয়াও রবীন্দ্র-অনুকারী অনেক কবি এই ধরনের কবিতা লিখিয়াছেন। আধ্যাত্মিক সুরের কবিতা লিখিয়া এদেশে সহজেই জনপ্রিয় হওয়া যায়। রাম-নামের জোরে মহাত্মা গান্ধী জাতির জনকপদে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জন-প্রিয়তার মোহ থাকিলে দ্বিজেন্দ্রলালও এইরূপ অজস্র কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার জীবনীকারের মতে—"ভগবদ্ভক্তির অল্পতাহেতু জাতীয় কবিতা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কবিতাগুলি এদেশবাসীর হৃদয় তেমনভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই..."।[৫]

আমার মনে হয় এইখানেই দ্বিজেন্দ্রকাব্যের মহিমা। তাহা স্বকীয় মর্যাদায় স্বকীয় সৌন্দর্যে রসিক-চিত্তে চিরন্তন আসন অধিকার করিয়া আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা সরল ঋজু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অকপট প্রকাশ। এই জন্যই তাঁহাকে দেখিয়া কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী লিখিয়াছেন "মনে আছে অনেকদিন পরে একটি আস্ত মানুষের দেখা পাইয়াছিলাম। একটা সজীব প্রাণ! দেখিবামাত্রই মজিয়াছিলাম।"

এই অকপট সজীবতাই প্রতিভার স্পর্শে তাঁহার কাব্যকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ মানিক্যের মতো জ্যোতির্ময় করিয়াছে। রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অনুপম অনন্যতায় রসিকচিত্তে শ্রদ্ধার আসনে মহামহিমায় বিরাজ করিতেছেন। আশা করি চিরকাল করিবেন। জন-প্রিয়তা? দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য জন-প্রিয় নয় তাহা সত্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই কি জন-প্রিয়? দ্বিজেন্দ্রযুগের অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন কি জন-প্রিয়? কেহ কি তাঁহাদের কথা মনে করিয়া রাখিয়াছেন? মাইকেল মধুসূদনের নামটাই অনেকের মনে আছে—তা-ও বোধ হয় টেক্‌স্‌টবুক কমিটির অনুগ্রহে। তাঁহার কাব্য আজকাল কয়জন পড়ে?

শিরে শূন্য পদে ভূমি মধ্যে আছি আমি তুমি
কল্প কল্প বিকাশ-বারতা!
আছে দেহ আছে ক্ষুধা আছে হৃদি—খুঁজি সুধা
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা!"

এ কবিতা যে অক্ষয়কুমার বড়ালের তাহা কয়টা লোক মনে করিয়া রাখিয়াছে!

"যাদুকরি, তুই এলি
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা-ভাষ্য—তোর ওই চক্ষু দীপিকায়
বিদ্যাপতি, মেঘদূত সব বোঝা যায়।
শব্দ হয় অর্থবান
ভাব হয় মূর্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?"

---

(৫) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৬৭০

প্রেয়সীকে কাব্যশিক্ষার গুরু-রূপে যিনি এই কবিতায় অভিনন্দিত করিয়াছেন তিনি কে? তাঁহার এ কবিতা পড়িয়াছেন কি? না, অশোক-গুচ্ছের কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন আজ বিস্মৃতির কুয়াশায় হারাইয়া গিয়াছেন। হারাইয়া যাওয়াটাই নিয়ম। জনগণের হৃদয়-দুয়ার দুর্ভেদ্য। সেখানে বারবার অহরহ যুগযুগান্ত ধরিয়া আঘাত না করিলে তাহা খোলে না। অজ্ঞাত লেখকের লেখা ছড়া লোকের মনে বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া আছে অসংখ্য বাউল গান, বৈষ্ণবের গান, অনেক পদাবলী। বাঁচিয়া আছে রামায়ণ, মহাভারত। ইহার কারণ কবি ও কথকরা এসব গান লোকের কাছে বার বার গাহিয়া গাহিয়া জনসাধারণের স্মরণপটে সেগুলি অমর বর্ণে আঁকিয়া দিয়াছে। লোকের মুখে মুখে যে কবিতার বার বার আবৃত্তি হয়, যে গান বার বার লোকের কর্ণপটহে সুরের ঝাঁজনা বাজায় তাহারাই জনপ্রিয় হয়। সিনেমার গান, রেকর্ডের গান, আবৃত্তি তাই জনপ্রিয়। বাধ্য হইয়া পড়িতে হয় বলিয়া পাঠ্যপুস্তকের কবিতাও বাঁচিয়া থাকে। পুরাকালে কবিতার সহিত গানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। এখনও বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে কবিরা কবিতা আবৃত্তি করেন না, গান করেন। কবি সভায় বা 'মুশয়রা'তে গানেরই প্রাধান্য, আবৃত্তির নয়। সেকালের গ্রীসে এবং ভারতবর্ষে ইলিয়াদ, অডিসি রামায়ণ-মহাভারত বেদ-উপনিষদ সবই সুরের মাধ্যমে প্রচারিত হইত। জনগণের মন সুরেই বেশি সাড়া দেয়। অনেক প্রাচীন কবিতা এই সুরের জন্যই অমর হইয়া আছে, যদিও কবিতা হিসাবে অনেক সময় তাহারা উৎকৃষ্ট নয়। কবির প্রতিভা যখনই ছাপার হরফে বন্দী হইয়া গ্রন্থে নিবন্ধ হইল তখনই তাহার মৃত্যু শুরু হইল। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক সাহিত্যের অধ্যাপক এবং Cambridge-এর কিংস কলেজের 'ফেলো' George Thomson লিখিতেছেন—"To most English people English poetry is a closed book." কিন্তু Irish poetry-র সম্বন্ধে একথা সত্য নয়। কারণ "For them poetry has nothing to do with books at all. Most of them are illiterate. It lives on their lips. It is their common property. Everybody knows it. Everybody loves it. It is constantly bubbling up in everyday conversation. And it is still creative…"[৬]। রাশিয়াতেও তাই।

আমাদের দেশে যাত্রা থিয়েটার সিনেমার গান তাই লোকের মুখে মুখে বাঁচিয়া আছে। পুস্তকের কারাগারে বন্দী হইলেই কবির প্রতিভার অসীম দুর্দশা। প্রথমত গুদামের মালিক, প্রকাশক এবং দ্বিতীয়ত সমালোচক-প্রহরীদের পাল্লায় পড়িয়া তাঁহার নাকালের আর শেষ থাকে না। কেন জানিনা, মোহিতলাল মজুমদারের মত রসিক লোকও তাঁহার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালকে স্থান দেন নাই। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। তাঁহার কিছু ভালো কবিতাও আছে। জনসাধারণ তাঁহাকে মনে করিয়া রাখিয়াছে কি? কেহ কি তাঁহার কোন কবিতা মুখস্থ বলিতে পারে? পারে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলীর প্রথমভাগে যে ভূমিকাটি আছে (সম্ভবত সজনীকান্ত দাস এটি লিখিয়াছেন) তাহাতে দেখিতেছি—

"বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিভা যথাযথ সমাদর লাভ করে নাই। প্রথম

(৬) Marxism and Poetry pp. 2

ও প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে সকলের চক্ষু এমনই ধাঁধিয়া গিয়াছিল যে আশে-পাশের অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধদীপ্তি জ্যোতিষ্কেরা সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দলের প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং ; তিনি স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্পর্কে যাহা অনুভব করিয়াছেন, অকপটে তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছেন। অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, কাহারও সহিত আপোষমীমাংসায়ও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি ঋজু মেরুদণ্ডের লোক ছিলেন, অত্যধিক নমনীয়তা বা ন্যাকামি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না ; কঠোর হস্তে ইহার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের চাবুক চালাইয়াছেন, ফলে তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইয়াছে লোকে তাঁহাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী অপবাদ দিয়া প্রায় 'একঘরে' করিয়াছে। 'আষাঢ়ে' 'মন্দ্র' 'আলেখ্য' ও হাসির গানের কবি প্রায় অপঠিত থাকিয়াই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন"।

ভূমিকাকার একটি কথা কিন্তু বিস্মৃত হইয়াছেন। কবি যদি সচেষ্ট হইয়া আত্ম-প্রচারে বদ্ধপরিকর না হন তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবেই। ভাস্কর-দীপ্ত রবীন্দ্রনাথেরও বহু বিজ্ঞাপিত রচনাগুলি ছাড়া অন্য কোন রচনাকেই জনসাধারণ মনে করিয়া রাখে নাই। তাঁহার বিশাল সাহিত্যকীর্তির অধিকাংশই অপঠিত। নোবেল প্রাইজ না পাইলে রবীন্দ্রনাথের নামটাও বোধ হয় লোকে এতদিনে ভুলিয়া যাইত। যে সব কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মতো স্পষ্টবক্তা আপোষ-বিমুখ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রিয় ছিলেন না, জনসাধারণ তাঁহাদেরও মনে রাখে নাই। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপমা দেবী—এ রকম অনেক নাম করিতে পারি—ইঁহাদের কথা জনসাধারণ ভুলিয়া গিয়াছে। সেদিন একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আবিষ্কার করিলাম যে 'সেঁজুতি' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের যে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে তাহার নাম পর্যন্ত তিনি শোনেন নাই। শুধু এদেশেই যে এরূপ অজ্ঞতা বর্তমান তাহা নয় বিলাতেও তাহাই। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম লণ্ডনে এদেশের একজন ভদ্রলোক রাস্তার একটি সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'শেকসপীয়রকে চেন ?'—সে উত্তর দিয়াছিল—'না চিনি না, তবে কোন রাস্তায় কোন নম্বর বাড়িতে থাকে যদি বলিয়া দিতে পারেন তবে আপনাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারি'। এই সাধারণ লোকেরা চাকরী-ব্যবসা করে, সংসার-ধর্মে মশগুল হইয়া থাকে, থিয়েটার-সিনেমা দেখে, রাজনীতি লইয়া হুল্লোড় করে, পরনিন্দা পরচর্চা পরশ্রীকাতরতায় নিমগ্ন হইয়া থাকে। ইহাদের কাছে কবিরা সমাদৃত হইবে ইহা প্রত্যাশা করাই হাস্যকর। কোনও কারণে কাদার বাজারদর যদি বাড়িয়া যায় ইহারা চন্দন ফেলিয়া দলে দলে কাদার দিকেই দৌড়াইবে। অনেকদিন আগে আমি এ বিষয়ে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম।—খানিক উদ্ধৃত করি।

উদোর পিণ্ডির লাগি বুদো যেথা পেতে আছে ঘাড়
অর্কফলা আন্দোলিয়া বৃথা সেথা শাস্ত্র-আলোচনা
বদ্ধপরিকর হ'য়ে সকলে দুহিবে যেথা ষাঁড়
সুরভি কপিলা সেথা কেন করে বৃথা আনাগোনা।
অমৃত-রসিক বন্ধু খুঁজিও না তাড়ির দোকানে
শূকর কাদাই চায়, চন্দনের মূল্য নাহি জানে।

চন্দন তবুও আছে এবং থাকিবে চিরকাল
চন্দন-রসিকও আছে—হয়তো সংখ্যায় তারা কম—
গড্ডলিকা সম কভু হয় না তো রসিকের পাল
সুরসিক বিধাতার অপরূপ এইতো নিয়ম।
তবু তাহাদেরই লাগি রূপলোকে আলো অনির্বাণ
চিরশ্যাম কল্পলোকে মনোপাখী বাঁধে যেথা নীড়
রস-স্রষ্টা পায় সেথা রসিকের নিশ্চিত সন্ধান
নাই সেথা কলরব, নাই সেথা গাদাগাদি ভীড়
আলো সেথা চিরদীপ্ত তুচ্ছ করি তস্কর শ্বাপদ
পেচক-প্রশংসা লাগি সে আলোক লালায়িত নয়
সত্যের ভাস্বর লোকে তার দীপ্তি চির নিরাপদ
অনির্বাণ, আনন্দিত, স্বয়ম্প্রভ, শুদ্ধ জ্যোতির্ময়।
সে মিলন মহাতীর্থে আনন্দের বোধন সদাই
আছে শুধু শিব-উমা নন্দী-ভৃঙ্গীরা কেহ নাই।

এই মহাতীর্থে সমস্ত সার্থক রস-স্রষ্টা কবিদের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালও সগৌরবে সমাসীন। নন্দী-ভৃঙ্গীদের কাছে হয়তো তিনি পপুলার নন, কিন্তু শিব-উমার প্রসন্ন স্নেহদৃষ্টি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। যে কবিরা নন্দী-ভৃঙ্গীদের নিকট পপুলার হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন তাঁহাদেরই পতন হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পপুলারিটির জন্য উন্মুখ হন নাই, ইহাতে তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাও একটা বড় কবির লক্ষণ। তাঁহারা নিজ শক্তি সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন থাকেন এবং এই জন্যই তাঁহাকে অনেকে দাম্ভিক মনে করে। "আমি কারও তোয়াক্কা করি না বাবা" ইহা প্রায় সব প্রথম শ্রেণীর কবিরই মনোভাব। অবশ্য দুই একজন প্রথম শ্রেণীর কবি তোয়াক্কা করেন এবং সেজন্য তাঁহাদের অসীম দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। কীট্‌স্‌কে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল।

কবিশেখর কালিদাস রায় দ্বিজেন্দ্রকাব্যসঞ্চয়ন গ্রন্থে—[৭] প্রাককথন শিরোনামায় দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার যে বিশ্লেষণ করিয়াছে তাহা শুধু উচ্চাঙ্গের সমালোচনাই হয় নাই তাহাতে তাঁহার নিজেরও সূক্ষ্ম রস-বোধের প্রচুর নিদর্শন আছে। তিনি নিজে একজন বৃদ্ধ কবি, সেজন্য অতি সহজেই দ্বিজেন্দ্র-কাব্যজগতে প্রবেশ করিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-চমৎকারিত্বকে সহৃদয় শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"দ্বিজেন্দ্রলালকে কোনো কবির শিষ্য বা অনুবর্তী বলা যায় না। তার অনুবর্তী হয়ে হাসির গান কেউ কেউ লিখেছেন। কিন্তু অন্য রসের গান বা কবিতা কেউ লেখেন নি। কাজেই এ পথে তাঁর শিষ্য পরম্পরা নেই। তাঁর সমসাময়িক কবিদেরও কোন প্রভাব তাঁর রচনায় পড়ে নি। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি ছিলেন—"Like a star when only one is shining in the sky." কিম্বা—"He was like a star that dwelt apart।" আত্মচরিত্র, মানস প্রকৃতি, কাব্যাদর্শ, সেকালের

(৭) দ্বিজেন্দ্রকাব্যসঞ্চয়ন : শ্রীদিলীপকুমার রায় সংকলিত। প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

সামাজিক চরিত্র ও আবেষ্টনীর সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর কবিতার গভীর সম্পর্ক আছে বলে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তেজস্বী, সৎসাহসী, মার্জিতরুচি, অকপট, দেশভক্ত, স্বজাতিবৎসল, ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থাবান, আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষ।...তৎকালীন সমাজে চারিদিকে কাপট্য, অসারল্য, অনাচার, অসংগতি, দাম্ভিকতা, ইতরতা, বাক্যের সহিত আচরণের অসামঞ্জস্য, পরানুচিকীর্ষা, স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন ইত্যাদির অজস্র নিদর্শন দেখে তাঁর মনে যেমন বিতৃষ্ণার ভাব জেগেছিল তেমনি তাঁর দেশভক্ত মনে ক্ষোভ ও আক্ষেপ জেগেছিল।

তিনি সমাজ-সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করলে ওসব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন, সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন, নানা সংঘসমিতি করতেন। তিনি জন্মসিদ্ধ কবি, তাই কবিতা লিখেছেন।...রঙ্গাত্মক মনোভাব তাঁর সহজাত। নদীয়া অঞ্চলের রঙ্গরসাত্মক ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। এই মনোভাবের সঙ্গে অসত্যের প্রতি বিতৃষ্ণা-জাত ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের মিলনে তার কবি-মনের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল। তার ফলে বহু লিরিকজাতীয় নানা রসের কবিতাতেও রঙ্গব্যঙ্গের ছায়াপাত হয়েছে। বহু কারুণ্য রসের কবিতার মধ্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভাব অনুস্যূত হয়েছে—যেমন রাজপুত জাতির পরাধীনতার গভীর বেদনাও রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। রঙ্গব্যঙ্গের রচনা ছাড়া অন্য কবিতার রসাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তাঁরই ভাষায় বলি—

কাব্য নয়ক ছন্দোবন্ধ মিষ্ট শব্দের কথারহার
কাব্যে কবির হৃদয় নেই যার, তাহার কাব্য শব্দ সার।
যেথায় ভাস্বর যেথায় মূর্ত ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ
উৎসারিত মহাপ্রীতি তাহাই কাব্য তাহাই গান।"

দ্বিজেন্দ্র কাব্যের মর্মকথা কবিশেখর কালিদাস রায়ের এই উক্তিতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। কবির কাব্যের সম্পূর্ণ রস কবিতা পাঠ না করিলে বোঝা যায় না। কিছু কিছু উদ্ধৃত করি

"যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকা ধারা
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্র তারা
দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আননখানি
আমার কুটির-রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়-রাণী

কিম্বা,

পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গে !
শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনী, ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে
কত নগ-নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণযুগ মাই
কত নর-নারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি

* * *

নারদ-কীর্তন-পুলকিত মাধব-বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জটি-জটিলজটা-পর ঝরিয়া"

কিম্বা,

"বঙ্গ আমার ! জননী আমার ! ধাত্রী আমার ! আমার দেশ !

কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ !

কিম্বা,

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে, জয় মা জননী, জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী
সদ্যঃস্নানসিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকর লিপ্ত
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল আনন দীপ্ত

জননী তোমার বক্ষে শান্তি কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি !"

কিম্বা ভৈরবীর এই গানটি—

"এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি—
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায় ধরেনা ধরেনা তায়
আকুল অসীম প্রেম রাশি
তোমার হৃদয় খানি আমার হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।"

কিম্বা—

"একি মধুর ছন্দ মধুর গন্ধ পবন মন্দ মন্থর
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্মর
একি নিখিল বিশ্ব হাসি
একি সুরভি স্নিগ্ধ শিশির সিক্ত কুসুম রাশি রাশি।

কিম্বা—

"দিন যায়, দিন আসে, নব অনুরাগে
আবার সে জাগে ;
বসন্ত চলিয়া যায় মলয় বাতাসে
আবার সে আসে
ঘুম আসে ধীরে, ছেয়ে দুটি আঁখি পুটে
সেই ঘুমও টুটে
কিন্তু এক রাত্রি আসে ঘনাইয়া, তাহা চিরস্থায়ী
এক শীত আসে তার অবসান নাই
একটি প্রগাঢ় নিদ্রা আসে
আর ভাঙে না সে।"

কিম্বা—

"এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নব স্নিগ্ধ ঘনসম প্রিয়
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে ঃ স্বর্গীয়
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে
তুমি নও শীত
ধরণীর ;
কোন সূর্যালোক হ'তে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির
শুধু গাথা—গীত
আলোক ও প্রেমে
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।
আগে যেন কোথা ভালো দেখেছি তোমারে
কোথা বল দেখি
মর্মর-প্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু—সে কি তুমি ?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোক আলোকি ছিলে কি
র‍্যাফেলের প্রাণে......"

দ্বিজেন্দ্রলালের এরূপ অসংখ্য কবিতা 'কেন' ভাল, অরসিককে তাহা যুক্তি দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। বধিরকে শত চেষ্টা করিয়াও সুরের মর্ম বোঝান যায় না, অন্ধের নিকট বহু বক্তৃতা করিয়াও বর্ণ মহিমা প্রত্যক্ষ করানো যায় না। যাঁহারা সমঝদার, যাঁহারা রসিক তাঁহারা ভালো কবিতা পাঠ করিবামাত্রই বুঝিতে পারেন কবিতাটি ভালো। কিন্তু আমাদের মধ্যে যেমন সবাই ডাক্তার, সবাই রাজনীতিজ্ঞ, তেমনি সবাই কাব্যরসিক। সকলেই মনে করেন তিনি কাব্যের সম্বন্ধে 'ফতোয়া' জারি করিবার অধিকারী। অনেক বণিক তাই বাণীর কমল বনে ঢুকিয়া নিকষে কমল ঘষিয়া যাচাই করিতে চান কমলটা দামি কিনা এবং দামি হইলে কেন দামি। পাশ্চাত্য দেশ জড় বিজ্ঞান চর্চায় পারদর্শী এবং পারঙ্গম। অর্নিথোলজি, জুওলজি, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তাঁহারা সন্ধানী আলোকপাত করিয়া পাখি প্রজাপতি পতঙ্গ ফুলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া জানিতে চাহিয়াছেন ইহাদের জীবনরহস্যের ব্যাপারটা কোথায় নিহিত। সুন্দর প্রজাপতি পাখি পতঙ্গ ফুলকে ডিসেকটিং টেবিলে চড়াইয়া তাহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়া তাঁহারা আমাদের কৌতূহলের খোরাক জোগাইয়াছেন। রসায়ন এবং পদার্থ-বিদ্যায় এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া তাঁহারা অবশেষে ভয়ঙ্কর 'এটম্ বম্' এ-র সম্মুখীন হইয়াছেন, কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত মানব-জাতিই এখন একটা মহাবিপদের ছায়াপাতে আতঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তাঁহারা কাব্যের ক্ষেত্রেও নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে এবং জানাইতে চান কবিতা কি, কবিতা কোন গুণে কেন সুন্দর, কবিতার প্রাণ-বস্তু কি, রস কাহাকে বলে, সৌন্দর্যই বা কি। Good poetry কাহাকে বলে, Great poetryই বা কি বস্তু, এসব লইয়া তাঁহারা বিস্তর বাগ্‌বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয় রস ও সৌন্দর্যের রহস্যকে তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই, নানা প্রবন্ধে নিজেদেরই তাঁহারা নানাভাবে আস্ফালন করিয়াছেন মাত্র। রস ও সৌন্দর্য অবর্ণনীয়, তাহা ব্রহ্মাস্বাদের মতো অনুভব যোগ্য, বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে বুঝানো অসম্ভব। সম্প্রতি Marjorie Boulton এর লেখা 'The Anatomy of poetry' পড়িলাম। মহিলা নিজে একজন কবি তাই আসল কথাটা বইয়ের গোড়াতেই বলিয়া ফেলিয়াছেন—'The things that are most interesting and most worth having are impossible to define. .. The fact that a man or woman deeply in love can find 'no words' is well known, though the attempt to find words has produced some of our greatest poetry' .. কিন্তু সমালোচকরা সে কাব্যও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী সমালোচকদের অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় রূপ-রস-সাহিত্য-স্টাইল-কাব্যপাঠ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ তাঁহার সাহিত্যকথা গ্রন্থে সংগ্রহ করিরা গিয়াছেন সেগুলি পাঠ করিলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী সমালোচকদের চিন্তার ধারাটা বুঝা যায়। Marjorie Boulton কবিতার বাহ্যিক রূপ, মানসিক রূপ, Rhythm, Phonetic From, Mental Form প্রভৃতি নানারকম Form লইয়া আলোচনা করিয়াছেন! মোহিতলাল মজুমদারের প্রবন্ধেও Form লইয়া অনেক আলোচনা আছে। তিনি Form-এর বাংলা করিয়াছেন রূপ এবং একটি অত্যন্ত খাঁটি কথা বলিয়াছেন। কাব্যের জড় উপাদানপুঞ্জই—তা সে যত মূল্যবান উপাদান হোক না কেন—তাহাই কাব্যকে রূপবান করিতে পারে না। সাহিত্যের ছোট-বড় প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন[৮] "কোনও গ্রন্থের বিচারে সেই গ্রন্থের বিষয়টাই বড় নয়, কারণ সেইটাই তাহার জড় অংশ, লেখকের চিৎশক্তির প্রভাবে সেই জড়-উপাদান যে চিদ্‌-বস্তুতে পরিণত হইয়াছে তাহাই রচনার আসল রূপ!" অন্যত্র, "যেখানে বস্তু বস্তুত্ব হারাইয়া রসে পরিণত হইয়াছে তাহাই সাহিত্য-হিসাবে উৎকৃষ্ট রচনা"[৯] তিনি আর একটি প্রবন্ধে[১০] বলিতেছেন—"সাহিত্যের উৎকর্ষের প্রমাণ মৌলিকতা।...এ মৌলিকতা নূতন তথ্য-আবিষ্কার বা তত্ত্বচিন্তার মৌলিকতা নয়—ওই যে রচনা-রূপ বা style-এর কথা বলিয়াছি তাহারই মৌলিকতা। এ মৌলিকতার কারণ আর কিছুই নহে লেখকের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব লেখা পড়িবামাত্র বুঝিতে পারি—এ এক নূতন সম্পূর্ণ অপরিচিত-পূর্ব ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হইতেছে; এ দৃষ্টি এ ভঙ্গী আর কোথায়ও নাই..."।

এই মানদণ্ডে বিচার করিলে দ্বিজেন্দ্রলাল একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। যেমন ধরুন কম্যুনিজম লইয়া অনেক বড় বড় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অপদার্থ ধনীদের বিরুদ্ধে

---

(৮) সাহিত্য কথা : মোহিতলাল মজুমদার পৃঃ ৬৪

(৯) সাহিত্যে ছোট ও বড়—সাহিত্য কথা পৃঃ ৬৭

(১০) রস ও রূপ—সাহিত্য কথা পৃঃ ৭২

পদদলিত নিষ্পিষ্ট দরিদ্রদের আক্রোশ লইয়া অনেকেই কাব্য-প্রবন্ধ নাটক-নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। সহৃদয় কবিমাত্রেই অসহায় দরিদ্রদের পক্ষে। দ্বিজেন্দ্রলালও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। কিন্তু তাঁহার 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের ষোড়শ চিত্র 'রাজা নামক কবিতাটি পড়ুন—

১

তোমার টাকা আছে? আছে না হয় টাকা
তোমার কাছে আমি কিছু চাচ্ছি নাক
যে চায়, মাথা নীচু করুক তোমার কাছে
মাথা নীচু কর্তে আমি যাচ্ছি নাক।
কিসের তবে দর্প? কিসের তবে গর্ব?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো?
তোমার কাছে আমি ভাবো কিসে খর্ব
তোমার কাছে মাথা নীচু করতে যাব?

২

খাচ্ছ পোলাও তুমি? খাও না, পোলাও খেয়ে
আমার চেয়ে তোমার বাড়েনিক ক্ষুধা
পোলাও তোমার কাছে নয় ক তেমন স্বাদু
যেমন এই শাকান্ন আমার কাছে সুধা।
শয়ন কর তুমি দুগ্ধফেননিভ
কোমল শয্যায় যদি পাখার বাতাস খেয়ে,
ছেঁড়া মাদুর পেতে আমি ঘুমাই যদি
—তোমার নিদ্রা নয়ক গভীর আমার চেয়ে
জুড়ি হাঁকাও তুমি আমি যাচ্ছি হেঁটে
আমার পানে তাইতে চেয়ো নাক নীচু
ত্রিতল হর্ম্য তোমার মার্বেল মোড়া যদি
আমার কুঁড়ের চেয়ে ধন্য নয় সে কিছু।
তোমায় পঙ্গুর মতো যাচ্ছে টেনে নিয়ে
আমি হেঁটে যাচ্ছি নিজের পায়ের জোরে
তোমার প্রাসাদ ভবন সেও পরের দেওয়া
আমাব কুঁড়েখানি—নিজের গায়ের জোরে
তোমার হস্ত দু'খান প্রজার রক্তে মাখা
তোমার শরীর সে-ও পুষ্ট পরের খেয়ে
তোমার মাথা—যদি মাথা বল তাকে—
নয়ক বেশী কিছু পশুর মাথার চেয়ে।
কিসের তবে দর্প? কিসের তবে গর্ব?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো
তোমার চেয়ে আমি ভাবো কি সে খর্ব
তোমার কাছে মাথা নীচু কর্তে যাব।

৩

ওরে ও ভাই চাষী, ওরে ও ভাই তাঁতী
পড়িস নাকো নুয়ে ; জানিস এ সব ফাঁকি
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে
কর্বে তোদের উপর রক্তবর্ণ আঁখি ?
সারিবন্ধ হয়ে একবার মাথা তুলে
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজা ভাবে
দেখবি এই যে দম্ভ, দেখবি এই যে দর্প
দেখবি এই যে স্পর্ধা—চূর্ণ হয়ে যাবে।
উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা—
এদের সামনে কেন মাথা নুয়ে যাবি ?
সমস্বরে বল—এই সকলেরই মাটি
কারো চেয়ে কারো বেশী নাইক দাবী।"

এ কবিতা লেখা হইয়াছিল U. S. S. R. প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আলেখ্য প্রথম প্রকাশিত হয়। বড় কবিদের ব্যক্তিত্ব এক-রঙা নয়। তাঁহাদের কল্পনার বিভিন্ন উল্লাসে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব এবং কবিত্ব অনুরঞ্জিত হয়। তাঁহাদের বীণায় তাই নিত্য নূতন সুর বাজে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়[১১] "অনুভূতির বৈচিত্র্য পরম্পরা লইয়া চৈতন্য চিৎপ্রবাহ" এবং কবির এই চিৎ-প্রবাহ আরও বিচিত্র এবং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। তাই যে কবি উক্ত কবিতা লিখিয়াছেন সেই কবিই আবার ভিন্ন ভিন্ন সুরে নানা কবিতা লিখিয়াছেন : দুই একটা উদ্ধৃত করি।

গোধূলি

সূর্য অস্ত গেল। দিবার শুভ্র আলোক অন্ধকার লেগে
ভেঙ্গে গেছে। চূর্ণ হ'য়ে ক্ষিপ্ত হ'য়ে যেন একটা ঝড়ে ;
শুয়ে আছে বর্ণগুলি চারিধারে—আকাশে ও মেঘে।
যেন একটা বর্ণ-সৈন্য ঘুমিয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে ;
যেমন একটা মহানদী বহে গিয়ে পূর্ণ খর-বেগে
শেষে শাখায় উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে মন্দীভূত তেজে
যেমন একটা মহাগীতি মহাতানে মহাচ্ছন্দে জেগে
ছড়িয়ে পড়ে বিকম্পিত শত ভগ্ন মূর্ছনাতে বেজে।
সূর্য অস্ত গেল। বিশ্ব ঘেরে এল কৃষ্ণ সুপ্তি নেমে
মিশিয়ে গেল মহানদী সিন্ধুজলে, গীতি গেল থেমে।

[ত্রিবেণী : দশপদী কবিতা]

নবদ্বীপ

বঙ্গের গৌরব এই নবদ্বীপ পুর
বঙ্গের কলঙ্ক এই নবদ্বীপ। দূর
করি সে কলঙ্ক, ধৌত করি সে অখ্যাতি
লজ্জার পুরীষপঙ্ক হইতে এ জাতি

(১১) সৌন্দর্য-তত্ত্ব রামেন্দ্র-গ্রন্থাবলী পরিষৎ সংস্করণ পৃঃ ১৮৩

উঠাইয়া স্ববলে, প্রেমহীন, সামান্য অসার
ক্ষুদ্র চিত্তে, জাগাইয়া ছিলেন মহতী
আশা ও সান্ত্বনা।— হেথা সেই মহামতি
মাতিয়া ছিলেন প্রভু, মানবের হিতে
প্রমত্ত উন্দাম এক প্রেমের সঙ্গীতে।
অবিশ্বাস করিবেন? এই ক্ষুদ্র স্থান
নদীতীরে কাঁচাপাকা বাড়ি কয় খান
অধিকাংশ চালা ঘর! ময়লার খনি
শীর্ণ গলি। ওই সব মিষ্টান্ন বিপণি।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানেতে বিলাতি দ্রব্য ঘটা
লণ্ঠন (তাহার মধ্যে হিংক্‌সেরও ক'টা)

* * *

পমেটম, নানাবিধ ফিতের প্যাকেট,
আর সর্বনাশ—কুলবালার জ্যাকেট

* * *

গৃহাঙ্গণে 'কোপি', আরো দুই এক ঘরে
হরি হরি—এ কি দেখি—মুরগীও চরে।

* * *

সত্য বটে; কিন্তু প্রিয়ে তবু সত্য এই,
এই সেই নবদ্বীপধাম এই সেই তীর্থভূমি চিরস্মরণীয়,
পঙ্কিল পবিত্র কুৎসিত সুন্দর, প্রিয়
অক্ষয় স্মৃতির মঠ, চির অভিরাম।
—প্রেমের জনমক্ষেত্র—নবদ্বীপ ধাম।

* * *

তবু এই সেই নবদ্বীপ; ধৌত করে
সেই গঙ্গা, সে জলাঙ্গী, আজও ভক্তিভরে
তার পদ রজ। প্রিয়ে, শিরে লও তুলি,
প্রেমে সুপবিত্র আজও তার স্বর্ণধূলি:
হোক সে পঙ্কিল আজি, বিলুপ্ত বিভব
বিহীন-সৌন্দর্য-জ্ঞান-প্রতিভা গৌরব,
তবু চিরপুণ্যময় তাহা—স্বর্গসম
অবনত কর শির—প্রেয়সি, প্রণম।

এই কবিতাটি দীর্ঘ: আমি মাঝে মাঝে বাদ দিয়া উদ্ধৃত করিলাম। সম্পূর্ণ কবিতাটি পাঠ করিলে রসিক পাঠক পুলকিত হইবেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-ব্যক্তিত্বের আর একটা রূপ দেখিতে পাইবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যে সম্ভবত আস্তিক্য-বুদ্ধি-সম্পন্নই ছিলেন এই সব কবিতাই তাহার প্রমাণ। তিনি গৌরাঙ্গকে ভক্তি করিতে পারেন, প্রেমকে যিনি জীবনের মহামূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য করেন তিনি যে নাস্তিক ছিলেন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু একটা কবিতায় তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন:—

সে কবিতাটি 'আলেখ্য' পুস্তকের দশম চিত্র 'বিধবা'। খুব বড় কবিতা। পূর্ণিমার গভীর রাত্রে চতুর্দিক স্বপ্নাতুর।

এমন সময়, শূন্য ঘরে
কেগো তুমি ভূমি পরে
ব'সে মুক্ত বাতায়নের মূলে ?
একাকিনী আছ চেয়ে
কে তুমি সুন্দরী মেয়ে
স্রস্ত বসন, স্রস্ত এলোচুলে ?
ছড়িয়ে দুটি রাঙ্গা পায়ে
হেলান দিয়ে কবাট গায়ে
মরাল-গ্রীবা বাঁকিয়ে বাইরের দিকে।

*   *   *

আকাশ সুনীল ধরা শ্যামা
কিছুই তুমি দেখছ না মা
দেখছ বসে বাতায়নের ধারে
জীবন-গ্রন্থখানি খুলি
অতীতকালের পৃষ্ঠাগুলি
উল্টে পাল্টে তাহাই বারে বারে।

সে গ্রন্থে কত সুখের, কত দুঃখের, কত আশার, কত স্মৃতির, কত উন্মুখ বাসনার ছবি—'মনে পড়ে প্রাণের কথা নানা।' বারবার মনে হইল তাহার সুখের দিন শেষ হইয়াছে—'তার সঙ্গে আর হবে নাক দেখা'। দুই বৎসরেই জীবনের সুখ-স্বর্গ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে—'তার সঙ্গে আর হবে নাক দেখা'—। কবি বলিতেছেন,—

"যত আছে নিগূঢ় তথ্য
এর চেয়ে নয় কিছু সত্য
যেটা আজি দেখছ ব'সে তুমি।
যতখানি হেঁটে যাচ্ছ
যতখানি দেখতে পাচ্ছ
ধূ ধূ করছে জীবন মরুভূমি।
মহাশূন্য দগ্ধ সে যে
জ্বলছে অন্ধ-কারী তেজে
অগ্নি নিয়ে করছে খেলা বায়ু
নাইক বারি নাইক তরু
কেবল বালু, কেবল মরু
—শুষ্ক তপ্ত দীর্ঘ পরমায়ু।

৬

রাত্রি গভীর হ'তে গভীর !
পট-প্রান্তে বিশ্ব ছবির
জ্যোৎস্না-লেখা মুছে গেল ধীরে

অলস হ'য়ে এল আঁখি
গরাদেতেই মাথা রাখি
ঘুমিয়ে পড়ল আমার জননী রে।"

এই করুণ ছবি দেখিয়া কবির মনে সন্দেহ জাগিল। সত্যই কি ভগবান বলিয়া কেহ আছেন? সত্যিই কি তিনি করুণাময়? মনে নাস্তিকতা জাগিয়া উঠিল—

"হায়রে মানুষ, বিধির কৃত্য
চোখের সামনে দেখছি নিত্য
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি
খোসামোদের মন্দির খুলে
মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে
উচ্চৈঃস্বরে দয়াল বলে' ডাকি।"

এই কবিতা যিনি লিখিয়াছেন তিনিই আবার নৃত্যপরা নর্তকীদের মুখে এই গান গাহিয়াছেন—,

"আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে—
নিয়ে এই হাসি রূপ গান
আজি আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে
তোমায় করিতে সব দান।

* * *

ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন-সৌরভ
ভেসে আসে উচ্ছল জলদলকলরব
ভেসে আসে রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি
ভেসে আসে পাপিয়ার তান।
আজি এমন চাঁদের আলো মরি যদি সে-ও ভালো
সে মরণ স্বরগ-সমান।"

এই একই কবি লিখিয়াছেন......

"ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র।
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র!
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা,
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম ভক্তি ধর্ম শিক্ষা

* * *

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে' দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী!
কর্মজ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

দ্বিজেন্দ্রলালই এ ধরণের ছন্দ বঙ্গভাষায় প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং এ ছন্দের গুরু-গম্ভীর মহিমায় আমরা আজও মুগ্ধ হইয়া আছি। অনেক কবি এ ছন্দের সার্থক

অনুকরণও করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা নানা মেজাজের, নানা রূপের, নানা বর্ণের, নানা ছন্দের। সবই সৌন্দর্যময়। কিন্তু দার্শনিকদের মতে এ সৌন্দর্য খণ্ডসৌন্দর্য। মহামান্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্য-চিন্তা' গ্রন্থে 'রস ও সৌন্দর্য" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"পূর্ণ সৌন্দর্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, তাহাকে অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। বৃত্তি দ্বারা যে সৌন্দর্যের আভাস ফোটে—তাহা সাপেক্ষ, পরতন্ত্র, ক্রমবৃদ্ধিশীল, কালান্তর্গত। পূর্ণ সৌন্দর্য ইহার বিপরীত। এই পূর্ণ সৌন্দর্যের ছায়া ধরিয়াই খণ্ড সৌন্দর্যের আত্মপ্রকাশ"।[১২] কাব্যে এই খণ্ড সৌন্দর্যই প্রতিভাত হয়। কবির চিত্ত ও কল্পনা পরিবেশের প্রভাবে নানাবর্ণে রঞ্জিত হয়। কবিরাজ মহাশয়ের ভাষায় এগুলি আগন্তুক কারণ। "স্ফটিক সন্নিধানে নীলবর্ণের স্থিতিতে "স্ফটিকে নীলাভাষ হয়, পীতবর্ণে পীতাভাষ হয়"।[১৩] কবিরাজ মহাশয়ের থিয়োরি "—কো হ্যন্যাৎ. কঃ প্রাণ্যাৎ, যদ্যেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ"। রসই সার—রসই সত্ত্ব। রসের লোভে সকলেই চঞ্চল। রস ভিন্ন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। যাহার আস্বাদন হয় নাই, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। রসের জন্য পাগল, সুতরাং তাহার অনুভূতি একদিন কোথাও অবশ্যই হইয়াছে। নিশ্চয়ই একদিন সমস্ত জগৎ সেই রসপানে মাতোয়ারা হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল, পরে নিয়তির প্রেরণায় সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জগৎ আজ তাহারই পুনঃপ্রাপ্তির আশায় মণিহারা ফণীর ন্যায় অশান্তভাবে ছুটিতেছে—"।[১৪] কবিরাও এই মণিহারা ফণীর দল।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঝিঁঝিঁট খাম্বাজে অভিমানভরে আলাপ করিতেছেন—

"আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি
ফিরে দেখা পাই আর না পাই
দূরে থাকো, কাছে থাকো মনে রাখ নাহি রাখ
আর কিছু চাহি নাক' আর কোনও সাধ নাহি
আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি।
অবহেলা অপমান বুক পেতে লব, প্রাণ!
ভালবেসেছিলে জানি, মনে শুধু রবে তাই
আমি তবু তা লাগি নিশি নিশি রব জাগি
এমনই যুগ যুগ জনম জনম বাহি।
আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি—"

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"জ্যোৎস্না নিশীথে পূর্ণ শশীতে
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায় লখিতে?
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি দিলে কি!"

আরও অনেক কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখানো যাইতে পারে যে, সব কবিরাই

---

(১২) সাহিত্য-চিন্তা পৃষ্ঠা—২
(১৩) সাহিত্য-চিন্তা পৃষ্ঠা—৬
(১৪) সাহিত্য-চিন্তা পৃষ্ঠা—১

মণিহারা ফণা। সকলেই অশান্তভাবে মণিটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, খোঁজার ধরণটা কেবল প্রত্যেকের আলাদা। বিশ্বের টুকরো টুকরো রং, রস, রূপ, ছন্দ, গন্ধ, আনন্দ আমাদের কেবলই সেই অনন্ত রং-রস-রূপ-ছন্দ-গন্ধ-আনন্দের অফুরন্ত উৎসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। Robert Frost-এর একটি ছোট কবিতা আছে — Fragmentary Blue। সে কবিতায় তিনি বলিতেছেন, মাথার উপর যখন অনন্ত নীলাকাশ তখন টুকরা টুকরা এত নীল রং পৃথিবীতে ছড়ানো কেন? নিজেই উত্তর দিয়াছেন, অনন্ত নীলাকাশ এত দূরে, এত উঁচুতে যে আমাদের মনকে নীলের দিকে উন্মুখ করিয়া দিবার জন্যই কেবল বোধ হয় উহা আছে ঃ

"Why make so much of fragmentary blue
In here and there a bird or butterfly
Or flower : or wearing stone : or open eye
When heaven presents in sheets the solid hue ?
Since earth is earth, perhaps not heaven (as yet)
Though some savants make earth include the sky ;
And blue so far above us comes so high
It only gives our wish for blue a whet "

কবিরাও সাধক, ধর্ম-পথের সাধকের ন্যায় তাঁহারাও শেষে বিরাট ভূমায় অনন্ত ভালবাসায় বিলীন হইয়া যাইতে চান। উপরে কথিত প্রবন্ধটি শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় এই স্বয়ম্প্রভ বাক্যগুলি দিয়া শেষ করিয়াছেন,—"যে দিকে তাকাই সে দিকেই যদি সৌন্দর্য না দেখিতে পাই, যাহাকে দেখি তাহাকেই যদি ভালবাসিতে না পারি তবে রসসাধনায় সিদ্ধি হয় নাই বুঝিতে হইবে। সৌন্দর্য অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না। ভালবাসার কোন হেতু নাই। পূর্ণ সৌন্দর্য পূর্ণ প্রেমের সহিত স্বাভাবিক মিলনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের যাবতীয় বস্তুর সহিতই স্বাভাবিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কেহই পর থাকে না, কিছুই কুৎসিত থাকে না। মানুষের জীবনে সৌন্দর্য সাধনার ইহাই যথার্থ পরিণাম"।[১৫]

এই পরিণামের দিকে পৃথিবীর সকল বড় কবিই গা ভাসাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাতেও ইহার বহু আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার মন প্রায়শই যেন ভূমা-উন্মুখ।

"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।
রাখিস না আর মায়ায় ঘেরে স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দেরে
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই এমন রাত আর পাবো না লো।"

কিম্বা

"(ঐ) মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, "আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে' আয় আমার পাশে" ॥
বলে আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা

(১৫) সাহিত্য-চিন্তা পৃষ্ঠা—২৭

হেথা বাতাস গীতি-গন্ধ-ভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥”

কিম্বা

“চরণ ধরে' আছি পড়ে' একবার চেয়ে দেখিস না মা
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।
একি খেলা খেলিস ঘুরে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধ'রে ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয় পায়ে ভব আত্মহারা
মুখে হা হা অট্টহাসি অঙ্গবেয়ে রক্তধারা
তারা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা অভয়ে অভয় দে মা
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।”

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় যদি তাঁহার নাটকগুলির কবিত্ব-সম্পদ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না করি। আমাদের দেশের অনেক সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের নানারকম খুঁত ধরিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, নাটকের আইন কানুন দিয়া বিচার করিলে ওগুলা নাকি নাটকই হয় নাই। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন—দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছেন তাহা নাটক নয় তাহা তাঁহার কবিচিত্তের অপরূপ সৃষ্টি। তাহা নাটক আকারে লিখিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, মঞ্চে মঞ্চে অভিনয়-গৌরবের জয়মাল্যেও তাহারা ভূষিত, কিন্তু আসলে ওগুলি প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাশালী কবি-মানসের অপরূপ সৃষ্টি। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বিখ্যাত জি. কে. চেস্টারটন (G. K. Chesterton) লিখিতেছেন— “Dickens's work is not to be reckoned in novels at all. Dickens's work is to be reckoned always by characters, sometimes by groups, oftener by episodes, never by novels.”[১৬] তেমনি আমরাও বলিতে পারি, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির সাহিত্যিক মূল্য তাহাদের নাটকত্বের জন্য ততটা নহে, যতটা তাহাদের কবিত্বের জন্য, বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীর জন্য এবং চরিত্র-চিত্রণের জন্য। তাঁহার রাণাপ্রতাপ সিংহ, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, নূরজাহান, সীতা, পাষাণী নাটক হিসাবে যেমনই হোক কাব্য হিসাবে তাহারা যে অপূর্ব সৃষ্টি এ কথা রসিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। রাণা প্রতাপ সিং, গোবিন্দ সিং, চাণক্য, আওরঙ্গজেব, শক্তসিংহ, নূরজাহান, মানসী, মেহরুন্নিসা, সীতা, গৌতম, অহল্যা, মাধুরী প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রই প্রতিভাবান চিত্রকরের আঁকা এক একটি অনুপম চিত্র। সব চিত্রগুলির মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মা স্পন্দিত হইতেছে। এ গুলির মধ্যে স্রষ্টা নানাভাবে নিজের স্বকীয় প্রতিভার বহুমুখিতাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

মার্কিন ঔপন্যাসিক নোবেল লরিয়েট উইলিয়ম ফক্‌নার (William Falkner) নোবেল প্রাইজ লইবার সময় তাঁহার বক্তৃতায় একটি প্রাণস্পর্শী সত্য কথা বলিয়াছেন— “The subject of the literary artist is the human heart in conflict with itself.”[১৭] কবি-হৃদয়ের নানা পরস্পর-বিরোধী সুরের ঐকতানই কবির কাব্য।

(১৬) Charles Dickens by G. K. Chesterton PP. 58
(১৭) World Literature (A Mentor Book) PP. 162.

দ্বিজেন্দ্রলালের বহু কবিতায় ইহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ দেদীপ্যমান। তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলিতেও এই সত্যের মূর্ত প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ, টেনিসন, শেলী, কীটস, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় কবিরাও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। বিশেষ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের একটি চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তিবাদী মন, আদর্শবাদীর আক্ষেপ বা ক্ষোভ, এবং দূরদর্শী কবির আসন্ন বিপদ-আশঙ্কা মূর্ত হইয়াছে—সে চরিত্র চাণক্যের। দ্বিজেন্দ্রলালই যেন চাণক্য। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করিতে দ্বিধা করেন নাই। অপমানের প্রতিশোধ লইয়া অপমানিত শিখাগুচ্ছকে সোল্লাসে রক্তরঞ্জিত করিয়াছেন. চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাটের সিংহাসনে বসাইয়াছেন, ভাঙিয়া-পড়া মুরা ও কাত্যায়নকে ছলে-বলে কৌশলে বক্তৃতার যাদুতে মুগ্ধ করিয়া স্বপক্ষে আনিয়াছেন, অবশেষে মাতৃহারা দস্যু-অপহৃতা কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া দস্যুকে বলিয়াছেন:—"তোমায় এক রাজ্যখন্ড দিব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছ। তুমি আমায় সম্রাট করেছ। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ করে' আবার স্বর্গে উঠিয়েছ। আমি তোমাকে বধ করে' তোমার মূর্তি গড়িয়ে পূজা করব। না না একি! এ আনন্দ না দুঃখ? এ যে—এ যে, না একটা কিছু করতে হবে, যাতে বুঝতে পারি আমি বেঁচে আছি"—। নাটকের গোড়ার দিকে শ্মশানপ্রান্তে দাঁড়াইয়া যে চাণক্য বলিতেছেন—"ঐ বদ্ধ জলার উপর একটা ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিঃশ্বাস আটকে আসছে। ঘেয়ো কুকুরের বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দ পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। প্রভাতের সর্বাঙ্গে ঘা! পুঁজ পড়ছে। হে সুন্দরী বীভৎসতা! তুমি এত সুন্দরী! তাই আমি গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে নিত্য প্রত্যুষে তোমার কদর্যতায় স্নান করতে যেয়ে আসি; তুমি আমায় অনেক শিখিয়েছ প্রেয়সী আমার! তুমি আমায় শিখিয়েছ সংসারকে ঘৃণা করতে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ করতে, ঈশ্বরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোজা হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে। হে সুন্দরী! আমায় সংসার হ'তে আরও দূরে টেনে নিয়ে যাও—যত দূর পারো। নরকে হয় তাও ভালো: শুধু সংসার থেকে যত দূরে হয়"।—সেই চাণক্যই কন্যা আত্রেয়ীকে ফিরিয়া পাইবার পর বলিতেছেন—"আর আমি শাসন কর্তে চাই না। এখন আয় মা (আত্রেয়ীকে) তুই আমায় শাসন কর। তুই এই ভ্রান্ত পুত্রের হাত দুইখানি স্নেহবন্ধনে বেঁধে দে মা—যেমন যশোদা ননী চোরার হাত দুইখানি বেঁধে দিয়েছিল।"

দ্বিজেন্দ্র-জীবনী পাঠ করিয়া যে ব্যক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি—যাঁহার বিড়ম্বিত জীবনের বহু আর্তনাদ, অত্যাচার-অপমানের বিরুদ্ধে যাঁহার বহু সংক্ষোভ, বিরূপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে বহু ব্যাকুল প্রতিবাদ যাঁহাকে বিদ্রোহ-উত্তেজনায় বারংবার উত্তেজিত করিয়াছে, অথচ আবার যিনি ভাব-প্রবণ, স্নেহের কাঙাল, বাৎসল্য রসে অতি কোমল সেই দ্বিজেন্দ্রলালকেই যেন চাণক্য চরিত্রে মূর্ত দেখিতে পাই। শক্তসিংহ চরিত্রেও যেন তাঁহার যুক্তিবাদী অথচ ভাবপ্রবণ মনের আভাস আছে। বস্তুত সমস্ত কবিরাই নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঢালিয়া দেন। কল্পনার আলোকে, রূপের বৈচিত্র্যে, তাহা নানা মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া নানারূপে রসিক চিত্তকে উদ্ভাসিত করে। T. S. Eliot এর—'The three voices

of poetry' নামক যে বিখ্যাত নিবন্ধটি আছে তাহার প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন "The first voice is the voice of the poet talking to himself—or to nobody. The second voice is the voice of the poet addressing an audience, whether large or small. The third is the voice of the poet when he attempts to create a dramatic character speaking in verse; when he is saying, not what he would say in his own person, but only what he can say within the limits of one imaginary character addressing another imaginary character"[১৮] ঃ এই তিনটি voice-ই দ্বিজেন্দ্রকাব্যে শোনা যায়। এই ত্রি-ধারাই সব কবির কাব্যকে ত্রিবেণী-তীর্থ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য হইতে ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধ বড় হইয়া গিয়াছে, এ প্রবন্ধে আর সে সবের স্থান নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বিবিধ কাব্য-রত্নের বিস্ময়কর মঞ্জুষা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল। অনেকে বলেন দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি শেক্সপীয়রের নাটক হইতে, সংস্কৃত নাটক হইতে অনেক ভাব আহরণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্পর্কেও এরূপ একটা গুজব প্রচলিত আছে। শেক্সপীয়র স্বয়ংই এ-দোষ হইতে মুক্ত নন। তাঁহার অনেক নাটকের গল্প তাঁহার নিজের নহে। হ্যামলেট-এর যে রূপ আমরা দেখি তাহা তাহার তৃতীয় রূপ। ইহার পূর্বে অন্য নাট্যকারেরা নাকি ওই একই গল্পকে আরও দুইটা রূপ দিয়াছিলেন। সব বড় সাহিত্যিকের উপরই অন্য বড় সাহিত্যের ছাপ অনিবার্যরূপে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, শেলী, ব্রাউনিং, বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল সঙ্গীত, উপনিষদ, কালিদাস—কত কিছুরই তো প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি রবীন্দ্রনাথ স্বমহিমায় রবীন্দ্রনাথ। পরস্বাপহরণ করিয়া যেমন আমাদের দেহ গঠিত তেমনি প্রতিভাবান লেখক-লেখিকাদের চিন্তা-রশ্মিতে আমাদের প্রতিভাও প্রভাবিত। অন্য লেখকের প্রভাব হজম করিয়া তাহা স্বকীয় প্রতিভার অঙ্গীভূত করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই বড় লেখক। এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়র বা মুদ্রারাক্ষস হইতে চুরি করেন নাই, তাহাদের হজম করিয়া স্বকীয় প্রতিভাবলে নূতন সৃষ্টি করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলাল সামান্য একটা বক্তব্যকে, সামান্য একটা জিনিসকে, ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া অকারণে বৃহৎ করিতেন। ইহাতে নাকি art ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। "এই যদি ঘটে থাকে তাহলে সৃষ্টি ধ্বংস হ'য়ে যাক"—যেখানে এইটুকু বলিলেই চলিত সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"তবে আর কেন? ঈশ্বর আর তাকে রেখো না, এইক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেল। যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ তুমি নীলবর্ণ কেন। সূর্য! তুমি এখনও আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ, নেমে এস। একটা মহাসংঘাতে তুমি চূর্ণ হয়ে যাও। ভূমিকম্প তুমি ভৈরব হুংকারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙ্গে খান খান করে' ফেল। একটা দাবানল জ্বলে' উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে' দিয়ে চলে' যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণী-ঝঞ্ঝা এসে সেই

(১৮) On Poetry and Poets by T. S. Eliot 89.

ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও"।[১৯] এই বাড়াবাড়ি অনেকের ভালো লাগে নাই। কিন্তু G. K. Chesterton-এর মতো নামজাদা শিল্পী ডিকেন্সের কাব্য-জীবন আলোচনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—Exaggeration is the definition of art."[২০] Dickens সম্বন্ধে যেমন, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও তেমনি এ কথা সত্য। পাপিয়া ধাপে ধাপে সুর চড়াইয়া যেমন সুরসপ্তকের শেষ-বিন্দুতে গিয়া 'চোখ গেল' বলে, দ্বিজেন্দ্রলালও তাহাই করেন। তাঁহার বক্তব্য আবেগ-সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মহিমাময় কাব্যে রূপান্তরিত হয়। ধাপে ধাপে ওঠার এই প্রবণতা তাঁহার বাল্যরচনাতেও আছে। আর্যগাথা প্রথম ভাগের একটা ছোট কবিতার আরম্ভ এইরূপ। কবিতাটির নাম দিনমণি,—

"জ্বলন্ত গৌরব! মহান্ সুন্দর
জীবন্ত বিস্ময়! দেব প্রভাকর
মৃত্তিকায় বন্ধ বিস্মিত মানব
পূজে জানুপাতি ক্ষুদ্র নেত্র তুলি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি বা নাট্যকার ছিলেন না, একজন বড় সুরকারও ছিলেন। বিদেশী সুরকে তিনি স্বদেশী করিয়াছিলেন। আর্যগাথা গীতিগুচ্ছ। অনেক প্রসিদ্ধ গানেও তাহার প্রমাণ আছে। আমার মনে হয় গদ্যকে গানের মতো ধাপে ধাপে চড়াইয়া তিনি একটা Climax-এ লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভা বলে। রবীন্দ্রনাথও আমাদের দেশের আর একজন বড় সুরকার। তাঁহার গদ্যও সুরময়। কিন্তু সে সুর দ্বিজেন্দ্রলালের সুর হইতে স্বতন্ত্র। আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত প্রবাস-কালে ইংরেজী ভাষায় Lyrics of Ind রচনা করিয়া সে দেশের রসিক সমাজে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার Lyrics of Ind-এ যে ভাবরাশি প্রস্ফুটিত তাহাও অনেক স্থলে অনন্য। সামান্য একটা উদাহরণ দিই—

"Do not anatomise her beauty
Her true beauty to discover
You must hear her inner music
You must, friend, first learn to love her."

কালিদাস ও ভবভূতি প্রবন্ধেও তাঁহার কাব্য-প্রতিভার আর একটা রূপ দেখা গিয়াছে। রস-বিশ্লেষণেও তাহার প্রতিভা নির্ভীক। ভবভূতির নাটকের শেষ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ভবভূতি এক অঙ্কেই করিলেন অভিনয়ে বিয়োগ ও বাস্তবে মিলন! কিন্তু হইয়া দাঁড়াইল বাস্তবে বিয়োগ ও অভিনয়ে মিলন।......এ নাটক এইরূপে শেষ করিয়া ভবভূতি শুদ্ধ কাব্যকলাকে হত্যা করেন নাই, Poetic Justice-কেও হত্যা করিয়াছেন। একজন অত্যাচারীকে অন্তিমে সুখী দেখিলে পাঠক কি শ্রোতা কেহই সন্তুষ্ট হয় না। ভবভূতি এ নাটক সেইরূপ করিয়াছেন।"—এই নির্ভীকতা শুধু তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নহে, তাঁহার প্রতিভারও বৈশিষ্ট্য।

(১৯) সাজাহান দ্বিতীয় অংক দ্বিতীয় দৃশ্য

(২০) Charles Dickens by G. K. C. PP. 18.

প্রত্যেক কবিই স্রষ্টা এবং প্রত্যেক কবিই তাঁহার নিজের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জগৎ সুন্দর, সে জগৎ অনন্য, এবং সে জগৎ রহস্যময়ও। একটি প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-জগতের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না। সে জগতের সমস্ত উপাদানের পরিচয় দেওয়াও দুঃসাধ্য। কারণ কবির দৃষ্টি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন হইতে কখন কিভাবে যে কত সৌন্দর্য আহরণ করিয়া নিজের সৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন সংক্ষেপে তাহার পরিমাপ করা শক্ত। শেক্‌সপীয়রের ভাষায় "The poet's eye in a fine frenzy rolling doth glance from heaven to earth, from earth to heaven and as imagination bodies forth the forms or things unknown, the poets' pen turns them to shapes and gives to airy nothing a local habitation and a name."

কবি ঐন্দ্রজালিক যাদুকর। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দলের।
নবরসে নববর্ণে করিতেছে আত্ম-আবিষ্কার
খেয়ালী মানব-স্রষ্টা
ক্ষণিকের খেলা-ঘরে বসি';
ক্ষণিকের খেলা তবু হতেছে শাশ্বত।
মানবের সৃষ্টির প্রকাশ
লোক হতে লোকান্তরে
যুগ হ'তে যুগান্তরে
চলিয়াছে মন্ত্রে যন্ত্রে আনন্দে ব্যথায়,
রক্তাক্ত সমারঙ্গনে
পুষ্পাকীর্ণ বাসক শয্যায়
চলিয়াছে তালে ও বেতালে
তারে ও বেতারে
আলোকে আঁধারে
সে বাণীর যাত্রাপথ অনন্ত অসীম।
মহাকাল-পটভূমিকায়
পদচিহ্নগুলি মাঝে মাঝে জেগে আছে শুধু।
আকাশেতে রাজহংস আজও উড়িতেছে
তার পাশে উড়িতেছে প্লেন
সেদিনের শতদল হ'য়েছে সহস্রদল আজি
মৃন্ময় দীপের পাশে জ্বলিতেছে বিদ্যুৎবর্তিকা
জ্বলিতেছে মানুষের মন।

প্রদীপ্ত জ্বলন্ত মনের মহিমাময় অধিকারী কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রণাম জানাইয়া আমার ভাষণ শেষ করিলাম।

স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল

একটা কথা প্রচলিত আছে স্বদেশপ্রেম আমরা নাকি ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। কথাটা সত্য নহে। যে আদিম ভারতবাসীদের পরাজিত করিয়া যাযাবর আর্যগণ এদেশে আসিয়া বসবাস করিতে শুরু করেন তাঁহাদের মধ্যেও স্বদেশ-প্রেম স্বজাতি-প্রেম ছিল। ইহার অনেক প্রমাণ আছে। কারণ স্বদেশ-প্রেম স্বজাতি-প্রেম অন্যান্য নানাবৃত্তির মতো মনুষ্যের মজ্জাগত। আর্যদের সহিত অনার্যদের বহুদিনব্যাপী বহু যুদ্ধই ইহার প্রমাণ। আর্যগণ যখন এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইলেন, যখন তাঁহারা এদেশে আসিয়া বেদ উপনিষদ রচনা করিয়া একটা নূতন সভ্যতার পত্তন করিলেন, ভারতবর্ষকে তাহারা যখন দেবভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়া সে দেশে শত শরৎ বাঁচিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, সে দেশের নদ-নদী গিরি-পর্বত অরণ্য-কান্তারকে দেব-দেবীর নামে চিহ্নিত করিয়া পূজা করিলেন, তীর্থে তীর্থে যখন দেবদেবী ঋষি মুনিদের মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহারা আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করিলেন—তখন তাঁহারা যে এদেশকে ভালবাসেন নাই একথা অবিশ্বাস্য। ইংরেজদের নিকট আমরা শিখিয়াছি 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' (Nationalism)—তাহা ওই স্বদেশ-প্রেমেরই বিকৃত খর্ব সংস্করণ। স্বদেশ-প্রেম মানব-প্রেমকে বহিষ্কার করে না, কিন্তু 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' করে। তাহাতে উদারতা নাই, বিশ্ববাসীর প্রতি সমদৃষ্টি নাই, কিন্তু স্বদেশ-প্রেমে আছে। ন্যাশনালিজ্‌মে বিনয় নাই, হামবড়া ভাবটাই প্রবল। নিজের কুৎসিত জিনিসকেও সুন্দর বলিয়া ঢাক পিটাইয়া জাহির করিবার প্রবণতাটা তাহার বড় বেশী। এই ন্যাশনালিজম্‌ই খর্ব হইতে খর্বতর হইয়া প্রভিনসিয়ালিজম্, (Provincialism) এবং কাস্টিজমে (Casteism) পরিণত হইয়া অবশেষে নিজেদের মধ্যে কুৎসিত দলা-দলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই দলাদলিতেই আমরা এখন নিমজ্জিত। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেম এই দলাদলি-মার্কা ন্যাশনালিজম্ ছিল না। তাহা প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রেমের উপর, বিদ্বেষের উপর নয়। তাঁহার জীবনীকার দেবকুমার বাবু লিখিতেছেন —"তৎকালে মাতৃপ্রেমে মাতোয়ারা দ্বিজেন্দ্রলাল আপন আন্তরিক অসীম আগ্রহেই বাঙ্গালীর এই দেশব্যাপী "স্বদেশী"-আন্দোলনের অতিবড় উৎসাহী অনুবর্তক, সমর্থক ও প্রচারক হইয়াছিলেন—যদিও যে রাজনৈতিক কারণে এ দেশে এই আন্দোলনের আবির্ভাব, তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। দেশাত্মবোধই তাঁহার মনুষ্যত্বকে তাঁহার প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। টাউন-হলে অনুষ্ঠিত সভায় যে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে তিনি ক্ষুব্ধ ও আক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।"[১] এই সময় দেবকুমার বাবুকে একটি পত্রে লিখিতেছেন,—

"আজ নব-জীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা তন্ময় হইয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনে আজ এ কি অপূর্ব আস্বাদ। যাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনারও

(১) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৩৯০-৯১

অতীত ছিল, আজ সেই বিচিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার ধন্য সার্থক হইল। এত সুখও যে আমাদের অদৃষ্টে ছিল তাহা কে জানিত ভাই। ধন্য সুরেন্দ্রনাথ! সার্থক তোমার জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনা। কিন্তু এত আনন্দের ভতরেও একটা কথা যখন আমার মনে হয় তখন আমি আশঙ্কায় উদ্বেগে কিছু ভীত ও চঞ্চল হই। মাকে আমার ভালবাসিব, সেবা করিব, অভিনব সুন্দর সাজ-সজ্জায় নিয়ত অলংকৃত করিব, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-প্রেম-কুসুমে সতত পূজা করিয়া চিত্ত-প্রসাদে ডুবিয়া থাকিব—আমার এই যে সাধ, এই যে আশা, এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুসন্তানের স্বভাবতঃ এ ইচ্ছা হইয়া থাকে, আর যার হয় না সে হতভাগ্য, কুলাঙ্গার, নরাধম। কিন্তু এই যে সব সাধ আকাঙ্ক্ষা এর জন্য আমি বাহিরের সুযোগ বা অবকাশের সন্ধান করি কেন? আর ও সব ভাবোদ্রেকের জন্য আমরা এখন বাহিরের দশটা কারণ ও অবস্থার উপরেই বা নির্ভর করিতে চাই কেন?···যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসায় মার দৈন্য-ক্লেশ দূর করিতে না পারি তবেই ত ভয় হয়—বুঝি বা আমাদের এই পূজা আন্তরিক নহে; তবেই তো ভয় হয়—হয়তো বা আমাদের এ অবস্থা ও ইচ্ছা স্থায়ী নয়, স্বাভাবিক নয়···”[২]

স্বল্পকাল স্থায়ী হুজুকের, সোডা-ওয়াটারের মতো বুদ্বুদময় স্বাদেশিকতার উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। গভীর অনাড়ম্বর, আন্তরিক অকৃত্রিম মাতৃভক্তির মতো তাঁহার স্বদেশ-প্রেম স্বতোৎসারিত সুবিমল নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার আদর্শের চতুর্দিকে নানা রূপে নানা ভঙ্গিমায়, অফুরন্ত রূপলাবণ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়াছে। এ প্রেম তাঁহার বিশ্বপ্রেমের অঙ্গ, সংকীর্ণ ন্যাশনালিজম্ নহে। তাঁহার বিখ্যাত নাটক 'মেবার পতনে' তিনি স্বদেশ-প্রেমের যে ছবি আঁকিয়াছেন, স্বদেশের দুঃখ-দৈন্য-দোষ-শৌর্য বীর্য সমস্ত মিলাইয়া হতাশা-বিষাদ-আনন্দের যে-এক অনুপম কাব্য সৃজন করিয়াছেন, তাহারই মধ্যে 'মানসী' একটি অনবদ্য আশ্চর্য সৃষ্টি। গোবিন্দ সিংহের কন্যা কল্যাণী তাহার মুসলমান স্বামী মহাবৎ খাঁ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে—'তাঁকে ভালবাসায় আমার পাপ নেই?' মানসী উত্তর দিতেছে—'ভালবাসায় পাপ! যে যত কুৎসিত তাকে ভালবাসায় তত পুণ্য! যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পার পাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই এক অনাদি সৌন্দর্যের কিরণ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। এমন হৃদয় নাই যেখানে সেই জ্যোতির একটিও রেখা এসে পড়েনি। তার উপর মহাবৎ খাঁ অধার্মিক নন, তিনি মুসলমান মাত্র। তিনি যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন তাতে কি তিনি এই ভাষার ভোজ-বাজিতে পাপী হয়ে গেলেন?···প্রেমের রাজ্যে সুন্দর-কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই, প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়। তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে। প্রেম-বন্ধন ব্যবধান মানে না। সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃউচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য। মৃত্যুর উপর বিজয়ী আত্মার মতো, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের উপর মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমর···'

(২) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৩৯১-৩৯২

এই সঙ্গীতেই স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় পূর্ণ ছিল। 'মেবার পতন' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে সত্যবতীকে মানসী বলিতেছে :

"মানসী।...আমাদের সেই সাধনা হোক। উচ্চ সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এ জাতি আবার মানুষ হবে।"

সত্যবতী। সে কবে ?

মানসী। যে দিন তারা এই অথর্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখবে ; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বইবে ; যে দিন তারা যা উচিত বা কর্তব্য বিবেচনা করবে নির্ভয়ে তাই করে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। যেদিন তারা যুগ-জীর্ণ পুঁথিকে ফেলে দিয়ে—নব ধর্মকে বরণ করবে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম মানসী ?

মানসী। সে ধর্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। তারপর আর তাদের কিছু করতে হবে না, ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে কুটিল স্বার্থসেবী হয়ে রাণা প্রতাপ সিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবে নির্বাণ প্রদীপ কোলে করে চির জীবন হাহাকার করলেও কিছু হবে না"—

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেমে অশোভন আত্ম-আস্ফালন নাই, আত্মসমালোচনা আছে। আছে আমাদের অধঃপতনে ক্ষোভ, আর আপশোষ। শম্ভুজীর সহায়তা লাভে বঞ্চিত দুর্গাদাসের ক্ষুব্ধ উক্তি স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালেরই অন্তরমথিত হতাশা—

'যোদ্ধা বটে মারাঠা জাত। অদ্ভুত অশ্বচালনা, অদ্ভুত সমর কৌশল, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা। এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা, ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম, কি না হতে পার্ত। না, তা হবার নয়। ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়! হিন্দু জাতি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেয়েছে আর এক হবার নয়। সে তেজ গিয়েছে যাতে কম্পমান আত্মাকে পরের হিতে টেনে নিয়ে যায়। উঠেছিল এই আর্যজাতি—যেদিন ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ছিল, বৈশ্যের নিষ্ঠা ছিল, শূদ্রের কর্তব্যবোধ ছিল। সে সব গিয়েছে ; আর ফির্বার নয়। এখন আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠন কর্তে হবে, নূতন বলে উঠতে হবে, নূতন তেজে কম্পমান হতে হবে...'

দুর্গাদাসের এ আশা সফল হয় নাই। শেষ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে দুর্গাদাস বলিতেছেন—'ব্যর্থ হয়েছি। পার্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নির্জীব হয়েছে। নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি যে পুরবাসীরা নিস্তেজ। ছায়ানিবিড় গ্রামগুলি দিয়ে হেঁটে গিয়েছি, দেখেছি গ্রামবাসীরা নিশ্চেষ্ট উদাসীন। বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গিয়েছি, দেখেছি কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমিকর্ষণ করছে। সমস্ত জাতির প্রাণ নেই। অত্যাচারে প্রপীড়িত হলেও পদাহত স্থবির কুকুরের মতো নিম্নস্বরে একটা গভীর আর্তনাদ করে মাত্র। প্রতিকারের চেষ্টা করে না। মোগল সাম্রাজ্য থাকবে না

বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠবে না।' দ্বিজেন্দ্রলালের এই আক্ষেপ, এই হতাশা, এই বিলাপ তাঁহার বহু গানে, নাটকের নানা চরিত্রের মুখে কখনও গম্ভীর ভাবে কখন ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সুরে মূর্ত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে অন্ধ করে নাই। তিনি বিস্ফারিত সজল নেত্রে দেশের গলদগুলি দেখিয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারের উপায়ও ভাবিয়াছেন।

কবি Goldsmith একটি কবিতার দুই লাইনে যে জাতীয় Patriot-এর কথা বলিয়াছেন—

'The Patriot's boast wherever we roam
His first, best country is ever is at home'

দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু সেই জাতের Patriot ছিলেন না। তিনি দেশের বিবিধ দোষ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিলেন, কিন্তু বিদেশে যেখানেই তিনি মানবতার উৎকর্ষ দেখিয়াছেন সেখানেই তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন।

জনসনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি—Patriotism is the last refuge of the Scoundrels'—জনসনের দেশের লোকের সম্বন্ধেই বেশী খাটে, যে দেশে Patriotism ও Politics প্রায় গলাগলি করিয়া চলে;—এ দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধেও খাটে যাঁহারা এদেশে বিলাতী ধাঁচে পলিটিক্সের রঙ্গমঞ্চে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নানা মুখোশ পরিয়া অবতীর্ণ হন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে খাটে না। কারণ তিনি পেশাদার Patriot ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক কবি, তিনি আদর্শ মনুষ্যত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সে আদর্শ দেশে নাই বলিয়া তিনি বারম্বার আক্ষেপে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, দেশের চারিত্রিক অবরোহণে, অনিবার্য পরাজয়ে, বিগত-মহিমার স্মৃতিতে ব্যাকুল হইয়া তিনি বারবার কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়াছেন। 'মেবার পতন' নাটকে মেবারের পরাজয়ের পর সত্যবতী কণ্ঠে যে মর্মন্তুদ গান উৎসারিত হইয়াছে তাহা দ্বিজেন্দ্রলালেরই বিক্ষত মর্মের অশ্রুসিক্ত আকুল ক্রন্দন—

"ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার
এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে
আজি মা কি গান গাহিব আর।
মেবার পাহাড় হইতে তাহার
নেমে গেছে এক গরিমা হায়
ঘন মেঘরাশ ঘেরিয়া আকাশ
হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার
পিকবর আজ হরষ গান
ফোটে নাক ফুল আসে না আকুল
ভ্রমর করিতে সে মধুপান।
আর নাহি বয় শিহরি মলয়
আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ

মেবার নদীর ম্লান দুটি তীর
করে নাক আর সে কলনাদ।
মেবার পাহাড় শিখরে তাহার
রক্ত-নিশান উড়ে না আর
এ হীন সজ্জা এ ঘোর লজ্জা
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার।"

মেবার একটা রূপক মাত্র, সমস্ত দেশকে লক্ষ্য করিয়াই এ গান তিনি গাহিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার স্বদেশী তিনটি নাটকই—রাণা প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস এবং মেবার পতন—টড-এর রাজস্থান অবলম্বনে মুসলমানী শাসনের কাহিনী, কিন্তু তাঁহার আসল লক্ষ্য ছিল তাঁহার সমসাময়িক অধঃপতিত ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষ ইংরেজের বুটের তলায় নিষ্পিষ্ট, যে ভারতবর্ষের শঠতা, অসাধুতা, নীচতা, কাপুরুষতা ও চাটুকার বৃত্তি তাহার ভবিষ্যৎকে বারম্বার ম্লান করিয়া দিতেছে—সেই ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যেই স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের কবি হৃদয় নানা সুরে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। কখনও তিনি আমাদের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া মৃত্যু-শয্যায় শায়িত প্রতাপের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—'ঐ সেই চিতোর। ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ, যা একদিন রাজপুতের ছিল, আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে—মনে পড়ে আজ আমার পূর্ব-পুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে' গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন। মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমর সিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ যাতে কাগার-নদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুতের শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীর নারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখছি। ঐ সেই চিতোর। তা উদ্ধার করব ভেবেছিলাম কিন্তু পাল্লাম না'......এই একই কথা উদয়পুরের রাজপথে সত্যবতী চারণের দল লইয়া গাহিয়া বেড়াইতেছেন—কবির বীণা গানের ছন্দে বাজিয়াছে—

"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়
যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর
বিরাট দৈন্য দুঃখে তাহার
শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বলিল সেখানে যেই দাবাগ্নি
সে রূপ-বহ্নি পদ্মিনীর
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে
যবন সৈন্য ক্ষত্র-বীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার
রক্ত পতাকা উচ্চ শির
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।"

সেই একই কবির হৃদয় আবার ঔরঙ্গজীবের লক্ষাধিক শত্রু সৈন্য দেখিয়া শৌর্য-বীর্যে-প্রেরণায় জ্বলন্ত মশালের মতো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দুর্গাদাস নাটকে মাড়বারের রাণীর মুখ দিয়া তিনিই যেন গ্রামবাসীদের বলিতেছেন—'তোমাদের গ্রাম, কুটির ছেড়ে চলে' এস। তরবারি লও। ওঠ; এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ় পণ করে' ওঠো! ওঠো যেমন তূরীশব্দে সুপ্ত সিংহ জেগে ওঠে। ওঠো যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে' ওঠে; ওঠো যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গে কল্লোল ওঠে; ওঠো, রাজস্থান জানুক, ঔরঙ্গজীব জানুক যে তোমাদের শৌর্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।' সেই একই কবি সমরক্ষেত্রে যাইবার জন্য দেশবাসীকে উৎসাহ দিতেছেন—

"ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা—
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ওই ডাকে ভারত মাতা।
কে বল করিবে প্রাণের মায়া
যখন বিপন্না জননী জায়া
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে"

কখনও আবার কল্পনা করিতেছেন প্রকৃত দেশ-প্রেমিকের ডাকে দেশ সত্যই বুঝি জাগিয়া উঠিবে। তাই শক্তসিংহ যখন তাহার দাদা প্রতাপ সিংহের নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছেন তাহা তাঁহারই স্বদেশ-প্রেমিক হৃদয়ের সুখ-কল্পনা।

"প্রতাপ। তুমি! সৈন্য কোথায় পেলে?

শক্ত। সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেখান দিয়ে এসেছি চীৎকার করে' বলতে বলতে এসেছি যে, 'আমি প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহ: যাচ্ছি প্রতাপ সিংহের সাহায্যে, কে আসবে এস।—তা শুনে বাড়ির গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এল, পিতা ছেলে ছেড়ে এল, কৃপণ টাকা ছেড়ে এল। রাস্তার মুটে মোট ফেলে অস্ত্র ধর্লে, কুব্জ সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। দাদা, তোমার নামে কি জাদু আছে তুমি জাননা, আমি জানি।"

আবার কখনও কল্পনা করিতেছেন যে ঔরঙ্গজীবের স্তাবক পৃথ্বীরাজও প্রতাপ সিংহ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন এ সংবাদে বড়ই দমিয়া গিয়াছেন:

"পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ তুমি না কি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছ?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী। হায়, হতভাগ্য হিন্দুস্থান! শেষে প্রতাপ সিংহও তোমাকে পরিত্যাগ কর্লে। প্রতাপ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি; আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল যে প্রতাপের গৌরব কর্তে পার্তাম।······

প্রতাপ। পৃথ্বী, লজ্জা করে না যে তুমি, তোমার ভাই, বিকানীর, গোয়ালিয়র, মাড়বার সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান কর্বে, আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজপুতনায় একা আমি, সামান্য দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জন করে' তোমাদের গৌরব কর্বার আদর্শ জোগাব?

পৃথ্বী। হাঁ প্রতাপ! অধম ভালুককে জাদুকর নাচায় কিন্তু কেশরী গহনে নির্জনে গরিমায় বাস করে। দীপ অনেক কিন্তু সূর্য এক। শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্বত গর্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে' থাকে। প্রতাপ! সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে রুক্ষ কেশে অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে তাকে নূতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে, অগ্নির লেলিহান শিখা তাদের কীর্তি প্রথিত করে। তুমি সেই সন্নাসী প্রতাপ!"

কত রকম কল্পনাই না তিনি করিয়াছেন। অত্যাচারী মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তুঙ্গ-শির অনমনীয় চরিত্র ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী বীর প্রতাপ সিংহের ভাস্বর চরিত্র তাঁহার অমর সৃষ্টি। নিজেই তিনি প্রতাপ সিংহ। তাঁহার নিজের তেজ, দীপ্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা এ অবস্থায় পড়িলে নিজে তিনি কি করিতেন, কি বলিতেন তাহাই যেন অনুপম শিল্প সুষমায় প্রতাপ চরিত্র হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাঁহার আর একটি অপূর্ব মহিমাময় সৃষ্টি পৃথ্বীরাজের স্ত্রী যোশী। পৃথ্বীরাজ কবি, আকবরের চাটুকার। তাঁহার স্ত্রী ঠিক তাহার বিপরীত। সামান্য একটু উদ্ধৃত করি—

"পৃথ্বী।...সম্রাট আকবর লোকটা বড় যা তা বুঝি। আসমুদ্রক্ষিতিশানাং—জানো? সমস্ত আর্যাবর্ত যাঁর পদতলে—

যোশী। ধিক, একথা বলতে বাধলো না? একথা বলতে লজ্জায় ঘৃণায় রসনা কুণ্ঠিত হল না? এত দূরে অধঃপতিত? ওঃ, না প্রভু সমস্ত আর্যাবর্ত এখনও আকবরের পদতলে নয়। এখনও আর্যাবর্তে প্রতাপ সিংহ আছে। এখনও একজন আছে যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সম্রাটদত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে—"

দেশ তাঁহার অন্তরতম স্বপ্ন ছিল। জীবন-সাধনার আরাধ্য দেবতা ছিল। প্লেটোর উক্তি—'there can be no affinity nearer than our own country'—একথা দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে অত্যুক্তি নহে। দেশকে তিনি সত্যই অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দেশের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তি ছিলই; কিন্তু দেশের বর্তমান অধঃপতন দেখিয়াও তিনি বারবার বিচলিত হইয়াছেন। তিনি গাইয়াছেন—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে পড়িয়াছে—

> "কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
> কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ
> সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ—'
> যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘিরে আছে আজি আঁধার ঘোর
> কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার কবি-কল্পনা বারবার দেশ-বন্দনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—

"ভারত আমার, ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থ-ক্ষেত্র
... ...
ভারত আমার ভারত আমার, সকল মহিমা হোক খর্ব
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব !"

ভারতবর্ষের রূপবন্দনায় তিনি মুখর হইয়া ভাবে যেন বিভোর হইয়া গিয়াছেন—

"শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে ।"

দেশবাসীকে যেন মিনতি করিয়া বলিতেছেন—

"একবার গালভরা মা ডাকে
মা বলে ডাক মা বলে ডাক
মা বলে' ডাক মাকে
ডাক এমনি করে' আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক ভরে
আর ভায়ে ভায়ে এক হ'য়ে থাক যেখানে যে থাকে
দুটি বাহু তুলে নৃত্য করে' ডাক রে মা মা বলে'
আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে—"

কখনও সাধের বীণা'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"পারো যদি জাগো বীণা—ধর আরও উচ্চতান
গাইব আমি নূতন গানে নূতন প্রাণে কম্পমান
(বীণা) পারো যদি জাগো তবে বেজে ওঠ উচ্চরবে
(আজ) নূতন সুরে গাইতে হবে আমি সঙ্গে ধরি তান
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা সমাজ ভয় যাতে সবাই আবার মানুষ হয়
এমনি গাইতে পারি দয়াময় কর এই বরদান ।"

এই একই কবিতায় আগের কলিতে তিনি গাহিয়াছেন—

"(কোথায় আনন্দেতে উঠব নেচে মরা মানুষ উঠবে বেঁচে
(আমি) পাইনা শুধু সাগর সেঁচে ভাগ্যে শুধুই বিষ-পান ।"

এই বিষ স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালকে বহুবার বহুভাবে পান করিতে হইয়াছে। তাই এই একই কবি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন বহুবার। মনে হয় নিজেকেই যেন তিনি ব্যঙ্গ করিতেছেন, নিজেরই শিরে করাঘাত করিয়া যেন বলিতেছেন—হায় ভগবান, আমরা এই ! মন্দ্র-কাব্যে মুদ্রিত জাতীয় সঙ্গীতটি শুনুন—

"বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে
চৌদ্দশত পুরুষ আছি পরের জুতা খেয়ে

তথাপি যাই মানের লাগি ধরণী মাঝে ভিক্ষা মাগি
নিজ মহিমা দেশ-বিদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে
বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে।
লজ্জা নাই 'আর্য' বলি' চেঁচাই হাসি মুখে
মুখে বলি তা বাজে যে কথা বজ্রসম বুকে।

... ...

কেহই এত মূর্খ নয় সবাই বোঝে, জেনো
হাজারি 'গীতা' পড় তুমি পয়সা বেশ চেনো

... ...

ব্যবসা কর, চাকরি কর নাইকো বাধা কোন
ঘরের কোণে ক্ষুদ্র মনে রৌপ্যগুলি গোণ
চারটি করে' খাও ও পর, স্ত্রীর দু'খানা গহনা কর
আর্যকুল বৃদ্ধি কর ও পার কর মেয়ে
—বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে।"

দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালই ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালে রূপান্তরিত হইয়াছেন। একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

অনেককে বলিতে শুনিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী সঙ্গীতগুলিতে গভীরতর অনুভূতি তেমন নাই। দেশের ভৌগোলিক বর্ণনা ও ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপেই তাহা মুখর। এই সব সমালোচকেরা ভুলিয়া যান যে মায়ের রূপ বর্ণনা এবং গুণ কীর্তন প্রকৃত সন্তানদের বক্ষে যে অনুভূতির সঞ্চার করে, যে আবেগে, যে মাধুর্যে তাহা অন্তরকে প্লাবিত করিয়া দেয় তাহা অবর্ণনীয়। 'মা, তোমার মুখখানি কেমন সুন্দর', 'মা তোমার হাতের রান্না কি অপরূপ', 'মা তোমার চুলের মতো চুল আর তো কারো দেখি নি'—এই সব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ উক্তিগুলি গভীর প্রেম-সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ। যাহার মা রূপসী, যাহার মা মহীয়সী, যাহার মা জগদ্‌বরেণ্যা—সে তো মায়ের এসব কথা শত মুখে বলিবেই। মাতৃবন্দনায় সেটা না বলিলেই অশোভন অস্বাভাবিক হইবে। আমাদের দেশে দেব-দেবীদের বন্দনা ছন্দে-গ্রথিত রূপ ও গুণ বর্ণনা মাত্র। সরস্বতীর ধ্যান—

"তরুণ শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ;
কুচভরণমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে
নিজকর কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকল বিভব সিদ্ধৈঃ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।"

লক্ষ্মীর ধ্যান—

"পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়াং ত্রৈলোক্য মাতরম্
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাম্
রৌক্ম-পদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥"

দক্ষিণা কালীর ধ্যান—

"করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাম
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ পাণিকাম্ ।"

আমি তিনটি মাত্র ধ্যান উদ্ধৃত করিলাম, এই রূপ বহু দেবতার বহু ধ্যান বর্ণিত আছে। সবই রূপ-বর্ণনা সবই গুণ-বর্ণনা। অন্যান্য দেশেও দেব-দেবীর প্রশংসা রূপ-বর্ণনা ও গুণ-বন্দনার বর্ণাঢ্য প্রকাশ। চিরাচরিত এই রীতি অবলম্বন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালও তাই গাহিয়াছেন,—

"সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে,·অমল কমল আনন দীপ্ত
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র
মন্ত্র-মুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্দ্র।"

গাহিয়াছেন—

"মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড় ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কানন তীর
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী-শ্রীর
শৌর্যে স্নেহে ও শুভ্র চরিতে কে সম মেবার সুন্দরীর।"

গাহিয়াছেন—

"ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ,·এমন কালো মেঘে
তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠে পাখীর ডাকে জেগে
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায়·এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।"

গাহিয়াছেন—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ
তার কি না এই ধূলায় আসন তার কি না এই ছিন্নবেশ
উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি—চণ্ডীদাসও গাহিল গান—"

'আমার মা কত সুন্দর' 'আমার মায়ের কত গুণ'—একথা নানাভাবে বলিয়া বলিয়াও তাঁহার যেন তৃপ্তি হয় নাই। স্বদেশপ্রেমিক সব বড় কবিই দেশমাতার

রূপবর্ণনা করিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন—। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানটি মনে করুন

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী
অয়ি নির্মল সূর্য-করোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননীজননী
নীল সিন্ধুজল-ধৌত চরণতল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী !"

কিম্বা গোবিন্দ দাসের—

"উত্তরে চাহিনু ফিরা দূর হিমাচলে
জন্মেছে জাহ্নবী শত পুণ্য পদতলে
সে অমৃত বারি স্পর্শে চিতায় চিতায়
সগর-বীরের বংশ জাগে পুনরায়।
আবার চাহিনু ফিরা সুদূর পশ্চিমে
কুঙ্কুমে কুসুম হাসে দুধ-জমা হিমে
ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু বিপাশা
গদ গদ পঞ্চনদে নাহি ফোটে ভাষা !"

কিম্বা দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরীর বর্ণনা—

"শ্যামাঙ্গী বরষা আজি বিহ্বলা মোহিনী সাজি
এলায়ে দিয়েছে তার মসীবর্ণ কালো কালো চুল
শ্রীকণ্ঠে পরেছে বালা অপরাজিতার মালা
দু কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুমকার ফুল
নীলাম্বরী শাড়িখানি পরি
অপূর্ব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী—"

কিম্বা কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের—

"ভরা কোটি জ্যোতিষ্কেতে মহান নীলাকাশ
মোদের আকাশ সেই যেখানে ধ্রুবতারার বাস
মোদের আকাশ স্বচ্ছ সুনীল দিব্য নীলাম্বর
রাকা চাঁদের সুধার সায়র, রামধনুকের ঘর
কোথায় মোরা ক্ষুদ্র অণু, কোথায় মহাকাশ
আমরা ঘটে-পটেই দেখি তাহার যে বিকাশ—"

কিম্বা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর—

"এ কি দশ-ভুজা মূর্তি ! দশভুজে দশ প্রহরণ
অক্ষম সন্তান তরে স্নেহ-ধর্মে দশদিক করিয়া রক্ষণ
লক্ষ্মীর ঐশ্বর্যরাশি ধনে-ধান্যে দশদিশি উঠে উছলিয়া
বিদ্যাদাত্রী ভারতীর বরবাণী নিঃস্যন্দিত শ্রবণ ভরিয়া
মরি মরি এতরূপ—এত শোভা জননীর কে দেখেছে কবে ?"

কিম্বা কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ভাদুরানী এস ঘরে' কবিতায়—

"নিভায়ে তপন ভাদর গগন ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে
সঘনে গরজি বিজলী চমকে ভ্রূকুটি হানে সে রেগে।
হেরি বাদরের ক্ষণিক ক্ষান্তি পাখী কলতান ধরে
এ হেন বাদরে আদরিনী মেয়ে ভাদুরানী এস ঘরে।

* * * *

ঘন বাড়ন্ত আখের পাতায় আলিপথ গেছে ঢেকে
কাঁকড়া-শামুক-মাছ-ব্যাঙে ভরা নালী গেছে এঁকে বেঁকে
আজি পাট-ক্ষেতে হাতী ডুবে যায়! মন যে কেমন করে
কাঁদিছে দাদুরী আদরিনী মেয়ে ভাদুরানী এস ঘরে।"

কিম্বা কবি করুণানিধানের—

"ভো মহার্ণব নীল ভৈরব
গর্জদ্-জল ভঙ্গে
দূর অম্বুদ-মন্দ্র সমান
তুলিতেছ কার বন্দনা গান
নক্তন্দিব উদ্বোধনের
দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।"

এই সমস্তই দেশের রূপ বর্ণনা। বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত বড় কবিই মায়ের রূপ বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত। হইতে পারে এসব কেবলমাত্র ভৌগোলিক বর্ণনা, কিন্তু দেশের ভূগোল লইয়াই সব দেশের কবিরা পাগল। টেমস, টাইবার নদী ও আল্পস পর্বত লইয়া ওদেশের কবিদেরও উচ্ছ্বাস কম নহে। দ্বিজেন্দ্রলালও এই উচ্ছ্বাসেই প্রমত্ত, মায়ের এই বাহিরের রূপেই তিনি তন্ময়। কিন্তু তাঁহার বর্ণনায়, তাঁহার অপরূপ ছন্দের ঝঙ্কারে, তাঁহার বক্তব্যের বিদগ্ধ স্বচ্ছ ঋজু মহিমায় তাঁহাকে অনন্য করিয়াছে। তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের দীপ্তি তাই আজও দেশের লোকের মনে ঝলমল করিতেছে, চিরকাল করিবে।

সব দেশেরই একটা অন্তরের দিক থাকে, যাহা তাহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, যাহাতে তাহার চরিত্রের পরিচয় দেদীপ্যমান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ইংরেজদের বৈশিষ্ট্য যেমন তাহাদের বণিক বৃত্তি, ফরাসীদের বৈশিষ্ট্য যেমন তাহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তায়,—ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তেমনি ধর্মে।[৪] রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করিয়া গিয়াছেন। একটি মাত্র সনেটে তিনি সে বৈশিষ্ট্যের যে রূপ-প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছেন তাহা অপরূপ, অনবদ্য, অতুলনীয়।

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট-দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।

(৪) দ্রষ্টব্য :—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পৃঃ ১৯-২৩

কর্মীরে শিখালে তুমি যোগ-যুক্ত চিতে
সর্বফল স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু, অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখ সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

ভারতের সংস্কৃতি, বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস—বস্তুত ভারতের সমস্ত মহিমা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিতে বিধৃত। কোনও স্বদেশ-প্রেমিক বড় কবি দেশের অন্তরের বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। দ্বিজেন্দ্রলালও পারেন নাই। তাঁহার নাটকগুলির বহু চরিত্রে উক্ত কবিতার ভাবরাশি জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া মঞ্চে আবিভূর্ত হইয়াছে। তিনি আমাদের জাতীয় মহত্ত্বকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে একটি কবিতায় আবদ্ধ করেন নাই—বহুরূপে স্ফূর্ত করিয়াছেন।

রাণা প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, যোশী, সত্যবতী, অজয়, সালুম্ব্রাপতি, গোবিন্দ সিংহ, গৌতম, রামচন্দ্র, সীতা প্রভৃতি চরিত্র ভারতীয় মহিমাকে মূর্ত করিয়াছে। মুসলমান দিলীর খাঁ এবং মহাবৎ খাঁর চরিত্রেও তিনি সেই মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এমন কি ভ্রাতৃত্যাগী শক্ত সিংহও শেষ পর্যন্ত ওই মহিমায় অভিভূত হইয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি—সে যুগে এবং এখনও আমাদের মনকে স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতের মহত্ত্ব কোথায়, ভারতের সূর্য কোন আকাশ হইতে স্বর্ণ-কিরণ বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়াছে তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি মঞ্চে দেখিলে (এমন কি ঘরে বসিয়া পড়িলেও) আমরা অনুভব করিতে পারি। স্বদেশী আন্দোলনে দেশের সুপ্ত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির ভূমিকা, তাঁহার প্রতাপ সিংহ, মেবার পতন নাটকে চারণ-চারণীদের ভূমিকার মতো, সমরাঙ্গনে তূর্যধ্বনির মতো, আবেগময়, প্রাণময়, সঞ্জীবনী মন্ত্রোচ্চারণের মতো। তাহা আমাদের মনকে মাতাইয়া দেয়, তাতাইয়া দেয়, উল্লাসিত করে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের দুরূহ পথে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানগুলি চিরন্তন পাথেয় সরবরাহ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বদেশী গানের সুরগুলিও তাঁহার নিজের দেওয়া। সে গান শুনিলেই সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কবিশেখর কালিদাস রায় ঠিকই বলিয়াছেন, —"বঙ্গ আমার জননী আমার"—এই গানটি শুনে বাঙালী প্রথম বুঝল ঐ গানের কবিত্বটাই বড় নয়, তার চেয়ে ঢের বড় ওর সুর, যে সুর তারা আগে কখনও শোনে নি। গানের সুর যে হৃদয়কে এ ভাবে জাগিয়ে তাতিয়ে মাতিয়ে তুলতে পারে তা তারা কখনও কল্পনা করেনি। এ গান তার সুরবাহন-সহ একদা প্রত্যাদেশের মতোই তাঁর কণ্ঠে আবির্ভূত হয়—যেন বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো।... দ্বিজেন্দ্রলালের এই গান বাংলার সহস্র সহস্র তরুণ হৃদয়কে শুধু যে অনুপ্রাণিত করেছিল তাই নয়, তরুণ হৃদয়কে জাতীয় সংগ্রামে, বহু দেশভক্তকে সর্বস্ব উৎসর্গ

করতেও প্রণোদিত করেছিল। এই গান দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে একক আবির্ভূত হয়নি, তার পিছু পিছু এল 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ'। এলো 'ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র'—ইত্যাদি।···উত্তরাধিকার সূত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার সঙ্গীতানুরাগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন স্রষ্টা, তাই তাঁর পূর্বসূরীদের পুনরাবৃত্তি বা অনুকরণকে স্বধর্ম মনে করতেন না।···তিনি বাংলার নিজস্ব সুরধারার সঙ্গে ওস্তাদি ধারা মিলিয়ে নতুন সুর সৃষ্টি করলেন এবং তাদের উপযুক্ত বাহনেরও সৃষ্টি করলেন। তাঁর সুরধুনীর মকরও তাঁরই আবিষ্কার'।[৫]

সুরে গানে কবিতায় নাটকে দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল স্বকীয়তার সিংহাসনে সম্রাটের মতো সমাসীন হইয়া আছেন। অনেকে বলেন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, দ্বিজেন্দ্রলালের গান—'বড্ড বেশি sentimental'। এই সব সমালোচকদের মধ্যে অনেকে সত্যকার রসিক লোক আছেন। কিন্তু তাঁহারা রসিক হইলেও ভীরু। তাঁহারা আকাশে মেঘ দেখিলে ঝড়বৃষ্টির ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করিয়া দেন, তেল-ঘি-মসলা দেওয়া গরগরে তরকারির বদলে স্ট্যু কিম্বা সিদ্ধ খান, দোলের দিন রঙের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া বাস করেন, কোন প্রকার উত্তেজনা, উদ্দীপনা, হৈ চৈ বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইঁহারা সাধারণত নিজেদের intellectual বিশেষণে ভূষিত করিয়া গর্ব অনুভব করেন। J. R. Lowell নামক একজন রসিক বিদেশী সাহিত্যিক কিন্তু বলিয়াছেন—"Sentiment is intellectualised emotion; emotion precipitated, as it were in pretty crystals by the fancy"[৬]

রসিক মাত্রেই জানেন এই সব pretty crystals-ই কাব্যকে অলংকৃত করে। বস্তুত কাব্য মাত্রেই sentiment-এর প্রকাশ, কোনও কবির সে প্রকাশ হয়তো কম, কাহারো বা বেশি। কিন্তু sentiment না থাকিলে কাব্যই হইবে না। সেণ্টিমেণ্ট বর্জিত একরূপ কাব্য আছে বটে, কিন্তু সেসব কাব্য লবণ-বিহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশ-প্রেমে দেশকে মাতাইবার জন্যই sentimental নাটক লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মভাব যেখানে দেশের লোকের মর্মে প্রবেশ করিতে পারে নাই দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ণ-বহুল সেণ্টিমেণ্ট অনায়াসে সেখানে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণকে মাতাইয়া ভুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে সব গান বা কবিতা স্বদেশী আন্দোলনের সময় রচিত হইয়াছিল সেগুলিও সেণ্টিমেণ্ট-রঙীন।

অনেকের মতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশী নাটকগুলি অত্যন্ত বেশি sentimental বলিয়া নাকি উচ্চশ্রেণীর নাটক-পর্যায়ভুক্ত নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল দেববাসীকে চিনিতেন, দেশের থিয়েটার সম্প্রদায় এবং নট-নটীরাও তাঁহার অপরিচিত ছিল না। ইহাদের সহিত খাপ খাওয়াইয়াই তিনি নাটক লিখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য

(৫) দ্বিজেন্দ্র-কাব্যসঞ্চয়ন পৃঃ ঞ-ট

(৬) Dictionary of thought PP. 588

ছিল নাটক যেন অভিনয়-সাফল্য অর্জন করে। তাহা না করিলে সবই বৃথা। বিখ্যাত নাট্যকার J. B. Priestley তাঁহার 'The Art of the Dramatist' প্রবন্ধে এই সত্য কথাটা অতি সুষ্ঠুভাবে বলিয়াছেন। —"A dramatist writes for the Theatre. A man who writes to be read and not to be performed is not a dramatist. The dramatist keeps in mind not the printer but a company of actors, not readers but play-goers. He is as closely tied to the theatre as a chef is to a kitchen. His ultimate object, even though, he cannot achieve it by himself, is the creation of something I shall call the 'dramatic experience'.[৭] ......দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকগুলিতে এই 'dramatic experience সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি বারংবার শত শত মুগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনীত হইয়াছে। তাহাদের হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ কম্পিত হইয়াছে, তাহাদের স্বত-উৎসারিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়াছে! এই বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। নাটকের মাধ্যমে তিনি জনসাধারণের চিত্তে ভারতবর্ষের আদর্শ মূর্ত করিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য তিনি মহৎ নাট্যকারও।

দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রবর্তী নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও এই একই হিসাবে মহৎ নাট্যকার। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও কয়েকটি যুগান্তকারী নাটক লিখিয়া অভিনয়-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 'আলিবাবা' অপেরাকে সমালোচকের লেন্সের তলায় ফেলিয়া বিচার করিলে হয়তো অনেক দোষ ধরা পড়িবে, কিন্তু নাট্যজগতে আলিবাবা মৃত্যুঞ্জয়—ওই জাতীয় নাটকের জোড়া বাংলা সাহিত্যে আর নাই। নাটকের জগৎ একটা আলাদা জগৎ। সে জগতের সহিত সাহিত্য-পাঠক-জগতের কোনও সম্পর্ক থাকিবেই, থাকিতেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। নাট্যকার নাট্যামোদীদেরই আরাধ্য। নাট্যকার তাঁহার নাটক লইয়াই মাতিয়া থাকেন, তিনি জনতার চারণ, জনতার কবি বটে, কিন্তু জনতার সঙ্গে বা সমাজের হোমরা চোমরাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় না। কারণ তিনি সাধক। মহাকবি মহানাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া অধ্যাপক ডক্‌টর মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন........'Shakespeare way for about twenty years engrossed in his professional work in London almost losing touch with all strata except the world of players and authors. His detachment, as reflected in his work, is probably traceable to this fact. Had he been more intimate with royalty and the court he would have been another Beaumot or another Fletcher" [৮] ঃ

(৭) The Art of the Dramatist by J. B. Priestley P. 3.

(৮) Elizabethan stage and Audience and Shakespear's plays ;—Lecture delivered in the Aıts college Pilani by Dr. M. M. Bhattacherjee.

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। একটা গানে তিনি নিজেই একথা বলিয়াছেন

"জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান।"

"আমি কারো তোয়াক্কা করি না বাবা" এই ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের সুর। তাই তাঁহার শত্রু জুটিয়াছিল অনেক। শেক্‌সপীয়রেরও জুটিয়াছিল। ভলতেয়ারের মতো লোকও তাঁহার বিরুদ্ধ-সমালোচক ছিলেন ; [৯] টলষ্টয়—'was also a carping critic or Shakespeare' [১০] কিন্তু এসব সত্ত্বেও মহাকবি মহানাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়র নিজস্ব স্বকীয়তায় আজও বিশ্ব-সাহিত্য-দর্পণে সমুজ্জ্বল। ইহার কারণ ডক্‌টর ভট্টাচার্য উক্ত প্রবন্ধেই বলিয়াছেন্—"Shakespeare is universal and reflects the spirit of humanity. He transcends narrow interests, appeals and consideration and rises to a higher place. ......In Elizabethan England he wrote for the nation, not only for the masses or for the gentry or the nobitily."

Shakespeare-ও কাহারও তোয়াক্কা করিতেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি নাটকের জগতে সেই great art লইয়া তন্ময় ছিলেন যাহার সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন—"One criterion of greatness of art is its capacity to attract the interests of the people in the most comprehensive sense of the expression."[১১]

দ্বিজেন্দ্রলালও শেক্‌সপীয়রের সমধর্মী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক সমালোচকেরা তাঁহার নাটক ও স্বদেশী সঙ্গীতগুলির বিচারে সব সময় যে বিশুদ্ধ পক্ষপাতহীন সাহিত্য-বুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন একথা মনে হয় না। কিছু ঈর্ষা, কিছু পরশ্রীকাতরতা, কিছু অভিভাবকী ভঙ্গীতে পিঠ চাপড়ানো—এ সবও ছিল। তাই তাঁহার জীবনে যে সম্মান পাওয়া উচিত ছিল সে সম্মান তিনি পান নাই। শেক্‌স্‌পীয়রও পান নাই।

শেক্‌স্‌পীয়রও পাইয়াছিলেন ঈর্ষা ও ক্রোধ। "His growing popularity as a playwright excited the anger and jealousy of Green."[১২] দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনেও এসব ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যে 'বিম্ববতী' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। সে কবিতায় রানী বার বার নানাসাজে সাজিয়া মন্ত্র-পড়া মায়াময়কনক-দর্পণের সম্মুখে বারবারই প্রশ্ন করিতেছে—"সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে"। কিন্তু হায় দর্পণে বারবার যে ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা

(৯) ঐ
(১০) ঐ
(১১) ঐ
(১২) ঐ

তাঁহার ছবি নয় তাঁহার সতীনের মেয়ে বিম্ববতীর 'মধ্মাখা হাসি-আঁকা' ম্খ। অবশেষে রানী দর্পণ দ্রে ফেলিয়া দিয়া রাগে হতাশায় হিংসায় প্রাণত্যাগ করিলেন— কিন্তু দর্পণে তখনও বিম্ববতীর হাসিমাখা ম্খটিই ফ্টিয়া রহিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের বির্দ্ধ সমালোচকরা আর নাই, দ্বিজেন্দ্রলালও আর নাই— কিন্তু মহাকালের দর্পণে স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার অম্লান মহিমার 'বিম্ববতী' আজও ঝলমল করিতেছে। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল ছটায় বঙ্গ-সাহিত্যের আকাশ এবং বঙ্গবাসীর চিত্ত আজও প্রদীপ্ত।

এই স্বদেশপ্রেমের জন্য তিনি অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজ উপর ওয়ালারা এজন্য তাঁহার উপর র্ষ্ট ছিলেন। যোগ্যতা সত্ত্বেও ভালো পদে তিনি অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। এই স্বদেশপ্রেমের জন্যই—বস্তুত স্বদেশের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'যৌবনস্বপ্ন' নামক প্স্তকের কয়েকটি কবিতা তিনি লালসা-ক্লিন্ন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবান কবি যদি এই ধরণের কবিতা লেখেন দেশ উৎসন্নে যাইবে। তাঁহার এই মতবাদ ভুল কি নির্ভুল তাহা আলোচনা করিব না। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে দেশের ও সাহিত্যের মঙ্গলের জন্যই তিনি এই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এজন্য রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার শত্র্ হইয়াছিল। ইহা তাঁহার পক্ষে স্খের ছিল না। বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। যাহা করিয়াছিলেন তাহা কর্তব্যবোধেই করিয়াছিলেন, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য করিয়া ছিলেন। কোনও প্রেমের পথই কুস্মাস্তীর্ণ নহে। স্বদেশ-প্রেমের তো নহেই। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি—যখন তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল তখন। কল্পনায় তিনি স্বদেশকে মহিমার শিখরে তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁহাকে বারবার আবিষ্কার করিতে হইয়াছে দেশ দ্র্দশার নরককুণ্ডে শায়িত। যাহাকে রাজরাণী ভাবিয়াছিলেন আসলে সে ভিখারিণী। তাঁহার স্বদেশবাসীর মধ্যে রাণাপ্রতাপ সিং বা দ্র্গাদাস বিরল, কিন্তু উমিচাঁদেরা অজস্র। অবশেষে তাই তাঁহাকে গাহিতে হইয়াছে—

"কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মান্ষ হ'
গিয়াছে দেশ দ্ঃখ নাই আবার তোরা মান্ষ হ'
পরের 'পরে কেন এ রোষ নিজেরই যদি শত্র্ হ'স
তোদের এ যে নিজেরই দোষ আবার তোরা মান্ষ হ'।"

কিন্তু তব্ তিনি রণক্ষেত্র হইতে কখনও পলায়ন করেন নাই, তাঁহার স্বদেশপ্রেমের স্র কখনও নিস্তেজ হয় নাই, কখনও মন্দের সহিত তিনি আপোস করেন নাই, নিজের লাভ ক্ষতির দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই, আমরণ সেই য্দ্ধ ক্ষেত্রে তিনি য্দ্ধ করিয়া গিয়াছেন—যে য্দ্ধক্ষেত্রে তাঁহারই ভাষায়—

"সেথা নাহি অন্নয় নাহি পলায়ন সে ভীম সমর মাঝে
সেথা র্ধির-রক্ত অসিত অঙ্গে
ম্ত্যু ন্ত্য করিছে রঙ্গে
তীব্র আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়-বাদ্য বাজে।"

স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে আর্তনাদের সঙ্গেই বিজয় বাদ্য বাজিয়াছে। কিন্তু আর্তনাদ তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই, বিজয়-বাদ্যের উন্মাদনায় তিনি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হন নাই। তিনি প্রেমিক ছিলেন, তিনি স্বদেশকে জাগাইতে আসিয়াছিলেন, তাহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলি এখনও তাঁহার দেশবাসীকে জাগাইতেছে। তাঁহারই রচিত একটি কীর্তনের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করি—

"ওকে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়
পথে পথে ওই নদীয়ায়—
ওকে যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে
ওকে দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে
দেখে যারে তোরা দেখে যা—"

ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলাল

মানব সভ্যতার শোভাযাত্রায় সাহিত্যের আবির্ভাব যখনই ঘটিয়া থাকুক তখন হইতেই আমরা রঙ্গ-ব্যঙ্গের কিছু কিছু আভাস পাই। রঙ্গ-ব্যঙ্গ মানব-মানসের অপরিহার্য প্রয়োজন। যাহা অশোভন যাহা অন্যায় যাহা স্বার্থ-বিরোধী তাহার বিরুদ্ধে মানব চিরকালই প্রতিবাদ জানাইয়াছে। প্রতিবাদ জানানোটাই জীবন্ত প্রাণের লক্ষণ। আদিম মানব নখ-দন্ত বিস্তার করিয়া সে প্রতিবাদ করিত, সভ্য মানবও যুদ্ধক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নখদন্ত বিস্তার করে, কিন্তু তাহার সাহিত্যিক রূপ রঙ্গ-ব্যঙ্গ। অতি প্রাচীনকালের সাহিত্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের বর্ণ-বিন্যাস কখনও প্রচ্ছন্ন-রূপে কখনও বা অতি প্রকট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশোপনিষদের এই শ্লোকটির কথাই ধরুন

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
তত ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রত।"

যাহারা অবিদ্যার উপাসক তাহারা অন্ধ তমোলোকে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরের লাইনেই শ্লেষ করিয়া বলিতেছেন যাঁহারা বিদ্যায় রত তাঁহারাও প্রবেশ করেন অধিকতর অন্ধকারে। আমার মনে হয় এই শ্লোকটির মধ্যে ব্যঙ্গের স্ফুলিঙ্গ আছে।

রামায়ণে রাবণের মহিমাকে ধূলিসাৎ করিয়া বীর হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড, রাবণের দরবারে আসন না পাইয়া লাঙ্গুল পাকাইয়া বিরাট মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর উপবেশন—এ সমস্তই ব্যঙ্গ-রসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কালনেমির লঙ্কাভাগের কথা এখনও ওই জাতীয় ধূর্তকে দেখিলেই আমাদের মনে পড়ে।

মহাভারতেও ব্যঙ্গরস কম নাই। বড় বড় রথী মহারথীরা দুর্যোধনকে পাপী জানিয়াও নিমকের খাতিরে তাহার পক্ষ ত্যাগ করেন নাই, দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ কালেও

তাঁহাদের ধৈর্য বিচলিত হয় নাই 'প্রভুর পদে সোহাগ মদে দোদুল কলেবর' তাঁহারা নিজ নিজ আসনে অলজ্জিত হইয়া সমাসীন রহিলেন। ইহাও মস্তবড় একটা ব্যঙ্গ। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে—জাতকে, হিতোপদেশে, পঞ্চতন্ত্রে, কথাসরিৎসাগরে —ব্যঙ্গের বহু নমুনা পাওয়া যইবে। বিদেশের সাহিত্য 'আরব্য-উপন্যাস'তো রঙ্গ-ব্যঙ্গের একটি খনি। বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের মধ্যে মহাকবি কালিদাস ছিলেন। সুতরাং সে সভা যে সাহিত্যিক রঙ্গ-ব্যঙ্গের হাস্যকলরবে মুহুর্মুহু মুখরিত হইত এ কথা অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না। যে পুরুষকার লইয়া আমাদের এত গর্ব সেই পুরুষকারকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন কবি কালিদাস। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

নেতা যস্য বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বজ্রং, সুরাঃ সৈনিকা
স্বর্গে দুর্গং, অনুগ্রহঃ খলু হরেরৈরাবতো বাহনঃ
ইত্যাশ্চর্য বলান্বিতোঽপি বলিভি র্ভগ্নঃ পরৈঃ সঙ্গরে
তদ্‌ব্যক্তং ননু দৈবম্‌ এব শরণং ধিক্‌ ধিক্‌ বৃথা পৌরষম্‌।

[বৃহস্পতি যাঁহার নেতা, বজ্র যাঁহার অস্ত্র, দেবতারা সৈনিক, স্বর্গ যাঁহার দুর্গ, শ্রীহরির অনুগ্রহ যিনি লাভ করিয়াছেন, ঐরাবত যাঁহার বাহন এই প্রকার অদ্ভুত বলশালী সুরপতি ইন্দ্রও যুদ্ধকালে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে দৈবই মানুষের একমাত্র শরণ ; পুরুষকারকে ধিক্‌]

সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যঙ্গের এরূপ বহু নিদর্শন আছে। আর একটি অনুরূপ শ্লোক মনে পড়িতেছে। শ্লোকটির রচয়িতা কে জানি না—

পিযূষেণ সুরাঃ শ্রীয়া মধুরিপু, মর্য্যাদায়া মেদিনী
শক্রে কল্পরুহৈ, শশাঙ্ক কলয়া শ্রীশঙ্কর তোষিত,
মৈনাকাদি নগা মামোদরগতা স্নেহেন সংবর্ধিতা
মজ্জুলিকরণে ঘটোদ্ভব মুনি কে না পি নো বারিতা।

সমুদ্র দুঃখ করিয়া বলিতেছেনঃ—আমি দেবতাদের সুধা দিয়াছিলাম, ভগবানকে লক্ষ্মী দিয়াছিলাম, পৃথিবীকে মর্যাদা দিয়াছিলাম, ইন্দ্রকে কল্পতরু দান করিয়াছি, মহাদেবের ললাটে চন্দ্র-কলা স্থাপন করিয়াছি, মৈনাক প্রভৃতি নগেরা যখন ভয়ে আমার উদরে আশ্রয় লইল, তখন আমি তাহাদের সস্নেহে সংবর্ধিত করিয়াছি। কিন্তু ঘটোদ্ভব মুনি অর্থাৎ অগস্ত্য ঋষি যখন গন্ডুষে আমাকে পান করিতে উদ্যত হইলেন কেহই আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিল না।

ব্যঙ্গরসের এরূপ আরও বহু শ্লোক আছে, যথা—

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।

কাকের ঠোঁট যদি সোনার হয়, দুই পায়ে যদি মাণিক থাকে প্রত্যেক ডানা যদি গজরাজ-মুক্তা-শোভিত হয়—তবু কাক কাকই থাকে, রাজহংস হয় না। ভবভূতির এই বিখ্যাত শ্লোকটি শুনুন—

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন
অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ, মা লিখ।

হে ব্রহ্মা, অন্য যাহা কিছু দুঃখ তুমি দাও সহ্য করিব।
কিন্তু অরসিকের কাছে রসনিবেদনের দুঃখ আমাকে দিও না।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য এরূপ শত শত ব্যঙ্গ রচনায় অলঙ্কৃত। আকবর বাদশাহের সভায় বীরবল ছিলেন। তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গ প্রদীপ্ত শাণিত ও বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। আকবর বাদশাহের মহিমা ম্লান হইয়া আসিয়াছে কিন্তু রসের জগতে আজও বীরবল অমর হইয়া আছেন। গোপাল ভাঁড়কেও আমরা ভুলি নাই। কাব্যশাস্ত্রে যে দশটি রসের উল্লেখ আছে তাহাতে ব্যঙ্গ রসকে কোনও পৃথক স্থান দেওয়া হয় নাই। ব্যঙ্গ রস বস্তুত একটি রস নহে। একাধিক রসের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। হাস্য, রৌদ্র, এবং অদ্ভুত এই তিনটি রসের প্রভাবই ব্যঙ্গরসে কিছু কিছু আছে। এই ব্যঙ্গ রসে বাঙালীর জীবন অভিষিক্ত। যে সব প্রবচন, প্রবাদ ও ছড়া লোকমুখে বাঁচিয়া আছে তাহাদের মধ্যেও ব্যঙ্গরসের ছড়াছড়ি। 'কত সাধ যায়রে চিতে মলের আগে চুটকি দিতে' 'কানা গরুর ভিন্ন গোয়াল' 'থাকরে কুকুর আমার আশে ভাত দিব তোরে পৌষমাসে' 'ধান নাই চাল নাই আন্দিরাম মহাজন' 'নিজের বেলায় আঁটি সাঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি'—ব্যঙ্গরসের এরূপ অনেক প্রবচন বাঙালীর মুখে মুখে আজও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় এইরূপ একটি প্রবচন সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-রসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ওই সংগ্রহে ব্যঙ্গপ্রিয় বাঙালীর ব্যঙ্গপ্রবণতার অনেক উদাহরণ মিলিবে। ছোট ছোট ছড়াতেও ব্যঙ্গরসের ছড়াছড়ি ঃ যেমন "আম শুকালে আমসী ঃ যৌবন ফুরালে কাঁদতে বসি"—কিম্বা

"ঠকিলাম লো দিদি ঠকিলাম লো
হাটে বাজারে গিয়ে মিশি কিনে আনিয়ে
আয়না খুলিয়া দেখি দাঁত নাহি লো!"

এই ছড়াটি সাহিত্যিক বাংলায় আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে ঠিক এই রূপ দিতে পারি নাই। আর একটি শ্লোকেরও করিয়াছিলাম—শ্লোকটি মনে নাই। অনুবাদটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"দারোগা হইল যবে গোবর্ধন গোফ,
শালা তার সেই সূত্রে রাখিলেন গোঁফ।"

আমাদের সামাজিক জীবনে শালা-শালী-বউদিদি-বেয়াই বেয়ানদের সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক সে মাধুর্যের মধ্যে ব্যঙ্গ পরিহাসের আমেজ কম নয়। বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি লোকসাহিত্য হাস্যরসে ও ব্যঙ্গরসে ভরপুর। অতি প্রাচীন কালের সাহিত্যেও ইহার অনেক উদাহরণ আছে। কবিশেখর কালিদাস রায় বলিয়াছেন "কিন্তু তা সভ্যজনের উপভোগ্য নয়। তাতে আছে সঙের খেলা, ভাঁড়ামি, অশ্লীলতা এবং গালাগালি। প্রাকৃত জনসমাজে এসব হাস্যরসের রচনা বলে গণ্য হয়েছিল। এই কদর্যতা চরমে উঠেছিল কবির লড়াইয়ে ও খেউড়ে"।[১] প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে না উল্লেখ করিয়া পারিতেছি না। বর্তমান-যুগে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার পর যাহা সভ্যজনের 'উপভোগ্য' হইয়াছে দেখিতেছি

(১) দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন পৃঃ দ

তাহাও কম অশ্লীল বা কদর্য নহে। পথে ঘাটে স্টেজে সিনেমায় মঞ্চে উৎসবে ব্যসনে কামিনীদের যে সব আবরণ-থাকা-সত্ত্বেও উলঙ্গিনী মূর্তি দেখি, নাম-করা সাহিত্য-পত্রিকাগুলিতে যে ধরণের অশ্লীল কদর্য গল্প উপন্যাস ছাপা হয়, আর্টের নামে এবং ফোটোগ্রাফির কৌশলে যে-ধরণের নির্লজ্জ ছবির আবির্ভাব প্রত্যহ দেখি, তাহাতে মনে হয় আধুনিক সভ্যজনের উপভোগের মানদণ্ড নিশ্চয়ই বদলাইয়াছে। যাঁহারা পূর্বে 'বাইনাচ' দেখিয়াও শিহরিয়া উঠিতেন, তাঁহারাই আজকাল টাইট-প্যাণ্ট পরা যুবতীর টুইস্ট নাচ বা হুলাহুলা নাচ অবিচলিত ভাবে বসিয়া দেখিতে সক্ষম। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে সেকালের খিস্তি খেউড়ও সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য। সেকালের ওই কবিরা সব সময়ই অশ্লীল কবিতা লিখিতেন না। বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা (১৭৭৫—১৮৫১) জাড়াগ্রাম প্রসঙ্গে চাটুকার যজ্ঞেশ্বর ধোপাকে গানে যে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন তাহা এ যুগের মার্জিত শ্রবণে হয়তো খুব বেশি বেসুরা মনে হইবে না।

"কেমন করে' বললি জগা জাড়া গোলক বৃন্দাবন
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা চৌদিকে তার বাঁশের বন।

... ...

বাবুতো বাবু লালাবাবু কোলকাতাতে বাড়ি
বেগুন পোড়ায় নুন দেয়না এ বেটারা তো হাড়ী
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায় মুফতের মধু অলি
মাপ কর গো রায় বাবু দুটো সত্যি কথা বলি
জগা ধোপা খোশামুদে অধিক বলব কি
তপ্তভাতে বেগুন পোড়া পান্তা ভাতে ঘি॥"

কবি মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে রঙ্গ-ব্যঙ্গের নিদর্শক অনেক আছে। মুরারি শালের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া সে কালের খল কপট বণিক সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন মুকুন্দরাম। কালকেতু বাড়িতে আসিয়াছে ভাবিয়া মুরারি সঙ্গে সঙ্গে পলাতক

'বেনে বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা-জোখা করে টাকাকড়ি
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বেড়া
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি।"

কিন্তু মুরারির স্ত্রী পলাইল না। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল:

'বীরের শুনিয়া বাণী হাস্যে বলে বান্যানী
ঘরেতে নাহিক পোতদার
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার
আজি, কালকেতু যাও ঘর।'

শুধু তাহাই নয়, ধার তো শোধ করিলই না আরও দুইটা ফরমাস করিল:

'কাষ্ঠ আন্য একভার একত্র শুধিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিও বদর।'

চতুর বণিকের স্ত্রী আরও চতুর। মুরারি শীলের চরিত্রটি রঙ্গে-ব্যঙ্গে চমৎকার। কবিকঙ্কণের গুজরাট নগরে প্রজাপত্তন, মুসলমানদের বর্ণনা, সর্বোপরি তাঁহার 'উজ্জ্বল জীবন্ত পাষণ্ড' ভাঁড়ু দত্তের সৃষ্টি তাঁহার ব্যঙ্গ-প্রতিভার পরিচয় দান করে। আজু গোঁসাই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের কবি। তিনি প্যারডি রচনায় সুদক্ষ ছিলেন। তিনিই অনেকের মতে বাংলাসাহিত্যে প্রথম প্যারডি লেখক। 'এ সংসার ধোঁকার টাটি' কবিতার প্যারডি—'এ সংসার রসের কুটি, খাই দাই আর মজা লুটি'। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। রায়গুণাকরও তাঁহার সৃষ্টিতে ব্যঙ্গ রসের অনেক নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে তিনি উর্দু ফার্সি শব্দও ব্যবহার করিতেন। 'ভট্ট কহে কোতোয়ালে ঐসারে গারি মত দিজিয়ে ···সমুঝকে বাত কীজিয়ে।' নীলাচল-লীলা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদের যে ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা এখনও উপভোগ্য ঃ

"খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত নাচিব গাইব কুতুহলে
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।"

বিদ্যাসুন্দরে রঙ্গব্যঙ্গ হাস্য-রসের অভাব নাই। সুন্দরকে দেখিয়া নারীদের পতি-নিন্দা উপলক্ষে কবির প্রতি কবি-পত্নীর ব্যঙ্গোক্তি ঃ

"মহাকবি মোর পতি কত রস জানে
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।"

ইহা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতাটা মনে পড়িয়া যায় ঃ

"সেদিন বরষা ঝর-ঝর ঝরে কহিল কবির স্ত্রী
রাশি রাশি মিল করিয়াছ-জড় রচিতেছ বসি পুঁথি বড় বড়
মাথার উপরে বাড়ি পড় পড়—তার খোঁজ রাখ কি ?"

বঙ্গ-সাহিত্যের উষাকালে দুইটি প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ রচনার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। 'আলাল' ও 'হুতোম'। ইহাদের সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"আলাল ও হুতোমে আমরা ব্যঙ্গের এক উদার সার্বজনীন বিস্তৃতির পরিচয় পাই।" ইহার পরই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করিতে হয়। তিনি চন্দ্র নহেন সূর্য। তাঁহার উদয়ের সঙ্গে নানা দিকে নানা বিহঙ্গের কাকলী শোনা গেল, কাননে কাননে বিবিধ ফুল ফুটিল—চারিদিকে একটা সাড়া পড়িল, প্রাণ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইল। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন যুগের সূচনা করিলেন। ব্যঙ্গ রচনার সুস্থ সবল মনোহর গ্রাম্যতাবর্জিত রূপ তাঁহারই প্রতিভার ভাস্বর দ্যুতিতে বাংলা সাহিত্যকে ভূষিত করিল। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তরে, তাঁহার মুচিরামে, তাঁহার লোক রহস্যে, তাঁহার উপন্যাসের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা চরিত্রে ব্যঙ্গের এবং হিউমারের প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটিল। তিনি অনেক ব্যঙ্গ কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'অধঃপতন' সঙ্গীত হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"যাব ভাই অধঃপাতে কে যাইবি আয় সাথে
কি কাজ বাঙ্গালি নাম রেখে ভূমণ্ডলে

লেখা-পড়া ভস্ম ছাই কে কবে শিখেছে ভাই
লইয়া বাঙ্গালি দেহ এই বঙ্গস্থলে
হংস পুচ্ছ ল'য়ে করে কেরানীর কাজ করে
মুন্সেফ চাপরাশি আর ডিপুটি পেয়াদা
অথবা স্বাধীন হ'য়ে ওকালতি পাশ ল'য়ে
খোসামুদি জুয়াচুরি শিখেছি জেয়াদা
সার কথা বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কাজ নাই
কি কাজ সাধিব মোরা এ সংসারে থাকি
মনোবৃত্তি আছে যাহা ইন্দ্রিয় সাগরে তাহা
বিসর্জন করিয়াছি কিবা আছে বাঁকি ?
কেন দেহভার বয়ে যমে দাও ফাঁকি।"

কবিতাটি দীর্ঘ। আমি একটি কলি (stanza) মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক ব্যঙ্গ কবিতার মূল ভাব এই 'অধঃপতন' সঙ্গীতে আছে। অবশ্য সে সবের বলিবার ভঙ্গী বিভিন্ন। বঙ্কিমের ঠিক পূর্বে আরও দুইজন প্রতিভাধর কবি বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গ-রসের আমদানি করিয়াছিলেন—ঈশ্বরগুপ্ত ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন দত্তের দুইখানি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আজও আমাদের মনে ব্যঙ্গরসের উদাহরণস্বরূপ হইয়া আছে। ঈশ্বরগুপ্ত অনেক ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সে সব কবিতায় তাঁহার পূর্ববর্তী যুগের রং ও গন্ধ রহিয়া গিয়াছে। কবিতাগুলিতে রঙ্গরস থাকিলেও কিছু আঁশটে এবং প্রচুর রসুন পেঁয়াজের গন্ধ আছে। সাত্ত্বিক রুচিবাগীশদের নিকট তাই তাহা আজকাল তেমন সমাদৃত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য ও অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর তিনিই একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া গিয়াছেন। সে ভূমিকা হইতে অল্প একটু উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের ভক্ত হইলেও সমালোচনার সময় তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টি ভক্তি-ভাবে ঝাপসা হইয়া যায় নাই। তিনি লিখিয়াছেন 'অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতায় এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বর প্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায় অনুপ্রাস-যমকের ঘটায় তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময় একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায় কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয় পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না।...অনুপ্রাস যমক যে সব সময়ে দূষ্য এমন কথা বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য শুনায় বটে কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময় বড় মধুর।...বাঙ্গালাতেও তাই।...ঈশ্বরগুপ্তের এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—'বিবিজান চলে যান লবেজান করে'।' ঈশ্বরগুপ্তের দেশ-বাৎসল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। একথা বিশেষভাবে এই জন্য উল্লেখ করিতেছি, কারণ দেশ-ভক্তিই অনেক সময় ব্যঙ্গ-কবিতায় আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেমই ব্যঙ্গ কবিতায় রূপায়িত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেশ-বাৎসল্যের উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গলা দেশে—দেশবাৎসল্যের প্রথম

নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইলেও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন ঃ—

'ভ্রাতৃ ভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'

তাঁহার কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতার টুকরা উদ্ধৃত করি।

মেম সাহেব দেখিয়া ঃ—

'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে
আহা তায় রোজ রোজ কত 'রোজ' (rose) ফোটে
ঢলঢল টলটল বাঁকা ভাব ধরে
বিবিজান চলে যান লবেজান করে।' (ইংরেজী নববর্ষ)

মহারাণীর স্তুতি-পরায়ণ Agitator-দের কান ধরিয়া টানাটানি—

'তুমি মা কল্পতরু আমরা সব বোঝা গরু
শিখি নি সিং বাঁকানো
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙেনা
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব
ঘুসি খেলে বাঁচব না!'

বিলাতী ভাবাপন্ন সাহেব বাবুদের তিনি কম ব্যঙ্গ করেন নাই—

'যখন আসবে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে
বুঝি হুট বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে—'

এই সব কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক ব্যঙ্গ কবিতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাব এক। আমার মনে হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার সহিত ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-মানসের খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

ব্যঙ্গ-সাহিত্যের রস-ভান্ডারে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের দানও অসামান্য। তাঁহার 'জামাই বারিক' 'সধবার একাদশী,' 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি স্মরণযোগ্য ব্যঙ্গ-রচনা। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত—'তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাঁহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কাল-ক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।"

ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রভাকর' বঙ্গসাহিত্য গগনে, বহুকাল প্রভাবিকীর্ণ করিয়াছিল; আমার বিশ্বাস

দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁহার প্রতিভার আওতায় পড়িয়াছিলেন, যদিও তাঁহার ব্যঙ্গরচনায় অভব্য বা অশ্লীল কিছু নাই। ঈশ্বর গুপ্তের সব কবিতাই অশ্লীল নহে। তাঁহার তপ্‌সে মাছের প্রতি কবিতা—

"কষিত কনক-কান্তি-কমনীয় কায়
গাল-ভরা গোঁফ দাড়ি তপস্বীর প্রায়
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে।"

কিম্বা বাঙালী মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া লেখা—

'সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি
নশী জশী ক্ষেমি বামী রামী শ্যামী গুল্‌কি।'

এসব কবিতা অশ্লীল নহে। এই ধরণের কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানেও আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো ঈশ্বরচন্দ্রও বাংলা কবিতার মধ্যে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—

'হিপ হিপ হুররে ডাকে হোল ক্লাস
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস্ গ্লাস।'

দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু পূর্বে রসরাজ অমৃতলালও রঙ্গরসে হাসির নাটকে, ব্যঙ্গ রচনায় বাঙালী সমাজকে মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার 'খাসদখল' যদিও একটি বিশেষ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত তবু তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমসাময়িক ব্যঙ্গকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের আকাশে Halley's comet—যখন ফুটিয়া ওঠে তখন উহার প্রভায় দশদিক আলোকিত হইয়া ওঠে, পরন্তু সবাই উহাকে দেখিয়া ভয় পায়। কে জানে কাহার কোন্ অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, আর দেশশুদ্ধ লোক তাহা দেখিয়া হাসিবে আর হাততালি দিবে"।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই সমগ্র ইন্দ্রনাথ সাহিত্য আমাদের চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিব না।

অতি সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রসের যে পটভূমিকা রচনা করিলাম সেই পটভূমিকার উপরই ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যের অনেক রসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রঙ্গ-ব্যঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই বৎসরের শারদীয়া কথা-সাহিত্যে কবিশেখর কালিদাস রায়ের আলোচনাটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রসিকের অতি মনোজ্ঞ সহৃদয় আলোচনা। ব্যঙ্গকারকে সাহিত্যের আমির ওমরাহদের দরবারে সাধারণত বড় আসন দেওয়া হয় না। তাঁহার কৃতিত্বটা কেহ যেন আমলের মধ্যে বা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতে চায় না। Gilbert Highet তাঁহার The Anatomy of Satire গ্রন্থের প্রথম পাতার প্রথম লাইনেই বলিয়াছেন—'Satire is not the greatest type of literature. It cannot, in spite of the ambitious claims of one of its masters, rival tragic drama and epic poetry.' যে লেখক লেখনীর চাবুক লইয়া অসাধু, ভণ্ড বা চোরকে চাবকান অথবা দশজনের

সমক্ষে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাকে অপদস্থ করেন, আহত ও অপমানিত ব্যক্তিরা সে লেখকের প্রতি কখনও প্রসন্ন হইতে পারে না। সর্বদেশের সর্বসমাজেই অসাধু, ভণ্ড ও চোরের সংখ্যা অনেক। সুতরাং অধিকাংশ লোকই ব্যঙ্গকারের উপর চটিয়া যায়, এমন কি সমালোচক এবং সাহিত্য বিচারকরাও। কারণ তাঁহাদের পিঠেও কোনও ব্যঙ্গকারের কশাঘাত যে পড়ে নাই তাহা কে বলিবে? শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকারের চাবুক শুধু নিজের সমাজে এবং নিজের কালেই আবদ্ধ নহে। সে চাবুকের শপাশপ শব্দ যুগ হইতে যুগান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়! তাই ওই খুঁতধরা লোকটার উপর কেহ খুশী হইতে পারে না। তাই সব সাহিত্যের সুধী সমালোচকরা বলেন—'Satire is not the greatest type of literature'—ইহা বলাই স্বাভাবিক। গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স্ পুস্তকের লিলিপুটেরা বা ব্রবডিংন্যাগরা নানাবেশে মানব সমাজের সর্বস্তরে সর্বদা বিরাজমান। Swift রূপক ব্যঙ্গকাব্যে তাহাদেরই স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাই তাঁহার উপর অনেকেই তেমন প্রসন্ন নহেন। Mr. Kenne'h Tynan বার্ণাড শ'কে 'demolition expert' বলিয়াছেন[২]। James Sutherland কিন্তু ব্যঙ্গকারদের উপর অতটা বিরূপ নহেন। তিনি বলিতেছেন—"The motives that lead to satire are varied, but there is one motive that may almost be called a constant; the satirist is nearly always a man who is abnormally sensitive to the gap between what might be and what is, just as some people feel a sort of compulsion when they see a picture hanging crooked to walk up to it and strengthen it, so the satirist feels driven to draw attention to any departure from what he believes to be the truth or honesty or justice. He wishes to restore the balance, to correct the error and often, it must be admitted, to correct or punish the wrongdoer...much of the worlds' satire is undoubtedly the result of a spontaneous or self-induced overflow of powerful imagination and acts as a catharsis for such emotions"[৩] —এই শেষোক্ত মন্তব্যটিই সর্বাপেক্ষা সত্য। ব্যঙ্গকার কেবলমাত্র নীতিবাগীশ অডিটার বা দারোগা নহেন, তাঁহার 'powerful imagination' আছে, অর্থাৎ তিনি কবি। বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা ব্যঙ্গকার—তাঁহারা সকলেই প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যের অন্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিরাট দান। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের দিকপালরাই বড় বড় ব্যঙ্গকার—Voltair, Rabelias, Petronius, Swift, Pope, Horace, Aristophanes, Lucretius, Goethe, Shakespeare সকলেই কোন না কোন সময়ে ব্যঙ্গের রসে মাতিয়া উঠিয়াছেন।[৪] চার্লস ডিকেন্স এবং আধুনিক যুগের বার্ণার্ড শ'কেও এই পঙ্‌ক্তিতে অনায়াসে বসানো যায়।

(২) English Satire: James Sutherland, p. 1

(৩) J. Sutherland English Satire. pp. 4-5.

(৪) The Anatomy of Satire by Gilbert Highet, pp. 1

রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণ ব্যঙ্গকার ছিলেন। তাঁহার 'ব্যঙ্গকৌতুক,' 'হাস্যকৌতুক,' তাসের দেশ, অচলায়তন, 'সে'—সবই অপূর্ব ব্যঙ্গ রচনা। তাঁহার আঁকা ছবিগুলিও অনেক সময় মনে অত্যুৎকৃষ্ট কার্টুনের রস জাগায়। তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাও অনেক আছে। প্রতিভাধর কবিরা কেহই রঙ্গ-ব্যঙ্গ-রস বিবর্জিত নহেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ করা মানব মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা। কবিদের প্রতিভা সে প্রবণতাকে উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করে। বিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রকার 'পিসিয়েল' এর মুখে শুনিয়াছি তাঁহার কাছে নাকি টলস্টয়, ডিকেন্স প্রভৃতি সাহিত্যিক প্রবরদের আঁকা কার্টুন সংগ্রহ আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু ব্যঙ্গকার নহেন, তিনি বড় নাট্যকার এবং কবিও। মনের একটা বিশেষ মেজাজে তিনি 'আষাঢ়ে' 'হাসির গান' 'কল্কি অবতার' এবং 'আনন্দ বিদায়' লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দ্বেষ নাই, নিছক ব্যঙ্গ আছে। Sutherland সাহেবের ভাষায়—ইহারা 'overflow of powerful imagination'।

কবিশেখর কালিদাস রায় কথা সাহিত্যে 'রঙ্গ ব্যঙ্গে' দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও কবিতাগুলির সমজদার হতে হলে সে কালের দেশ ও সমাজের খবর কিছু কিছু রাখা চাই'—তিনি তৎকালীন সমাজের যে ছবি আঁকিয়াছেন সে ছবি বর্তমানে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাল্য-বিবাহ, ঘোমটা আর নাই। এখন যৌবনেও বিবাহ হয় না এবং স্ত্রীলোকদের বেশবাস দেখিয়া পুরুষদের ঘোমটা দিতে ইচ্ছা করে। এখন বিলাত ফেরতরা সমাজে স্থান পাইবেন কিনা সে প্রশ্ন নাই, বিলাত-ফেরত জামাই পাইলে কন্যার পিতারা বর্তিয়া যান, জামাই যে বিলাত-ফেরত একথা কোথাও কোথাও বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রেও বিজ্ঞাপিত হইতে দেখিয়াছি। এখন অনেক ছেলে-মেয়ে বিলাতে গিয়াই বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। অসবর্ণ বিবাহ আজকাল সমাজে স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, স্বামী-স্ত্রী উপার্জন না করিলে সংসার চলিবে না এ ধারণাটা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। Co-education আজকাল প্রতি স্কুল, কলেজে। ইহাতে যদিও educationটা হয়তো নাই—'Co' টাই আছে, কিন্তু সেজন্য কেহ বিচলিত নহেন। এখন তথাকথিত ভদ্রঘরের বিবাহিতা বা অবিবাহিতা রমণীরা সুলভ হইয়া পড়িয়াছেন, মৃতদার ব্যক্তিদের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার আর প্রয়োজন হয় না। অকৃতদারেরাও কাঁধে দারার জোয়াল চাপাইয়া দায়িত্ব বন্ধনে নিজেদের বাঁধিতে চাহেন না। জন্ম-নিরোধ আমাদের গভর্ণমেণ্ট আজকাল সঙ্গত মনে করিতেছেন। হয়তো কিছু দিন পরে ভ্রূণ-হত্যাও এদেশে আইনসঙ্গত হইবে। সমাজের এই পরিবর্তিত অবস্থাতেও কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ রচনা সমান লাগ-সই। তাহার কারণ তাঁহার ব্যঙ্গ রচনার লক্ষ্য আদর্শ-ভ্রষ্ট মানুষ, সে মানুষ সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে এবং সম্ভবত সব যুগেই থাকিবে। তাই তাঁহার চাবুকের জন্য পৃষ্ঠের কখনও অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে ভণ্ডামি, যে ন্যাকামি, যে গোঁড়ামি ও যে গুণ্ডামিকে তিনি ব্যঙ্গ-বাণে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন সে সব বর্তমান সমাজে সগৌরবে বিবর্ধমান। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরে এবং অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ লাগিয়া সে সবের মুখোশ পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। বিখ্যাত ব্যঙ্গকার Swift বলিয়াছেন "Satire is a sort of glass whercin beholders generally discover every body's face but their own, which is the chief reason for the reception it

meets in the world and so very few are offended with it।" Swift সাহেবের এ কথার সহিত কিন্তু মতের মিল হইল না। Swift-এর উপরই কত লোক বিরূপ হইয়াছিলেন তাহা কি নিজে তিনি জানেন না? যাহাদের লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ বাণ ছোঁড়া হয় তাঁহারা সেটা বুঝিতে ঠিকই পারেন, কিন্তু ভান করেন যেন পারেন নাই। কানে তুলা দিয়া এবং পিঠে কুলা বাঁধিয়া এই সব গণ্ডার চর্মধারীরা মুখে একটা স্মিতহাস্য ফুটাইয়া সমাজে নির্লজ্জের মতো বিচরণ করিতে দক্ষ। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাদের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্বেষের বিষ উদগীরণ করেন নাই। 'আনন্দ-বিদায়' রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত বটে কিন্তু ইহাতে বিদ্বেষ নাই। আছে রঙ্গ ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রতিবাদ। এবং তিনি ইহা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া। 'তুমিও শেষে এমনটা করিতেছ'—এই স্বপ্নভঙ্গ, এই আক্ষেপই ব্যঙ্গে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিনি নিজেকেও কম ব্যঙ্গ করেন নাই। উদাহরণ 'আলেখ্য' কাব্য গ্রন্থের দ্বাদশ চিত্র—'মদ্যপ' কবিতাটি। হাসির গানে তাঁহার 'জিজিয়া কর' বা 'খুসরোজ' কবিতা দুটিও নিজের প্রতি ব্যঙ্গ। চাকুরি, জীবনের গ্লানি, পঙ্ক হইতে এই সব কবিতা শতদলের মতো ফুটিয়াছে। 'জিজিয়া করে'—

"পড়ে আছি চরণ তলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল
সৈবে সবই নই তো মানুষ আমরা সবাই ভেড়ার পাল
যে যা করিস দেখিস চাচা মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা
সাঁশটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিসরে দুটো দুবেলায়।"

কিম্বা 'খুসরোজে'—

"আমরা সব 'রাজভক্ত' রাজভক্ত' বলে' চেঁচাই উচ্চরবে
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে
আমাদের ভক্তি যা এ—মানের প্রাণের পেটের দায়ে
দেখে সে রক্ত আঁখি ভক্তি যা তা ছুটে পালায়
সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

হাসির গানে আরও অনেক কবিতা আছে যাহা নিজের প্রতিই ব্যঙ্গ। প্রথম প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পাক্কা সাহেবী জীবন-যাপন করিতেন। নিজের নামটা পর্যন্ত বদলাইয়া 'মিঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রে' করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে 'ধুতি-চাদর-নিবারিণী' সভাস্থাপনও তাঁহারই কীর্তি। 'বিলাত ফের্তা', কবিতায়

"আমরা সাহেব সঙ্গে পটি
আমরা মিস্টার নামে রটি
যদি "সাহেব" না ব'লে 'বাবু' কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর
আমরা হ্যাট বুট আর কোট প্যাণ্ট পরে'
সেজেছি বিলিতি বাঁদর।"

মনে হয় তিনি নিজেকেই যেন ব্যঙ্গ করিয়াছেন। 'পাঁচটি এয়ার' কবিতাতেও সেই সন্দেহ হয়। এ কবিতায় তাঁহার নিজের বেপরোয়া 'আমি কাউকে তোয়াক্কা করি না বাবা' ভাবটিকেই তিনি যেন ব্যঙ্গের হোজ পাইপের সম্মুখীন করিয়াছেন।

"আমরা পাঁচটি এয়ার
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা
আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস আমরা পাঁচটি এয়ার।
দেখ, ব্র্যাণ্ডি মোদের রাজা আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী
আমরা করিনে কাহারে ডর আমরা করিনে কাহারে হানি
আমরা রাখিনে কাহারও তক্কা, আমরা করিনে কাউরে কেয়ার
এ ভব মাঝে সবই ফক্কা—জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার।"

তাঁহার 'Reformed Hindoos' কবিতাতেও কি তিনি নিজেকে বাদ দিতে পারিয়াছেন? তিনি নিজেও কি ওই সমাজভুক্ত ছিলেন না? Reformed Hindoos—এর যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহার সহিত হয়তো তাঁহার চরিত্রের পুরাপুরি সাদৃশ্য নাই। কিন্তু খানিকটা আছে বইকি। উদ্ধৃত করি একটু

আমরা Reformed Hindoos
It must be under-stood
যে একটু heterodox আমাদের food.
কারণ চলে মাঝে মাঝে 'এটা' 'ওটা' 'সেটা' যখন we choose
কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি if you think
তালে you are an awful goose
আমাদের ভাষা একটু quaint as you see
এ নয় English কি Bengali
আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer
কোন ধর্মের ধারি না ধার
করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists
the Mahomedans, Christian and Jews
কিন্তু ফলার ভোজে হিঁদু নই if you think
তা'লে you are an awful goose."

এরকম আরো অনেক কবিতা আছে যেখানে ব্যঙ্গের খোঁচাটা তাঁহার নিজের গায়েও লাগিয়াছে। কিন্তু বড় শিল্পী মাত্রেই নির্বিকার। গম্ভীর কবিরা যখন যেখানে সৌন্দর্য দেখেন তখন তাঁহার কল্পনা যেমন ভাবাবিষ্ট হয়, ব্যঙ্গকার কবিও তেমনই যখনি যেখানে অসঙ্গতি দেখেন তখনই তাঁহার নির্মম শিল্প প্রতিভা চকমক করিয়া ওঠে। খামখেয়ালী পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন, বেপরোয়া চাকুরী লাঞ্ছিত দ্বিজেন্দ্রলালকে ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালই নানা কবিতায় উপহাস করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সব ব্যঙ্গ রচনাই 'ব্যঙ্গ' নহে। পূর্বেই বলিয়াছি ব্যঙ্গ-রসে রৌদ্ররস হাস্যরস এবং অদ্ভুত রসের সমন্বয় ঘটে। তাঁহার সব কবিতাতে এ সমন্বয় নাই। অনেক কবিতাই বিশুদ্ধ হাস্যরসের কবিতা।

ব্যঙ্গরসের পরিচয় পাই সেখানে, যেখানে কবি চটিয়াছেন কিন্তু আত্মবিস্মৃত হন নাই, হাসি মুখে তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন। ইহার উদাহরণ 'কল্কি অবতার' 'আনন্দ বিদায়' 'ত্র্যহস্পর্শ' 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি প্রহসন গুলিতে। 'আনন্দ বিদায়' ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্যে লিখিত বলিয়া হয়তো ঈষৎ হীনপ্রভ। কিন্তু ইহাতে ব্যঙ্গকারের ব্যঙ্গ-নিপুণতা বিস্ময়কর। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ-নিপুণতা আরও বিস্ময়কর তাঁহার হাসির গানের কয়েকটি কবিতায়। 'জিজিয়া কর' 'খুসরোজ' 'Reformed Hindoos' 'বিলেতা ফেতা' এবং আরও অনেক কবিতায়। এ কবিতাগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি পূর্বেই দিয়াছি। হাসির গানের কবিতা হইতে আরও কিছু কিছু নমুনা দিতেছি।

"চম্পটির দল (ইউরেশিয়ানদের উদ্দেশ্যে বোধহয়)

চম্পটির দল আমরা সবে
একটু মেশাল রকম ভাবে
আমরা কজন এইছি ভবে।
যদি কিছু দেশী রং
রেখেছি সাহেবী ঢং
একটু তবু নেটিভ গন্ধ
কি কর্ব তা রবেই রবে।
ইংরেজীতে কহি কথা
সেটা 'পাপার' উপদেশ
হ্যাট্টা কোট্টা পরি কেন
কারণ সেটা সভ্য বেশ।
টেবিলেতে খাচ্ছি খানা
কারণ সে সাহেবিয়ানা
খাই বা যদি শাক চচ্চড়ি
টেবিলেতে খেতেই হবে···

হ'ল কি হ'ল কি—এ হ'ল কি
এত ভারি আশ্চর্য
বিলেত ফেরতা টানছে হুকা
সিগারেট খাচ্ছে ভট্টাচার্য।
হোটেল ফের্তা মুন্সেফ ডাকছেন
মধুসূদন কংসারি
চট্ট চটির দোকান খুলে
দস্তুর মত সংসারী!"

সমাজের ভাঙনের, যা-খুশী করিবার প্রবৃত্তির অনেক উদাহরণ আছে এ কবিতায়। শেষটি এইরূপ—

"রাধাকৃষ্ণ রঙ্গ-মঞ্চে
নাচছেন গিয়ে আনন্দে
ব্যাখ্যা করছেন হিন্দু-ধর্ম
হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে।
শাস্ত্রীবর্গ কোনই শাস্ত্রের
ধারেন না এক বর্ণ ধার
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে
বেশী মাত্রায় কর্ণ-ধার।"

এই সমাজের আলোকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদেরও পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাঁহার 'নব কুল কামিনী' কবিতায়—

"ক'টি নবকুল কামিনী
অন্ধকার হইতে আলোকে চলেছি মন্দ-গামিনী।
জানি জুতা, মোজা, কামিজ পরিতে
চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে
পারত পক্ষে উপর হইতে
নীচের তলায় নামি নে,
গৃহের কার্য করুক সকলে
খুড়ি, জেঠী, পিসী, মাসিতে
আমরা সবাই নব্য-প্রথায়
শিখেছি হাসিতে কাসিতে'
করিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ
করিতে নৃত্য গীত, বাদ্য
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে
ঘুরিতে দিবস যামিনী।
ব্যবসা করিয়া, চাকুরি করিয়া
আনুক অর্থ পতিরা
রাজি আছি, তাহা খরচ করিয়া
বাধিত করিতে সতীরা।"

এ কবিতার শেষ লাইন—

"যেমন সভ্য স্বামীরা, তাহার
চাই ত যোগ্য ভামিনী।"

'বলি ত হাসব না' কবিতাটিতে কবি ব্যঙ্গের অট্টহাস্য করিয়াছেন।

"বলিত হাসব না, হাসি রাখতে চাইত চেপে
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে
যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে!

সাহেব-তাড়াহত, থতমত, অঙ্গম্লথ স্থবির
ভূত-ভয়-গ্রস্ত পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর
যবে সব কলম ধ'রে গলার জোরে
দেশোম্ধারে ধায়
তখন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে
হ'য়ে ওঠে দায়!
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রিবর্গ
টিকি দীর্ঘ নাড়ে
একটু 'গ্যানো পড়ে' কেহ চড়ে
বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে
কোর্তে এক ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত
ব্যস্ত কোন ভায়া
তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফ ভরে
ছেড়ে প্রাণের মায়া।"

ভীরু, ভণ্ড, বক-ধার্মিক, সভ্যতার ছন্মবেশে পরিহিত বর্বরদের সম্বন্ধে তিনি নির্মম ছিলেন। যাহারা কথায় কথায় গীতা আওড়ায় অথচ প্রতিটি কাজে গীতার বিপরীত আচরণ করে, তাহাদের উদ্দেশ্যেই তাঁহার বিখ্যাত 'গীতার আবিষ্কার' কবিতাটি। এ কবিতার শেষ কলিটি শুনুন—

"গীতার জোরে সচ্ছে ঘুষি, সচ্ছে কানুটিটে
গীতার জোরে পেটে না খাই, সয়ে যাচ্ছে পিঠে
করি যদি ধাপ্পাবাজী, মিথ্যে মোকর্দমা
স'য়ে যাবে—গীতার পুণ্য অনেক আছে জমা
মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয়, এ হেন
মুগার কোর্মার চেয়ে আমার গীতাই মিষ্টি যেন
আমার গীতাই মিষ্টি যেন।
(কোরাস্) গীতার মত নাইক শাস্ত্র গীতার পুণ্যে বাঁচি
বেঁচে থাকুক গীতা আমার গীতায় ম'রে আছি
বাবা! গীতায় মরে আছি।"

এই ভণ্ডদের উদ্দেশ্যেই লেখা 'হিন্দু'—

"এবার হয়েছি হিন্দু করুণাসিন্ধু
গোবিন্দজীকে ভজি হে
এখন করি দিবা রাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধা-রসে মজিহে।
আর মুরগী খাইনা কেন না পাইনা
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই
আহা জান ত আমার স্বভাব উদার
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।"

'চণ্ডীচরণ' ও একটু অন্য-রকম ধর্ম-প্রবক্তাদের উদ্দেশ্যে লিখিত।

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থকার
এম্নি তিনি হিন্দুধর্মের কর্তেন মর্ম ব্যক্ত
দিনের মতো জিনিষ হ'ত রাতের মত অন্ধকার
জলের মত বিষয় হ'ত ইটের মত শক্ত।
... ...
রইল না কারো সন্দেহ সংসারটা এ ঝকমারি
যদিও কেউ ছাড়লে নাক ব্যবসা কি নক্‌রি
সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধর্ল মাংস রকমারি
ফাউল বিফ্‌ ও মটন হ্যাম ইন্‌ অ্যাডিশন টু বক্‌রি
(কোরাস্‌) সবাই বল্লে হাঃ হাঃ হাঃ
লিখছে বেশ—হাঃ হাঃ হাঃ
যা হোক তোরা নিজের নিজের ঘটিবাটি সামলা।"

ইংরেজ এ দেশে আসিবার পূর্বে আমাদের সমাজে মোড়ল ছিল, উজির, নাজির সামন্ত ছিল। কিন্তু 'নেতা' নামক জীবের আবির্ভাব হইয়াছে ইংরেজী শাসন এ দেশে প্রচলিত হওয়ার পর। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'আলেখ্য' কাব্য-গ্রন্থের চতুর্দশ চিত্রে নেতার ছবি আঁকিয়াছেন। প্রথম অংশের খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি।

"কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে
গানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা
কিছুই বোঝা যাচ্ছে নাক নেড়ে চেড়ে
কি রকম যে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায় সভায় হাটে-মাঠে গোলেমালে
বক্তৃতাতে আকাশ পাতাল ফাটছে,
যাদের সময় কাটত নাক কোন কালে
তাদের এখন খাসা সময় কাটছে।
নেতায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভরে' গেল
সবাই নেতা, সবাই উপদেষ্টা
চেঁচিয়ে তো সবার গলা ধরে' গেল
অন্য কিছুর দেখাও যায় না চেষ্টা।
লিখে লিখে সম্পাদকে কবিগণে
ভীষণ তেজে অনুপ্রাসে কাঁদছে
সবাই বলছে কি কাজ এখন 'পিটিশনে'
সবাই কিন্তু পায়ে ধরেই সাধছে।

এই নেতারই একটি ব্যঙ্গচিত্র 'নন্দলাল'। আমাদের ব্যঙ্গসাহিত্যে রত্নের মতো তাহা ঝলমল করিতেছে। কিছু উদ্ধৃত করি।

"নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ
স্বদেশের তরে যা করেই হোক রাখিবেই সে জীবন

সকলে বলিল 'আহা কর কি, কর কি নন্দলাল
নন্দ বলিল বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ
তখন সকলে বলিল বাহবা বাহবা বেশ।"

নন্দর ভাইয়ের কলেরা হইল। কিন্তু নন্দ তাহার সেবা করিতে গেল না। যদি মরিয়া যায়! 'বাঁচাটা আমার অতি দরকার'। সুতরাং সে কাগজ বাহির করিয়া সকলকে গদ্যে পদ্যে গালি দিতে লাগিল।

"পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায় খায় তার দশগুণ
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোক্কা সন্দেশ থাল থাল
তখন সকলে বলিল—বাহবা, বাহবা নন্দলাল।"

কাগজে এক সাহেবকে গালি দিয়া নন্দ কিন্তু বিপদে পড়িল। 'সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি'। নন্দলাল কিন্তু দেশোদ্ধারব্রতী, গলা-টিপুনিতে সে মারা যাইতে চায় না। সাহেবকে সে বলিল—

"বল ক'বিঘৎ নাকে দিব খৎ—যা বল করিব তাহা
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহা !

নন্দ শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়াই রহিল

"নন্দ বাড়ির হ'ত না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি
চড়িত না গাড়ি কি জানি কখন উলটায় গাড়িখানি ;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ রেলে কলিশন হয়
হাঁটিতে সর্প কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল
সকলে বলিল—ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।"

সত্যই নন্দলাল আজও বাঁচিয়া আছে। শুধু তাহার ভোলটা পালটাইয়াছে মাত্র।

'আষাঢ়ে' নামক কবিতা-গুচ্ছ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহার পুরা নাম 'আষাঢ়ে বা গুটিকতক হাসির গল্প'। ছন্দে-গাঁথা এ রকম গল্পগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম এবং একেবারে অভিনব। শ্রীহরি গোস্বামী, অদল-বদল, ভট্টপল্লীর সভা, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা, ননীরাম পালের বক্তৃতা প্রভৃতি কবিতাগুলি হাস্য-ব্যঙ্গ এবং গল্পরসে টইটম্বুর। কিন্তু 'আষাঢ়ে'তে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যাহা ঠিক গল্প নয়। এগুলিতে গল্প অপেক্ষা ব্যঙ্গই বেশী। যেমন ধরুন সংস্কৃত ছন্দে লেখা কর্ণ-বিমর্দন কাহিনী।

"জানো না কি কদাচন মূঢ়
কর্ণ-বিমর্দন মর্ম কি গূঢ় ?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য
যদি না তা আকর্ষণ জন্য।
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর কার নয় আদর চিহ্ন ;

তবু যদি সাহিব অল্পে স্বল্পে
টানে হয় তা মধুর বিকল্পে
অন্তত নাসা রক্ষার্থে সে
কান-মলা হয় গিলিতে হেসে।"

কিম্বা 'ডেপুটি-কাহিনী'—কে জানে হয় তো ইহাতে তাঁহার আত্ম-কাহিনীর রূপ আছে—

"তড়বড় খেয়ে ভাত দড় বড় ছুটি—
অপিসেতে চলে যান নবীন ডেপুটি
অতি এক লক্ষ্মী ছাড়া ছক্কর করিয়া ভাড়া
তাতে দুটি পক্ষিরাজ বাঁধা
একটি লোহিত বর্ণ অপরটি সাদা।

(২)

পরিয়া ইংরাজী প্যাণ্ট গলা আঁটা কোটে
চাপকান্ অঙ্গে আর রোচেনাক মোটে
অথচ ইংরেজি সজ্জা পরিতেও হয় লজ্জা
ভয়তেও কতকটা বটে
বাবুদের সাহেবিতে সাহেবেরা চটে।

(৩)

এদিকে অন্তরে জাগে ইচ্ছা অবিরত
সাহেবিটা, বাহিরেতে পোষাকে অন্তত ;
কেরাণীর চাপকান্ পরিতেও অপমান
এই বেশ তাই পরিবর্তে
ত্রিশঙ্কুর মত স্থিতি না স্বর্গে না মর্তে।

(৪)

তদুপরি শিরে শোভে 'ধুম্রপানসেবী
সাহেবের ক্যাপ—নয় অথচ সাহেবী
কিনারা উলটানো তার
কি রকম বোঝা ভার
অনেকটা বহুরূপী ;
চিৎপুর উদ্ভাবিত অত্যদ্ভুত টুপি।"

এই বেশে ডেপুটি সাহেবের অপিস-যাত্রা। সেখানে নানা উকিল ফরিয়াদী আসামী-পূর্ণ এজলাস, কেরানীদের সম্ভ্রম। আদালতে বিচারের প্রহসন ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া তাঁহার গৃহস্থালীরও অপরূপ বর্ণনা দিয়াছেন কবি। তারপর মুন্সেফ বাবুর বাড়ি প্রত্যহ তাসপাশা খেলা, বাড়িতে ফিরিতে রোজ দেরি—

"১১ ১২টা কভু—ফিরিয়া আসিলে প্রভু
স্ত্রীর সঙ্গে হ'ত বিসম্বাদ
বুঝে ওঠা হ'ত ভার কার অপরাধ।"

তারপর বদলি। প্লীহা সারাইবার জন্য একেবারে চট্টগ্রামে গেলেন। সেখানে তিন বৎসর বাস। শেষটা বড় করুণ দৃশ্য—

"এইরূপ করিলেন সৌভাগ্যের ক্রোড়ে
বুদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞতার জোরে।
সপুত্রকলত্র কন্যা ডেপুটির অগ্রগণ্যা
('অগ্রগণ্যা' ব্যাকরণ সঙ্গত) সর্বাঙ্গ
সুন্দর সৌন্দর্যপূর্ণ জীবলীলা সাঙ্গ।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল তাঁহার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে 'মুন্সেফ আবিষ্কার' নামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি বড়। সামান্য সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি।

নিয়তি একদিন সন্ধ্যাকালে বিধাতাকে গিয়া বলিলেন—আপনার সৃষ্টিতে 'তাক্' লাগিবার মতো কিছুই নাই।

"মানুষেরা হাসে গায়
সকলেই খায় দায়
একই ভাবে বন্ধুসনে গল্প করে সবে
এর মধ্যে আছে বল আশ্চর্য কি তবে ?"

বিধাতা বিশ্বকর্মাকে তলব করিয়া—এই একই প্রশ্ন করিলেন। বিশ্বকর্মা প্রতিশ্রুতি দিলেন তাক্ লাগানো জীব তিনি সৃষ্টি করিবেন এবং বিধাতাকে তাহার বর্ণনা দিলেন—

"এই শ্রেণী দেখা হলে ফিরাইবে মুখ
করিবে না অভ্যর্থনা, কহিবে না কথা
সদাই ভাবনা আর সদাই বিমুখ
হুজুরের তুষ্টিলাভে হইলে অন্যথা ;
সদাই ভাবনা ভবে
কবে সবজজ হবে
ক'টা মেয়ে পার হল কটা আছে বাকী
ভাবিবে এ কথা নিত্য বসিয়া একাকী।

এদের দিয়েছি আয়—দিই নাই ব্যয়
এদের দিয়েছি দন্ত হাসি নাহি তায়
এদের দিয়েছি কণ্ঠ কথা নাহি কয়
দিয়েছি উদর, পেট ভরে' নাহি খায় ;
কেবল অঙ্গুলি তার করে মাত্র ব্যবহার
গলদেশে মালা তার দু'পয়সা হারে
শিরোদেশে টিকি তার আপনিই বাড়ে।"

'আষাঢ়ে' পুস্তকের 'কেরানী', 'বাঙ্গালী মহিমা' 'বৃদ্ধা কুমারী কাহিনী', 'কল্কিবক্ত'

প্রভৃতি কবিতাতেও গল্প রসের অপেক্ষা ব্যঙ্গরসই বেশী। একটু একটু উদ্ধৃত করি। 'কেরানী'—

"খেটে খেটে খেটে
—বলতে আপন দুঃখের কথা হৃদয় যায়গো ফেটে
চাইলাম গিয়ে অন্ন ত গৃহিণী এলেন তেড়ে
তাঁর সে সুদর্শন চক্র স্বর্ণনথটি নেড়ে—
সারা দিনটা খাটি
শরীর করে' মাটি
পোড়ার মুখো! কাহিল হলাম যেন একটি কাঠি
ছেলে কোলে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফুলে গেল পা-টা
তবু বলে' শুয়ে আছ! নিয়ে আয় তো ঝাঁটা!

'বাঙ্গালী মহিমা—'

খোল ইতিহাস—সতর তুরস্ক প্রবেশিল যবে গৌড়েতে
লক্ষ্মণ সেন ত দিলেন চম্পট কচুবনে এক দৌড়েতে।
সে অপূর্ব আধ্যাত্মিক দীর্ঘ পলায়ন কাহিনী
যোগ্য ছন্দ-বন্ধে বোধহয় আজিও ভাল ক'রে কেহ গাহিনি।
পরে আফগান মোগল পাঠান দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব ঃ তাহাও বীরত্বে সহিল বাঙালী উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ ঃ বাঙালী (লেখে ত সব ইতিহাস বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরেজের কোলে পাঠানের ক্রোড় হইতে!
করেছে সংগ্রাম মারহাট্টা শিখ মূর্খ যত সব মেড়ুয়া
তুমি সূক্ষ্মবুদ্ধি সন্ন্যাসীর মতো (যদিও পরনি গেরুয়া)
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে বুঝে নিলে সব পলকে
'ভবিতব্য লিপি কে খন্ডাতে পারে? কাটাকাটি করে' ফল কি!'

বাঙালী 'অগ্নি যুগে' যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল—এ কবিতা তাহার পূর্বে রচিত।

'বৃদ্ধা কুমারী কাহিনী'—

অতি করুণ কাহিনী। কুমারী প্রথম যৌবনে ভাবিয়া ছিল রাজপুত্র সাধিয়া আসিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু রাজপুত্র আসিল না, মন্ত্রীপুত্র না, কোটাল পুত্র না, এমন কি শেষ পর্যন্ত কেহই আসিল না। কবিতার শেষ দুই ছত্র এই ঃ

'যদি বুঝে টান নাহি দাও লাগসৈ
পরে উঠিবে না কিছু বঁড়শীটি বই।'

'কলিযজ্ঞ'—মনে হয় কংগ্রেসকে বিদ্রূপ—সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দে লিখিত। একটু উদ্ধৃত করি। কলিযজ্ঞে প্রদত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে—

"এরূপ শুদ্ধ ইংরাজী, এরূপ উপমা ছটা
এরূপ শব্দবিন্যাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা ॥

সিসিরো পিট বর্কাদি কাছাকাছি ত নিশ্চয়
একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে॥
চা-পান-নিরত প্রাতে ইংরাজ লাট সাহেব
পড়িয়া এ মহাবার্তা আতঙ্কেতে বিমূর্ছিত।

'হাসির গানে'র অনেক কবিতায় ব্যঙ্গরস নাই বিশুদ্ধ হাস্যরস আছে। রাম বনবাস, দুর্বাসা, কালোরূপ, কৃষ্ণ রাধিকা সংবাদ নতুন কিছু করো, হ'ল কি, প্রণয়ের ইতিহাস, প্রাণান্ত, বুড়োবুড়ি, বিরহ-তত্ত্ব, চাষার প্রেম, বিষ্যুৎ বারের বারবেলা, বিলেত, বর্ষা প্রভৃতি কবিতা বিশুদ্ধ হাস্যরসের কবিতা। একটি মাত্র নমুনা দিতেছি। কালোরূপ—

"কালোরূপে মজেছে এ মন
ওগো সে যে মিশ্‌মিশে কালো, সে যে ঘোরতর কালো
—অতি নিরুপম।"

কোকিল কালো ভোমরা কালো, আমরা কালো তোমরা কালো, মুচি-মিস্ত্রী ডোমরা কালো, কিন্তু জান না কি কালো—সেই কালো রং। কালী কালো মিশি কালো অমাবস্যার নিশি কালো, গদাধরের পিসী কালো কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ, ওগো সে কালো বরণ। গ্রহস্পর্শ, পুনর্জন্ম, বিরহ প্রহসন তিনটিও হাস্যরসের উৎস। তাঁহার অন্যান্য নাটকগুলিতে তিনি যে সব চরিত্র হাস্যরস বা ব্যঙ্গের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন সেগুলিও পরম উপভোগ্য। রাণা প্রতাপ সিংহে মেহের, মেবার পতনে হেদায়েৎ, সাজাহানে দিলদার, কল্কি অবতারে বিদ্যানিধি, পাষাণীতে চিরঞ্জীব, চন্দ্রগুপ্তে বাচাল প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যই অনন্য। সত্যই তিনি বাংলা সাহিত্যের রঙ্গ-ব্যঙ্গের আসরে অদ্বিতীয়। তাঁহার মতো বিশুদ্ধ গ্রাম্যতাদোষহীন অথচ শাণিত সাহিত্যিক ব্যঙ্গ ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই। ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যে একটি কবিতায় আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করি।

বঙ্গ সাহিত্যের পথে
যুগ যুগান্তর হ'তে
কল্লোল্লাসে বাজায়ে কিঙ্কিনী
রঙ্গ-ব্যঙ্গ আনন্দের বহে স্রোতস্বিনী।
নদী সে বিচিত্রা মহীয়সী
কখনও উত্তাল মেঘনা—কভু উশ্রী সুশ্রী রূপসী।
কিন্তু সে তো নদী নয়—রঙ্গমত্ত জনতা নির্ভীক—
নাই তার সংখ্যা সীমা, নাই তার ঠিক বা বেঠিক
আছে তাতে সাধু চোর, আছে তাতে সতী ও অসতী
আছে গজ অশ্ব রথ আছে রথী আছে মহারথী
আরও কত জন আছে যাহাদের নাহিক নিরিখ
অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু আছে, আছে পদাতিক।
আছে নানাবিধ সং
বিবিধ বিচিত্র ঢং

ঢঙ্গায়িত স্বকীয় ধরণে ঃ
কাহারও চরণে
ঝুমঝুম বাজিছে নূপুর,
সামান্য বাঁশীতে কেহ তুলিয়াছে অসামান্য সুর,
মুখ ভঙ্গি করি'
মাথায় উষ্ণীষ ধরি'
ভুঁড়িটারে আস্ফালন করিতেছে কোন বিদূষক ঃ
কেহ বা না-হক
দন্ত বিকশিত করি কোমর দুলায়ে
ইতরে ভুলায়ে
তুলিয়াছে হাস্যের রোল ঃ
গম্ভীর কাহারও খোল
তুলিতেছে টপ্পার বোল ঃ
চারিদিকে ছড়াইয়া হাস্যের রং
কোথাও বা চলিয়াছে 'জেলে পাড়া' সং ঃ
ম্যাণ্ডোলিন চেলো সাথে কোথাও বা মৃদঙ্গ মন্দিরা
ছড়াইছে আনন্দ মদিরা ঃ

কেহ ফোঁকে রাম সিঙা, কেহ পেটে টিন ঃ
এস্রাজ সেতার বেণু-বীণ
কোথাও বা হয়েছে উত্তাল
এরই মাঝে এলে তুমি হে দ্বিজেন্দ্রলাল
বিকীর্ণ করিয়া এক যাদুকরী অপূর্ব মাধুরী
হস্তে লয়ে বাজি, ফুল-ঝুরি।
সমুজ্জ্বল ফুলকির পুষ্পবৃষ্টি হ'ল চারিভিতে।
তারাবাজি, তুবড়ি ও আতশ বাজিতে
আকাশে ফুটিল ফুল অজস্র ও বিবিধ বরণ
হাউই ছুটিল যেন তীরের মতন !
মহাশূন্যে উদ্ভাসিল হীরা পান্না চুনী পোখরাজ
মনে হ'ল কুবেরের রত্নাগার আজ
উজাড় করিয়া কেহ ছড়াইছে মুঠা মুঠা মণিমুক্তারাজি
একি সত্য ? একি স্বপ্ন ? একি ভোজবাজী ?

প্রদীপ্ত প্রতিটি রত্ন প্রতিভার অনন্য প্রভায়
বিচ্ছুরিল যে কিরণ অনবদ্য অপূর্ব শোভায়
অত্যদ্ভুত আলোকে তাহার
রূপান্তরও ঘটে গেল সে শোভা যাত্রার।
অদ্ভুত সে রূপান্তর
পর্বত হইয়া গেল সহসা প্রান্তর।

চূড়ামণি, শিরোমণি, তর্করত্ন আদিসব সেরা সেরা ব্রাহ্মণের পাল
হ'য়ে গেল নিমেষেতে কুকুর শৃগাল সাপ উল্লুক বিড়াল,
হ্যাট কোট টাইপরা বড় বড় দিকপাল তিমি
নিমেষেতে হয়ে গেল ক্রিমি
দাড়িওলা হোমরা-চোমরা বিশাল পুরুষ
ন্যাকামির প্রকোপেতে বুনিতে লাগিল 'লেস'
লইয়া কুরুশ।
সমাজের গণ্যমান্য বড় বড় হাতী ও গণ্ডার
লম্ফে লম্ফে পার হল ভব্যতা-পগার
ভেক রূপ ধরি!
গোস্বামী শ্রীহরি
পরিয়া ব্যঙ্গের ফাঁস—হয়ে গেল ঘুঘু
—মালকোষ হল যেন কাফি
শ্বশুরবাড়ি যাত্রী হরি আধখানা দাড়ি লয়ে
দুম্বা সম করে দাপা দাপি।

হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থকার শ্রীচণ্ডী চরণ
সন্দেহ করিল সবে—ঘটি বাটি করেন হরণ।
দেশভক্ত নন্দলাল পাশ বালিশের মতো
বিছানায় বিস্তারি' নিজেকে
দেখা গেল প্রাণপণে আগুলিয়া রয়েছেন
প্রাণ-পক্ষীটিকে!
যে কেরানী-পদ লাগি একদিন বহু তৈল হ'ল নিঃশেষিত
শোনা গেল আর্তকণ্ঠে তাহাদের গীতও—

'খেটে খেটে খেটে
হয়ে গেলাম বেঁটে
পড়ে গেল কপালেতে বড় বড় রেখা
কানে যায় না শোনা ভালো চোখে যায় না দেখা
চল্লিশ বছর থেকেই চুলও গেল পেকে
মাংসও গেল ঝুলে, সুঠাম শরীর গেল বেঁকে
দাঁতও হ'ল জীর্ণ এবং ভুঁড়ি গেল থেমে
চিবুক গেল উঠে এবং নাক গেল নেমে'।

সহসা বক্তৃতা-রত ধর্মধ্বজী নসীরাম পাল
ভাবাবেগে চেয়ারে অজ্ঞান হ'ল। 'সামাল সামাল'
চীৎকারিল সবে। কেনারাম কর্মকার
নিধিরাম সর্দার, কুড়োরাম পোদ্দার

কেনারাম তেলী
শেষ করি সেই সভা-কেলি
নিজ নিজ গৃহে যবে ফিরিল সত্বর।
হা-হা-হা-হা অট্টহাস্যে কাঁপিল অম্বর।

তারপর অন্য দৃশ্য ঃ
দেখা গেল 'কলি যজ্ঞ'—মহাসভা—মস্ত আসর
তাহার বর্ণনা করি অনুষ্টুপে ভেসে আসে কার মিষ্ট স্বর?
"ব্যারিষ্টার উকিলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য মহতী সভা।
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে
মাদ্রাজী, উড়িয়া, শিখ, বঙালী চ দলে দলে ॥
কাহারও পরণে কুর্তি, কাহারও উড়ুনি উড়ে
কাহারও বা ঝুলে চাপকান, কাহারও সাহেবী ধড়া ॥
কাহারও সম্মুখে টেড়ি, কাহারও পিছনে টিকি
কাহারও উপরে ঝুণ্ট—কা কস্য পরিবেদনা ॥
এরূপ বিবিধা মূর্তি সমাগত সভাতলে
বক্তৃতা করিয়া বাবা লড়াই করিতে ফতে ॥
তন্মধ্যে মুখ সর্বস্ব বাঙালী হি পুরোহিত
রেজলুশন নির্মাণে বক্তৃতায় মহারথা ॥
... ...
পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত
দিলে হি বক্তৃতা চোটে উড়াইয়া পরস্পরে ॥
বাঙালী মহিমা কীর্তি কলাপ কাহিনী যদি
শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

তারপর হা হা হাসি পুনরায় ধ্বনিল অম্বরে
থেমে গেল সহসা আবার ; নীলাম্বরে
দেখিলাম সুরঞ্জিত জ্যোতির্পটভূমি
আকাশ ও ধরণীরে রহিয়াছে চুমি'—
তার মাঝে বিরাট বিশাল
দাঁড়াইয়া আছ তুমি ব্যঙ্গকার হে দ্বিজেন্দ্রলাল
মুখে তব স্নিগ্ধ হাসি, চোখে ঝরে জল
অসংখ্য প্রণাম লহ, ওগো ব্যঙ্গকার কবি, হে দেশবৎসল।

ভাষণ

তারাশঙ্কর সম্বন্ধে আমার স্মৃতি

তারাশঙ্কর এখন স্মৃতি হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেই সে চলা-ফেরা করত, এখন সে ছবিতে পরিণত হয়েছে। আমাকে আপনারা অনুরোধ করেছেন তার সম্বন্ধে কিছু স্মৃতি-চারণা করতে। আমি একটু মুশকিলে পড়েছি। তার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় এ কথা যেমন সত্য তেমনি সত্য যে অনেক স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। আর একটা কথাও সত্য, সব কথাও অকপটে প্রকাশ করা যায় না। এই সব গোপনীয় কথার গোপনীয়তাই মধুর। সে মাধুর্য নষ্ট করা অশিল্পী-জনোচিত, তা আমি করব না। আর একটা কথা আমি ভাগলপুরে বসেই সাহিত্য-সেবা করেছি। কলকাতায় মাঝে মাঝে আসতাম। এই ক্বচিৎ কখনও আসার সময়েই আমি তারাশঙ্করের সংস্পর্শে আসি। প্রথম আলাপ হয় সজনীর 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। সেখানে তখন বেশ একটা আড্ডা বসত। আমি ভাগলপুর থেকে এসে মাঝে মাঝে সজনীর বাড়িতেই আতিথ্যগ্রহণ করতাম। আমাদের দলের মধ্যে সজনী-কান্তই ছিল সবচেয়ে বেশী প্রাণবন্ত পুরুষ। প্রতিভাবান লেখক-লেখিকাদের সে শুধু যে সমাদর করত তা নয়, তাদের সকলের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করত, তাদের আপদে বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করত, তাদের বাড়ি যেত, ধৈর্যভরে তাদের লেখা শুনত, কোথাও খটকা লাগলে অকপটে তা বলত। আমরা সুযোগ পেলেই তাকে আমাদের লেখা শোনাতাম। শুনেছি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি'তে অনেক অংশ সে বাদ দিয়েছিল। বিভূতি যখন 'পথের পাঁচালি'র কোন প্রকাশক পাচ্ছিল না তখন সজনীই সেটা প্রথম প্রকাশ করে। তারাশঙ্করের অনেক লেখাও সজনী শুনত এবং সেগুলো 'শনিবারের চিঠি'তে (পরে 'বঙ্গশ্রী' কাগজেও) প্রকাশ করত। তারাশঙ্করকে সজনীকান্তই সে যুগের বৃহত্তর রসিক সমাজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। অর্থ, সামর্থ্য সব দিক দিয়েই সে সাহায্য করত তাকে এ কথা তারাশঙ্কর বার বার স্বীকার করে গেছে। তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার নিরবচ্ছিন্ন যোগ ছিল না,—যখন কলকাতায় আসতাম দেখা হত। প্রথম আলাপের দিনটি আমার ভাল মনে আছে।

আড়ময়লা খদ্দরের জামা কাপড় গায়ে। ছিপছিপে রোগা লোকটি এককোণে চেয়ারে বসেছিল। সজনী পরিচয় করিয়ে দিল—একে চেন? তারাশঙ্কর। এ এখন আমাদের একটা গল্প পড়ে শোনাবে। তুমিও শোন। বসে পড়লাম। তারাশঙ্কর পড়তে লাগল। তার কণ্ঠস্বরে একটা চাপা উত্তেজনা আর চোখের স্বতঃস্ফূর্ত দীপ্তি মানুষ তারাশঙ্করকেও যেন মূর্ত করে তুলল আমার কাছে। গল্প পড়া শেষ হলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললাম—চমৎকার হয়েছে। খুব ভালো। তারাশঙ্কর চকিতে একবার আমার দিকে চেয়ে দেখল। তারপরই আমাকে উঠে পড়তে হল। অন্যত্র যাওয়ার কথা ছিল। আমি উঠতেই তারাশঙ্কর এগিয়ে এসে আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে বলল—ভারি আনন্দ হল আপনার সংগে পরিচয় হয়ে। আমার গল্পটা সত্যি ভালো লাগল? বললাম—সত্যি, ভাল লেগেছে। সেদিন তারাশঙ্করের চোখে-মুখে যে আনন্দের আলো দেখেছিলাম তা আজও আমার মনে আছে। স্রষ্টা সৃষ্টি করে' একবার আনন্দ পান, আর একবার আনন্দ পান প্রকৃত রসিকের মুখে সে সৃষ্টির গুণগান শুনে। আজকালকার লেখক-লেখিকারা প্রাণ খুলে কারো প্রশংসা করতে পারেন না। প্রাণ খুলে কারও লেখার দোষও দেখাতে পারেন না। এ বিষয়ে

তারা বেশী বাক্‌সংযমী। আমাদের সময় আমরা তা ছিলাম না। তারাশঙ্করের, সজনীর, শরদিন্দুর, পরিমলের, বিভূতি বাঁড়ুজ্যের, বিভূতি মুকুজ্যের, সরোজ রায়চৌধুরীর অনেক লেখার প্রশংসা আমি পত্রযোগে করেছি, নিন্দাও করেছি অনেক জায়গায়। কিন্তু তাতে আমাদের বন্ধুত্বে চিড় খায় নি। আমার লেখারও সমালোচনা ওরা করেছে। ওদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছি। কিন্তু সেটা কলহে বা মনান্তরে পরিণতি লাভ করেনি কখনও। আমরা অপরের সমালোচনাকে কখনও মান্য করেছি, কখনও করিনি। কিন্তু এ নিয়ে স্থায়ী তিক্ততার সৃষ্টি হয় নি আমাদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু এমন একটা নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক ছিল যে আমরা প্রত্যেকের পারিবারিক সুখ-দুঃখে সত্যিই বিচলিত হতাম। তারাশঙ্করের একটি মেয়ে যখন মারা যায়—তখন ভারী কষ্ট হয়েছিল আমার। তাকে চিঠি লিখেছিলাম। তার এক জন্মদিনে তার মায়ের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে লাভপুরে গিয়েছিলাম মনে পড়ছে। আর একটা ঘটনাও মনে পড়ছে এই সূত্রে। তারাশঙ্করের বাড়ির বারন্দায় বসেছিলাম। একটি লোক যাচ্ছিল সামনের রাস্তা দিয়ে। তারাশঙ্কর ডাকলো তাকে। আমায় বলল—তুমি ওকে জিগ্যেস কর শ্মশানে শব সাধনা করবার সময় ও কি দেখেছিল। অদ্ভুত জিনিস দেখেছিল একটা। তারপর থেকে পাগল হয়ে গেছে। লোকটি যখন কাছে এল তাকে প্রশ্ন করলাম—শুনলাম আপনি শ্মশানে গিয়ে শব-সাধনা করেছিলেন। কি দেখেছিলেন সেখানে? সে লোকটি তারাশঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে বলল—এঁকে বলব। তারাশঙ্কর বললে—বলো না। এ আমার বন্ধু। সাহিত্যিক একজন। তখন সে বলল—কিছুই দেখিনি আমি। মড়ার উপর চোখ বুজে বসেছিলাম। খানিকক্ষণ পর চোখ খুলে দেখি মড়ার উপর দুটি পা ঝুলছে শূন্য থেকে। খালি পা আর কিছু না। মা কালীর পা। আর সে পায়ে যে গয়না ছিল তা শত শত সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের চেয়েও উজ্জ্বল রূপময়। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আমি কিছু দেখতে পেলাম না। পা-পা-পা—কেবল পা দুটি দেখলাম। পা-পা-পা—চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল লোকটা। তারাশঙ্কর বললে—লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

আমি তারাশঙ্করের বাড়িতে গিয়ে বলেছিলাম, আমাকে বীরভূমী রান্না খাওয়াও। কলায়ের ডাল, পোস্ত, আর কচিকচি মাছের টক। বাড়ির মেয়েরা চমৎকার রান্না করেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে ছিল এক বাটি মাংসও। কারণ এটা রটে গিয়েছিল যে আমি রোজ মাংস খাই। তারাশঙ্কর একাধিকবার ভাগলপুরে আমার বাড়ি গিয়েছিল এবং তাঁর বরাদ্দ মতো সুকতো এবং আঝালা ঝোল রান্না করতে হয়েছিল আমার স্ত্রীকে। তারাশঙ্কর কিছুই খেতে পারত না তখন। খেত কেবল ঘন ঘন চা আর সিগারেট। সে যুগের কথা ভাবতে গিয়ে একটা কথাই মনে পড়ছে, আমরা—সে যুগের উদীয়মান লেখকরা—এমন একটা প্রীতির সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ ছিলাম যে সেটা প্রায় পারিবারিক বন্ধনের মতোই হ'য়ে উঠেছিল। আমাদের পরিচিত মহলে তারাশঙ্কর ছিল বড়বাবু, আমি ছিলাম মেজবাবু, আর সজনী ছিল ছোটবাবু। আমরা বড়বাবু তারাশঙ্করকে বড়দার মর্যাদাই দিয়ে এসেছি বরাবর। দেখা হলে প্রণাম করেছি, অগ্রজকে যেমন করি। তারাশঙ্কর বয়সে আমার চেয়ে একবছর বড় ছিল। সজনী ছিল একবছর ছোট। বীরেন ভদ্র (বিখ্যাত বিরূপাক্ষ) আমাদের আর একজন বন্ধু

ছিল। সে আমাকে এখনও মেজবাবু বলেই সম্বোধন করে। তারাশঙ্করও আমার প্রতি যে অনুজসুলভ ব্যবহার করেছে বরাবর তার স্মৃতি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভাগলপুরে ১৩৪৬ সালে ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আমার জন্মদিনে আমাকে যে সম্বর্ধনা দিয়েছিল সে সম্বর্ধনা সভায় সজনীকান্ত দাস একটি অভিনন্দন পত্র নিয়ে গিয়েছিল। অভিনন্দন পত্রটি লিখেছিল তারাশঙ্কর। পাটনায় ১৩৬৪ সালে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনও আমাকে সম্বর্ধনা দিয়েছিল একবার। অসুস্থ ছিল বলে তারাশঙ্কর সেখানে যেতে পারে নি। কিন্তু লোক দিয়ে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছিল আমাকে। আর একটা কথাও মনে পড়ছে। ভাগলপুরে সেবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বর্ণজয়ন্তী হয়। কলকাতা থেকে অনেক সাহিত্যিক এবং গায়কেরা তখন এসেছিলেন আমার বাড়িতে। সভা হচ্ছে। সভায় ভাগলপুরের একজন ভদ্রলোক উঠে ভাগলপুরের অতীত গৌরব কীর্তন করে অবশেষে বললেন, এখন ভাগলপুরের আর কিছুই নেই। তবু আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মান্য করে দিন কাটাচ্ছি। 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত ইঙ্গিতে গেছে থামিয়া—ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।' ভদ্রলোক বসতে না বসতে তারাশঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বলল—যেখানে বনফুল এখনও মধ্যাহ্নদীপ্তিতে বর্তমান সেখানে উনি সন্ধ্যার অন্ধকার কি ক'রে দেখছেন তা আমার মাথায় আসছে না। পুরুলিয়ায় আর একটা সভায় আমরা দু'জনেই উপস্থিত। একজন ভদ্রলোক হঠাৎ তারাশঙ্করকে নমস্কার করে' বললেন—আপনার 'জঙ্গম' পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। বক্তৃতা করবার সময় তারাশঙ্কর বলল—সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে যখন আপনাদের সম্যক পরিচয় নেই তখন আপনারা সাহিত্যিকদের এ সভায় নিমন্ত্রণ করেছেন কেন বুঝলাম না। আপনাদের পয়সা আছে বাইজি এনে নাচ দেখলেই পারতেন। তারাশঙ্কর এই রকম স্পর্শকাতর ছিল। হঠাৎ হঠাৎ রেগে উঠত। আবার ঠাণ্ডাও হয়ে যেত-পরক্ষণে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন লেখাটা আমার পেশা হয়ে ওঠেনি। ডাক্তারি করার ফাঁকে ফাঁকে লিখতাম মাঝে মাঝে টাকাও পেতাম। কিন্তু তারাশঙ্করের অন্য কোন পেশা ছিল না। নানা জায়গায় ছোটখাটো চাকরিও করেছে সে, আর লিখে কিছু পয়সা রোজগার করবার চেষ্টাও করেছে। সজনী এ বিষয়ে তাকে অনেক সাহায্য করত। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় তার অনেক লেখা প্রকাশ করেছিল সে। জীবনের গোড়া থেকেই তারাশঙ্কর রাজনৈতিক আন্দোলনে মেতে ছিল। সে জাত সাহিত্যিক ছিল, সুতরাং রাজনীতির সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। তার এর দু' নৌকায় পা দিয়ে আমি অনেকবার তীব্র ব্যঙ্গ করে কবিতায় চিঠি লিখেছি তাকে, রেগে সে চিঠির উত্তর দেয় নি। যখন দেখা হয়েছে তখন তর্ক করেছি। কিন্তু তা কখনও মনান্তরে পরিণত হয় নি। আমার ব্যঙ্গ আমার তর্ক সাহিত্যের পরিবেশেই নিবদ্ধ ছিল, আমাদের অন্তরকে বিরক্ত করেনি। ভাগলপুরে বসে একবার শুনলাম—সন্দীপন পাঠশালার অভিনয় নিয়ে মহা হৈ চৈ হয়েছে। তারাশঙ্করকে কতকগুলো গুণ্ডা নাকি মেরেছে। শুনে বড়ই কষ্ট হল। স্মারক নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখে পাঠালাম। কবিতাটি যতদূর মনে পড়ছে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার গোড়াটা হচ্ছে—

উলঙ্গের দেশে যথা রজকের নাহি প্রয়োজন,
পরশ্রীকাতর দেশে কোথা পাবে শ্রীমান শ্রীমতী
গোলদারি কারবারে মণ দরে যেথায় ওজন
হীরা বা নিক্তির কথা সেখানে যে অবান্তর অতি।

আর শুনেছি তারাশঙ্কর নাকি ওই সব গুণ্ডাদের ক্ষমা করে' তাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল আবার। এটাও তারাশঙ্করের অদ্ভুত চরিত্রের একটা লক্ষণ। কারো সঙ্গে ঝগড়া করে বেশীক্ষণ থাকতে পারত না। দু'চারদিন পরে আবার তার সঙ্গে ভাব করে ফেলেন।

অনেক সভা, সমিতি, সম্মিলন, সংঘ প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিল সে। বরাবরই তার এ সব বিষয়ে প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। এ সব করে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাদের দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের নেক-নজরেও পড়েছিল সে। সে এম. এল. এ. ছিল, পার্লামেন্টের সদস্যও ছিল বোধহয়। সরকারের পয়সায় চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও ঘুরে এসেছিল সে। তার এই প্রবণতার সঙ্গে আমার মনের সায় ছিল না। কিন্তু এজন্য আমাদের বন্ধুত্বের ছন্দ-পতন হয় নি। সে আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে খাতির করত, আমিও করতাম তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে। আমার সঙ্গে তার মতের এবং তার জীবনদর্শনের মিল না থাকা সত্ত্বেও যে তাকে ভালবেসেছিলাম তার কারণ তার চরিত্রের ওই বিশিষ্টতা। তারাশঙ্করের সামাজিক সদ্ব্যবহারেরও অনেক পরিচয় পেয়েছি। আমি যখন ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে বাড়ি করলুম— তখন একদিন এসে সে বললে—তুমি ভাগলপুর ছেড়ে এসে ভুল করলে। কলকাতায় থাকতে পারবে কি? আমি বললাম, তোমরা যখন পারছ তখন আমিও পারব। সে বলল আমি ভাবছি লাভপুর গিয়ে থাকব। বললাম, তুমি যখন লাভপুর যাবে আমি তখন বিহার ফিরে যাব। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি আর লাভপুর গিয়ে থাকতে পারবে না। কলকাতা শত বন্ধনে বেঁধেছে তোমায়।

সত্যি আর সে লাভপুর ফিরতে পারে নি। কিন্তু সে বোধহয় একটু ভয়ে ভয়ে থাকত। যেখানে যেত—সঙ্গে একজন পাহারাদার নিয়ে যেত। শুনেছিলাম সে নাকি কোন রাজনৈতিক দল থেকে চিঠি পেয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি।

গত দু' তিনমাস থেকে পুজোর লেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল দু'জনকেই। অনেকদিন দেখা হয় নি। শেষবার যখন দেখা হয় তখন একটা কৌতুকজনক ব্যাপার শুনলাম। সে নাকি রোজ ম্যাগ সাল্‌ফ খায় পেট পরিষ্কার করার জন্য। আমি বললাম—রোজ খেও না। কিন্তু রাজি হ'ল না সে।

জীবনের শেষের দিকে ধর্মের উপর সে খুব জোর দিয়েছিল। রোজ ঠাকুরঘরে ঢুকে পুজো করত। গলায় একটা মালাও থাকত সর্বদা। শুনেছিলাম—কোন এক সাধুর কাছে না কি মন্ত্র নিয়েছে। অনেকদিন আগে সজনীর কাছে শুনেছিলাম সে এক ফকিরের খোঁজে রাত্রে গড়ের মাঠে গিয়ে না কি গুণ্ডাদের হাতে পড়েছিল। এ খবর সত্যি কি মিথ্যে জানি না। শুধু এইটুকুই জানি খামখেয়ালী তারাশঙ্করের পক্ষে সবই সম্ভব।

ইদানীং নানারকম ওষুধ খেত সে। নানারকম পিল। তার ওষুধ খাওয়ার গল্প বীরেন ভদ্র লিখেছে। দু'ঘণ্টা অন্তর অন্তর কিছু না কিছু খেত একটা। আমাকে বলেছিল—আমার স্ত্রী ওষুধ খাওয়ার ঘোর বিরোধী। আমি ওকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাই।

আরও নানা কথা মনে পড়ছে। কিন্তু সব কথা তো লেখা যাবে না। সুতরাং এইখানেই থামলাম।